বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহজালাল (রহঃ) অবদান

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

সৈয়দ শহীদ আহমদ বোগদাদী

Dhaka University Library
449281
449281
GIFT
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিঃ নং ও শিক্ষাবর্ষ- ১৮৬/ ২০০৬-২০০৭

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহজালাল (রহঃ) অবদান

আরবী বিভাগে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

449281

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. আ.স.ম আব্দুল্লাহ

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

সৈয়দ শহীদ আহমদ বোগদাদী

পিএইচ.ডি. গবেষক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি নং ও শিক্ষাবর্ষ- ১৮৬/ ২০০৬-২০০৭

জুলাই- ২০১০ইং

Dhaka University Institutional Repository

449281

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহজালাল (রহঃ) অবদান

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক সৈয়দ শহীদ আহমদ বোগদাদী কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহজালাল (রহঃ) অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

(প্রফেসর ড. আ.স.ম. আব্দুল্লাহ)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

(DECLARATION)

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, 'বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহজালাল (রহঃ) অবদান' শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

সৈয়দ শহীদ আহমদ বোগদাদী

(সৈয়দ শহীদ আহমদ বোগদাদী)

২৭/০৭/২০১০

পিএইচ.ডি গবেষক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি. নং ও শিক্ষাবর্ষ ১৮৬/২০০৬-২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তালার জন্য যিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব রূপে বিশেষিত করেছেন। যার দয়ায় মানব জাতি তত্ত্ব ও তথ্য জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম প্রাণাধিক প্রিয়তম বিশ্বনবী ও রাসুল রাহমাতুললিল আলামীনের উপর যার পরে আর কোন নবী আসবেন না। যিনি মানব কল্যাণ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছেন মানবতার মহান শিক্ষকরূপে। যার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়িন, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন, ফুকাহা, মুজাদ্দিদিন, মুবাল্লিগিন উলামা মাশায়েখ তথা দা'ঈগণ। আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি উপমহাদেশের অন্যতম আউলিয়াকুল শিরোমণি ও মহান মুবাল্লিগ শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার বিষয়ের উপর রচিত।

পিএইচ.ডি. গবেষনার লক্ষ্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রখ্যাত স্বনামধন্য অধ্যাপক আমার প্রাণাধিক পরম শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর আ.ন.ম আবদুল মান্নান খান এর সাথে দেখা করে আমার সাগ্রহ মিনতি ব্যক্ত করলে তিনি আমাকে আলোচ্য শিরোনামটি নির্ধারণের পরামর্শ দেন। তাঁর ইন্তেকালের পর অত্র বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড.আ.স.ম আব্দুল্লাহ স্যার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আলোচ্য অভিসন্দর্ভটির সামগ্রিক পরিকল্পনা, রূপরেখা, প্রণয়ন, অধ্যায় বিন্যাস তথা গবেষণা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করে দিয়েছেন। মরহুম গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর আ.ন.ম আবদুল মান্নান খান স্যারের এবং বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. আ.স.ম আব্দুল্লাহ স্যারের অকৃত্রিম আন্তরিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল আমার অন্যতম শ্রম সাধনার উৎস। যাদের সুচিন্তিত, সুপ্রসন্ন, সুদৃঢ় পরিকল্পনা, মেধাশ্রিত প্রাজ্ঞ পরামর্শ আমার গবেষণা কর্মকে স্বচ্ছ সাবলিল রূপে সহজবোধ্য করে দিয়েছে। সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণতি করে চির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক যিনি হাজারো ব্যস্ততা ও অসুস্থতার মাঝে ও সীমাহীন ত্যাগ শ্রম স্বীকার করে অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পড়ে ভুল ত্রুটি অসংগতি সংশোধন, রচনাবলীর তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক বিষয়াবলীর উপর সুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপনে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করার পথ সুগম করে দিয়েছেন। গবেষণা কর্মের জন্য যিনি অকৃপন হস্তে অবারিত দস্তে দিয়েছেন মূল্যবান বই পত্র গবেষণা ধর্মী সাময়িকি ইত্যাদি।

শুধু আজ কেন কোন দিনই আমার পক্ষে এ ঋণ শোধ হবার নয়। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যান স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. এ.বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যার ও বিভাগের সকল আছাতেজায়ে কেরামের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। অত্র বিভাগের অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গবেষণা বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমি ঋণী, তাদের সহযোগিতা কখনও ভুলার নয়। প্রশাসনিক ভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশেষতঃ এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. সেকশনের সম্মানিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একান্ত সহযোগিতা পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড় ইসলামী ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ও কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট এর সম্মানিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট ও আমি কৃতজ্ঞ।

সহপাঠী বন্ধু ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনয়িম খান, ড. আবদুল মান্নান মোল্লা সহ আর অনেকে, তাঁদের বন্ধু সুলভ আচরণ দ্বারা যে সহযোগিতা করেছেন তা কখনও ভুলার নয়। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধের বড় ভাই জনাব হাজী সৈয়দ ছাদেক মিয়া ও জনাব হাজী সৈয়দ হাফিজ আহমদ তাঁদের ঐকান্তিক দোয়া ও সহযোগিতা আমার চলার পথের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি। জনাব আব্দুর রউফ, হাজী তাহির আলী, স্নেহভাজন মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা ছালেহ আহমদ সহ কম্পিউটার ম্যান ছাইফুল আলম (সিলেট) ও নূরে আলম (ঢাকা) তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদান কামনা সহ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট শোকরিয়া আদায় করছি যিনি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে স্বার্থক করেছেন। হে আল্লাহ! আমার এ সাধনাকে কবুল কর এবং মরহুম মাতা, পিতা, শিক্ষকমন্ডলী সহ সকল মুমিন নরনারী যারা পরপারে চলে গেছেন তাদের ক্ষমা কর, মর্যাদা বৃদ্ধি কর। যারা জীবিত আছেন তাদের হায়াতে ত্বাইয়্যিবা, উপযুক্ত প্রতিদান দান কর। এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও শ্রম সাধনাকে আমার নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমীন

বিনয়াবনত

সৈয়দ শহীদ আহমদ বোগদাদী

পিএইচ.ডি. গবেষক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

পূর্ণ শব্দ	সংক্ষিপ্ত চিহ্ন
রাহিমাহুল্লাহ/ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি	রহঃ / র. / রহ.
রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু/ আনহুম	রা.
সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	সা.
মৃত্যু	মৃ.
জন্ম	জ.
খ্রিষ্টাব্দ / খ্রিষ্টিয়	খ্রি.
ঈসায়ী/ ঈসাব্দ	ঈ.
হিজরী	হি.
ডক্টর	ড.
অবসর প্রাপ্ত	অব.
সম্পাদক/ সম্পাদিত	সম্পা.
অনুবাদক / অনূদিত	অনু.
বাংলা	বা.
জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা।	জে.এ.এস.পি.
জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা।	জে.এ.এস.বি.
জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা	জে.এ.এস.বিডি.
তারিখ-ই ফিরিশতা	ফিরিশতা
জিয়া-উদ-দীন বারানী	বারানী
রিয়াজ-উস-সালাতীন	রিয়াজ
তারিখ বিহীন	তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ও হিজরী অব্দগুলোর সমপরিমাণ
খ্রিষ্টাব্দ নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপ

১। বঙ্গাব্দের সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ পেতে হলে প্রাপ্ত বঙ্গাব্দের সাথে ৫৯৩ যোগ করতে হবে যেমন ১৩৮৬ বাং + ৫৯৩ = ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ।

২। হিজরী অব্দের সমপরিমাণ খ্রিষ্টাব্দ পেতে হলে নিম্নোক্ত সূত্র পেলে অংক কষে বের করতে হবে।

$$A.H \frac{3\times A.H}{loo} + 621 = A.D.$$

হিজরী ১০৮৪- $\frac{৩\times১০৮৪}{১০০}$ +৬২১ খৃ. = ১৬৭২/ ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ।

Fracting being neglected. [১]

সন পরিবর্তনের পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতিঃ

১। হিজরী সনকে খ্রিষ্টীয় সনে পরিবর্তনের নিয়মঃ
সাধারণতঃ হিজরী সন ৩৩ বছরে খ্রিষ্টীয় সন ৩২ বছর হয়।
কেননা হিজরী হিসাব চান্দ্র বছর অনুযায়ী হয় এবং খ্রিষ্টীয় হিসাব সৌর বছর অনুযায়ী হয়।

ফরমুলা ঃ খ্রীষ্টিয় সন $\frac{৩২}{৩৩}$ (হিজরী সন) + ৬২২

উদাহরণ: ১৪১২ হি. = $\frac{৩২}{৩৩}$ (১৪১২) + ৬২২

১৪১২ × ৩২ = ৪৫১৮৪ ÷ ৩৩ = ১৩৬৯.২১
১৩৬৯ + ৬২২ = ১৯৯১ খ্রিঃ
এ হিসাবে ভগ্নাংশ বিবেচ্য নয়।

২। খ্রীষ্টীয় সনকে হিজরী সনে পরিবর্তনের নিয়ম

ফরমুলা ঃ হিজরী সন $\frac{৩৩}{৩২}$ (খ্রীষ্টিয় সন - ৬২২)

উদাহরণ: ১৯৯১ খ্রি. = $\frac{৩৩}{৩২}$(১৯৯১-৬২২)

১৯৯১ - ৬২২ = ১৩৬৯ × ৩৩ = ৪৫১৭৭
৪৫১৭৭ ÷ ৩২ = ১৪১২ হিঃ [২]

---

০১. এনামুল হক; ড. মনীষা মঞ্জুষা (ঢাকা, মুক্তধারা ১৯৮৪ইং, ৩য়) পৃ- ৫০-৫১ ও ৫৩
০২. মুস্তাফিজুর রহমান, ড. কুরআন পরিচিতি, (ঢাকা, নুবালা পাবলিকেশন্স ৩৭/বি, ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পৃ- ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ
(ABSTRACT)

অত্র অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অবদান"- অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের সুবিধার্থে এ অভিসন্দর্ভটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

০১. প্রথম অধ্যায়ে "শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (রহ.) পরিচিতি" অর্থাৎ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর প্রাথমিক জীবন তথা মুর্শিদ পরিচয়, বাল্যকাল, শিক্ষা, নছব নামা ও পীরদের শাজারাহ সহ হযরত শাহজালাল ও শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি দু'জন ভিন্ন মনীষি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

০২. দ্বিতীয় অধ্যায়ে "হযরত শাহজালাল (রহ.) এর কর্মজীবন" অর্থাৎ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর কর্ম জীবনের সূচনা লগ্নে ব্যাঘ্রকে চপেটাঘাতের মাধ্যমে কামালিয়াতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পীর ও মুর্শিদ কর্তৃক ইসলাম প্রচারের ইজাজত ও নির্দেশনা প্রদান। এ প্রেক্ষাপটে ইয়ামন, বাগদাদ, দিল্লী হয়ে বাংলাদেশের পথে শাহজালাল (রহ.) তাঁর সঙ্গী সাথী আউলিয়া বাহিনীর শুভাগমন এজনপদে। এ বিষয় আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

০৩. তৃতীয় অধ্যায়ে "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও হযরত শাহজালাল (রহ.)" অর্থাৎ বাংলাদেশ তথা বাংলার পরিচিতি, নামকরণ, ভৌগলিক সীমা, ধর্ম, অধিবাসীর আলোচনার সাথে সাথে ইসলাম প্রচারের সূচনা ও বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

০৪. চতুর্থ অধ্যায়ে- "সিলেটে ইসলাম ও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর আগমন" অর্থাৎ সিলেটের নামতত্ত্ব, ভৌগলিক বিবরণ, বিভিন্ন যুগে সিলেটের অবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, মুসলিম আগমন ও বসতি সহ মুসলিম শাসন ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি সিলেট বিজয়ের পটভূমি শাহজালাল (রহ.) এর তথায় আগমন ও বিজয়ের সময় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

০৫. পঞ্চম অধ্যায়ে "সিলেটে ইসলাম ও হযরত শাহজালাল (রহ.)" এ বিষয়ে তাসাউফ বা ত্বরিকত, কারামত, জীবনাদর্শ কবি সাহিত্যিকদের লেখনিতে শাহজালাল (রহ.) আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এর সাথে সাথে জীবনীকার, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও পত্রিকা সম্পাদকীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

০৬. ষষ্ট অধ্যায়ে 'ইবনে বতুতার সফর ও হযরত শাহজালাল (রহ.) অর্থাৎ ইবনে বতুতার পরিচিতি বিশেষতঃ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভেরজন্য সিলেট সফর, ইসলাম প্রচারে তিনিও তাঁর ৩৬০ আউলিয়া বাহিনী, শাহজালাল (রহ.) এর ওফাত, দরগা শরীফ, বিভিন্ন মুদ্রা ও শিলালিপির আলোচনা সহ ঈসালে সওয়াব উরস-ই শাহজালাল এর গঠন মুলক শরীয়তের দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও জনসেবায় যথেষ্ট অবদান রাখেন। উক্ত অবদানের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের কলেবর বা আয়তন ছড়িয়ে অসংখ্য ভল্যুম বা খন্ডে পরিণত হবে। সেজন্য বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের মৌলিক দিকসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ঃ		
	শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পরিচিতি	০১-৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ		
	হযরত শাহজালাল (রহ.) এর কর্ম জীবন	৪৭-৭০
তৃতীয় অধ্যায়ঃ		
	বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও হযরত শাহজালাল (রহ.)	৭১-১৩০
চতুর্থ অধ্যায়ঃ		
	সিলেটে ইসলাম ও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর আগমন	১৩১-২৪৯
পঞ্চম অধ্যায়ঃ		
	সিলেটে ইসলাম ও হযরত শাহজালাল (রহ.)	২৫০-৩০৫
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ		
	ইবনে বতুতার সফর ও হযরত শাহজালাল (রহ.)	৩০৬-৪১৭
তথ্য নির্দেশিকা		৪১৮-৪২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (রহ.) পরিচিতি

অবতরণিকাঃ

প্রত্যেক জাতির অতীত ও বর্তমানের মাঝে নিহীত আছে তার ভবিষ্যতের বীজ। যে জাতি তার অতীত সম্বন্ধে উদাসীন সে জাতি আত্মবিস্মৃত। আত্ম বিস্মৃত জাতি নিজেকে সভ্য জগতের কাছে পরিচয় দেবার গৌরবের অধিকারী নয়। তাই ইতিহাস জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব[১]। এতে পাওয়া যায় জাতীয় উন্নতি, পরিমাপের মাপকাঠি ও চলার পথের নির্দেশনা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনকাল থেকে শুরু করে তাঁর ইন্তেকালের অর্ধশত বছরের মধ্যে ইসলাম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পরে তাঁর প্রিয় সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উত্তরসুরী আলিমগণ ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকেন। সৈন্যবাহিনী ছাড়াও এসব আউলিয়ায়ে কেরাম ইসলাম প্রচারের জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

এসব ধর্ম প্রচারকদের অনেকেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং কখনও ব্যক্তিগত ভাবে কখনও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন। শায়খুল মাশাইখ শায়খ জালাল যিনি শাহজালাল নামে সমধিক পরিচিত। তিনি বিশ্বের মহান দরবেশদের মধ্যে অন্যতম। [২]

তখনকার সামাজিক পরিমন্ডলে ব্রাহ্মণ্যদের আধিপত্য সু-প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের শাসন-শোষণ ঘৃণা নির্যাতনে সে যুগের স্থানীয় আদম সন্তান মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হত। বর্ণ-বৈষম্যবাদের ভয়াবহ যাতাকলে তাদেরকে নিগৃহীত নিস্পেষিত জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হত। মানব জীবনের সুকুমার বৃত্তি ও মন-মানসিকতার সুষম সচেতনতার সাথে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

---

১. মুর্তাজা আলী সৈয়দ, হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, (ঢাকা, এ.বি. বুক স্টোর্স, আজিমপুর, জানুয়ারী ১৯৭০, ২সং) পৃ-১।

২. শামসুল আলম এ.জেড.এম, হযরত শাহজালাল কুনিয়াতি, (রহ.) (ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল লিঃ, আগষ্ট ১৯৯৬, ৩সং) পৃ -৫

Dhaka University Institutional Repository

এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের বুকে মুবাল্লিগ আউলিয়ায়ে কেরামদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন আল কুরআনুল করীম ও পবিত্র হাদীসের অমর বাণী। ইসলামের সাম্যমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ। তাঁদের পরিবেশ অচিরেই স্বকীয় সুষমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাঁদের রুহানিয়াত তথা অমর অন্তর উৎসারিত স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার পবিত্র ধারা নিগৃহীত সমাজ তথা এই মাটির পৃথিবীতেই যেন বেহেশতের সন্ধান খুঁজে পায় এবং সামাজিক সুবিচার ও প্রকৃত মানবতাবাদী আদর্শের উপস্থিতিতে বর্ণবৈষম্য ক্লিষ্ট নিম্নবর্ণের মজলুম মানুষ নির্বিঘে তাদের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের শৃংখল ভেঙ্গে খান খান করে সাবেক ধর্ম কৃষ্টি সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে দলে ইসলামের সার্বজনীন সাম্যের তাওহীদ ও রিসালাতের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নব উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

যেসব সুফীয়ায়ে কেরামের ত্যাগ ও সাধনার বদৌলতে বাংলাদেশ ও আসামের মানুষ পবিত্র ইসলামের আব-এ কাওসারের সন্ধান পেয়েছে [৩] তাদের মধ্যে সিলেটের হযরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) অন্যতম। তাঁর অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই আজ এ অঞ্চলের ব্যাপক গণ মানুষের আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যুগ যুগ ধরে দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী নামে খ্যাত সিলেট শহরে সমাহিত এ মুকুটবিহীন আধ্যাত্মিক সম্রাটকে ভক্তিভরে যথার্থ আন্তরিকতার সহিত সম্মান করে আসছেন। যার বাস্তব প্রমাণ আজও প্রতিদিন দুরদুরান্ত থেকে হাজারো হাজারো ভক্ত আশেকীন সালাম পেশ করার মানসে তাঁর পবিত্র মাযার জিয়ারত করে থাকেন। সুক্ষ দৃষ্টিতে তাঁর পবিত্র মাযার ও আঙ্গিনা প্রাঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, সত্যিকার অর্থে এখানে মহান আল্লাহর ওলী শায়িত রয়েছেন এবং তাঁরই সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় এ রাজত্বের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিশেষতঃ শত সহস্র গরীব দুঃখী ও দুস্থ মানবতার সাহায্য ও ভরণ-পোষনের জ্বলন্ত প্রমাণ এখানে অর্থাৎ মাজার প্রাঙ্গণে বিদ্যমান। এখানে প্রতিদিন এদের আহার্য্য ও ভরণ পোষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক সাহায্য- সহযোগিতা অলৌকিক ভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম প্রচার ও খিদমতে খালক্ব তথা জনসেবার সুমহান ব্রত নিয়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে যে কাজের সূচনা করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তদীয় সঙ্গী সাথী সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে, এরই ধারাবাহিকতা অনুকরণ ও অনুসরণে হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী (রহ.) আজ থেকে সাত শত সাত বছর পূর্বে তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সেই মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ৩৬০ আউলিয়া বাহিনী যেন জালালিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বাংলাদেশ ও আসাম অঞ্চলের সকল ধর্মপ্রাণমুসলমান এ সংগঠনের সাধারণ সদস্য। প্রকৃত নায়েবে নবী, আলেম উলামা, পীর মাশায়েখ, বুযর্গানে দ্বীন যেন এ মিশনের কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য। শায়খুল মাশাইখ শাহজালাল (রহ.) এর সুযোগ্য উত্তর সুরী হিসেবে তারা

---

৩. প্রাগুক্ত পৃ- ৯

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ, মাদরাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খানকাহ, এতিম খানা, লঙ্গরখানা ও বহুমুখী সেবা মূলক বিভিন্ন সংস্থার প্রতিষ্ঠা, পৃষ্ঠপোষকতা, পরিচালনা করার মাধ্যমে যেন জালালিয়া মিশনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এতদঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতায়। ইসলাম ও মুসলমান আক্রান্ত হলে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর আউলিয়া বাহিনীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এর সমুচিত জবাব প্রদান করে থাকেন।

সিলেট শহরে সমাহিত সুফী সাধক হযরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) এর আধ্যাত্মিক প্রভাব এবং অক্লান্ত সাধনায় সিলেট, কাছাড়, কুমিল্লা, নোয়াখালী, মোমেনশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা তথা বাংলা - আসামের লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের সুশীতল শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেন। সুফী সাধকের প্রেম ভালোবাসা, সেবা ও সাধনার প্রভাবেই বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচারিত হয়।

বহু প্রখ্যাত কামিল সুফি সাধকের মধ্যে হযরত শাহ জালাল (রহ.) একটি বিশেষ দিক দিয়ে অনন্য। তিনি নিজে যে শুধু ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন তা নয়। তাবলীগে দ্বীন তথা ইসলাম প্রচারের দিকে তার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষ তার খানকায় এসে মুক্তির বাণী শুনতে পেত। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্বের বাণী ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের দাওয়াত দিয়ে তিনি তার সঙ্গী আউলিয়াদের পাঠাতেন দূর দূরান্তে। বাংলাদেশের অন্য কোন সুফীসাধক তাঁর মতো ৩৬০জন সঙ্গী আউলিয়া নিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন বলে তেমন কোন জনশ্রুতি নেই। শাহজালাল (রহ.) ৭০৩ হি. মোতাবেক ১৩০৩ ঈসায়ী সেনাপতি সিকান্দর শাহকে নিয়ে সিলেট আসেন।[৪]

---

৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর প্রাথমিক জীবনঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলাদেশ ও আসাম অঞ্চলের একজন মহান ও বিশিষ্ট সুফী সাধক ছিলেন। তিনি মুসলিম বাংলার ইতিহাসের ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁকে এদেশের মুসলিম জাতি সত্তার আদি রূপকার বা 'পেট্রন সেইন্ট অব বাংলাদেশ' বলে চিহ্নিত করা হয়। তিনি এতদঞ্চলের পথিকৃৎ ইসলাম প্রচারক সুফী গুরু শায়খুল মাশায়েখ হযরত শাহজালাল (রহ.)।

জীবন পরিচিতিঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৮ঈ.) ও আলা উদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ ঈ.) সমরকালীন দুটো শিলালিপিতে তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে। ১৬১৩ ঈসায়ী একজন শাত্তারী[১] সূফী পন্ডিত মুহাম্মদ গাউস মানডুবীহ কর্তৃক সংকলিত 'গুলজারে আবরার' গ্রন্থে শাহজালাল সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই লেখক দাবী করেন যে, তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন 'শায়খ আলী শের রচিত শারহ-ই-নুজহাতুল আরওয়াহ' নামক গ্রন্থ থেকে। শায়খ আলী শের সিলেটের শায়খ জালালের শিষ্য ও সঙ্গী শায়খ নুরুল হুদার একজন বংশধর। আধুনিক কালে শাহজালাল সম্পর্কে লিখিত প্রথম জীবনী গ্রন্থ হচ্ছে 'সুহেল-ই-ইয়ামন'। সিলেটের মুন্সেফ মৌলভী নাসির উদ্দিন হায়দার ফার্সী ভাষায় ১৮৫৯ ঈসাব্দে গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং উহা লক্ষ্মৌর নেওল কিশোর কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সিলেটের মুফতি পরিবারের কাজী মুহাম্মদ হাসানের লাইব্রেরীতে দুখানি ফার্সী পান্ডুলিপি ছিল, একখানি মুহী-উদ-দীন খাদিমের 'রিসালা' এবং অন্য খানি অজ্ঞাত নামা লেখকের 'রাওদ্বাত-উস-সালাতিন'। দু'খানি পান্ডুলিপিই বর্তমানে পাওয়া যায় না, তবে নাসির উদ-দীন হায়দার সুহেল-ই-ইয়ামন লেখার সময় ঐ দুটি পান্ডুলিপির সাহায্য নেন। ঐ দুখানি পান্ডুলিপিও সিলেটে মুসলিম বিজয়ের চারশ বছর পরে রচিত। প্রথমটি ১৭১১ঈসায়ী এবং দ্বিতীয়টি ১৭২১ ঈসায়ী লিখিত।[২] এর সমর্থন অন্যান্য সমসাময়িক বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়।

---

১. রহিম এম.এ.ড. (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামন অনু.) বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, (ঢাকা বাংলা একাডেমী জুন ২০০৮, ১খ, ১২০৩- ১৫৭৬, ২-সং) পৃ- ৭৩। পঞ্চদশ শতকে শাত্তারিয়া তরিকা বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়। বিখ্যাত সুফী তাইফুর বিস্তামী (৭৫৩-৮৪৫ঈ.) থেকে এই সিলসিলার উৎপত্তি নিরূপন করা হয়।

২. আহমেদ শরীফ উদ্দিন, প্রফেসর, সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, (ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, জুলাই ১৯৯৯, ১ সং) পৃ- ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পৈতৃক বাসস্থান জাযিরাতুল আরবের ইয়ামন দেশ। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ, পিতামহের নাম ইবরাহীম। বাল্যকালে তাঁর পিতা-মাতা ইন্তেকাল করেন। শৈশবে তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দী তাঁকে পুত্র সম লালন পালন করেন। তাঁর পিতা কুরাইশ ও মাতা সৈয়দ তনয়া ছিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর বাল্য জীবন ইতিহাসের হারানো অধ্যায়। তার পিতা মুহাম্মদ অত্যল্প বয়সেই জিহাদে শহীদ হন। সম্ভবতঃ সুন্দর এ পৃথিবীর আলো দেখার পূর্বেই শাহজালাল (রহ.) পিতৃ হারা হন। জিহাদের ঐতিহ্য ছিল শাহজালাল (রহ.) এর পরিবারে। জিহাদী প্রেরণা ছিল তার শোণিতে। পরবর্তী জীবনে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় সংগ্রামী মহামানব রূপে। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন।

৯১৮ হি. / ১৫১২ ঈসায়ী সুলতান হোসেন শাহের আমলের একটি শিলালিপিতে[৩] ও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পিতার নাম মুহাম্মদ বলে উল্লেখ রয়েছে। এইচ.ই স্টাপলটন শিলালিপির সংশ্লিষ্ট অংশের নিম্নরূপ অনুবাদ করেছেনঃ In the honour of the greatness of the respected Shaik Ul Mashaikh Makhdum Shaikh Jalal Muzarrad son of Muhammad.[৪] শিলা লিপির ভাষায় বআজমতে শায়খুল মাশাইখ মাখদুম শায়খ জালাল মুজাররদ বিন মুহাম্মদ।

মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার প্রণীত 'সুহেল-ই-ইয়ামন' (১৮৫৯/৬০খ্রি.) গ্রন্থ অবলম্বনে ড. জে. ওয়াইজ বলেন- Shahjalal Mujarrad Yamani was the son of a distinguished saint, whose title of shaikus Shuyuke is still preserved. He belonged to Quraish Tribe, Shah Jalal's Father was named Muhammad.[৫]

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়ঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পিতার সঠিক নাম সম্বন্ধে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। (১) মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার রচিত 'সুহেল-ই-ইয়ামন' (১৮৫৯ঈ.) নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে তার পিতার নাম মাহমুদ (২) তাওয়ারিখ-ই-জালালীতে তার পিতার নাম শায়খ-উশ-শুয়ুখ মাহমুদ ইবন মুহাম্মদ ইব্রাহিম। (৩) সিলেট শহরের আম্বরখানায় (৯১১ হি.) আবিস্কৃত হোসেন শাহী শিলালিপিতে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পিতার নাম মুহাম্মদ বলে উল্লেখ আছে।[৬] (৪) ড. ওয়াইজ 'সুহেল-ই-ইয়ামন' গ্রন্থের আলোকে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে অবশ্য তার পিতার নাম মুহাম্মদ বলে উল্লেখ করেছেন।

---

৩. হাসানদানী আহমদ, বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইন্সক্রিপশন্স অব বেঙ্গল, (এপেন্ডিক্স-২ দি জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা ১৯৫৭ ভল্যুম-২) পৃ-৭।
৪. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, (জে.এ.এস.বি কলকাতা ১৯২২) পৃঃ ৪১৩।
৫. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, অগ্রপথিক সংকলন, আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম, (ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৯৫ ১সং) পৃ-৫।
৬. ব্লকম্যান ড. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা বায়মিট অব ক্লুনিয়া (১৮৭৩ খ্রি.) পৃ- ২৮০-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী কালে অধিকাংশ জীবনী লেখক হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পিতার নাম মাহমুদ অথবা মাহমুদ বিন মুহাম্মদ লিখেছেন।[৭]

(৫) হযরত শাহজালাল বিখ্যাত কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ও পিতামহের নাম ইব্রাহিম। তাঁর পিতা মোহাম্মদ ইয়ামনীর পূর্ব পুরুষ আরব দেশের ইয়ামন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।[৮]

মোহাম্মদ ইয়ামনী ধর্মযুদ্ধে (জেহাদে) নিহত হন। পিতামাতা উভয়ই ছিলেন কোরাইশ বংশীয় ও বিখ্যাত ওলী আল্লাহগণের বংশধর।

(৬) শাহজালালের পিতা মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম কোরায়শী ছিলেন তাইজের (Taiez) নিকটবর্তী আজ্জান দুর্গের আমীর। তিনি ছিলেন ইয়ামনের সুলতান মালিক মুহাম্মদ শামসুদ্দীনের হাদীসের শিক্ষক। সে সময় কেন্দ্রীয় সুলতান ও শক্তিশালী সামন্ত আমীরদের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত চলত। এরূপ এক খন্ডযুদ্ধে শাহজালালের জন্মের পূর্বেই আমীর মুহাম্মদ শাহাদত বরণ করেন।[৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, শিলালিপিতে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পিতার নাম মুহাম্মদ লেখা রয়েছে বিধায় তিনি শায়খ (শাহ) জালাল এবং পিতার নাম মুহাম্মদ। মাহমুদ বা মাহমুদ বিন মুহাম্মদ হতে পারে না এবং তিনি কুরাইশ বংশীয়।

উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে- "হযরত শাহজালাল ইয়ামনী কা-তায়াল্লুক কবিলায়ে কুরাইশ ছে থা। আপকে ওয়ালিদ কা নাম মুহাম্মদ থা। যিণকে আছলাফ ইয়ামন ছে কাওনিয়া আয়ে থে। শাহজালাল কে ওয়ালিদাইন উনকে বাছপন হীমে ওফাত পায়ে গায়ে"।[১০]

অর্থাৎ- হযরত শাহজালাল ইয়ামনীর সম্পর্ক কুরাইশ বংশের সাথে ছিল। তার পিতার নাম মুহাম্মদ ছিল। যার পূর্ব পুরুষ ইয়ামন হতে কাওনিয়ায় এসেছিলেন। শাহজালাল (রহ.) এর পিতা মাতা শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন।

মাতৃপরিচয়ঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাতৃ পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তার জন্মের কয়েক মাস পরেই কারও কারও মতে তিনমাস পরেই পিতৃহীন শাহজালাল (রহ.)মাতৃহারা হন। মাতৃ-পিতৃহীন এই ইয়াতিম শিশুকে লালন পালন করার ভার নেন তার এক নিকটাত্মীয়[১১] শিশু জালালের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন শিশুর খালু।

---

৭. চৌধুরী আব্দুল মালিক, হযরত শাহজালাল (কলকাতা, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৩১) পৃ- ৬।
৮. আজহার উদ্দিন আহমদ মুফতি, সিদ্দিকী, শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, (সিলেট নভেম্বর ১৯৩৮, ১সং) পৃ-২২।
৯. ফজলুর রহমান, সিলেটের একশত একজন, (সিলেট, ফখরুল কবির খাঁ, এপ্রিল ১৯৯৪ ১সং) পৃ- ১৭।
১০. উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যা (দানিশগা পাঞ্জাব, লাহোর, ১৩৯১হিঃ /১৯৭১ঈ. ৭খ. ১ সং) পৃঃ ৩৩২।
১১. ওয়াইজ ড. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা, পৃ- ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কারও কারও মতে লালন পালনকারী মনীষী ছিলেন তুর্কিস্তানের মহান সাধক খাজা সৈয়দ আহমদ ইয়াসভী। তবে অধিকাংশ লেখকের মতে তাঁর আধ্যাত্মিক উস্তাদ মাতুল এবং শিশুকালে লালন-পালনকারী ছিলেন সৈয়দ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দী। [১২]

শাহজালাল (রহ.) এর পিতা মোহাম্মদ ইয়ামনী। জালাল সুরুখ বুখারী নামক জনৈক ভদ্রলোকের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জালাল সুরখ বুখারী উত্তরকালে ভারতবর্ষে এসে মুলতানের নিকটবর্তী উঁচে বসতি স্থাপন করেন এবং তথায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (জ.৫৯৫ হি. মৃ.৬৫২ হি.)। মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার লিখেছেন যে, শাহজালাল (রহ.) এর মাতা হযরত জালাল বুখারীর কন্যা ছিলেন।[১৩] কোন কোন জীবনী লেখক মুলতানের সৈয়দ আহমদ কবির সুহরাওয়ার্দিকে শাহজালালের মাতুল বলে উল্লেখ করেছেন[১৪]। এই তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর মাতার আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

তবে এই তথ্য কতটুকু সঠিক তাতে সন্দেহ আছে। সৈয়দ জালাল বুখারী উঁচে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুরা নাম সৈয়দ জালাল উদ্দিন মুনীর শাহ সুরখ বুখারী। উঁচের এই বিখ্যাত জালাল বুখারী সাইয়্যিদুস সা'দাত এবং শুযুখ বুখারী নামে ও পরিচিত ছিলেন।

হযরত জালাল বুখারীর পাঁচ পুত্র ছিলেন। পুত্র সৈয়দ আলী সৈয়দ জাফরের জন্ম হয় বুখারাতে তাঁর বুখারার স্ত্রীর গর্ভে। উঁচে বসতি স্থাপন করার পর তিনি আরো বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী বিবি ফাতিমার গর্ভে উঁচে তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন সৈয়দ আহমদ কবির, সৈয়দ বাহা উদ্দিন এবং সৈয়দ মুহাম্মদ[১৫]। কোরাইশ বংশীয় ছিলেন। মাতা ছিলেন সৈয়দা[১৬]। উল্লেখ্য শাহজালালের মাতা সৈয়দা হাসিনা ফাতিমা বিনতে সৈয়দ জালালুদ্দিন সুরখ বোখারী। তিনিও ৩ মাসের শিশু জালালকে রেখে ইন্তেকাল করেন। এ স্থলে লক্ষনীয় যে, হযরত শাহজালালের মাজার রয়েছে উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে সিলেট শহরে এবং তাঁর নানা, মামা ও মামাত ভাইয়ের মাজার রয়েছে উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে মুলতানের উঁচ্ শরীফে। আরও লক্ষণীয় যে, শাহজালালের বাল্যকাল বহুলাংশে রাসুলে করিম (সা.) এর জীবনের সাথে মিলে যায়। উভয়েই পিতৃহীন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে মাতৃহারা হন। তাঁর পিতামহ ও চাচা / মামা দ্বারা লালিত পালিত হন[১৭]।

---

১২. Azhar Uddin Ahmed, Shahjalal and his Khadims (Sylhet, welsah Mission press, Sylhet 1914) P. 37

১৩. হযরত শাহজালাল কুনিয়াজী (রহ.) পৃ-৩।

১৪. Shahjalal and his Khadims, p-37

১৫. প্রাগুক্ত পৃ-৩৮

১৬. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা, ইফাবা, নভেম্বর ১৯৮৭, ২খ, ২সং) পৃ - ৩৭৬

১৭. সিলেটের একশত একজন, পৃ- ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আত্ম পরিচয়ঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনীর উপর কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখা নেই। সুফী দরবেশ বা তাঁদের অনুসারীগণ নিজের কর্তব্য কাজ নিষ্ঠা আন্তরিকতার সহিত আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির লক্ষে করে যান। আত্ম পরিচয় বা আত্ম প্রচার তাঁদের কাম্য নয়। অনেকে নিজের নাম পর্যন্ত গোপন করে অতি তুচ্ছ শব্দের নামে নিজেদের পরিচয় দেন। তাই তাদের ওফাতের শত শত বছর পর ইতিহাস চেতনা সম্পন্ন কৌতুহলী ব্যক্তিরা বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা আউলিয়ার জীবন কাহিনী দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। মনে হয় হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। এমনিভাবে তাঁর মাতা পিতার পরিচয় সম্বন্ধে বিতর্ক আছে তা নয়, তাঁর আত্ম পরিচয় সম্বন্ধেও বিতর্ক আছে[১৮]। অথচ শাহজালাল যেই সময় সিলেট শুভাগমন করেন সেই সময়কার দিল্লির সুলতানাত ও তাদের আওতাধীন রাজ্য ও রাজা বাদশাহদের ঘটনাবলী রাষ্ট্রীয় ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গে সাথীদের ইন্তেকালের শত শত বৎসর পর তাঁর আংশিক ইতিহাস প্রামাণ্য হিসেবে শিলালিপি বা পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপমহাদেশের বিভিন্ন দরবেশ আউলিয়াদের জীবন থেকে ধার করা এবং এমন সব অপ্রাসঙ্গিক কথা ও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবন কাহিনীতে ঢুকে গেছে যে, কোন কোন লেখক যেমন ধরুন (ব্লকম্যান সাহেব) সিলেট শাহজালাল নামে কোন ওলীর মাজারের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ পোষণ করে বসেছেন। ব্লকম্যানের মতে হযরত শাহ জালালের বিবর কাহিনী এবং সঙ্গী আউলিয়ার জীবন কথাও কাল্পনিক[১৯]।

হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র হলো সিলেট শহরের আম্বরখানা মহল্লায় প্রাপ্ত হোসেন শাহী শিলালিপি (৯১১ হি.)। এই শিলালিপিতে তাঁর নাম (শাহজালাল) শায়খ জালাল (রহ.) নামে অংকিত আছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) এর নাম এক শব্দে; তা হল জালাল। এক শব্দের নাম আরবীয় রীতি। যেমন আমাদের নবীর নাম এক শব্দের মুহাম্মদ (সা.)। উমর, উসমান, আলী, যুবাইর, তালহা (রা.), প্রভৃতি এক শব্দের নাম।[২০]

শায়খ আরবী শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ বয়োবৃদ্ধ। কিন্তু এর প্রয়োগিক অর্থ হচ্ছে ইসলামিক আইন ও ধর্ম তত্ত্বে জ্ঞানী ব্যক্তি। এই অর্থে শায়খ একজন আলিমও বটে। কিন্তু শায়খ হচ্ছেন সেই আলিম যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং অপরের আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে সহায়তা করেন। মুসলমানদের মধ্যে সুফীদের শায়খ বলা হয়। ভারত উপ মহাদেশে এবং বাংলায় সুফীদের শায়খ, মাখদুম, পীর ও মুর্শিদ বলা হয়। বাংলার সুলতানদের লিপিমালায় শায়খ ও মাখদুম দ্বারা সুফীদের বুঝানো হয়েছে। এ আমলের লিপিগুলো আরবী ভাষায় লেখা হতো বলে ফার্সী পীর শব্দটির উল্লেখপাওয়া যায় নি। কিন্তু বাংলার জন সাধারণের নিকট শায়খ অপেক্ষা পীর শব্দটি বেশী জনপ্রিয়।[২১]

---

১৮. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.) পৃ-৫।
১৯. ঢাকা রিভিউ - (আগষ্ট ১৯১৩ ই.) পৃঃ ১৫৩।
২০. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভি (রহ.) পৃ- ৭।
২১. বাংলা পিডিয়া, (ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, ৯খ, ১ সং) পৃ- ২৯৬।

শায়খ কোন ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক প্রধান আধ্যাত্মিক নেতাকে তার উত্তরাধিকারীগণ এবং শাখা প্রধানগণ কর্তৃক এই খেতাব প্রদত্ত হয়।[২২]

লিছানুল আরব (৩য় খন্ড ৫০৯ পৃষ্ঠা) 'শায়খ' বলতে প্রধান ব্যক্তি, পঞ্চাশের উর্ধ্ব বয়স্ক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে বলা হয়েছে)

شيخ: تدل هذه الكلمة علي الشخص الذي يحمل علائم كبر السن وقد نيف علي الخمسين عاما – ২৩

'شيخ' هذا اللقب الذي يطلق علي مؤسس الطريقة الصوفية يطلق ايضا علي من يأتون بعده علي رأس المراتب في الطريقة و كذالك علي رؤساء الفروع المختلفة–

আর-রায়িদ নামক আধুনিক আরবী অভিধানগ্রন্থে 'শায়খ' এর নয়টি অর্থ লিখেছেন। তা নিম্নরূপ:

١ – الذي بلغ من الشيوخة وهي غالبا ما فوق الخمسين

٢ – رجل الدين عند المسلمين

٣–العالم

٤ – الاستاذ المعلم

٥ – كبير القوم

٦ – كل كبير المقام

٧ – شيخ العل عند الدروز هو رئيس مذهبهم وزعيمهم الروحي ورئيس مجلسهم المذهبي

٨ – شيخ المرأة زوجها

٩ – شيخ النار ابليس – ২৪

'শায়খ' সম্মান সূচক শব্দ। সিলেটের শায়খ জালালকে শাহজালাল নামে সবাই জানে। শায়খ কিভাবে কখন 'শাহ' এ পরিণত হল। তা অজ্ঞাত।[২৫]

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন এ উপমহাদেশে দিল্লির সুলতানাত ছিল। সে সময় রাষ্ট্রভাষা ফার্সী ছিল। ফলে আমাদের সংস্কৃতিতে আরব ঐতিহ্য থেকে পারস্য ঐতিহ্য অধিকতর প্রবল। ফার্সী 'শাহ' এর প্রভাব সমাজ জীবন অতিক্রম করে ওলী আউলিয়াদের খানকা, মাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। মধ্য যুগে রাজা বাদশাহদের শান শওকত জাঁকজমক জনমনে এত প্রভাব সৃষ্টি করেছে যে, অনেকের কাছে 'শাহ' শব্দটি সম্মান সূচক হয়ে যায়। তাছাড়া বাংলাদেশের মুসলিম রাজন্যবর্গ দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, মুলতানের রাজা-বাদশাহদের কারো কারো মতো অত্যাচারী ছিলনা। ঐ সকল অঞ্চলে ওলী দরবেশদের নামের আগে 'শায়খ' শব্দই ব্যবহার করা হয়। শাহ শব্দ ব্যবহার করা হয় না। তাই শাহ খাজা মঈনুদ্দীন, শাহ মুজাদ্দিদে আলফে সানি, শাহ নিজামুদ্দীন আউলিয়া শব্দ শুনা যায় না, কিন্তু বাংলাদেশের ওলী দরবেশদের নামের আগে বা পরে শাহ শব্দটি ব্যবহার করা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ ওলী দরবেশদের 'শাহ' উপাধিতে ভূষিত করে সম্মান দেখায়, মহাত্ম আরোপ করে। এই প্রবণতার ফলেই জনগণ শায়খ জালালের পরিবর্তে শাহজালাল নামের সঙ্গেই পরিচিত হয়ে ওঠে এবং বর্তমানে এটা তার নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[২৬]

---

২২. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৯৭, ২৩ খ, ১সং) পৃ: ৫৫৭।
২৩. মাহদী আল্লামা মুহাম্মদ ড. দায়িরাতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়্যা, (আরবী), (দামেস্ক, সিরিয়া, দারুল ফিক্র, ২০ জুলাই ১৯৩৩ই. খ-১৩) পৃ: ৪৬৮-৬৯।
২৪. মাসউদ জুবরান, আর-রায়িদ, আধুনিক আরবী অভিধান (বাইরুত, লেবানন, জানুয়ারী ১৯৮৬, ২খ, ৫সং) পৃ: ৯০২।
২৫. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান (ঢাকা, ২খ, ১৯৫৬) পৃ - ৬৪-৬৫।
২৬. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী, পৃ-৮

'শাহ' এর শাব্দিক অর্থ সম্রাট, রাজা। ফার্সী শব্দ রাজা আরবী অভিধানে আল মালিকু এবং 'শাহানশাহ' মালিকুল মুলুক[২৭] সম্রাট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'শাহুল বাহার' বসরার রাজা। এইরূপ মুসলিম দেশ সমূহে 'শাহ' শব্দটি রাজা নিদর্শন সাধারণ প্রচলিত শব্দে অব্যাহত ভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই উপাধি আরবী উপাধি সম্পন্ন এমন শাসক গণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ফেরদৌসির রচনার ক্ষেত্রে গাসসানের আমীর মাহমুদ। নিয়মিত স্তুতি কবি শ্রেণীর নিকট স্বাভাবিক ভাবেই 'শাহান শাহ' উপাধি ব্যবহার একটি অতি সাধারণ প্রথা এবং যথেষ্ট উদারভাবে ইহার চর্চা করা হয়ে থাকে। ভারতের বেশ কয়েকজন মোঘল সম্রাটের নামের মধ্যে উহার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ হিসেবে 'শাহ' শব্দের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। (শাহজাহান, আজম শাহ)[২৮] আহমদ নগর, বীদার বেয়ারভিজাপুর ও গোলকুন্ডার শাসক শ্রেণীর মধ্যে এই শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। শতাধিক বছর পূর্ব থেকে প্রকৃত ত্বরিকত পন্থি প্রখ্যাত আলিম ওলামা পীর-মাশায়েখদের নামের পূর্বে শাহ শব্দের ব্যবহার রীতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

বিশেষতঃ পাক ভারতের আলিম ওলামা বুজুর্গানে দ্বীনের নামের সঙ্গে যুক্তভাবে উহার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যে মহান পরিবার বর্গের মাধ্যমে পাক ভারতে উলুমুল কুরআন ও উলুমুল হাদিছ এসেছে এবং যারা নিষ্টা ও আন্তরিকতার সহিত তাদের সারাটা জীবন এই খেদমতে উৎসর্গ করেছেন তারাই 'শাহ' পরিবার। এই 'শাহ' পরিবার বিশুদ্ধ পবিত্র কুরআন, পঠন এবং তাঁর মমার্থ সঠিকভাবে বুঝাবার জন্য তরজমা ও তাফসীর শাস্ত্র প্রনয়ন করেন। সাথে সাথে হাদিছ শরীফের সঠিক মর্মার্থ কিভাবে বুঝা যায় এ বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করে এই খিদমতে কঠোর পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণা করেছেন। সেই পরিবারের সম্মানিত মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিছীন বুযুর্গানে দ্বীনের নামের পূর্বে 'শাহ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.), শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.), শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.), শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.), শাহ আব্দুল কাদির মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) প্রমুখ বিশ্ব বরেণ্য ত্বরিকত পন্থী ওলামায়ে কেরাম। আল্লাহ তাদের রুহানী ফয়েজ থেকে আমাদের ফয়জিয়াব করুন। (আমিন)।

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জন্মস্থান

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জন্মস্থান সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[২৯] তাঁর জীবনীর প্রাথমিক উপকরণগুলি প্রধানতঃ উপাখ্যানমূলক। অবিসম্বাদিত ভাবে সত্য কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের অভাবে এই উপাখ্যানগুলিকেই আশ্রয় করে তদীয় ইতিহাসের গোড়াপত্তন করতে হয়। গভীর অনুসন্ধান ও প্রচুর বিশ্লেষণ পরে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাও প্রাচীর সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত হযরত শাহ জালাল (রহ.) জীবনেতিহাসের প্রারম্ভের দিকটা এমনি মসিমলিন যে, উপাখ্যানের ক্ষীন বর্তিকার সাহায্য না নিয়ে তথায় প্রবেশ করা চলে না।

---

২৭. আর রায়িদ (আধুনিক আরবী অভিধান) পৃঃ ৮৬০।

২৮. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৭ ২খ, ২সং) পৃ-৩৪০

২৯. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.), পৃ-৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জন্মস্থান সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি অভিমত প্রদত্ত হল।

প্রথমত ঃ তুর্কিস্থানের অন্তর্গত কুনিয়ার অধিবাসী

দ্বিতীয়ত ঃ তুর্কিস্থান জাদ বাঙ্গালী

তৃতীয়ত ঃ বুখারায়

চতুর্থত ঃ ভারতের ইটোয়া এবং সিলেটে

পঞ্চমত ঃ ইয়ামনে।

এখন এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করছি

(০১) সিলেট শহরের আম্বরখানায় প্রাপ্ত ৯১১/১৫০৫ সালের আবিস্কৃত শিলা লিপি অবলম্বনে হযরত শাহজালাল (রহ.) কে কুনিয়ার অধিবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিলালিপির অংশ বিশেষ অনুবাদ নিম্নরূপ শ্রেষ্ঠ আবিদ (আবিদে আ'লা) ও শ্রেষ্ঠ শায়েখ (কিবারিশ শায়েখ) শায়খ জালাল মুজর্রদকুনিয়াভি 'কুদ্দুসিল্লাহি শরহিল আজিজ'। সুলতান আলা উদ্দিন আবুল মুজাফফর সুলতান খাল্লাদাল্লাহ্ মুলকাহ্ ও সুলতানাহ্ (আল্লাহ তার রাজ্য ও সার্বভৌমত্বকে দীর্ঘজীবি রাখুন।) খানে আযম খালিল খান জামদার গয়র মায়ানী ও সর লস্কর ও উজির ইকলিমে মুয়াজ্জামাবাদ ৯১১ হিজরী (১৫০৫ ঈ.)।[৩০]

উল্লেখ্য, কেউ কেউ উল্লেখিত হোসেনশাহী শিলালিপির সূত্রে দাবী করেন যে, সিলেটের শায়খ জালাল (রহ.) জন্মসূত্রে তুর্কিস্তানের কুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের মতে শিলালিপিতে শায়খ জালাল মুজররদ কুনিয়ায়ি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ- তিনি অবিবাহিত এবং কুনিয়ার লোক ছিলেন। কুনিয়া বর্তমান তুরস্কের একটি শহর।[৩১] অধ্যাপক ড.আব্দুল করিম প্রমুখ এমতের প্রবক্তা। ড. মঈন উদ্দিন খান ইসলামী বিশ্বেকোষে যুক্তি প্রমাণ সহ ঐ দাবী প্রত্যাখ্যান করেন বলেন- কোনিয়া তখনও বাইযানটাইন খৃষ্টান সাম্রাজ্যের অধিনে ছিল, তাহা মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত, তুর্কীস্তানের কোন জনপদ নয়। অতএব কোনিয়ায় তাঁর জন্ম গ্রহণের কোন কথাই উঠেনা। কোনিয়াকে কুনিয়া মনে করে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীর পিতার নির্বাসিত স্থানের সাথে শাহজালালের জন্ম স্থানের সিদ্ধান্ত নেহায়াত কাল্পনিক বৈ কিছু নয়।[৩২]

হেনরী ব্লকম্যান যিনি ১৮৭৩ সালে স্বপ্ন ভিত্তিক ১৫০৫ সালের হোসেন শাহী শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, শিলালিপিতে বর্ণিত কুনিয়া ইয়ামনের একটি স্থান। কিন্তু কোন কোন লেখক পাঠোদ্ধারকারীর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন যার কোন যুক্তি নেই। এছাড়া ড. সাগীর হাসান মাসুমী দাবী করেন যে, শিলালিপির সংশ্লিষ্ট অংশটি বিনষ্ট এবং পাঠোদ্ধারযোগ্য নয়। অধ্যাপক ড. আব্দুল করিমের মতে সুহায়ল-ই-ইয়ামন অবলম্বনে দরবেশ এসেছিলেন ইয়েমেন থেকে, তবে এটিভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর মতে ১৮৭৩ ঈসায়ী সিলেটে আবিস্কৃত একটি শিলালিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, শাহজালাল ছিলেন কুনিয়ায়ি। অর্থাৎ তিনি এসেছিলেন কোনিয়া এলাকা থেকে। ড. সগীর হাসান মাসুমীর মতে ঐ শিলালীপির অংশটুকু বিকৃত হয়ে গেছে। কথিত শিলালিপিতে যেভাবে 'কুনিয়াভী' লেখা হয়েছে আরবী ফার্সী সাহিত্যের কোথা এরূপ উল্লেখ নাই।[৩৩]

---

৩০. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন, দেওয়ান, সিলেট বিভাগের ইতিহাস, (ঢাকা, সৈয়দা তাহেরা বেগম, নাজীবাজার, ২০০৬ঈ. ১ সং) পৃ ৭২

৩১. সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ ১০৮।

৩২. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা, ইফাবা, ২৩ খ) পৃ ৬৫১-৫২।

৩৩. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান (JASP), (Vol. X No. 2, Dec 1965) P. 65-66

Dhaka University Institutional Repository

এতদসত্ত্বেও অধ্যাপক ড. করিম দাবী করেন যে, তিনি এসেছিলেন তুরস্কের কুনিয়া শহর থেকে।[৩৪] অথচ ৩৬০ আউলিয়ার কেউ নিজেকে কুনিয়াভী বলে পরিচয় দেননি। বরং ইয়ামানী বলে পরিচয় দানকারী অনেক সঙ্গী-সাথী ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হল যে, ৯১২/১৫০৫ সালের শিলালিপিটির একটি ছাপ জে.ওয়াইজ পাঠোদ্ধারের জন্য ব্লকম্যানের কাছে প্রেরণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, শিলালিপিটি বা এর অংশ বিশেষ দুর্বোধ্য ছিল। Block man শিলালিপির ছাপটি (Rubbing) প্রকাশ করেন নাই।

ফলে তার পাঠ সঠিক কিনা তা যাচাই করা যাচ্ছেনা। এজন্য সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। অপরদিকে শাহজালাল (রহ.) কে আরবীয় বলেই ড. ব্লক স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং ভুল পাঠের কথা সহজেই ধরা পড়ে।

ড. সগীর হাসান মাসুমী এ অংশটি Damaged বলে দাবী করেন। তার একথা অদ্যাবধি কেউ চ্যালেঞ্জ করেননি। ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদানগুলো ড. সগীর হাসান মাসুমীর ধারণার অনুকুল। কারণ জালাল উদ্দিন রুমী ব্যতিত সেইসময়ে প্রখ্যাত কোন জালাল উদ্দিন কুনিয়াভির অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয়ঃ এস.এম. ইকরাম সি.এস.পি গুলজারে আবরার ১৬১২ ঈ. সূত্রে দাবী করেন যে, শাহজালাল তুর্কিস্থান জাদ বাঙ্গালী, তার মতে কথিত গুলজারে আবরারে তাকে তুর্কিস্থান জাদ বাঙ্গালী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ শাহজালাল (রহ.) না ছিলেন তুর্কিস্থানী আর না ছিলেন বাঙ্গালী। তুর্কীস্তানের সুফীদের তালিকায় শায়খ জালাল বিন মুহাম্মদ বলে প্রখ্যাত কোন সুফীর উল্লেখ নেই। গুলজারে আবরারে তার মুর্শিদের নাম বলা হয়েছে সৈয়দ আহমদ ইয়েসভী। অথচ তিনি শাহজালাল (রহ.) এর জন্মের অনেক আগে ১১৭৮ ঈসায়ী ইন্তেকাল করেন।[৩৭] এস.এম. ইকরাম ঐ গ্রন্থের বরাতে 'আবে কাওছার' গ্রন্থে লিখেছেন যে- 'আপ তুর্কিস্তানী থে মগর পয়দাইশ বাংগালা কি হায়।'

গুলজার সম্পর্কে এস.এম. ইকরাম বলেন Unluckily the urdu version contains some material errors, and even a perfectly accurate manuscript copy of the persian original is not available. [৩৮]

---

৩৪. বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; (ঢাকা, মার্চ ২০০৩. ৯ খ, ১সং) পৃঃ ৩১০।
৩৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা গবেষণা বিভাগ (ঢাকা, ইফাবা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫) পৃঃ ৮
৩৬. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, হযরত শাহজালাল দলিল ও ভাষ্য (ঢাকা, ই.ফা.বা. জুন- ১৯৯৯, ১সং) পৃ- ৩৬০।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৯
৩৮. An Unnoticed Account of Shaikh Jalal of Sylhet. JASP (Vol. 11, Dhaka, 1957), p-64.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ মুফতি আজহার উদ্দিন দাবি করেন যে, কুনিয়া বুখারায় অবস্থিত। তাই তিনি বুখারার অধিবাসী। তিনি বলেন "ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হতে আগত একদল তীর্থযাত্রী দৃঢ়তার সাথে আমাদের বলে গেছেন যে, কুনিয়া বোখারার সমীপবর্তী একটি ছোট শহর এবং ইহা স্বয়ং তারা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।" তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক যে, একথাও সত্য। তাহলে কোন কুনিয়া বা কোনিয়ার অধিবাসী ছিলেন সিলেটের শাহজালাল (রহ.)? একজন ব্যক্তিতো এই তিনটি ভিন্ন স্থানে জন্ম গ্রহণ করতে পারেন না।

চতুর্থঃ শেখ শুভোদয়া গ্রন্থের মতে (যা ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত) তিনি ছিলেন ভারতের উত্তর প্রদেশের ইটোয়ার অধিবাসী। গুলজারে আবরারে তাঁকে তুর্কিস্তানজাদ বাঙ্গালী হবার তথাকথিত দাবীর মতই এটি ও আরেকটি উদ্ভট দাবী। শাহজালাল (রহ.) উত্তর প্রদেশের ইটোয়া বা তুর্কিস্তান জাদ বাঙ্গালি হতে পারেন না।

জনৈক ভারতীয় লেখকের মতে তিনি সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। এটাও একটা ভুয়া ও মনগড়া মতামত; এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

উল্লেখ্য গুলজার বা নুজহাতুল আরওয়াহ্ ও শোনা কথার উপর বিশ্বাস করে লেখা হয়ে থাকবে যার কোন প্রামান্য উৎস নেই। এ কারণেই গুলজারে দরবেশের পরিচিত ও পীর প্রসংগ অন্যান্য প্রামাণ্য উৎস দ্বারা সমর্থিত নয়। আর প্রাচীনত্বের বিচারেতো গুলজারের চেয়ে শেখ শুভোদয়া বেশী প্রাচীন। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত বলে কথিত জাল শেখ শুভোদয়া গ্রন্থের মতে শায়খ জালাল জন্মসূত্রে উত্তর ভারতের ইটোয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাহলে প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে যাচাই বাছাই না করেই কি দরবেশকে উত্তর ভারতের অধিবাসী বলে মেনে নিতে হবে? এ গ্রন্থের বক্তব্যের স্বপক্ষে ও কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। [৩৯]

পঞ্চমতঃ শাহজালালের জন্মস্থান ইয়ামন শাহজালালের জীবন বৃত্তান্তের উৎস হল দুটি প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়ের আলোকে মুনসেফ নাসির উদ্দিন হায়দার কর্তৃক ১৯৫৯/৬০ ঈ. রচিত সুহেলই-ইয়ামন। এতে হযরত শাহজালালকে দক্ষিণ আরবের ইয়ামন বাসী বলা হয়।[৪০]

হযরত শাহজালাল (রহ.) সামপ্রতিক জীবনীকারদের মধ্যে শামসুল আলম শাহজালাল (রহ.) কে তুর্কি বংশদ্ভুত বলে দাবী করেন্ তিনি বলেন, শায়খ জালালকে যদিও বহু গ্রন্থে ইয়ামনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং স্থানীয় জনসাধারণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি ইয়ামনবাসী ছিলেন, আমরা তাঁর ইয়ামনের হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করতে পারি না। আমরা দেখেছি যে, তিনি তুর্কিস্থানের অন্তর্গত কুনিয়াবাসী ছিলেন। তিনি আরো বলেন, ইয়ামনী নামটি হযরত শাহজালালের নামের সঙ্গে এত বেশি জড়িত যে,মনে হয় হযরত শাহজালালের ইয়ামন দেশের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল। [৪১] তবে একাধিক গবেষক ও জীবনীকারের বরাত দিয়ে তিনি বলেন "এমন হইতে পারে যে, শায়খ জালালের পূর্বপুরুষ ইয়ামেন বাসী ছিলেন।"

---

৩৯. সিলেট বিভাগের ইতিহাস, পৃ ২২-২৩

৪০. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৯৭, ২৩ খ, ১সং) পৃ ৬৪৯।

৪১. শামসুল আলম এ.জেড.এম, হযরত শায়খ জালাল (রহ.) (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৩, ১সং) পৃ ৩১।

পক্ষান্তরে শাহজালালের সর্ব শেষ জীবনীকারের উল্লেখ দিয়ে ড. মঈন উদ্দিন আহমদ খান বলেন, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী নির্দেশ করেন যে, তাঁর দরগায় রক্ষিত একটি ফলক লিপিতে তিনি কোনিয়ার অধিবাসী ছিলেন বলে উল্লেখ আছে, যা বুকানন সাহেব ইয়ামনের একটি স্থান বলে মন্তব্য করেছেন।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের (সিলেট) আজীবন সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল হক (মরহুম) এ বিষয়ে গবেষণাকরে তার সারা জীবন কাটিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"পুণ্যভূমি আরবের হিজায পবিত্রতম স্থান। সেই হিজায ক্ষেত্রের সংলগ্ন দক্ষিণ ভূ ভাগই-ই ইয়ামন এবং এই ইয়ামন প্রদেশের অন্তর্গত 'কার্ণিয়া' নামক স্থানে শাহজালাল (র.) এর জন্ম হয়।"[৪২]

উল্লেখ্য ইয়ামনে কার্ণিয়া বা এরূপ কোন স্থান আছে কিনা জানা দরকার। হযরত শেখ শরফ উদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরী (রহ.) রচিত মাকতুবাতে সদী তাসাউফের একখানি প্রসিদ্ধ কিতাব। ইহা ৭৫৭ হি. সনে প্রণীত হয় ইহাতে কার্ণ বা ক্বারণ নামের একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা এই, যখন ক্বারণ প্রদেশে ওয়াসে (রহ.) ছিলেন। তখন হযরত রসুল করিম (সা.) এরশাদ করেছিলেন- নিশ্চয় ইয়ামনের দিক হতে আল্লাহর সুগন্ধি পাচ্ছি। (মাকতুবাতে সদী- পৃঃ ৭৫)

প্রাণিধান যোগ্য যে, কবি জালালুদ্দিন রুমীর জন্মস্থান কুনিয়া ছিল না। তিনি ৬০৪/১২০৭ সনে ইরান দেশের খুরাসান এর অন্তর্গত বালখ এ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতা বাহা উদ্দিন ওয়ালাদকে এক সময় দেশান্তরে গমন করতে হলে তিনি পুত্র জালালুদ্দিন কে সঙ্গে নিয়ে সর্বশেষ প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোনয়ায় বসতি স্থাপন করেন। পিতার মৃত্যুর পরেও পুত্র জালালুদ্দিন তথায় বসবাস করতে থাকেন এবং ইন্তেকালের পর সেখানেই তিনি সমাহিত হন বলে তাঁকে কুনিয়ায়ী ও রুমি নামে স্মরণ করা হয়। [৪৩]

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, শাহজালালের জন্মস্থান রুমীর বাসস্থান কুনিয়াতেই নয়।

পক্ষান্তরে তাঁর অসংখ্য হিন্দু মুসলমান ইংরেজী জীবনীকার এ বিষয়ে একমত যে, তিনি ইয়ামেনী ছিলেন আরবী ছিলেন। তাঁর এক শব্দ বিশিষ্ট নাম (জালাল) তাঁর আরবী ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে।[৪৪]

অতএব, তাঁর আরব ও ইয়ামেনী হওয়া এবং মুজাররদ (চিরকুমার) হওয়ার বিষয়টি নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত।

---

৪২. (ক) নুরুল হক মুহাম্মদ, হযরত শাহজালাল ইয়ামনী, (সিলেট আল ইসলাহ, শাহজালাল সংখ্যা, ১৩৬৪ বাংলা) পৃঃ ১২৮ (খ) আজহার উদ্দিন আহমদ মুফতি শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি (সিলেট ১৩৮৬ বাংলা, ৩সং) পৃ ৩১

৪৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৯৭, ১ খ, ১ সং) পৃ ৪৩১

৪৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৯৭, ২৩ খ, ১ সং) পৃ ৬৫০

হযরত শাহজালাল ইয়ামনী হওয়ার দলিলঃ

প্রাচীন কয়েকটি নসবনামা সূত্রে জানা যায় যে, শাহজালাল (রহ.) জন্মসূত্রে ইয়ামনী ছিলেন। তাঁর কতিপয় ইয়ামনী সঙ্গী ও ইয়ামন থেকে তাঁর সাথে এদেশে আগমন করেন। এঁদের অনেকের বংশধর এখনও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। হযরত শাহজলালের সাথী বংশধরদের অনেকের কাছে অদ্যাপি এরকম অনেক লিখিত প্রমাণ মওজুদ আছে। এসবকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। হযরত শাহজালালের সাথী ৩৬০ আউলিয়ার অনেকের মাযার জালালাবাদের বিভিন্ন স্থানে যুগ যুগ ধরে সম্মানিত ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে আসছে। এদের অনেকে ইয়ামনের অধিবাসী।[৪৫] সিলেটে সর্বজন মান্য অর্থাৎ এসব মাযার ও প্রমাণ হিসেবে গণ্য।

৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ আলী ইয়ামনী (রহ.) সুলেমান করনী কুরায়শীর নাম হযরত শাহজালাল ও ৩৬০ আউলিয়া সংক্রান্ত প্রায় সকল গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত শাহজালালের মাযারের পাশেই ইয়ামনের যুবরাজ শাহ আলী ইয়ামনী চিরন্দ্রিায় শায়িত আছেন।[৪৬] সুলেমান করনী কুরায়শী সিলেটের করণশীতে ইসলাম প্রচার করেন। এখানেই তার মাযার অবস্থিত। একারণেই স্থানটির নাম হয়েছে করণশী এবং অন্যান্য স্থানে বর্তমান। অবিশ্বাসীরা (সন্দেহ প্রবণ অর্থে) কি হযরত শাহজালালের এসব সাথী দরবেশদের এবং তাদের বংশধরদের (যারা ছিলেন/ আছেন) অস্বীকার করবেন?[৪৭]

ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজ লেখকগণ সহ প্রায় লেখকই হযরত শাহজালালকে ইয়ামনের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রায় পৌনে দুশ গ্রন্থ ও প্রবন্ধে শাহজালাল (রহ.) কে ইয়ামনী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

১. অধ্যাপক ড. এনামুল হক এর A History of Sufism in Bangal পিএইচ.ডি. থিসিস গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট শিলালিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা সত্ত্বেও হযরত শাহজালাল (রহ.) কে বার বার 'ইয়ামনী' বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন Shah Jalal Mugarrad-I-Yaman (d. 1346): The tomb of this saint of Bengal is in the distric of Sylhet.[৪৮]

২. বাংলা সুহরাওয়ার্দীয়া সাধকদের মধ্যে শ্রীহট্টের বঙ্গ বিখ্যাত সাধক শাহজালাল মুজাররদ-ই-ইয়ামনী একটি অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। বাংলার মুসলমান এই স্বনাম খ্যাত দরবেশের নিকট এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির জন্য প্রভূত পরিমাণ ঋণী।[৪৯]

---

৪৫. বাংলা পিডিয়া, (ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি মার্চ- ২০০৩, ৪র্থ ১সং) পৃঃ ২৪২
৪৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (৪৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা। ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫) পৃ. ৮
৪৭. দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় ১০/১২/২০০৩ইং।
৪৮. Enamul Haq; Dr. A History of Sufism in Bengal (Dhaka 1975) P-218-24
৪৯. আল ইসলাহ (সিলেট কেমুসাস, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৬৪ বাংলা) পৃঃ ৮১

Dhaka University Institutional Repository

৩. হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন আরবের অধিবাসী। ইয়ামন দেশ হতে দিল্লি হয়ে তিনি সিলেট আসেন এবং সেখানেই তার সাধনা সিদ্ধির বাস ভূমি রচনা করেন।[৫০]

৪. তিনি আরবের ইয়ামন হতে সিলেটে আগমন করেন।[৫১]

৫. হযরত শাহজালাল ছিলেন মুজাররদ বা চির কুমার। তাঁর জন্ম হয়েছিল আরবদেশের ইয়ামন প্রদেশে। তাই তিনি হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী নামে মশহুর।[৫২]

৬। এশিয়া মহাদেশের আরবদেশের ইয়ামন[৫৩] প্রদেশের কুনিয়া বা কার্নিয়া নামক স্থানে তার জন্ম। পিতার নাম মুহাম্মদ।

এসব গ্রন্থ ছাড়া আরো শতাধিক গ্রন্থে হযরত শাহজালাল (রহ.) কে 'ইয়ামনী' বলা হয়েছে। নিম্নে কতিপয় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তাঁরাও হযরত শাহজালাল (রহ.) কে 'ইয়ামনী' বলে উল্লেখ করেছেন।

1. The famous faker Hazrat Shah Jalal had been born in Yamen in Arabia.[৫৪]

2. The conquest of Sylhet by Muslims is ascribed by traditon to Shah Jalal of Yamen.[৫৫] The short account of Shah Jalal given by Dr. Wise in the Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1873. Page 278, Seems to be based on the suhail-I- Yaman Complited in 1859 by Nasir uddin Haidar. The original persian text was published in Calcutta in 1894 and a material translation in to Bengali by Elahi Baksh was printed in to Bengali year 1278.

3. This man was a native of Yamen in Arabia.

4. According to Munsif[৫৭] (Nasiruddin). Shah Jalal Muzarrad Yamani was the son of a distinguished saint. Whose title of Shaikhus Shuyak is still preserved.

এসকল বিবরন নিশ্চিত প্রমাণ করে যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) ইয়ামনী ছিলেন। কোন কোন আধুনিক পন্ডিত শিলালিপির দোহাই দিয়েই শাহজালাল (রহ.) কে আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) এর দীর্ঘকালের সাধনা ক্ষেত্র কুনিয়ার বাসিন্দা বানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করেছেন, ড. সগীর হাসান মাসুমী।

---

৫০. বজলুর রশীদ আ.ন.ম, আমাদের সুফীসাধক (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৭৭) পৃ- ৬
৫১. নুর মুহাম্মদ আজমী, মাওলানা হাদিসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (ঢাকা এমদাদীয়া লাইব্রেরী- ১৯৬৬ই.)পৃ-২৬২
৫২. চৌধুরী মুহাম্মদ মুসলিম, উজ্জল এক নায়ক (ঢাকা ই.ফা.বা ১৯৮০) পৃ-৯
৫৩. চৌধুরী, গোলাম আকবর সাহিত্য ভূষন, ইসলাম জ্যোতি হযরত শাহজালাল (রহ.) (সিলেট ১৯৭০) পৃ ৯
৫৪. B.C. Allen. I.C.S. Assam District Gazetteers (Sylhet Vol. 11, Sylhet 1905), p- 24.
৫৫. E.A. Gait I.C.S. History of Assam (Sylhet 1905), p- 40
৫৬. Provincial Gazetteers of India. Eastern Bengal and Assam p.p 54/65.
৫৭. J. Wise, Dr. Notes of Shah Jalal the patron saint of Silhat, cited by H. Blochmann Cotribution to the Geography and History of Bengal (Muhammadan perid calcutta. 1873, P. 73.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন- Accepting the fourteenth century as the era of Shahjalal as indicated by the inscription preserved in the Dacca Museum (Dated 918/1512) and supported by the statement of Ibn-e-Battuta it becomes difficult to accept the version of Gulzar-I-Abrar[৫৮] of Ghousi which was compiled in 1022 Ah/1613 Ad. is about two centuries after the time of Shah Jalal especially when the version is compared with the Expression (কিনাঈ) which has wrongly been considered by a number of scholars. Moreover the attributive term derived from (ক্বাওনিয়া) কুনিয়া is কুনয়ভী (ক্বাওনওয়ী)=and not (কিনইয়ায়ি) which has, in this sense never been used in the whole Arabic persian literature.[৫৯]
The only possible explanation, Which can be offered at the present moment is therefore, that the expression in the inscription has wrongly been deciphered due to the fact that this part of the inscription is damaged and the original word must be read as সানয়ানী বা আল-ইয়ামনী instead of কুনিয়াভী which is supported by traditional version recorded by the suhail-I-Yaman that Shahjalal hailed from Yaman.[৬০]

উক্ত আলোচনায় ও হযরত শাহজালাল (রহ.) যে ইয়ামনী ছিলেন তা প্রমাণিত হল। এছাড়া আরো অনেক গ্রন্থে ও হযরত শাহাজালাল (রহ.) কে ইয়ামনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করা হল।

ক. আব্দুল কাদির কবি. ড.মুহাম্মদ এনামুল হক স্মারক বক্তৃতামালা, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ- ১২৮।

খ. সুফিয়া আহমদ ড. মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল, ঢাকা ১৯৭০ পৃ- ৩৩০।

গ. বাংলা একাডেমী. ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ - ১৩০

ঘ. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ. বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ পৃঃ ৩৮৫।

ঙ. মুহাম্মদ মতিউর রহমানঃআয়না-ই-ওয়াইসী (উর্দু) পাটনা, ভারত ১৯৭৬, পৃ- ২৭-২৮।

চ. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফঃ ইসলাম ও মানবতাবাদ, ঢাকা ১৯৮০, পৃ - ১৪

ছ. সাদেক শিবলী জামানঃ বাংলাদেশের সুফী সাধক ও ওলী-আউলিয়া (২য় সংস্করন), ১৯৮১ পৃ- ১-২

জ. খান বাহাদুর আহসানউল্লাঃ আউলিয়া চরিত, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ - ৫১

ঝ. উর্দু দায়রায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া, দানিশগাহ পাঞ্জাব, লাহোর ৭ম খন্ড ১৩৯১ হিঃ ১৯৭১ ঈ. ভাষ্য- (হযরত শাহজালাল ইয়ামনী কাতায়াল্লুক কবিলায়ে কুরাইশ ছেথা) পৃ- ৩৩৩।

---

৫৯. ইহা একটি চ্যালেঞ্জ বলে প্রতিয়মান হয়। আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের কোথায়ও এর এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না।

৬০. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান (JASP. Vol. X No. 2, December 1955) P- 65-66

ইয়ামেনের সানআয় অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন, ১৯৮৪ উপলক্ষে বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের স্পীকার আলহাজ্ব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ইয়ামনে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জন্মস্থান পরিদর্শন করে এসেছেন।[৬১]
উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত যে হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী ছিলেন।

জন্মকালঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। এটা অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত নয়। যখন এ শিশুর জন্ম হয় তখন কেই বা জানতো যে এ সন্তানের ভবিষ্যত বিপুল সম্ভাবনাময়। যদিও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সম-সাময়িককালে ইতিহাস বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল, তবুও তখনকার দিনে সাধারণতঃ রাজা-বাদশাহদের কাহিনীই ইতিহাসে স্থান পেত। সুফী সাধকদের নীরব সাধনার কথা তৎকালীন ঐতিহাসিকদের আলোচনার বিষয় হত না। সুফী-সাধকদের জীবন কথা লিখে গেছেন তাদের ভক্ত এবং সঙ্গীগন। দুর্ভাগ্যবশতঃ হযরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) এর সঙ্গীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি তাঁর ঘটনাবহুল জীবনালেখ্য লিখবেন। আর যদিও কিছু লিখে থাকেন তবে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। ফলে পরবর্তীকালীন লেখকদের জন্য তার জীবনকালের নানা ঘটনা, জন্মতারিখ জানা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার তাঁর "সুহেল-ই-ইয়ামন" গ্রন্থে যে তারিখ দিয়েছেন তা শাহজালাল (রহ.) এর জীবনের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন ৬২ বছর বয়সে ৫৯১ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়। সে হিসেবে তার জন্ম তারিখ দাড়ায় ৫২৯ হি.। এ সন সত্য হতে পারে না। কারণ তাতে শাহজালাল (রহ.) এর জীবনের বহু ঘটনা অসম্ভব হয়ে যায়।[৬২]
পাশ্চাত্য লেখক গীবসের "হিষ্টরী অব ইয়ামনী ডায়নেষ্টি" গ্রন্থ সূত্রে কেউ কেউ বলেন যে, হযরত শাহজালালকে ইয়ামনের শাসনকর্তা সুলতান ওমর আশরাফ ১২৯৬ সালে বিষ মিশ্রিত শরবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। এ সময় শাহজালালের বয়স ছিল ৩০ বছর[৬৩] সে অনুযায়ী তার জন্ম তারিখ ১২৯৬-৩০=১২৬৬ সালে নির্ধারিত হবার কথা।
আবার বাংলা একাডেমী ১২৭১ ঈসায়ী তার জন্ম তারিখ নির্ধারণ করেছেন। অথচ ১২৫৮ সালে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় শাহজালাল (রহ.) বাগদাদে ছিলেন। বিধায় ১২৬৬ বা ১২৭১ ঈসায়ী তাঁর জন্ম তারিখ হতে পারে না। কারণ ১২৫৮ ঈসায়ী শাহজালাল (রহ.) বাগদাদে জীবিত ছিলেন বলে স্বয়ং ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন।[৬৪]

৬১.বাংলাদেশ অভজারভার ২৭/১২/৮৪ইং, সাপ্তাহিক যুগভেরী সিলেট ৩১/১২/৮৪ ও ইসলামীক ফাউন্ডেশনপত্রিকা জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪।
৬২. হযরত শাহজালাল কুনিয়াতী পৃ ১০
৬৩. ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা, ইফাবা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫) পৃ ৯
৬৪. বাংলা একাডেমী চরিতাবিধান, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী জুন ১৯৮৫, ২সং), পৃ ৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বাবু সুখময় মুখোপাধ্যায় হযরত শাহজালাল ও শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযিকে অভিন্ন দেখিয়েছেন এবং তার জন্ম তারিখ ১২০০ ঈসায়ীর কাছাকাছি সময়ে বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতার উক্তি অনুসারে তার জন্ম এই সময়েই। সৌরসন অনুযায়ী ১১৯৭ ঈসায়ী, চান্দসন অনুযায়ী ৫৯৭ হি. ১২০২ খ্রি.।[৬৫]

ইবনে বতুতার সফর নামার আলোকে শাহজালাল (রহ.) এর জন্ম তারিখ ১১৯৬/১১৯৭ সালে নির্ধারিত হয়েছে। প্রায় সকল আধুনিক পন্ডিতই এই তারিখের উল্লেখ করে থাকেন।[৬৬]

হালাকু খান যখন বাগদাদ ধ্বংস করেছিলেন তখন সাধক শাহজালাল (রহ.) বাগদাদে ছিলেন। ঐ ঘটনাটি ঘটেছিল ১২৫৮ ঈসায়ী তথা ৬৫৬ হিজরীতে। তখন শাহজালাল (রহ.) এর বয়স ছিল ২৫-৩০ এর মধ্যে। এ হিসেবে অনুমান করা যায় যে, তিনি ১২২৮ এর কাছাকাছি কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন।[৬৭]

যদি ধরে নেয়া যায় যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) ৩২ বছর বয়সে বাংলাদেশে উপনীত হন, তবে তাঁর জন্মতারিখ দাঁড়ায় ৬৭১ হি. (১২৭১ ঈ.)। কারণ হোসেন শাহী শিলালিপি মতে শাহজালাল (রহ.) ৭০৩ হিজরীতে সিলেট বিজয় সম্পন্ন করেন।[৬৮]

উল্লেখ্য বিশ্ব বিখ্যাত সুফি পরিব্রাজক ইবনে বতুতার সাক্ষে জানা যায় যে, শাহজালাল (রহ.) ১৫০ বছর বয়সে ৭৪৬ হিজরী ইন্তেকাল করেন। এই হিসেবে তার জন্ম তারিখ (৭৪৬ - ১৫০) = ৫৯৬ হিজরী সনে হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে তার জন্ম তারিখ ৫৯৬ হিজরী সনে নির্ধারণ করা হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে তিনি ৭৪৮ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।[৬৯] এই হিসাবে তার জন্ম তারিখ (৭৪৮ - ১৫০) = ৫৯৮ হিজরী সনে হয়। ড. মাহদী হাসানের মতে ৭৪৭ হিজরী/ ১৩৪৭ ঈসায়ী শাহজালাল (রহ.) এর মৃত্যু তারিখ মেনে নিলে তার জন্ম তারিখ হয় (৭৪৭-১৫০) = ৫৯৭ হিজরী সনে।

ড. এম.এ রহিম বলেন ইবনে বতুতার বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে এই সিদ্ধ পুরুষ ১১৯৭ ঈসাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৭০] অতএব, হিজরী তারিখ উল্লেখ না করে অনেক পন্ডিত ১১৯৭ ঈসাব্দে জন্ম তারিখ নির্ধারণ করেছেন।

তাঁর জন্ম তারিখসংক্রান্ত সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইসলামী বিশ্বকোষ ২৩তম খন্ডে শাহজালাল (রহ.) এর জন্মতারিখ ১১৯৭ ঈসাব্দের স্থলে অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম কর্তৃক অনুমিত ১২০১ঈ. করা হয়েছে। কেননা এতে করে শাহজালাল (রহ.) নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সাথে দিল্লীতে (মৃ. ১৩২৫ঈ.) এবং ১৩০৩ ঈ. সিলেট বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন।[৭১]

---

৬৫. মুখোপাধ্যায় সুখময়, অধ্যাপক, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) (ঢাকা, খানব্রাদার্স এন্ড কো. প্যারিদাস রোড, এপ্রিল- ২০০০), পৃ ৬৮

৬৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা, ইফাবা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫) পৃ-৯

৬৭. মাসিক ভারতবর্ষ ঃ (২৯শ বর্ষ, ২খ, ১ স, পৌষ ১৩৪৮ বাংলা) পৃ- ৪০

৬৮. হযরত শাহজালাল কুনিয়াজী (রহ.), পৃ-১

৬৯. শহীদুল্লাহ মুহাম্মদ ড. ইসলাম প্রসঙ্গ, (ঢাকা, রেনেসাস প্রিন্টার্স লি: ১৯৬৩) পৃ-৯৮

৭০. রহিম এম.এ. ড. (মোহাম্মদ অসাদুজ্জামান অনু.) বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৮ইং, ২ সং, ১ খ) পৃ- ৭৩

৭১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩ খ, পৃ ৬৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মুর্শিদ পরিচয়, বাল্যকাল ও শিক্ষা

হযরত শাহজালাল (রহ.) বাল্যকালে পিতা ও মাতা ইন্তেকাল করেন। শৈশবে তার মামা সৈয়দ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দী তাঁকে পুত্রবৎ লালন পালন করেন। সৈয়দ আহমদ কবীরের পীর ও উস্তাদ ছিলেন সৈয়দ শাহ জালাল উদ্দিন বুখারী।[৭২]

সৈয়দ আহমদ কবীর দিল্লীর সম্রাট ফিরুজ তোঘলকের মুর্শিদ জালাল উদ্দিন মাখদুম জাহানীয়ান জাহান গাসৃতের (মৃ. ১৩৮৩ ঈ.) পিতা ছিলেন। হযরত শাহজালাল এর পিতা মুহাম্মদ বিখ্যাত দরবেশ জালাল সুরখ বুখারীর (১১৯৯-১২৯১ঈ.) কন্যাকে বিবাহ করেন। জালাল সুরখ বুখারী মুলতানের নিকটবর্তী উঁচ এ বাস করতেন ও সেখানে তার মাজার রয়েছে।[৭৩]

তাঁর মায়ের ওফাতের পর শিশু জালালের লালন-পালনের ভার নেন দাদা ইব্রাহিম কোরেশী। তিনি ছিলেন বিখ্যাত দরবেশ। তাইজ নগরীতেই তাঁর মাজার অবস্থিত। মূর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ৭৩০ হিজরীতে ইয়েমেন সফরকালে এই মাজার জিয়ারত করেন।

অদৃষ্টের নিবন্ধন, রাজরোষে পতিত হয়ে ইব্রাহিম কোরেশী ৬৭৩ হিজরীতে কারাবন্দী হন। বন্দী অবস্থায় ৬৮৩ হিজরীতে কারাগারে ইন্তেকাল করেন। দাদার কারাবন্দী হওয়ার পর তিন বছরের শিশু জালালের লালন পালনের ভার নেন তার মামা সৈয়দ আহমদ কবির। তিনি ছিলেন মক্কা শরীফের বিশিষ্ট আলিমও ওলী আল্লাহ। এ সময়ে তিন বছরের এতিম শিশু জালাল ইয়েমেন হতে পবিত্র মক্কায় আসেন। তার নানা জালাল উদ্দিন সুরুখ বোখারী ছিলেন অতি উচু স্তরের ওলী আল্লাহ। তিনি পাঞ্জাব ও রাজপুতনায় ইসলাম প্রচার করেন। ১২৫৮ সালে হালাকুখানের বাগদাদ ধ্বংসের সময় তিনি সেখানে ছিলেন। ৬৯১ হিজরীতে তিনি মুলতানের উঁচ শরীফে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন হযরত বাহা উদ্দিন জাকারিয়ার মুরিদ।

তার মামা ও মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ কবীর ৭২৫ হিজরীতে পিতার গদ্দীনশীন অবস্থায় উচ্ শরীফে দেহত্যাগ করেন। সৈয়দ আহমদ কবীরের পুত্র জালালুদ্দীন জাহানিয়া জাহাগাশত ও ৭৮১ হিজরীতে উঁচ শরীফে ইন্তেকাল করেন।[৭৪]

সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পীর ও মুর্শিদ এটাই সাধারণ বিশ্বাস। তবে এসম্বন্ধে ও বিতর্ক আছে। এই বিতর্কের সূত্র গাউসি মাজভী রচিত গুলজার-ই আবরার (১৬১৩ ঈ.) গাউসির বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত শাহ জালাল (রহ.) এর মুর্শিদের নাম খাজা আহমদ ইয়াসভী। এই মতটি সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

---

৭২. আল ইসলাহ, ২৬শ বর্ষ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৫৪ইং) পৃ ৭৭

৭৩. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ ৫

৭৪. ফজলুর রহমান, সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ (সিলেট, লে. কর্ণেল (অব.) আব্দুল মান্নান, এপ্রিল ১৯৯১, ১সং) পৃ ১৮৩-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

তুরস্কের ইতিহাসে ইয়াসভি নামে পরিচিত সুফী-সাধকদের একটা সিলসিলাহ পাওয়া যায়। বর্তমান তুরস্কে ও ইয়াসভি সুফিদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। লোক তাদেরকে সম্মান করে 'আতাইয়াসভি' বলে ডাকে। তুর্কি আতা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল পিতা। একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, রসুল (সা.) এর ইশারায় ইয়াসভি দরবেশদের কামালিয়াত হাসিল হয়।

খাজা আহমদ ইয়াসভি গোড়ার দিকে বিখ্যাত দরবেশ বাবা আরসালানের শাগরিদ ছিলেন। দরবেশ বাবা আরসালানের ইনতেকালের পর তিনি বুখারায় আসেন এবং খাজা ইউসুফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। খাজা ইউসুফের প্রথম দুই খলিফা খাজা আব্দুল্লাহ বারকী এবং খাজা হাসান আনদাকি এর ইন্তেকালের পর খাজা আহমদ ইয়াসভি তৃতীয় খলিফা মনোনীত হন এবং প্রচার কার্য চালিয়ে যান। কিছু কাল পর তিনি তুর্কিস্থানের ইসা নামক স্থানে যান। তুরস্কের অপর একজন বিখ্যাত দরবেশ খাজা আব্দুল খালেক আহমদ ইয়াসভির ইশারায় তিনি ইসা গিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

খাজা আহমদ ইয়াসভীর আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কাসিফীর বর্ণনা দেখা যায় যে, আহমদ ইয়াসভী খাজা আলী রামতানির সমসাময়িক ছিলেন। খাজা আলী রামতাতিনী ৭১৫ হি. (১৩১৫-১৬ ঈ.) ইন্তেকাল করেন।[৭৫]

গুলজারে আবরারের বর্ণনা অনুসারে হযরত শাহজালাল সুফীদের খাজা বা নকসবন্দি ত্বরিকায় মুরিদ ছিলেন। সোহেল-ই ইয়ামনের মতে তিনি সোহরাওয়ার্দী ত্বরিকার মুরিদ ছিলেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলী বলেন সোহেল ই ইয়ামনের লেখক বোধ হয় শেখ জালাল মুজাররদকে উচঁর বিখ্যাত দরবেশ শাহজালাল বুখারীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করে তাঁর পীরদের নাম দিয়েছেন। তাঁর মতে গুলজারে আবরারের বর্ণনা প্রাচীনতর ও অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য, সুতরাং সিলেটের শাহজালাল খাজা বা নকসবন্দিয়া তরিকার মুরিদ ছিলেন। কারণ ঐ সময়ে খাজা বা নকসবন্দিয়া ত্বরিকা তুর্কিস্তানে বিশেষ ভাবে গৃহীত হয়েছিল।

সোহেলী ইয়ামেনের লেখক ভুলে সৈয়দ আহমদ কবির কে সৈয়দ জালালুদ্দিন বুখারী মাখদুম জাহানিয়ান জাহান গাসতের শিষ্য দেখিয়েছেন। মাখদুম জাহানীয়া জাহান গাসত সৈয়দ আহমদ কবিরের পুত্র ছিলেন। সৈয়দ আহমদ কবির তাঁর পিতা সৈয়দ জালাল বুখারীর মুরিদ ছিলেন। পিতামহ ও পুত্রের নাম এক হওয়ায় সোহেল-ই-ইয়ামনের গ্রন্থকার ভ্রমে পতিত হন।[৭৬]

শাহজালাল (রহ.) এর ত্বরিকা সম্পর্কে অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক বলেন- 'বাঙ্গালার সুহরাওয়ার্দীয়া ত্বরিকার সাধকদের মধ্যে শ্রীহট্টের বঙ্গ বিখ্যাত সাধক শাহজালাল মুজাররদ-ই-ইয়ামনী একটি অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। বাঙ্গালার মুসলমান এই স্বনাম খ্যাত দরবেশের নিকট এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির জন্য প্রভূত পরিমাণ ঋণী।

৭৫. আল কাসিফি আলী ইবনে আল ওয়াইজঃ রাশাহাত, (নেওয়াল কিশোর প্রেস, কানপুর) ১৯১১, পৃ- ৮-৯।
৭৬. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর 'শাহজালাল' নিবন্ধে হযরত শাহজালালের (রহ.) কে সুহরাওর্য়াদীয়া ত্বরীকার সাধক বলে উল্লেখ করলেন। তাছাড়া সোহেল ই-ইয়ামন গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন "সে যাহাই হউক এ যাবৎ এই সাধকের সঠিক ইতিহাস উদ্ধারের জন্য অনেক পন্ডিত চেষ্টা করিয়াছেন- দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কেহই সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন বলে মনে হয় না তাহার জীবনী সম্বলিত ফারসী সুহেল-ই-ইয়ামন গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে এমন প্রমাদপূর্ণ হইলেও এ গ্রন্থ হইতে এ দরবেশের সাধারণ জীবন আখ্যায়িকা জানিতে পারা যায়।" সম্প্রতি এই সাধকের দরগা হতে যে সকল আরবী ও ফারসী শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। তাহার মর্মের সহিত সামঞ্জস্য রেখে সুহেল-ই-ইয়ামন গ্রন্থের আখ্যায়িকার সহিত মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, শাহজালাল (রহ.) ৭০৩ হিঃ অর্থাৎ ১৩০৩ ঈ. সিকান্দর খান গাজী নামক কোন গৌড় সেনাপতির সহিত একযোগে শ্রীহট্ট জয় করেন। সুতরাং ১৩০৩ ঈ. তিনি জীবিত ছিলেন।[৭৭]

সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) কে সৈয়দ আহমদ কবির সুহরাওয়ার্দী বলে সর্ব প্রথম 'সুহেল-ই ইয়ামন' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়। ১৮৬০ঈ. সিলেটের তৎকালীন মুন্সেফ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ইহার রেফারেন্স গ্রন্থ 'রিসালাহ' ও 'রাওদ্বাতুস সালাতিন' ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বনে রচিত হয়। সুতরাং এসকল দুস্প্রাপ্য গ্রন্থে ও নিশ্চয়ই পূর্বোক্ত বিবরণই উল্লেখিত হয়ে থাকবে। জনশ্রুতিতেও এর উল্লেখ পাওয়া ৩৬০ আউলিয়াদের বংশধরেরা ও সৈয়দ আহমদ কবীরকে সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী বলে থাকেন। ইহা ছাড়া আধুনিক লেখকদের অনেকেই ইহা স্বীকার করেন।[৭৮]

হযরত শাহজালালের মামা সৈয়দ আহমদ কবির মক্কা শরীফের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সুফী সাধক ও দরবেশ ছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী নামে খ্যাত ছিলেন। নামের শেষে সোহরাওয়ার্দী লকব ব্যবহারেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি সোহরাওয়ার্দী ত্বরিকার একজন দরবেশ ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে সুফীদের চৌদ্দটি তরিকার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সোহরাওয়ার্দী ত্বরিকা অন্যতম। আইনে আকবরীতে এই ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শায়খ আবু নজিব সুহরাওয়ার্দী (রহ.) এর নাম বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৫৬৩ হি. / ১১৬৮ ঈ. ইন্তেকাল করেন। তিনি বাগদাদের জামেয়া নিজামিয়ার প্রধান রেক্টর ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ বা মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি সুফিদের জন্য "আদাবুল মুরিদিন" গ্রন্থটি লিখেন।[৭৯]

মুফতি আজহার উদ্দীন আহমদ সহ কোন কোন লেখক বলেন, সৈয়দ আহমদ কবির তার পিতা জালাল উদ্দিন সুরখ বোখারীর শিষ্য ছিলেন। জালাল সুরখ বোখারীর জন্ম ৫৯৫ হিজরী সনে। ৫৯৬ হিজরী সনে শাহজালাল (রহ.) জন্ম গ্রহণ করেন। নানা ও নাতীর জন্ম একই সময়ে হতে পারেনা। ৫৯৫ হিজরী সনে যে জালাল সুরখ বুখারীর জন্ম, তার পুত্র আহমদ কবির হযরত শাহজালালের লালন পালন করার প্রশ্নই উঠেনা। ইহা অসম্ভব। সুতরাং জালাল সুরখ বুখারীর পুত্র বলে কথিত সৈয়দ আহমদ কবীর ও হযরত শাহজালালের মামা সৈয়দ আহমদ কবির ভিন্ন ব্যক্তি।[৮০]

---

৭৭. আল ইসলাহ, শাহজালাল সংখ্যা, (২৬বর্ষ, ১ম ৬ষ্ঠ সং, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৫৪ঈ.), পৃ ৮১-৮২

৭৮. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন, দেওয়ান, হযরত শাহজালাল (র.) (ঢাকা, ইফাবা, জুন-১৯৯৫) পৃ-১৪ ও গোলাম সাকলায়েন, ড. পূর্ব পাকিস্তানের সুফি সাধক (ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৩৮৭ বাংলা, ১সং) পৃ ৫৮

৭৯. হযরত শাহজালাল(র.) পৃ ১৩ ৮০. প্রাগুক্ত পৃ ১৫

মুর্শিদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাঃ

আধ্যাত্মিক মুর্শিদের প্রতি শাহজালাল (রহ.) এর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তার উস্তাদের জন্য নিজ হাতে রাঁধতেন। পরবর্তীকালে যখন তিনি সিলেট বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন দেখা যায় যে, তিনি অত্যন্ত ভক্তি এবং গাম্ভীর্যের সাথে মুর্শিদের মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করতেন ২৬শে শাওয়াল তারিখে ঐ উপলক্ষে তিনি নিজে নিকটবর্তী পাহাড় থেকে লাকড়ি তুলে এনে রন্ধনকৃত খাদ্য দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করতেন।

যে পাহাড় থেকে শাহজালাল (রহ.) লাকড়ি 'তুড়ে' বা তুলে আনতেন ঐ পাহাড়ের নাম হয়েছিল লাকড়িতুড়া। ঐ পাহাড়ের অংশে আছে বর্তমানে একটি চা-বাগান। ইংরেজ সাহেবদের উচ্চারণ বদান্যে বর্তমানে ঐ পাহাড়টির নাম, দাড়িয়েছে 'লাখাতুড়া'। সিলেট শহর থেকে আড়াই মাইল দূরে ঐ পাহাড়টি অবস্থিত। হযরত শাহজালাল (রহ.) লাকড়িতুড়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ আজও প্রতিবছর ২৬শে শাওয়াল মাযার থেকে ভক্তরা লাখাতুড়া পাহাড়ে যায়। মুর্শিদের প্রতি শাহজালাল (রহ.) এর শ্রদ্ধাকে শায়খ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর প্রতি সাধক জালালুদ্দিন তাবরিযির শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শায়খ শিহাব উদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী তার দুর্বল ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের জন্য গরম খাদ্য পছন্দ করতেন। হযরত জালালুদ্দিন তাবরিযি ভ্রমনকালে একটি জ্বলন্ত চুল্লীর উপর খাবার রেখে পথ চলতেন, যাতে তিনি চাওয়া মাত্রই মুর্শিকে গরম খাদ্য দিতে পারেন।[৮১]

বাল্যকাল ও শিক্ষাঃ

শাহজালাল (রহ.) বাল্যকালেই এতিম হয়ে যান। তার লালন পালন ও শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন তার মামা সৈয়দ আহমদ কবির সুহরাওয়ার্দীর। স্নেহপ্রবন মুর্শিদের নিকটেই তিনি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক শিক্ষা লাভ করেন।

মুর্শিদের আত্মীয়দের নিকট তিনি আল-কুরআন হাদিস, ফিকহ, তাসাউফ, দর্শন, যুদ্ধবিদ্যা, ইবাদত প্রভৃতি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষা করেন। মাদরাসা এবং মক্তবের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পেলেও তিনি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হননি। মুর্শিদের জীবন এবং শিক্ষা কিশোর জালাল (রহ.) খানকায় প্রতিপালিত বালক আসহাব-ই-সুফফায় ঐতিহ্যে গড়ে উঠেন।[৮২]

শাহজালালের স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআন মুখস্ত করেন। দ্বীনি শিক্ষার প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর বলিষ্ঠ পদচারণা। মাত্র ১৬ (ষোল) বছর বয়সে শাহজালাল (রহ.) ইলমে দ্বীনের প্রতিটি শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।

---

৮১. হযরত শাহজালাল কুনিয়াজী (রহ.), পৃ- ১৬-১৭

৮২. প্রাগুক্ত পৃ- ১৫

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য শাহজালাল (রহ.) ৩০ বছর পর্যন্ত মুর্শিদের খানকায় ইবাদত বন্দেগী ও বিদ্যার্জনে কাটান। সুদীর্ঘ ৩০ বছরের কঠোর সাধনার ফলে তিনি সুফী সাধকের নানা অতুলনীয় গুণে গুনান্বিত হন। কথিত আছে যে, তিনি ৩০ বছর পর্যন্ত খানকার বাহিরে যাননি। ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে থেকে বহুবছরের নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতে তিনি কামালিয়াত লাভ করেন। এই বিষয়ে এছাড়া আর নির্ভরযোগ্য তেমন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইবনে বতুতার ভ্রমন বিবরণী হতে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষার গভীরতা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময় তাঁর জনৈক মুরিদ বা খলিফা তাঁকে (শাহজালালকে) সম্বোধন করে বললেন, "মাওলানা ইনি (ইবনে বতুতা) আরব ও আজম (অনারব) উভয়ের মধ্যে একজন ভ্রমণকারী। এই মাওলানা সম্বোধন হতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। আলিম হওয়ার জন্য যেসব বিদ্যা হাসিল করতে হয় তার সবই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাসাউফ তত্ত্বে জ্ঞান লাভের জন্য সৈয়দ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দী (রহ.) এর মত এক প্রখ্যাত বুজুর্গ আউলিয়ার সোহবত লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এই কামিল পীরের সান্নিধ্যে থেকে অত্যল্প কালের মধ্যেই শাহজালাল (রহ.) সুফীবাদের দিকে তথা তাসাউফ তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। মামা ও পীর মুর্শিদ যত্ন সহকারে তাঁকে এই তত্ত্বজ্ঞান হাসিল করতে যথাসাধ্য সহায়তা করেন। কালক্রমে তিনি কামালিয়াতের উচ্চ শিখরে উপনীত হয়ে সাহেবে কারামতের মার্যাদা প্রাপ্ত হন।

মুসলিম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ওলিয়ে কামিলের অন্যতম রাহবর হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী (রহ.) ব্যক্তি জীবনে সেরা আবেদ। সমাজ জীবনে ছিলেন তাবলীগে দ্বীনে মুহাম্মদীর একজন মহান সিপাহসালার ও সমাজ সেবক।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর নসব নামা ও পীরদের শাজারা

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর নসব নামা বা বংশ তালিকাঃ

খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী (রা.)

↓

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)

↓

হযরত ইমাম জয়নুল আবিদিন (রহ.)

↓

↓	↓
ইমাম যায়েদ (রহ.)	ইমাম আলী আসগর (রহ.)
↓	↓
ইমাম তাজ উদ্দিন তাইজি (রহ.)	ইমাম সৈয়দ জাফর সাদিক(রহ.)
↓	↓
ইমাম আহমদ তাইজি (রহ.)	হযরত জালাল উদ্দিন সুরুখ বোখারী (রহ.) (নানা)
↓	↓
ইমাম ইব্রাহিম কোরেশী (র.) (দাদা)	সৈয়দা ফাতিমা (মাতা)
↓	
আমীর মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম (রহ.) (পিতা)	
↓	
হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী [৮৩]	

৮৩. সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, পৃ ১৯০ ও মোস্তফা কামাল সৈয়দ, সিলেট বিভাগের পরিচিতি, (সিলেট, রেনেসাঁ পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর- ২০০৪ঈ. ১সং), পৃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পীরদের শাজারা বা জীবন বৃক্ষ ঃ

১. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (জ. ৫৭০ঈ. ১২ই রবিউল আউয়াল, মৃ. ৬৩২ ঈ. ১১ হি. ১২ই রবিঃ আ.)

২. খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আলী (রা.) (৩৫-৪০ হি.)

৩. শায়খ হাসান বসরী (রহ.) (২১-২১০ হি.)

৪. শায়খ হাবীব আযমী (রহ.) (মৃ.- ১২১ হিঃ)

৫. শায়খ দাউদ তাঈ (রহ.) (মৃ. ১৬৫ হি.)

৬. শায়খ মারুফ কারখি (রহ.) (মৃ. ২০০ হি.)

৭. শায়খ সিররী সকতী (রহ.) (মৃ. ২৫০ হি.)

৮. শায়খ মমশাদ সিন্দরী (রহ.) (মৃ. ২৯৭ হি.)

৯. শায়খ আহমদ দিনরী (রহ.) (মৃ. ৩৬৭হি.)

১০. শায়খ আম্বিয়া (রহ.) (মৃ. ৩৯৩ হি.)

১১. শায়খ আজী উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) (মৃ. ৫৬৬হি.)

১২. শায়খ আবু নজিদ জিয়া উদ্দিন (রহ.) (মৃ. ৫৬৩ হি.)

১৩. শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) (মৃ. ৬৩২ হি.)

১৪. শায়খ মাখদুম বাহা উদ্দিন জাকারিয়া (রহ.) (মৃ. ৬৬১ হি.)

১৫. সৈয়দ জালাল সুরখ বোখারী (রহ.) (মৃ. ৬৫২ হি.)

১৬. সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী (রহ.) (মৃ. ৭২৫ হি.)

১৭. হযরত শাহজালাল মুজাররদ (মৃ. ৭৪৭ হি.)।[৮৪]

---

৮৪. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ ৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল ও শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি (রহ.)

পূর্বকথা ঃ হযরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) ও শায়খ জালাল উদ্দিন উদ্দিন তাবরিযি (রহ.) এর পরিচিতি সম্পর্কে তথা সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে আলোচনা করার পর পরস্পরের প্রামানিক তত্ত্বাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি গ্রহণ যোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রচেষ্টা চালাব যে, তাঁরা উভয় একজন না ভিন্ন ভিন্ন দুজন মনীষি। এ বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। শাহজালালের (রহ.) ইন্তেকালের শতশত বৎসর পর তাঁর জীবনালেখ্য রচনার সূচনা হয়। এ দীর্ঘ সময়ে দিল্লির সুলতানদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় তাদের জীবনী যথাযথ ভাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হলেও তার প্রামাণ্য কোন ইতিহাস সরকারীভাবে স্থান পায়নি। তাঁর জীবদ্দশায় ইবনে বতুতা সিলেটে তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তিনি তাঁকে তাবরিযি বলে সম্বোধন করে ছিলেন বলে তার সফরনামায় উল্লেখিত হওয়াই হচ্ছে এ বিতর্কের মূল সূচনা।
নিম্নে শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি এবং হযরত শাহ জালাল মুজাররদ (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হল। অতঃপর উভয়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলাদা আঙ্গিকে প্রামাণিক তত্ত্বাদি সহ আলোচনা করা হবে।

শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি (রহ.)

(মৃ. ১২২৫ ঈ.)

Shaik Jalal Uddin Tabrizi (R).

সুহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সুফী দরবেশদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বাংলায় এসেছিলেন, তিনি হলেন শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি।[৮৫]

তিনি পারস্যের (ইরান) তাবরিয নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এ দরবেশের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আব্দুর রহমান চিশতি তাঁকে আবুল কাসিম মাখদুম শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি নামে বর্ণনা করেন।[৮৬]

প্রথমে শায়খ আবু সাঈদ তাবরিযি এবং তাঁর ইন্তেকালের পর শায়খ শাহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৮৭] শুধুমাত্র তার কৃতিত্ব উত্তরবঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি নদীয়া বিজয়ের পর সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজির শাসন কালের কোন এক সময়ে তিনি লখনৌতি শহরে উপনীত হন এবং সেখানে থেকে পান্ডুয়ার সতের মাইল দূরত্বে আস্তানা স্থাপন করেন।

---

৮৫. গোলাম সরওয়ার, খাজিনাতুল আসফিয়া, নেওয়াল কিশোর, লক্ষ্মী ১৩২৫ হি, পৃ-২৭৮

৮৬. চিশতি আব্দুর রহমান প্রণীত মিরআতুল আসরার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পান্ডুলিপি নং- ১৬ এ আর, মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, পান্ডুলিপি নং এম.এ ১২/১৯-২০।

৮৭. আব্দুল করিম, (মোকাদ্দেছুর রহমান অনু.) বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (ঢাকা ১৯৯৩) পৃ ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে সমগ্র বাংলায় ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে; বাংলার তার দ্বারা বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ প্রভাবিত হয়। তিনি সাত বছর পর্যন্ত পীরের খেদমত করেন। শায়খ আব্দুল হকের অভিমতে হজ সমাপনের জন্য তার উস্তাদ শায়খ সোহরাওয়ার্দী প্রতি বছর পবিত্র মক্কা-মদিনায় গমন করতেন। আর তাঁর সাথে জালাল উদ্দিন তাবরিযিও যেতেন। পীর অসুস্থ থাকায় ঠান্ডা খাবার খেতে পারতেন না। সুতরাং স্বীয় পীরকে গরম খাবার দেয়ার জন্য শিষ্য জালাল উদ্দিন মাথায় একটি চুল্লি বহন করতেন। যখনই পীর ক্ষুধার্ত হতেন সাথে সাথেই চুল্লি নামিয়ে গরম খাবার পরিবেশন করতেন। তার অসীম ধৈর্য্য, একাগ্রচিত্ততা, ও দীর্ঘযত্নে অভিভূত হয়ে হযরত শিহাব উদ্দিন তাঁকে খিরকা-ই- খিলাফত দান করেন।[৮৮]

শায়খ জালাল উদ্দীন বাগদাদ থেকে বহু দেশ ভ্রমনের পর ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখান থেকে মুলতান অবস্থানকালে তার ঘনিষ্ট সতীর্থ খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ও শায়খ বাহা উদ্দিন জাকারিয়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন মুলতানের- শাসনকর্তা ছিলেন নাসির উদ্দিন কুবাচা। ঐ সময় জালাল উদ্দিন তাবরিযি মুলতান ত্যাগ করে দিল্লিতে আসেন। এ দরবেশ দিল্লীতে পৌছলে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ শায়খুল ইসলাম নাজমুদ্দীন সুগারাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। সুলতান তাঁকে প্রাসাদের সন্নিকটে অবস্থান করার আদেশ ও দিয়েছিলেন। ফলে শায়খুল ইসলাম ঈর্ষান্বিত হয়ে শায়খ জালালুদ্দীন এর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগটি ছিল কলঙ্কিনি এক মহিলার সাথে অসচ্চরিত্রের অভিযোগ।[৮৯] পরিশেষে অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ ঘটনায় জালাল উদ্দিন মর্মাহত হয়ে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে দিল্লী ত্যাগ করে বাংলায় আগমন করেন।

শায়খ জালাল উদ্দিন ভারতের অন্তর্গত উত্তর প্রদেশের 'ইটাওয়া' জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কাফুর। তিনি রমজান খান নামীয় একজন বণিকের সহায়তায় শিক্ষা লাভ করেন। আর ঐ বনিকের দুষ্কর্মের অংশীদার হয়ে গৃহ পরিত্যাগ করেন। শুধু একটি কালো পোশাক পরে তিনি বাংলায় এসেছিলেন। তার হাতে একটি পাত্র ও একটি যড়ি ছিল। [৯০]

'সিয়ারুল আরিফিন' গ্রন্থের লেখক বলেন, যখন শায়খ জালাল উদ্দীন বাংলায় পৌছান, তখন এদেশের অধিবাসীগণ তার নিকট ভিড় জমায় এবং তার শিষ্যত্ব লাভ করেন। তিনি এখানে একটি খানকাহ ও একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু জমি ও বাগান কিনেন তিনি। তার লঙ্গর খানার খরচ নির্বাহের জন্য তা দানকরেন। তিনি বহু অবিশ্বাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।[৯১]

---

৮৮. আব্দুল হক দেহলভী, শায়খ, আখবারুল আখিয়ার (উর্দু অনুবাদ) (করাচী ১৯৬৩) পৃ ৪৪
৮৯. আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী, (২য় খন্ড কলকাতা ১৮০৫) পৃ ৪৪-৪৫
৯০. বাংলা মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, পৃ ১৩৬
৯১. জামালী মাওলানা, সিয়ারুল আরিফিন (দিল্লী ১৩১১ হি.) পৃ ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন একজন বিখ্যাত সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁর ত্যাগ, সাধনা, নিষ্টাও গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। বিরাট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং মানবহিতৈষীমূলক সেবার দ্বারা তিনি বাংলায় অলৌকিক কার্য সাধন করেন। উৎপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত, হিন্দু ও বৌদ্ধরা ত্রাণ লাভের জন্য দলে দলে তাঁর আশ্রয়ে ইসলাম কবুল করেন। এভাবে তিনি উত্তর বাংলার এক শক্তিশালী মুসলিম সমাজের ভিত্তিভূমি রচনা করেন। বাংলায় নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসন সংহত ও মজবুত করার ক্ষেত্রে ও তার যথেষ্ট অবদান ছিল। এদরবেশের অসামন্য প্রভাব হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর ছিল। সর্বজনস্বীকৃত যে, তিনি ১২২৫ ঈসায়ী দেওতলায় ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাঁর সমাধি বিদ্যমান।[৯২]

শায়খ জালাল উদ্দিন সমাজ জীবনে অপরিসীম ও স্থায়ী প্রভাবের দরুন তার স্মৃতি অদ্যাবধি মানুষের মনে রেখাপাত করেছে। ফলে কাল ক্রমে সত্যিকার পীরের ধর্ম হিন্দু সমাজে গ্রহণীয় হয়ে উঠে। এভাবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ উদার ও প্রগতিশীল হয়ে উঠে।

জার্ণাল অব পাকিস্তান হিস্টোরিকেল সোসাইটি ১৯৬০ (Jounal of pakistan historical society 1960) এ বলা হয়েছে (শায়খ) জালাল উদ্দিন তাবরিযি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাবরিযে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর মুরিদ ছিলেন। তিনি কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ও শেখ বাহা উদ্দিন জাকারিয়া (রহ.) প্রমুখ দরবেশের সম সাময়িক। ১২৪৪ ঈসায়ী তাঁর ইন্তেকাল হয় ও তাঁকে দেওতলায় (পাড়ুয়ার কাছে) সমাহিত করা হয়।

---

৯২. তালিব আবদুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা, ইফাবা, ডিসেম্বর ২০০২, ৩সং) পৃ ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.)

Hazrat Shah Jalal (R)

(মৃ. ১৩৪৭ ঈ.)

হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলার একজন মহান ও বিশিষ্ট সুফী সাধক ছিলেন। তাঁর পূর্ণনাম হলো শায়খ জালাল উদ্দীন মুজাররদ। জীবনে তিনি বিয়ে করেননি। তাঁকে এজন্য মুজাররদ বলা হয়। কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন তা নিয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কারো মতে তিনি ইয়ামনে জন্ম গ্রহণ করেন এ কারণে তাঁকে ইয়ামনী বলা হয়।[৯৩] আবার কারো মতে তিনি কুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।[৯৪] দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী তারই 'হযরত শাহজালাল (র.)' নামক গ্রন্থে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জন্মস্থান ইয়ামন।[৯৫]

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জন্মসন নিয়েও অনেক মতান্তর রয়েছে। ইবনে বতুতা বলেন তিনি দেড়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের সময় ৭৪৬ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। এ হিসেবে তিনি ৫৯৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে তিনি ৫৯৮ হিজরীতে।[৯৬] ড. মাহদী হাসান বলেন তিনি ৫৯৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে তার জন্ম ৫৯৫ হিজরী উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখিত ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ৬ষ্ট হিজরীর শেষ দশকে তার জন্ম।[৯৭]

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পিতার নাম ছিল মুহাম্মদ তাঁর মাতার নাম সৈয়দা ফাতেমা। তিনি ছিলেন তার মাতুল সাইয়্যিদ আহমদ কবির ইয়ামনীর শিষ্য। গুরুর নির্দেশে তিনি শত শত সহচর নিয়ে ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট হন। ঐ সময় হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর সহচরসহ ইসলামের উদ্দেশ্যে পথে পথে জিহাদ করেছিলেন ইসলামী হুকুমত কায়িম রাখার জন্য। বিজিত দেশগুলোতে তার সাথীদের কিছু কিছু রেখে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। শুধু তিনি ৩৬০ জন শিষ্যসহ সিলেটে উপস্থিত হন এবং পরাজিত করেন সিলেটের হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দকে।[৯৮] সিলেট বিজয়ের পর সেখানে হযরত শাহজালাল (রহ.) অবস্থান করে মানব সেবা ও ধর্ম প্রচারের কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। ইবনে বতুতার বিবরণে তার আত্ম সংযম, ধর্মনিষ্ঠ ও সেবা ধর্মী জীবনের পরিচিতি জানা যায়। ইবনে বতুতা যখন শাহজালাল (রহ.) সঙ্গে দেখা করেন।

---

৯৩. Shams Ud-din Ahmed, Inscriptions of bengal (Rajshahi-1960, Vol IV) p-169

৯৪. ইসলাম প্রসঙ্গ, (ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা ১৯৬৩) পৃ- ৯৭।

৯৫.তিনি এতে ৩৪ জন গবেষক, ঐতিহাসিক এবং গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মতামত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জন্মস্থান ইয়ামন। দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত) হযরত শাহজালাল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ পৃ- ৪-৭

৯৬. ইসলাম প্রসঙ্গ পৃ- ৯৮

৯৭. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৮৭ ২খ, ১সং) পৃ- ৩৭৬।

৯৮. আব্দুল লতিফ মুহাম্মদ, শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মুনায়রী ও নুর কুতবুল আলম (রহ.) সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি খুবই বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি শীর্নকায় লম্বা আকৃতির ছিলেন এবং তার ছিলো অল্প দাড়ি। প্রায় চল্লিশ বছর তিনি একাধারে রোজা রাখতেন। আর দশদিন অন্তর (ইফতার) রোজা খুলতেন। তাঁর একটি গাভী ছিল, সেই গাভীর দুধই ছিল তার খাদ্য। সারা রাত তিনি এবাদতে মগ্ন থাকতেন। ইবনে বতুতা আরো বর্ণনা করেন যে, এ শায়খের শ্রমের দরুন ঐ এলাকার অধিবাসীগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়। এ কারণে তাদের মধ্যে তিনি বসতি স্থাপন করেন। তিনি সেখানে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

এ খানকাহ মূলত সুফি দরবেশ ও পরিভ্রাজক মানুষের আশ্রয় স্থল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাকে বিশেষ করে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত। তারা নানা রকম উপঢৌকন তার জন্য আনতো এবং তার আস্তানায় অনেক লোককে ঐ গুলো দিয়ে খাওয়ানো হতো।[৯৯] শাহজালাল (রহ.) এর ধর্মপ্রচারের উদ্যম ও নিঃস্বার্থ সেবার ফলে এই সুদুর অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল এবং বাংলার অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এটা উন্নতি হয়েছিল।

প্রকৃত পক্ষে তিনি তার মহান কার্যাবলীর দ্বারা মুসলিম বাংলার নির্মাতাদের মধ্যে উচ্চ আসন লাভের অধিকারী। তাঁর ধর্মের প্রতিগভীর অনুরাগ, আদর্শ জীবন ও দুস্থ মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার জন্য তিনি বাংলার মুসলমানদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। ফলে, অদ্যাবধি তিনি সাধারণ লোক সমাজে চির অমর হয়ে রয়েছেন। তার স্মৃতি শত শত লোক সঙ্গীতে আজও উজ্জল হয়ে আছে।

এই সুফী দরবেশ ১৫০ বছর বয়সে ১৩৪৭ ঈসায়ী পরলোক গমন করেন। সিলেটে তাঁর সমাধি অদ্যাবধি সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট তীর্থস্থান।

শায়খ জালালুদ্দিন আত তাবরিযি এবং সিলেটের শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদানের পর এখন একটু সবিস্তারে আলোচনা করার প্রয়াস চালাব।

শায়খ জালালুদ্দীন আত তাবরীযি (রহ.)ঃ

শায়খ জালালুদ্দীন আত তাবরিযি (রহ.) উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফী সাধক এবং বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগে যেই সকল মনীষি ব্যাপকভাবে দেশের সর্বত্র ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন তিনি তাদের অগ্রনায়ক। বস্তুত শায়খ তাবরিযি খ্রিষ্ট্রীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পান্ডুয়াকে কেন্দ্র করে বাংলার উত্তরাঞ্চলেই ইসলাম প্রচারে অসাধারণ সফলতা অর্জন করেন প্রায় একশত বৎসর পরে সিলেট কে কেন্দ্র করে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাখদুম শাহজালাল পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রচারে অনুরূপ কৃতিত্বের অধিকারী হন।[১০০]

তিনি (ইবনে বতুতা) শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর এই স্পষ্ট বর্ণনা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আধুনিক কিছু সংখ্যক পন্ডিত মনে করেন যে, দুজন জালালই (শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযি এবং সিলেটের শাহজালাল) এক অভিন্ন ব্যক্তি।

---

৯৯. H.A.R Gibb- Ibn Batuta Travels in Asia and Africa (London, 1926) p- 144-45

১০০. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা, ইফাবা, ২৩ খ, ১সং), পৃ- ৫৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আধুনিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, তারা ছিলেন দুজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। দুজনই ছিলেন বড় দরবেশ, বাংলার মানুষের উপর দুজন বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তবে তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল ভিন্ন শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযির নাম মালদহের (পশ্চিমবঙ্গ) পান্ডুয়া ও দেওতলার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু শাহজালালের নাম সিলেটের (পূর্ববঙ্গ) ও আসামের সঙ্গে জড়িত। তাদের সময়কাল ও ভিন্ন। শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযি সিলেটের শাহজালালের চেয়ে কমপক্ষে এক শতাব্দি আগে সক্রিয়ভাবে বর্তমান ছিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ (মৃ. ১২৩৬ঈ.) দিল্লির শায়খ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (মৃ. ১৩৩৫ঈ.) এবং মুলতানের শায়খ বাহা উদ্দিন জাকারিয়া (১২৬২ঈ.) সমসাময়িক। দরবেশ দের জীনীমুলক সাহিত্য অনুসারে জালালুদ্দিন তাবরিযি ১২২৫ অথবা ১২৪৪ ইসায়ী ইন্তেকাল করেছিলেন। কাজেই শেষোক্ত তারিখটি মেনে নিলেও তিনি শাহজালালের মৃত্যুর ১০৩ বছর আগে ইন্তেকাল করেছিলেন। এখনও বহু মানুষ রোজ শাহজালালের মাজার জিয়ারত করেন তাঁর কবরটি অস্বাভাবিক রকম বড় (বাংলার মানুষের আকৃতির তুলনায় এবং এটা ইবনে বতুতার সাক্ষ্যকে সমর্থন করে। [১০১]

পান্ডুয়ার বড় দরগাহের ফারসী কবিতা সম্বলিত একটি শিলালিপিতে আছে। উহার প্রথম পংক্তিঃ

جلال الدین شه تبریز مولد– که در مدحش ربانها شد کهریز–

অর্থাৎ- জালালুদ্দিন শাহ যিনি তাবরিযে জন্মগ্রহণ করেন
তার প্রশংসার রসনাসমূহ মুক্তা নির্গত করে।

ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ সমূহে শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযির বিদ্যাবত্তা, আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিক ঘটনাবলীর বহু বর্ণনা থাকলেও তার বংশ বৃত্তান্ত ও প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে কোন বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না। মিরআতুল অসূরার গ্রন্থে তার পূর্ণ নাম আবুল কাসিম মাখদুম শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযি উল্লেখ করা হয়েছে। পান্ডুয়া শায়খ তাবরিযির দরগাহের একটি শিলালিপিতে তাঁকে শায়খ জালাল মুহাম্মদ তাবরিযি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতিয়মান হয় যে, শায়খ তাবরিযীর কুনিয়া (উপনাম ছিল) আবুল কাসিম এবং তার প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। উল্লেখ্য যে, মাখদুন, শাহ, শায়খ প্রভৃতি শব্দ পীর মুর্শিদের নামের পূর্বে সম্মান সূচক পদবী হিসেবে ব্যবহৃত হলেও মুহাম্মদ শব্দটি কখনও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোন ও সাধক বা তাপসের প্রতি আরোপ করা হয় না। কাজেই শিলা লিপিতে উল্লেখিত মুহাম্মদ শব্দটি প্রশংসিত এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ইহা শায়খ তাবরিযির প্রকৃত নামরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। এরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে।[১০২]

---

১০১. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (ঢাকা, মার্চ ২০০৩, ১ সং) পৃ ৩১১।
১০২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩খ, পৃ ৫৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

কুনিয়াঃ ও সম্মানসূচক পদবীসহ শায়খ তাবরিযির পূর্ণনাম মাখদুম শায়খ আবুল কাসিম মুহাম্মদ জালালুদ্দিন তাবরিযি। জীবনী গ্রন্থ সমূহে ও সাধারণ্যে তিনি শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর নামের শেষে তাবরিযি শব্দটি জন্মস্থান নির্দেশক ইহা কোন বংশগত নিসবা নহে বরং তাঁর ব্যক্তিগত নিসবা। এই নিসবা হতে স্বতসিদ্ধ ভাবে প্রমাণিত হয় যে, শায়খ জালালুদ্দিন পারস্যের তাবরীয শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হলায়ুধ মিশ্রের রচিত বলে কথিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শেক শুভোদয়ায়' (শায়খের শুভ আবির্ভাব) শায়খ তাবরিযি ভারতের উত্তর প্রদেশের ইটাওয়া জিলায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং কোনও মুসলিম বনিকের গৃহে জয়গীর থেকে বিদ্যা শিক্ষা করেন বলে যে গল্প কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার মূলে আদৌ কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সমকালীন বা পরবর্তীকালের প্রামাণিক কোন সূত্রেই তাঁকে ভারতের অধিবাসী বলে উল্লেখ করা হয় নাই। এসকল সূত্র হতে নিঃশর্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এই উপ-মহাদেশে বহিরাগত। পান্ডুয়ার বড় দরগাহের একটি শিলালিপিতে শায়খ জালালুদ্দীনকে 'তাবরীয মুয়াল্লাদ' বলে উল্লেখ করা হয়েছ। শায়খ জালালুদ্দিন তাবরীযির জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রধান সূত্র সমূহ হল ফাওয়াইদুল ফুয়াদ, খাজিনাতুল আসফিয়া, সিয়ারুল আউলিয়া, আখবারুল আখিয়ার প্রভৃতি গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে শায়খ তাবরিযির জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা থাকলেও তাদের সুনির্দষ্ট সন তারিখের উল্লেখ নেই। তবে ইতিহাসের আলোকে জীবনী গ্রন্থে উল্লেখিত ঘটনাবলীর সুনির্দিষ্ট সময় পর্ব নির্ণয় করা সম্ভবপর। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ হতে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, সিলেটের মাখদুম শাহজালাল মুজাররদ ও পান্ডুয়ার শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং তাদের কার্যকাল ও কর্মক্ষেত্র ও বিভিন্ন।[১০৩]

শায়খ তাবরিযির পরিচিতিঃ

জন্ম ও শিক্ষাকালঃ উপরে উল্লেখিত গ্রন্থ সমূহের বর্ণনামতে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির জন্ম স্থানের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ঘটনা হতে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি তাবরিযে জন্ম গ্রহণ করেন এবং প্রচলিত প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভের পর প্রথমে শায়খ আবু সাইদ তাবরিযীর নিকট তরীকত (আধ্যাত্মিক বিদ্যা) শিক্ষা লাভ করেন ও মুরিদ হন। আখবারুল আখিয়ার গ্রন্থের উর্দু সংস্করণে শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযির জন্মকাল ৫৩২ হিজরী ১১৩৭ খ্রীঃ উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে কোন সূত্রের উল্লেখ না থাকলেও সম সাময়িক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ৫৩২ হিজরীকে শায়েখ তাবরিযির সম্ভাব্য জন্ম সাল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যদিও ফার্সী সংস্করণে তার সাল উল্লেখিত হয়নি। শায়খ আবুসাইদ তাবরিযির মৃত্যুরপর শায়খ জালালুদ্দীন বাগদাদে প্রখ্যাত সুফি সাধক শায়খ আবু হাফস শিহাবুদ্দীন উমর ইবনে মুহাম্মদ সুহরাওয়ার্দী (৫৩৯-৬৩২/১১৪৪-১২৩৪) এর নিকট সোহরাওয়ার্দিয়া সুফী ত্বরিকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সাত বৎসর এই মহান তাপসের সাহচর্যে থেকে শায়খ জালালুদ্দীন আধ্যাত্মিক সাধনায় কামালিয়াত ও পরম সফলতা অর্জন করেন। তিনি স্বীয় মুর্শিদের সেবা যত্নে এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

---

১০৩. প্রাগুক্ত পৃ ৫৫৯

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ জালালুদ্দীন যখন বাগদাদে অবস্থান করছিলেন সেই সময় তিনজন প্রখ্যাত শীর্ষ স্থানীয় সুফী সাধক শায়খ সোহরাওয়ার্দীর সন্দর্শন ও উপকার লাভের মানসে বাগদাদ গমন করেছিলেন। তারা হলেন উপমহাদেশের চিশতিয়া তরীকার প্রবর্তক সুলতানুল মাশাইখ খাজা মইনুদ্দীন মুহাম্মদ হাসান সিজযী চিশতি (৫৩৭-৬৩৩-১১৪২/১২৩৬) খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (৫৩৭-৬৩৩/১১৪২-১২৩৫) এবং উপমহাদেশে সুহরাওয়ার্দীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক শায়খ বাহা উদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী ৫৬৫-৬৬৫/১১৬৯-১২৬৬) বাগদাদে শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর খানকাতে উপরোক্ত তিনজন মাশাইখের সাথে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির পরিচয় হয় এবং তাঁদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির জন্মের তারিখ, বাগদাদে অবস্থান এবং উপ মাহাদেশে আগমনের সম্ভাব্য সময় পর্ব নির্ণয়ে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো বিবেচ্য। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) বাগদাদে শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর খিদমতে কয়েক মাস (ছয় মাস) অবস্থান করে বিভিন্ন পবিত্র স্থান জিয়ারতের পর স্বীয় মুর্শিদ শায়খ উছমান হারুনীর নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগমন করেন।

খাজা মইনুদ্দীন চিশতি (রহ.) এর ভারতের আজমীরে অবস্থানের পর শায়খ বাহা উদ্দিন যাকারিয়া, খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার ও শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি উপমহাদেশে আগমান করেন। মুলতানে এই তিন আধ্যাত্মিক সতীর্থ ও বন্ধু একত্রে মিলিত হন। তখন মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান নাসিরুদ্দীন কুবাচা (১২০৬-১২১৬ ঈ.)। পুণরায় এই তিন সাধকের একত্রে মিলিত হবার সুযোগ ঘটে দিল্লীতে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুত মিশের শাসনামলে (১২১০-৩৬ঈ.) জীবনী গ্রন্থসমূহের বর্ণনা হতে ইহাও জানা যায় যে, শায়খ বাহা উদ্দিন জাকারিয়া স্বীয় মুর্শিদ শিহাবুদ্দীনের নির্দেশে মুলতানের উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেন। এই সময় শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু শায়খ বাহা উদ্দিনের সাথে উপমহাদেশে আগমনের আকাংখা ব্যক্ত করলে শায়খ শিহাবুদ্দীন তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। যাত্রাপথে উভয়ে বিভিন্ন পবিত্র স্থান জিয়ারত করে খুরাসান পৌছলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন পবিত্র স্থান জিয়ারত ও বিভিন্ন সুফী সাধকের সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে শায়খ তাবরিযি স্বীয় বন্ধু ও সফর সঙ্গীর অনুমতি ক্রমে তথায় থেকে যান এবং শায়খ বাহা উদ্দিন তথা হতে স্বীয় জন্মভূমি মুলতানে প্রত্যাবর্তন করেন। শায়খ তাবরীযী খুরাসানে অবস্থানকালে নীশাপুরে শায়খ ফরিদুদ্দীন আততারের (৫১২-৬২৭/১১১৮-১২২৯) সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। কিছুকাল পরে শায়খ জালালুদ্দীন মুলতানে এসে শায়খ বাহা উদ্দিনের সাথে মিলিত হন। খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী উশী ও সেই সময় মুলতানে অবস্থান করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাসিরুদ্দীন কু বাচা তখন মুলতানের শাসনকর্তার পদে অধিষ্টিত ছিলেন। কুবাচা ১২০৬ - ১২১৬ঈ. পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। শায়খ তাবরিযি মুলতানে আগমনের পরে খাজা কুতুবুদ্দীন মুলতান হতে দিল্লী আগমন করলে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ (১২১০-৩৬) তাঁকে অতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং দিল্লিতে তাঁর বসবাসের সুব্যবস্থা করেন। এই সময় শায়খুল ইসলামের পদ শূন্য হওয়ায় সুলতান তাঁকে এই পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি অসম্মত হন। অগত্যা শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরাকে এই পদে নিয়োগ করা হয়। [১০৪]

---

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬০

Dhaka University Institutional Repository

খাজা কুতুবুদ্দীন যখন দিল্লিতে অবস্থান করেছিলেন তখন শায়খ জালালুদ্দীন মুলতান হতে দিল্লি গমন করেন। সেই সময়ও মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন নাসিরুদ্দীন কুবাচা (১২০৬-১৬ ঈ.) এবং দিল্লির সম্রাট ছিলেন সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ (১২১০-৩৬ ঈ.)। মুলতানে অবস্থানকালেই শায়খ জালালুদ্দীন তাবরীযীর মহত্ব ও আধ্যাত্মিক কামালিয়াতের সুখ্যাতি দিল্লিসহ উত্তর ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লি পৌছলে স্বয়ং সুলতান তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং অনুরক্ত ভক্তের ন্যায় তাঁকে সম্মান করতে থাকেন একজন তত্ত্বজ্ঞানী বিজ্ঞ আলিম ও সত্যনিষ্ঠ কামিল দরবেশ রূপে দিল্লীর জনগণ ও স্বয়ং সুলতান শায়খ জালালুদ্দিনকে বিশেষ সমাদর করতে থাকলে শায়খুল ইসলাম নাজমুদ্দীন সুগরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন। তিনি শায়খ জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে সুলতানের নিকট কতিপয় অভিযোগ ও পেশ করেন। সুলতান ইলতুতমিশ এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের উদ্দেশ্যে খ্যাতনামা মাশাইখ ও আলিমদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। মুলতানের শায়খ বাহা উদ্দিন জাকারিয়া নাগুরের শায়খ হামিদুদ্দীন ও দিল্লীর শায়খ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ারও এই কমিটির সদস্য ছিলেন। তদন্তে অভিযোগ সমূহ মিথ্যা প্রমাণিত হলে শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরাকে শায়খুল ইসলাম পদ হতে সুলতান অপসারিত করেন।

এই অপ্রীতিকর ঘটনার পর শায়খ জালালুদ্দীন দিল্লী ত্যাগকরে বাদায়ুন গমন করেন। এই খানে অবস্থানকালে জনৈক হিন্দু দস্যু সরদার তার নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং পরবর্তীকালে তিনি খাজা আলী নামে খ্যাতহন। শায়খ তাবরিযির বাদায়ুন হতে বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় খাজা আলী ও তাঁর সঙ্গী হবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ব্যক্ত করলে শায়খ তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন "বাদায়ুন তোমার কর্মক্ষেত্র।" বাদায়ুনেই শায়খ আলা উদ্দিন আল-উসুলী নামে খ্যাত বিজ্ঞ আলিম বাল্য বয়সে শায়খ তাবারিযির মুরিদ হন। শায়খ আলা উদ্দিন ছিলেন শায়খ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৫-১৩২০) শিক্ষক। শায়খ নিজামুদ্দীন তার এই শিক্ষক সম্বন্ধে বলতেন যে, তিনি স্বীয় মুর্শিদ শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযির মহান স্বভাব চরিত্রের অনুসারী ছিলেনঃ

انـه كـان من اصحاب الشيخ جلال الدين التبريزي وكان علي قدم

شيخه في الخصال الحميدة–

বর্ণিত জীবনী গ্রন্থসমূহ ও আইনে আকবরীর বর্ণনা মতে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি বাদায়ুন হতে বাংলার আগমন করেন। বাংলার তৎকালীন রাজধানী লাখনৌতি (লক্ষনাবর্তী / গৌড়)- এ কিছুকাল অবস্থান করে তিনি স্থায়ীভাবে পান্ডুয়াতে বসবাস করেন এবং এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। উল্লেখিত জীবনী গ্রন্থ ও অন্যান্য ফার্সী সূত্রের কোন একটিতে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি বঙ্গদেশে আগমনের পর এই দেশ হতে অন্য কোনও দেশে কখনও গমন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সিয়ারুল আরেফীন, তাযকিরাই-হিন্দ ও অন্যান্য জীবনী গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি বঙ্গদেশে আগমনের পর লাখনৌতী (গৌড়) ও পান্ডুয়ায় অবস্থান করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এই অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ শ্রেণীর জনগণ (বৌদ্ধ ও হিন্দু) তাঁর চারিত্রিক মহত্ব, ধর্ম পরায়নতা ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

নওমুসলিমদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে পান্ডুয়ার তিনি একটি খানকা (ধর্মচর্চা ও সুফী সাধনার আবাসিক কেন্দ্র) এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর দুস্থ, দরিদ্র ও পর্যটকদের আহার্য দানের উদ্দেশ্যে একটি লঙ্গর খানা প্রতিষ্ঠা করেন। খানকাহ ও লঙ্গরখানার রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি পান্ডুয়া ওপার্শ্ববর্তী এলাকায় বহু জমি ক্রয় করে ঐগুলি উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করে দেন। তাঁর ওয়াকফকৃত সম্পত্তিসমুহ বর্তমানে বাইশ হাজারী ওয়াকফ ষ্টেট (বার্ষিক আয় বাইশ হাজার টাকা অথবা ২২ হাজার বিঘা সম্পত্তি বলে এরূপ নামকরন) নামে একজন মুতাওয়াল্লী দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে।[১০৫]

শায়খ তাবরীযির খানকাহ যেইস্থানে নির্মিত হয় উহার সন্নিকটে ছিল একটি হিন্দু মন্দির। মন্দিরে উপাসনা কারীগণকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং মন্দিরটিকে আধ্যাত্মিক শক্তি বলে ধ্বংস করে তথায় একটি তাকিয়া (খানকাহ) মতান্তরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আমীর খসরু ও তাঁর রচিত 'আফদ্বালুল ফাওয়াইদ' গ্রন্থে অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযী যখন বাংলার কোনও একটি শহরে (পান্ডুয়া/ দেওতলা) আগমন করেন তখন তথাকার অধিবাসীরা একটি দৈত্য (দেও demon) কর্তৃক আক্রান্ত হচ্ছিল। প্রতিরাত্রে দৈতটি একজন লোককে হত্যা করে ভক্ষণ করত। শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযি দৈত্যটিকে বন্দি করে জনগণকে বিপদমুক্ত করেন। তাঁর এই অলৌকিক কর্মে মুগ্ধ হয়ে সেই স্থানের হিন্দু শাসক ও জনগন তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তিনি তথায় একটি খানকাহ নির্মাণ করেন।

খানকা, লঙ্গরখানা ও মসজিদ ছাড়াও (পান্ডুয়া ও পাশ্ববর্তী দেওতলা নামক স্থানের বহু "চিল্লা খানাহ" শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযির কঠোর রিয়াদাতে আধ্যাত্মিক কৃচ্ছ সাধনা) এর স্মৃতি বহন করে। যেই স্থানে তিনি রোজা রেখে একাধিকক্রমে চল্লিশ দিন আল্লাহর যিকর ও ইবাদাত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন উহাই 'চিল্লাখানা' নামে পরিচিত। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব গভীর বিদ্যাবত্তা ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য সম্পর্কে 'সিয়ারুল আরিফিন' গ্রন্থের লেখক বলেন-

"জাহিরী ও বাতিনী-ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিদ্যাসমূহে তিনি সুফী সাধকগন কর্তৃক তাঁর আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও তত্ত্বজ্ঞান স্বীকৃত, দিব্যদর্শন (কাশফ) ও অলৌকিক কর্মে (কারামত) তিনি ছিলন অনন্য সাধারণ, সংসার জীবন ও পার্থিব ভোগ বিলাসে তাঁর নিরাসক্তি ছিল সীমাহীন।"[১০৬]

---

১০৫. Khan Alid Ali M. Memories of Goure and pandua (Sec. Stapleten, calcutta 1931. পূর্ণঃ মুদ্রন New Delhi 1997, P- 96-106.

১০৬. জামালীমাওলানা, সিয়ারুল আরিফিন (রচনাকাল১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ দিল্লী ১৩১১ হিঃ) পৃ- ১৬৪-৬৯)।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মন্যবাদ, সামন্তবাদ ও বর্ণবাদের যাতাকলে নিস্পেষিত তৎকালীন বাংলার বিশেষত উত্তরবঙ্গের জনগন কে শায়খ তাবরিযি দেখিয়ে ছিলেন মুক্তির পথ, চিরন্তন শান্তির পথ শায়খ তাবরিযি অস্ত্রদারী মুজাহিদ বা ধর্ম যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন- সংসার অনাসক্ত আল্লাহ প্রেমিক, জনকল্যাণে নিবেদিত মহৎপ্রাণ সাধক। ইসলামের একত্ববাদ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ। তিনি তাঁর বিস্ময়কর আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব ও দৈনন্দিন কার্যাবলীর মাধ্যমে জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেতেন "নারী ও ধন সম্পদে আসক্ত ব্যক্তি কোনও কল্যাণ অর্জন করতে পারে না।" তিনি পার্থিব লোভ লালসা ও মোহমায়া হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাহার অর্জিত বিরাট ভূ-সম্পত্তি জনকল্যাণে ওয়াকফ করে দেয়া এবং খানকা ও লঙ্গরখানায় দৈনিক হাজার হাজার লোককে আহার্য দান হতেই প্রমাণিত হয়। তিনি জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে মুক্ত হস্তে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করতেন যা কোন ধনাঢ্য রাজার পক্ষেও সম্ভব হতনা। বস্তুত সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকা অনুসারীদের একটা বৈশিষ্ট হল তারা জনগণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির সাথে তাদের দৈন্যদশা মোচনেও যত্নবান হতেন।

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির খানকাহ শুধু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির প্রশিক্ষণের কেন্দ্র ছিল না ইহা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্রেও পরিণত হয়েছিল।

বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের বিভিন্ন স্থরের বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর নিকট ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে এবং এইভাবে তাঁর জীবদ্দশায় উত্তরবঙ্গে একটি শক্তিশালী মুসলিম সমাজ গড়ে উঠে। অমুসলিম জনগন তাঁকে দেব সুলভ চরিত্রের অধিকারী ও দৈব ক্ষমতা সম্পন্ন একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ হিসাবে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত এবং রোগ শোক ও দুঃখ দুর্দশা মোচনে তার আশির্বাদ কামনা করত। পান্ডুয়ায় তাঁর মাজার পুরুষ পরম্পরাক্রমে তাদের নিকট পুন্য তীর্থক্ষেত্র রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ও রাজশক্তির সাহায্য বা ছত্রছায়া ছাড়া শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি বঙ্গদেশে ব্যাপক ইসলাম প্রচারে যেই সাফল্য অর্জন করেন এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণের উপর তিনি যে অবিস্মরণীয় প্রভাব বিস্তার করেন বাংলার সুফী সাধকের ইতিহাসে তাঁর তুলনা বিরল।

ইন্তেকালঃ শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির মৃত্যুর তারিখ শুধু পরবর্তী কালে লিখিত একটি গ্রন্থে পাওয়া যায়।মুফতি গোলাম সরওয়ার লিখিত ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর থেকে প্রকাশিত খাজিনাতুল আসফিয়া গ্রন্থে এই তারিখ ৬৪১ হি. ১২৪৪ ঈ. মতান্তরে ৬২২হি./১২২৫ঈ. সালে পান্ডুয়ায় ইন্তেকাল করেন।

যদিও খাজিনাতুল আসফিয়া গ্রন্থটি অনেক পরে লিখিত তবুও শায়খ জালাল উদ্দীনের মৃত্যুর তারিখটি সত্য বলে মনে করার কারণ আছে। ১ম শায়খ ফরিদ উদ্দিন গাঞ্জে শাকর (৫৭১-৬৬৬হি./ ১১৭৫-১২৬৯ঈ.) এর নিজাম উদ্দিন নামক এক শিষ্য ৬৫৫ হিজরী ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাহাতুল কুলুব নামে এখানি পুস্তক লিখেন। এ পুস্তকে শায়খ ফরিদ উদ্দিনের মালফুজ বা

Dhaka University Institutional Repository

আলাপ আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়। এক মজলিসে শায়খ ফরিদ উদ্দিন বলেন যে, তিনি শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলেন। শায়খ তাবরিযি সেই সময় হাসছিলেন। জনৈক বন্ধু এই অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: মুমূর্ষ ব্যক্তির ইহা কি রকম হাসি? উত্তরে বলা হল: আল্লাহ সম্পর্কিত তত্ত্ব জ্ঞানের ইহাই নিদর্শন- [১০৭]

উল্লেখ্য শায়খ ফরিদ উদ্দিন গাঞ্জে শাকর ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই সূত্র অনুসারে শায়খ জালালুদ্দিন ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে পরলোক গমন করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ রাহাতুল কুলুব পুস্তকটি লিখিত হয় ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব, শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযির মৃত্যু ১২৫৭ ঈসায়ীর আগে নির্ধারণ করতে হয়। তাই খাজিনাতুল আসফিয়ার সাক্ষ্যমতে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির মৃত্যুর তারিখ ১২৪৪ ঈসায়ী গ্রহণযোগ্য। সুতরাং শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি শাহজালাল (রহ.) থেকে একশত বৎসর পূর্বের লোক ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। [১০৮]

শাহজালাল ও শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি এক নন:

আধুনিক পন্ডিতদের অত্যন্ত বিতর্কিত প্রশ্ন হলো শাহজালাল ও শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজি কি একই ব্যক্তি? এই বিতর্কের উৎস হলো ইবনে বতুতা, তিনি বলেন যে, তাঁর বাংলায় আসার এবং কামরূপের পাবর্ত্য এলাকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ছিল শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির সঙ্গে সাক্ষাত করা।

ইবনে বতুতা, যাকে নিজে দেখেন, যার সান্নিধ্যে তিন দিন অবস্থান করেন, তার নাম ভুল করতে পারেন না, এই ধারণায় কেউ কেউ মনে করেন যে, শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি এবং শাহ জালাল একই ব্যক্তি। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন লোক এবং এ বিষয়ে বিস্তর লেখা লেখি হয়েছে। সুফীদের সম্বন্ধে সুলতানী এবং মোগল আমলে দিল্লিতে অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়। তার মধ্যে ফাওয়ায়িদুল ফুওয়াদ একটি প্রামান্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। এই পুস্তকে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজি সম্বন্ধে নিম্নরূপ তথ্যাদি পাওয়া যায়। [১০৯]

(১) শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিজি প্রথমে শায়খ আবু সায়িদ তাবরিজির শিষ্য ছিলেন। আবু সায়িদ তাবরিযির মৃত্যু হলে তিনি শায়খ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর (১১১৪-১২৩৫ ঈ.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আজমীরের শায়খ মুঈন উদ্দীন চিশতি (১১৪২-১২৩৬ ঈ.) শায়খ আবু সাঈদ তাবরিযি ও শায়খ সাহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর বন্ধু ছিলেন। শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি শায়খ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (মৃত্যু ১২৩৫ খ্রিঃ) এবং মুলতানের শায়খ বাহা উদ্দিন জাকারিয়া (১১৬৯-১২৬৬ ঈ.) বন্ধু ছিলেন। এ সকল তথ্য থেকে বুঝা যায় শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজি প্রধান সুফীদের সমসাময়িক ছিলেন যারা দ্বাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকের মধ্যেই পরলোক গমন করেন।

---

১০৭. বাদায়ুনী, নিজামুদ্দীন আহমদ, রাহাতুল কুলুব (মালফুজাত-ই- শায়খ ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শাকর, রচনাবলি ৬৫৫/১২৪৫ লাখনৌ তা-বি) পৃ ৪৬
১০৮. সিলেট- ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ ১২২
১০৯. প্রাগুক্ত পৃ ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

(২) সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী ১১৯২ ঈসায়ী তরাইন বা তিরোয়ারী যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং প্রায় একই সময়ে খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতি আজমীরে আসেন ইবনে বতুতার মতে শাহজালাল ১৫০ বছর বয়সে ১৩৪৭ ঈসায়ী মৃত্যুবরণ করেন এই হিসাবে শাহজালালের জন্ম হয় ১১৯৭ ঈসায়ী অর্থাৎ শায়খ মুঈন উদ্দীন চিশতি আজমীর আসার সময় শাহজালালের জন্মই হয়নি। কিন্তু শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি বৃদ্ধ না হলেও আধ্যাত্মিক সাধানার খ্যাতি অর্জন করেন, ফলে তিনি শায়খমুঈন উদ্দিন চিশতির বন্ধু হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

(৩) শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি সুলতান ইলতুতমিশের সময় দিল্লিতে আসেন। সুলতান তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রাসাদেই থাকা খাওয়ার-ব্যবস্থা করেন। দিল্লিতে শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেন। কিন্তু শায়খ কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী তার পক্ষ সমর্থন করেন। অবশেষে প্রায় অলৌকিক ভাবেই তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। অতএব, শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি তখন একজন প্রবীন লোক ছিলেন কিন্তু শাহজালাল তখন একজন বালক মাত্র (১৫০ বছর বয়সে মারা যাওয়ার কথা হিসেবে ধরলেও) তাছাড়া ইবনে বতুতার সাক্ষ্যমতে, শাহজালাল ইলতুত মিশের মত্যুর (১২৩৬ ঈ.) ২২ বৎসর পরেও বাগদাদে ছিলেন এবং খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর হত্যাকান্ড (১২৫৮ ঈ.) দেখেন।

যাই হোক দিল্লি থেকে শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি লখনৌতি চলে আসেন এবং বাকী জীবন লখনৌতিতে (বা বাংলায়) কাটান। মৃত্যুপর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যান বলে প্রমাণ নেই। শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযির মৃত্যুর তারিখ শুধু পরবর্তীকালে লিখিত একটি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। মুফতি গোলাম সরওয়ার লিখিত এবং ১৮৭০ ঈসায়ী লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত 'খাজিনাতুল আসফিয়া' গ্রন্থে এই তারিখ ৬৪২হি./ ১২৪৪ ঈসায়ী যদিও খাজিনাতুল আসফিয়া গ্রন্থটি অনেক পরে লিখিত তবুও শায়েখ জালাল উদ্দিনের মৃত্যুর তারিখটি সত্য বলে মনে করার কারণ আছে।

১ম শায়খ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশাকার নিজাম উদ্দিন নামক এক শিষ্য ৬৫৫ হিঃ বা ১২৫৭ঈ. রাহাতুল কুলুব নামে একখানি পুস্তক লিখেন, এ পুস্তকে শায়খ ফরিদ উদ্দীনের মালফুজ বা আলাপ আলোচনা লিপিবদ্ধ করাহয়। এক মজলিসে শায়খ ফরিদ উদ্দীন বলেছেন যে, তিনি শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি দেখেন যে, শায়খ জালাল হাসছেন। উপস্থিত একজন জিজ্ঞাসা করলেন মৃত্যু পথ যাত্রী কিভাবে হাসতে পারে। তিনি উত্তর দেন যে, এটা আল্লাহ তায়ালার রহস্য জ্ঞানের চিহ্ন। শায়খ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশাকর ১২৬৯ ঈসায়ী পরলোক গমন করেন, এই সূত্র অনুসারে শায়খজালাল উদ্দীন ১২৬৯ ঈসায়ীর আগে পরলোক গমনকরেন। ২য়, রাহাতুল কুলুব গ্রন্থটি লিখিত হয় ১২৫৭ ঈসাব্দে। অতএব শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযির মৃত্যুর তারিখ ১২৫৭ ঈসায়ীর আগে নির্ধারণ করতে হয়। তাই খাজিনাতুল আসফিয়ার সাক্ষ্য মতে শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযির মৃত্যুর তারিখ ১২৪৪ ঈসায়ী গ্রহণযোগ্য সুতরাং শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি শাহজালাল থেকে একশত বৎসর পূর্বের লোক ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। [১১০]

---

১১০. প্রাগুক্ত পৃ ১২২

Dhaka University Institutional Repository

পান্ডুয়ার শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি ও সিলেটের শাহজালাল মুজাররদ কুনিয়াভী (অথবা ইয়ামনী) যে দু'জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি তা উভয়ের জীবনেতিহাস ও কার্যাবলী হতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইবনে বতুতা তার 'তাজারিবুল আসফার' নামক ভ্রমন বৃত্তান্তে সিলেটে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে যে দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ করেন তার নাম শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি রূপে উল্লেখ করায় বেভারিজ (H. Beveridye.) স্টাপলন (H.E. Stapleton) সহ কয়েকজন আধুনিক লেখক এই ভ্রান্তিমুলক মত পোষন করেন যে, পান্ডুয়ার শায়খ তাবরিযি ও সিলেটের শাহজালাল (রহ.) উভয় অভিন্ন ব্যক্তি। [১১১]

উপরোক্ত লেখকগন সিলেটের হযরত শাহ জালাল (রহ.) ও তাঁর তিনশতাধিক সঙ্গী সাথির জন্মমৃতু কাল, গৌড় গোবিন্দের শাসনকাল, বাংলার তৎকালীন সুলতানদের শাসন কাল ও সিলেট বিজয়ের সন তারিখ পর্যালোচনা করলে অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারতেন যে, ইবনে বতুতা সিলেটের যেই মহান সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁর সময়পর্ব এবং পান্ডুয়ার শায়খ তাবরিযির সময় পর্বের মধ্যে প্রায় শতবর্ষের ব্যবধান, তাদের কর্মক্ষেত্র ও ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে সিলেটের সাধকের নামের শেষে তাবরিযি শব্দের সংযোজন হয় প্রক্ষিপ্ত কিংবা লেখক অথবা লিপিকারের বিভ্রম জনিত।
উপরোক্ত ভ্রমন বৃত্তান্ত ছাড়া অন্য কোন ও গ্রন্থেই সিলেটের হযরত শাহজালাল (রহ.) নামের সাথে তাবরিযি শব্দটির উল্লেখ নেই। জীবনগ্রন্থ সমূহে তারনামের শেষে মুজাররদ (চিরকুমার) এবং নিসবা রূপে ইয়ামনী অথবা কুনিয়াভি প্রায়ই উল্লেখরয়েছে। সিলেট অঞ্চল হতে তিনিকখনও গৌড় বা পান্ডুয়া অঞ্চলে গমন করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মাখদুম শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযির কর্মকেন্দ্র ছিল উত্তর বঙ্গের গৌড় পান্ডুয়ায়। তিনি সিলেট বিজয়ে ১৩০৩ ঈসায়ী অংশগ্রহণ করেছিলেন কিংবা সিলেট অঞ্চলে কখনও গমন করেছিলেন বলে কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয় নাই। ইবনে বতুতা ১৩৪৬ ঈসায়ী সিলেটে আগমন করেন এবং শায়খ তাবরিযি ইহার প্রায় একশত বর্ষপূর্বে ১২২৫ কিংবা ১২৪৪ ঈসায়ী ইনতিকাল করেন। কাজেই শায়খ তাবরিযির সহিত তার সাক্ষাৎ লাভ কল্পনা ও করা যায় না। হযরত শাহজালালের ইন্তেকাল হয় ১৩৪৭ ঈসায়ী সিলেটে। কাজেই ইহা সুনিশ্চিত যে, ইবনে বতুতা সিলেটে যে সাধকের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তিনি মখদুম শায়খ জালালুদ্দীন মুজাররদ কুনিয়াভী ইয়ামনী। তিনি বাংলার জনগণের নিকট শাহজালাল নামে পরিচিত। [১১২] অতএব উভয় দরবেশ এক হতে পারেন না।

---

১১১. ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ ৫৬৩।
১১২. প্রাগুক্ত পৃ ৫৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযির স্মৃতি বিজড়িত দুটি স্থান, পান্ডুয়া এবং দেওতলা। পান্ডুয়া প্রাচীন আমলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এটি গৌড়ের প্রায় ২০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মুসলমান সুলতানেরা পান্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করে এর নাম দেন ফিরুজাবাদ। পান্ডুয়ার শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির দরগা আছে এটি বড়ি দরগাহ বা বাইশ হাজারী দরগা নামে খ্যাত।

'রিয়াদ্ব-উস-সালাতিনে' বর্ণিত আছে যে, স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে সুলতান আলা উদ্দিন আলী শাহ (১৩৪১-৪২) মূল দরগা ভবনটি নির্মাণ করেন। এই দরগাহের বিভিন্ন ভবনে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপিতে শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির নাম আছে। ১৬৬৪ ঈসায়ী উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে তাঁর নাম শাহজালাল ১৬৭৩-৭৪ ঈসায়ী উৎকীর্ণ দ্বিতীয় শিলালিপিতে তার নাম জালালুদ্দীন শাহ, জালাল উদ্দিন তাবরিযি কিন্তু এই শিলালিপিতে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, জালাল উদ্দীন শাহ তাবরিজি (তাবরিয ইরানের একটি শহর) জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭২২ ঈসায়ী৷ তৃতীয় শিলালিপিতে তাঁর নাম দেওয়া আছে শাহ জালাল তাবরিয এবং ১৬৮২ ঈসায়ী৷ একখানি শিলালিপিতে তাঁর নাম জালাল উদ্দিন শাহ। উল্লেখযোগ্য যে, এই শিলালিপি গুলি পরবর্তীকালে, উৎকীর্ণ, প্রাচীনতম টিও শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির সময়ে প্রায় চার শত বছর পরে উৎকীর্ণ।

পান্ডুয়ার পনেরো মাইল উত্তরে মালদহ জেলার উত্তর সীমানায় কাছাকাছি দেওতলা অবস্থিত। এই স্থান ও শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির স্মৃতি বিজড়িত এখানে তার চিল্লা খানা বা সাধনার স্থান আছে। এই স্থানে প্রাপ্ত কয়েকখানি শিলালিপিতে শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্যগুলি ইতিহাসের দৃষ্টিতে পান্ডুয়ায় প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে অনেক বেশী মূল্যবান। এই শিলালিপি গুলিতে জানা যায় যে, শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির সম্মানার্থে দেওতলার নাম তাবরিজাবাদ রাখা হয়। একখানি শিলালিপিতে দেওতলা ওরফে তাবারিযাবাদকে শায়খ জালাল মুহাম্মদ তাবরিযির শহর বলা হয়েছে। সময়ের বিচারেও এই শিলালিপিগুলো প্রাচীন, প্রথমটি ১৪৬৪ ঈসায়ী উৎকীর্ণ।

অতএব, শিলালিপিগুলোর সাক্ষ্যে পান্ডুয়া দেওতলার শায়খ জালাল ছিলেন তাবরিযি। কিন্তু সিলেটের শাহজালাল ছিলেন কুন্যয়ারী। অতএব, উভয় শাহ বা শায়খ জালাল এক হতে পারেন না।[১১৩]

শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির মাযার ও প্রাসিঙ্গিক কথা

শাহজালাল (রহ.) এর কবর সিলেটে অবস্থিত, কিন্তু শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির করব কোথায় চট করে তা বলা যায় না। এটা গবেষণা করে বের করার বিষয়। পান্ডুয়ায় বাইশ হাজারী দরগাহে ৯ - ৬´´ দীর্ঘ × ৬ -২´´ প্রস্থ একটি কবর আছে। কিন্তু দরগাহের মুতাওয়াল্লীরা বলেন যে, কবরটি নকল। ওখানে শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি সমাহিত নন বরং তিনি সমাহিত আছেন আওরঙ্গবাদে (দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদের নিকটে) কিন্তু আওরঙ্গবাদে শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির কবর সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে না।

---

১১৩. সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ ১১২, ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ুনের আমলে রচিত মাওলানা জামালীর সিয়ারুল আরিফিন গ্রন্থে এবং আবুল ফজলের আইনে আকবরী গ্রন্থে বলা হয় যে, শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি বন্দরদেব মহলে সমাহিত আছেন। কিন্দুদিউ বা মালদ্বীপেও শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি সম্পর্কে কোন জনশ্রুতি নেই বা কেউ ছিল বলতে পারে না। সিয়ারুল আরিফেনে কিছু তথ্য আছে যা এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিধায় উল্লেখকরা যেতে পারে। এই পুস্তকে বলা হয় যে, শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি বাংলায় গেলে লোকজন তার চতুর্দিকে ভীড় জমায়। তিনি সেখানে একটি খানকা নির্মাণ করেন এবং দুস্থদের জন্য লঙ্গরখানা খোলেন। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি দেওমহলে যান। সেখানে একটি কুপ আছে একজন বিধর্মী অনেক অর্থ ব্যয় করে সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি মন্দিরটি ধ্বংস করে দালানকে তাকিয়া বা খানকায় পরিণত করেন এবং অনেক বিধর্মিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই মন্দির স্থলেই এখন তাঁর কবর অবস্থিত। এই সূত্রে শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি বাংলা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা নেই, বরং এই বিবরনে বুঝা যায় যে, শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি বাংলায় দেওমহলে সমাহিত হন। অর্থাৎ শায়খ জালালের সমাধিস্থল দেওমহল বাংলারই কোথাও অবস্থিত।

উপরে বলা হয়েছে যে, দেওতলা স্থানটি শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযির স্মৃতি বিজড়িত, তার সম্মানার্থে দেওতলার নাম তাবারিযাবাদ। দেওতলা এবং দেওমহল সমার্থক আরবী বা ফারসী 'মহল' বাংলায় - তলা, তাই মনে হয় আইনে আকবরী এবং সিয়ারুল আরিফিনের দেওমহল এবং শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির স্মৃতি বিজড়িত দেওতলা একই স্থান এবং এই স্থানেই শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি সমাহিত আছেন। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, শাহজালাল এবং শায়খ জালাল উদ্দীন তাবারিযি এক নয়, তারা ভিন্ন ভিন্ন লোক, প্রথম ব্যক্তি সিলেটে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতের মালদহ জেলার দেওতলায় সমাহিত আছেন।

আমি মনে করি, হযরত শাহজালাল মুজাররদ ও শায়খ জালাল উদ্দিন তাবারিযির ভিন্নতা, প্রমাণ করে একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি। তবুও একটি প্রশ্ন পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে পারে প্রশ্নটি হচ্ছে ইবনে বতুতা যাকে দেখেছেন তাঁর নাম ভুল করলেন কি করে? ইবনে বতুতা যে ভুল করেন সেই বিষয়ে ড. এম.এ. রহিম নিম্নরুপ ব্যাখ্যা দেন।

ইবনে বতুতা দিল্লিতে ছয় বছর অবস্থান করেন এবং সুফি সাধকের সহিত মেলামেশা করেন, ঐ সময়ে তিনি নিশ্চয়ই শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি সম্পর্কে শুনেছিলেন। পরে তিনি চীনে যাওয়ার পথে সিলেটে শাহজালালের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। শাহজালালের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রায় বিশ বছর পরে তার ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়। ইবনে বতুতা নিজে তার ভ্রমণ কাহিনী লিখেননি। তিনি স্মৃতিচারণ করেন এবং একজন সেক্রেটারী স্মৃতিকথা লিখে নেন। বিশ বৎসর পূর্বে ঘটিত ঘটনাবলী বর্ণনা করার সময় তারিখ এবং প্রায় একই রকম নামে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইবনে বতুতা হয়ত ভুল করেই শাহজালালের নামের সঙ্গে তাবরিযি শব্দটি যোগ করে পাঠকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ড. এম.এ. রহীম সাহেবের যুক্তি উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিশ বৎসরের ব্যবধানে স্মৃতি ভ্রম হতে পারে, বিশেষ করে নামের একটি শব্দের বা তারিখে। ইবনে বতুতার ভুলের আকেরটি প্রমাণ বাংলার ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা বলেন সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহ বলবনী বংশের লোক ছিলেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইবনে বতুতার এই উক্তি ভুল, সুলতান শামস উদ্দীন ফীরুজ শাহ বলবনি বংশের লোক ছিলেন না। [১১৪]

অতএব, সম সাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্তী কালের জীবনীগ্রন্থ সমূহ ও ঐতিহাসিক সূত্র সমূহের বর্ণনা হতে ইহা সুস্পষ্ট যে, শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি বঙ্গদেশেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন, বঙ্গদেশেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং পান্ডুয়া অথবা সন্নিকটস্থ দেওতলায় তিনি সমাহিত হন। এই মহান সাধকের ফাতিহা তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর রজব মাসের ১ হতে ২০ পর্যন্ত পান্ডুয়া বড় দরগাহে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগন তার মাজার জিয়ারত করেন। তবে সারা বৎসরই দেশ বিদেশের ধর্মপ্রাণ জনগন ও পর্যটক এই মাজার জিয়ারত করতে আসেন। এই দুই স্থানে তাঁর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত বহু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

সর্বশ্রেণীর জনগণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ সাধন নিপীড়িত, দরিদ্র ও পীড়িত অসংখ্য লোকের দুঃখ দুর্দশা মোচন, স্বীয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মহত্বের দ্বারা সর্ব সাধারণ জনগনকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির পথ প্রদর্শনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এইভাবে তিনি অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগনকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন এবং ১৩শ শতাব্দীর প্রথশ ভাগে বঙ্গ দেশে, বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে মুসলিম সমাজের ভিত্তি মুল সুদৃঢ় করতে অসাধারণ সফলতা অর্জন করেন। [১১৫]

সর্বশেষে বলতে হয় যে, ইবনে বতুতা সম সাময়িক হলেও তার বিবরণ স্মৃতিচারণ মূলক হওয়ায় সন তারিখ নাম ধাম অক্ষরে অক্ষরে সত্য নাও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে শায়খ জালাল উদ্দিনের নামের সঙ্গে তাবরিযি শব্দ যোগ করে তিনি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। ইচ্ছা বশতঃ এমন কোন কিছু করার কথা নয় তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তথা ভুল বশতঃ মানুষ হিসেবে এমন কিছু হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

উল্লেখ্য ইবনে বতুতা ৭৪৬ হিজরীতে বাঙ্গালা পরিদর্শন করেছিলেন সুতরাং পান্ডুয়ার জালাল উদ্দিন তাবরিজির সাথে তার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অধিকন্তু তিনি যখন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময় সম্ভবতঃ কামরুপের জালাল উদ্দিনের জন্ম হয়নি। কারণ ইবনে বতুতার বর্ণনামত কামরুপের জালালুদ্দীন ১৫০ বছর বয়সে ৭৪৭ হি. অব্দে মানবলীলা সংবরন করেছিলেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয় ৫৯৬ হি. জন্ম গ্রহণ করে থাকবেন। সে সময় দেওতলার জালাল উদ্দিন তাবরিযি খোরাসান ও বাগদাদ ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। একথা স্থির নিশ্চিত যে পরিব্রাজকের বর্ণিত কামরূপের জালাল উদ্দিনএবং পান্ডুয়ার জালাল উদ্দিন তাবরিযি একই ব্যক্তি নহেন। [১১৬]

---

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩, ১১৪।
১১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৯৭, ২৩শ, ১সং) পৃ ৫৬৫
১১৬. আজহার উদ্দিন আহমদ মুফতি সিদ্দিকী, শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, (ঢাকা, উৎস প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০০২, ৫সং) পৃ ৪০

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য জালালুদ্দিন তিবরিযিকে সিলেটের শাহজালাল মনে করা ভুল। তবে একথা নিশ্চিত যে, ইবনে বতুতা সিলেটের শাহজালালের সহিত সাক্ষাত করেন।[১১৭]

যারা বা যাদের লেখায় হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী (রহ.) এবং জালাল উদ্দিন তাবরিযিকে অভিন্ন তথা একজনই দেখিয়েছেন, সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

(১) স্যার হেনরী ইউল এবং প্রাচ্যের ইতিহাস বিশারদ হ্যামিলটন গিব এর লেখা পড়লে মনে হয় তারা শাহজালাল মুজররদ (রহ.) এবং জালালুদ্দিন তাবরিযিকে একই ব্যক্তি ধরে নিয়ে বিভিন্নমুখী বর্ণনার সমন্বয় করতে চেয়েছেন, এভাবে যে জলালুদ্দীন তাবরিযির চিল্লা খানা পান্ডুয়ার এবং তিনি সমাহিত আছেন সিলেটে।

(২) নুজহাতুল খাওয়াতির প্রণেতা সৈয়দ আব্দুল হাই বেরলভী, হযরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) এবং জালাল উদ্দিন তাবরিযিকে একজন বলে দেখিয়েছেন।

(৩) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেন যে, শাহ জালাল তাবরিযি বারিন্দ্র ভূমিতে প্রথম দিকে ইসলাম প্রচার করেন এবং পরবর্তী কালে তিনি সিলেট বসবাস করেন। তাঁর মতে এটা নিশ্চিত যে, ইবনে বতুতা সিলেটে-ই শাহজালাল তিবরিযির সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তিনি ৭৪৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

'তিনি সিলেটের পীর হযরত শাহজালাল' প্রবন্ধে লিখেন যে, দেখা যাচ্ছে জালাল উদ্দিন তাবরিযি মৃত্যুর তারিখ ইবনে বতুতা ব্যতিত সকলে কেবল শোনা কথার উপরে বিশ্বাস করে শাহ জালাল উদ্দিন তাবরিযিকে সিলেটের শাহজালাল হতে পৃথক মনে করা ভুল।[১১৮]

(৪) বিশ্ব ভারতীয় প্রাক্তন অধ্যাপক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বাবু সুখময় মুখোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর (স্বাধীন সুলতান দের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮) বইয়ের পরিশেষে উল্লেখ করেন ইবনে বতুতার দেখা শেখ জালালুদ্দিন কে? আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ড. আব্দুল করিমের মতে ইবনে বতুতা শেখ জালালুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি শেখ জালালুদ্দিন তাবরিযি নন, শেখ জালালুদ্দিন কুনিয়ায়ী। ড. আব্দুল করিম লিখেছেন- Ibn Batuta reference to shaykh Jalal Tabrizi in kumrup is mistake for shaykh Jalal Kunayai, as he comited in many other case in connection with Bangle"

ইবনে বতুতা যে লোককে নিজের চোখে দেখেছিলেন তার নাম ভুল ভাবে লেখা তার পক্ষে কি সম্ভব? শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি; অন্য কারও সঙ্গে দেখা করে শেখ জালালুদ্দিন তাবরিযির সঙ্গে দেখা করেছি। বলা কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব বলে মনে হয় না বলে স্বপক্ষে তিনি অনেক যুক্তি দেখিয়েছেণ।[১১৯]

(৫) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর নিবন্ধে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর উপাধি তাবারিযি দেখিয়ে তিনি শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযি এবং শাহজালাল (রহ.) কে অভিন্ন বলে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।

---

১১৭. ইসলাম প্রসঙ্গ, পৃ ৯৭
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮
১১৯. বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর, পৃ ৬৮৭-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন- শাহজালাল (রহ.) এরপূর্ণ নাম জালালুদ্দীন। তিনি ছিলেন ইয়ামনের অধিবাসী ৫৯৬/১১৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুহাম্মদ যিনি আবু সাঈদ তাবরিযির খলিফা ছিলেন শাহজালাল চির কুমার ছিলেন বলে তাকে মুজাররদ বলা হয়। তার পিতৃপুরুষ কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। মাতা ছিলেন সৈয়দা, পিতা- মাতার ইন্তেকালের পর মামা সৈয়দ আহমদ কবীরের তত্ত্বাবধানে শরীআত ও মারিফাতের বিদ্যা হাসিল করেন। পরে পিতা মুহাম্মদের মুর্শিদ আবু সাঈদ তাবরিযির মুরিদহন ও খিলাফত লাভ করেন। এই কারণে পিতার ন্যায় তাঁর ও একটি উপাধি হয় তাবরিযি। আবু সাঈদ তাবরিযির ইন্তেকালের পর তিনি শায়েখ শিহাব উদ্দিন আস সুহরাওয়াদীর মুরিদ হন। [১২০]

শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি ও হযরত শাহজালাল (রহ.)

বাংলাদেশে তাসাউফের মাধ্যমে ইসলামের প্রসারতা ও ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযির এদেশে আগমন ভারত বাঙ্গালা বিজয় খ্রিষ্টীয় ১৩ শতকের গোড়ায় হয়েছিল। পক্ষান্তরে শাহজালাল (রহ.) এর আগমন একশত বৎসর পরে সিলেট বিজয় খৃষ্টীয় ১৪ শতকের গোড়র দিকে হয়েছিল। উভয়ই প্রায় শত বৎসর ব্যবধানে পবিত্র মক্কা, মদীনার পবিত্র ভূমি থেকে বাগদাদ ও দিল্লী হয়ে বাঙ্গালায় পদার্পণ করেন। উভয়ই পবিত্র কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক রাসুল (সা.) এর বিশুদ্ধ সুন্নাহর পাবন্দ ছিলেন এবং উভয়েই কঠোর আল্লাহ প্রেমের সাধনায় নিমজ্জিত ছিলেন। অকল্পনীয় নূরে মোহাম্মদী (সা.) এর ফায়দ্ব এর আকর এবং আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। উভয়েই শরীয়ত ও তরিকত সম্মত আল্লাহর ইবাদত ও জনসেবার উদারতায় এবং আচার-ব্যবহারে, গণসংযোগে, ধর্ম-কর্মে, দয়া-দাক্ষিন্যে, উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্ম-বর্ণ গোত্র-জাতি শ্রেণী-নির্বিশেষে ন্যায়নিষ্ঠ ও সদাচারে অতুলনীয় ছিলেন। এসব সাদৃশ্যের দরুন ইবনে বতুতা এবং তাকে অনুসরণ করে ইংরেজ পন্ডিত বিভারেজ ও এতদুভয়ের অনুকরণে আরো অনেকে দুই জালালকে একই ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১২১] মূলতঃ এ ব্যাপারে ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছেন ঐ ম্যুর পরিব্রাজক ইবনে বতূতা। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন জালাল উদ্দীন তাবরিযি নামক কোন ওলীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি কামরূপ এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় এক জায়গায় সূফী সাধককে জালাল উদ্দিন (বারসামী) সিরাজী বলেছেন। জালাল উদ্দিন তাবরিযি এবং জালাল উদ্দিন সিরাজী এক ব্যক্তি নন। জালাল উদ্দীন তাবরিযি ও সিলেটের শাহজালালও এক নন। এটা ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে প্রমাণিত। ইবনে বতুতার রিসালা তাঁর নিজের হাতের লেখা নয়, বহুদেশ ভ্রমণ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে মরক্কোর রাজদরবারে তিনি তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করান। তাঁর বর্ণনা সমূহ মুহাম্মদ ইবনে জওজী নামক রাজ সভাসচিব কর্তৃত লিখিত হয়েছিল। বহুকাল আগে সংঘটিত ঘটনাবলীর স্মৃতি কিংবা বিশ বছর পূর্বে দেখা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন কিছু লিখতে বা বর্ণনা করতে গেলে বর্ণনাকারীর পক্ষে তারিখ ও নাম বিশেষ করে সাদৃশ্য মুলক নামের মধ্যে ভুল করা স্বাভাবিক। এ ধরণের ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে ইবনে বতুতা শায়খ জালালের (শাহজালাল) নামের সঙ্গে আল তাবরিযি আখ্যা জুড়ে দিয়েছেন।[১২২]

---

১২০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় খন্ড) দ্বিতীয়সংস্করণ। ইসলামী বিশ্বোকোষ প্রকল্প ই.ফা.বা প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৮৭) পৃ ৩৭৬।
১২১. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা ই.ফা.বা, জুন-১৯৯৭, ২৩খ, ১সং) পৃ ৬৫৩
১২২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬, ১খ) পৃ ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

উর্দু 'দায়রায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে শাহজালাল ইয়ামনী সিলহেটি আওর শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি জো পান্ডুয়া মে মদফুন হেঁ দর মখতলিফ বুজর্গ হায়।[১২৩] অর্থাৎ- শাহজালাল ইয়ামনী সিলেটি এবং শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযি যিনি পান্ডুয়ায় সমাহিত আছেন অবশ্যই ভিন্ন বুজুর্গ।

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দু'জন স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ড. আব্দুর রহিম ও ড. আব্দুল করিম পুঙ্খানু পুঙ্খরুপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ড. আব্দুর রহিম তাঁর সোস্যাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' এর ১ম খন্ডে ইবনে বতুতার সাক্ষের উপর নির্ভর করে দু'জনকে একব্যক্তি বলে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় খন্ডে শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি ও শাহজালাল দুই ব্যাক্তি বলে বর্ণনা দেন।[১২৪]

অতএব, এ বিষয়ে ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদের মতামত টুকু সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেয়াই শ্রেয়। কারণ গবেষণার আলোকে দেশের স্বনামধন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় পন্ডিতদের পান্ডিত্য পূর্ণ সিদ্ধান্তই এ পরিপ্রেক্ষিতেচূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে করি। নিম্নে এ বিষয়টি হবুহু তুলে ধরছি।

''সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে 'শাহজালাল' নিবন্ধটি প্রকাশের সময় কোন ও মহল হতে কোন জোরালো দ্বিমত উত্থাপিত না হওয়ায় সম্পাদক মন্ডলী গভীর ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে ড.এ.কে.এম. আইউব আলী ভিন্ন মত পোষণ করে শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি নিবন্ধটি লিখলে সম্পাদনা পরিষদের সভায় আলোচনাক্রমে ২ জন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের মতামত নেওয়া হয়। তাতে তাঁরা উভয়কে ভিন্ন দুই ব্যক্তি বলে মত প্রদান করেন। পরে ৫ জন ঐতিহাসিকের এক সভা আহবান করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ৪ জন ঐতিহাসিক এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত মত পোষণ করেঃ ইতিহাসে অনেক বিতর্কিত বিষয়ে মীমাংসা হয় না। শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি এবং সিলেটের শাহজালাল (রহ.) একই ব্যক্তি বা দুই ব্যক্তি কিনা এ প্রশ্নের নিশ্চিত চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও পর্যন্ত সম্ভব নয়। তবে এই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি মনে করে যে, এই দুইজন পৃথক দুই ব্যক্তি। সম্পাদনা পরিষদ বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের গৃহীত সিদ্ধান্তই অনুমোদন করে।''[১২৫]

---

১২৩. উর্দু দায়রায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যাহ (লাহোর, দানিশগা পাঞ্জাব, ১৯৭১ ইং ৭ খ, ১সং) পৃ ৩৩৬।

১২৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা, ইফাবা, জুন- ১৯৯৭, ২৩খ, ১সং) পৃ-৬৫৩

১২৫. প্রাগুক্ত পৃ- ৬৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযররত শাহজালাল (রহ.) এর কর্মজীবন

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

ব্যাঘ্রকে চপেটাঘাতের ঘটনা, মাটি আস্বাদন করার উপাখ্যান ও শাহজালাল মুজাররদ (রহ.)

অবতরণিকাঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনীর প্রাথমিক উপকরণ প্রধানতঃ উপাখ্যানমূলক। এসমস্ত উপাখ্যানগুলোর অবলম্বনে তঁর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। যদিও কোন কোন ঘটনায় নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু শতাধিক বছরের চেয়ে বেশী সময়ের মধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে যতগুলো পুস্তক লেখা হয়েছে বা প্রবন্ধছাপা হয়েছে প্রায় সবকটিতে হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক ব্যাঘ্রকে চপেটাঘাতের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ভিত্তির অভাবে প্রত্যেকেই তাদের কল্পনার আলোকে ঘটনাটিকে বিভিন্ন রূপ দিয়েছেন।[১] মূলত সকল ঘটনার বিষয়বস্তু একই। নিম্নে এ বিষয় আলোচনা করা হল।

মুফতি আজহার উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী বলেন হযরত শাহজালাল (রহ.) মাতুলের সঙ্গে যখন পবিত্র মক্কায় অবস্থান করেছিলেন, সে সময়ে একদা একটি হরিন ব্যাঘ্র কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সৈয়দ আহমদ কবিরের নিকট এ হিংস্র জন্তুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন পূর্বক তিনি তাঁর ভাগ্নের হযরত শাহজালাল (রহ.) উপর এর সুবিচারের ভার অর্পণ করলেন। তদনুসারে হযরত শাহজালাল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে। সৈয়দ আহমদ কবির হোজরাতে বসে মনে মনে ভাবলেন যদি এই ব্যাঘ্রটিকে দুহাতে পাঁচ আঙ্গুলির দক্ষিণ হাতের তিন ও বাম হাতের দু' আঙ্গুলীর সাহায্যে থাপপর মেরে জঙ্গল হতে তাড়িয়ে দেয়া হয় তবে উপযুক্ত শাস্তি হবে। হযরত শাহজালাল (রহ.) আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে তাঁর মাতুলের ইচ্ছা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন এবং তদনুসারে কার্য করলেন। ফিরে এসে যথাযথ ভাবে ঘটনাটি তার মাতুলের নিকট বর্ণনা করলেন। এতে তিনি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন। তোমার আধ্যাত্মিকতা চরমে পৌছেছে; আমার এবং তোমার হৃদয় এক হয়ে গেছে, তোমাকে আবদ্ধ করে রাখা চলেনা। অতএব, যাও ভারতে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ কর।

সুহেল-ই-ইয়ামনগ্রন্থে ঘটনাটি এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদিন হযরত শাহজালালের পীর সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী পবিত্র মক্কায় তার খানকার মধ্যে বসা ছিলেন। তখন একটি হরিণ তার কাছে এসে বিচার চেয়ে বসল। জনাব আল্লাহ আপনাকে অনেক ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। আমি আপনার সাহায্য প্রার্থী, কেননা একটি হিংস্র বাঘ অত্যাচার চালিয়ে আমাকে ঘর ছাড়া করেছে। আমার কি ছিল, এখন কি হয়ে গেল, এই বিষয় আমার হৃদয় মন চুর্ন বিচুর্ণ হয়ে গেছে। আল্লাহ আপনাকে একজন বিচারকের যে গুণ থাকা দরকার তা দিয়েছেন। আপনি হচ্ছেন সৃষ্টি জগতের সেরা আমি তো এক অতি সাধারণ নিরীহ জীব।

---

১. শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.), পৃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

আমি আমার ঘোর সংকটে আপনার সহযোগিতা চাই যাতে আমার প্রতিশোধের পথ সুগম হয়। হরিণির এমন আহাজারি আর ভয় জনিত কষ্ট শুনে তাঁর দয়াদ্র মন উথলে গেল তিনি নিপীড়িত হরিনীর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর ভাগ্নে শাহজালাল (রহ.) কে নির্দেশ দিলেন। শাহজালাল হরিণিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখলেন একটি বাঘ বসে আছে। বাঘটি শাহজালালের (রহ.) চেহারা দেখামাত্র পায়ে লুটিয়ে পড়ল। শাহজালাল চাচ্ছিলেন বাঘটিকে মেরে হরিণীর উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার পীর সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দীর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন শাহজালাল যেন তার ডান হাতের তিন আর বাম হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে বাঘের মুখে আঘাত করেন। তিনি তাই করলেন এবং বাঘটি গৃহচ্যুত করে হরিণীকে তার হৃত গৃহ পুনরুদ্ধার করে দিলেন।
উপরোক্ত ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার এই অভিনব পদ্ধতি অর্থাৎ দুই হাতের পাঁচ আঙ্গুলি এক করে আঘাত করার গুঢ় রহস্য গুরু শিষ্যের মন একস্থরে পৌঁছে গিয়েছিল। বিধায় মামা ও পীর সৈয়দ আহমদ কবির বললেন 'জালাল সুমা বকামালে রসিদি' অর্থাল জালাল তুমি আত্মোন্নতির চরমে পৌঁছে গেছ।"[২]

ড. ওয়াইজ ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপঃ একদিন সৈয়দ আহমদ কবির তার মক্কাস্থ আস্তানার সম্মুখে উপবেশন করে আল্লাহর ধ্যানে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন দেখলেন যে, একমৃগ শাবক সহ তাঁর দিকে আসছে। মৃগটি বর্ণনা করল কিভাবে বনে একটি শার্দুল আবির্ভূত হয়ে মৃগকুল নিধন করছে। মৃগটি সৈয়দ আহমদ কবিরের নিকট আবেদন করল যে, তিনি যেন বনে গমন করে শাদুলটিকে বন হতে তাড়িয়ে দেন। শায়খ জালাল কে ডাকা হল এবং নির্দেশ দেয়া হল। যেন বনে গিয়ে শার্দুলটিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পথিমধ্যে শায়খ জালাল ভাবতে লাগলেন তিনি শার্দুলটিকে কি করবেন, অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি শার্দুলটিকে বনের মধ্যে পেলেন। তার নয়ন থেকে চোখ জলসানো জ্যোতি নিক্ষিপ্ত হল তা সহ্য করতে না পেরে শার্দুলটি পালিয়ে গেল। তার সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায়নি।[৩]

প্রকাশ থাকে যে, মোরগের বাচ্চাকে চিল অথবা শৃগাল যখন তাড়া করে, তখণ সাধারণ মানুষতো এসব আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ধাওয়াকারী চিল শৃগাল ও সাপকে লাটি পেটা করে তখন তো পশুপাখি জীবজন্তুর ভাষা বুঝার কথা উঠে না। এই কথা কে না বুঝে? তবে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদেরকে তা বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। যেমন হযরত সুলাইমান (আ.) কে আল্লাহ পাক পশু পাখি জীব-জন্তুর ভাষা বুঝার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ মওজুদ আছে। যেমন- তিনি এরশাদ করেন-

وورث سليمن داود وقال يايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين–

---

২. আব্দুর রহিম, শ্রীহট্ট নূর (উইকলি ক্রনিক্যাল প্রেস, শ্রী কার্তিক চন্দ্র দাস প্রিন্টার্স কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৯০৫) পৃ ১৩-১৪

৩. ওয়াইজ ড., (কলকাতা, জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৭৩ ইং) পৃ ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ- সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন এবং বলেছিলেন হে লোক সকল আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছুর জ্ঞান দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব [৪] আল্লাহ পাক যদি অনুরূপ ক্ষমতা তার কোন প্রিয় বান্দাকে দিতে চান দিতে পারেন।

এতে সংশয় পোষণ করা ইসলামী আকাইদের পরিপন্থি নবী রাসুল কর্তৃক এসব অলৌকিক কর্মকান্ডকে পরিভাষায় 'মু'জিযা' এবং ওলী আউলিয়া কর্তৃক অনুরূপ অলৌকিক কর্মকান্ডকে 'কারামত' বলা হয়। এসব বিষয় সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। কুরআন-হাদিস বা নবী সাহাবা চরিতের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে যদি এসব কিংবদন্তী তথা ওলী-আউলিয়াদের কর্তৃক সংঘটিত অলৌকিক কর্মকান্ড বর্ণনা করা হয় এতে আপত্তি করার কোন কিছু হতে পারে না। আল্লাহর প্রকৃত প্রিয় বান্দাদের পক্ষ থেকে এ ধরণের শত শত অলৌকিক কর্মকান্ড প্রকাশ পেয়ে আসছে এবং এ ধরাবাহিকতা চলতে থাকবে। এগুলো ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়া বা যুক্তিতে আসেনা এগুলো বলার কোন অবকাশ নেই কারণ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত এমন কোন কিছু সংঘটিত হওয়াই হচ্ছে কারামত। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য আকাইদের কিতাব আকাইদে নাছাফীর ভাষ্য ও মর্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া হল।

كرامة الاولياء حق فتظهر الكرامة علي طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس والمشي علي الماء والطيران في الهواء وكلام الجماد والعجماء- كما نقل عن كثير من الاولياء-

অর্থাৎ- আওলিয়ায়ে কেরামদের পক্ষ থেকে সংঘটিত অলৌকিক কর্মকান্ড সত্য। সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত এমন কোন কিছু প্রকাশিত হওয়াই হচ্ছে কারামত। সুদীর্ঘ দুরত্ব স্বল্প সময়ে অতিক্রম করা, পানাহার, পোশাক প্রকাশ পাওয়া, পানি এবং বাতাসের উপর দিয়ে চলা, জড় বস্তু ও প্রাণীকুলের সাথে কথা বলা।[৫] এসব বিষয় অনেক আউলিয়ায়ে কেরামদের জীবনে সংঘটিত হয়েছে বলে বর্ণিত আছে। প্রামাণ্য দলিল পবিত্র কোরআন ও হাদীসে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মূল কিতাবের ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে তার মর্মার্থ নিম্নরূপ সুলাইমান (আ.) এর মন্ত্রী সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী আছফ বিন বরখিয়া রাণী বিলকিসের সিংহাসনকে সুদীর্ঘ দূরত্ব থাকা সত্বেও চোখের পলকে নিয়ে এসেছিলেন। প্রয়োজনের সময় চাহিদানুসারে খাদ্য সামগ্রী সামনে উপস্থিত হওয়া হযরত মরিয়মের বেলায় যখনই হযরত জাকারিয়া (আ.) তার নিকট আসতেন তখন অমৌসুমী পানাহার সামগ্রী মওজুদ পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে মরিয়ম তোমার নিকট এসব বস্তু কোথেকে আসল? উত্তরে তিনি বলতেন আল্লাহর নিকট হতে। পানির উপর দিয়ে চলা অনেক অনেক আউলিয়ার জীবনীতে বর্ণিত রয়েছে।

৪. আল কুরআন- ১৯: ১৮

৫. আন-নাসাফী আবূ হাফস উমর ইবন মুহাম্মদ, জ. ৪৬১ হিঃ মৃ. ৫৩৭ হিঃ মাওয়ারাউন্নাহর এর শহরসমূহের মধ্যে একটি শহর। উর্দু শরাহ আকদুল ফাওয়াইদ আলা শরহিল আকাইদ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী অনু. (চট্টগ্রাম হাটহাজারী) জমিরিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯৭ হিঃ, পৃ. ১৯৬, ১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাতাসের উপর দিয়ে চলা যা জাফর বিন আবি তালিব এবং লোকমান আস সারখাসী (রহ.) এর জীবনীতে বর্ণিত আছে। জড় পদার্থ এবং জন্তু জানোয়ারের সাথে কথাবার্তা বলা যেমন হযরত সুলায়মান (আ.) এবং আবুদ দরদা এর সামনে একটি পেয়ালা ছিল, উহা 'সুবহানাল্লাহ' বলল। উল্লেখিত বুজর্গদ্বয় পেয়ালা কর্তৃক এ তাসবিহ পাঠ নিজ কানে শুনেছেন। পশুদের কথা বার্তা বলা যেমন আছহাবে কাহফের কুকুর কথা বার্তা বলেছিল। নবী করিম (সা.) হতে বর্ণিত আছে একজন লোক গাভীর উপর বোঝা দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল হঠাৎ করে উহা তার দিকে ফিরে বলল আমাকে একাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, নিশ্চয় আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাষাবাদের তথা ক্ষেত কৃষির জন্য। উপস্থিত জনতা আশ্চর্য হয়ে বলল 'সুবহানাল্লাহ' গাভী ও কি বলতে কথা পারে। তখন নবী করিম (সা.) শুনে বললেন, আমি উহার সত্যতা জ্ঞাপন করছি। (আল্লাহর কুদরতের বাইরে কিছুই নয়)।

দলিল হিসেবে কতিপয় পবিত্র কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করছি।

(১) বিলকিছের সিংহাসন সম্পর্কিত আল কুরআনে বলা হয়েছে, সুলাইমান বলেছেন- হে পরিবদবর্গ, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকিসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? জনৈক দৈত্য বলল- আপনি আপনার আসন হতে দাঁড়ানোর পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি এক কাজে শক্তিমান ও বিশ্বস্থ।[৬]

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুলে পাক (সা.) এরশাদ করেছেন- আমি হযরত জাফর (রা.) কে জান্নাতের মধ্যে ফিরিশতাদের সাথে উড়তে দেখেছি।

(৩) আসহাবে কাহাফের কুকুরের কথা- لا تطردوني فاني احب اولياء الله

অর্থাৎ- তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিওনা কেননা আমি আল্লাহর বন্ধুদেরকে ভালবাসি।

এখন মূল বিষয়ে আসা যাক; প্রশ্ন করা হয় আরব মরুভূমির দেশ। সেখানে বাঘ হরিণ বিচরণ ভূমি কোথায়? সেখানে পাহাড় জঙ্গল আছে। রাসুল করিম (সা.) হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। কয়েকরাত্রি নির্জনে এবাদত করার লক্ষ্যে। এমতাবস্থায় তার ওপর সর্বপ্রথম ওহী নাজিল হয়। এ বিষয় বিতারিত বোখারী শরীফের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে। একথা কে না জানে পবিত্র হাদিস শরীফে যার বর্ণনা রয়েছে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে রাসুল করিম (সা.) সর্ব প্রথম আরব বাসির নিকট দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়ে দেন। এখানেই তো প্রকাশ্য প্রকৃত ইসলামী বিপ্লবের সূচনা। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আরবের ভূগোল-ইতিহাস পাঠকদের নিকট ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এ বিষয়ে বক্রতার আশ্রয় নেয়া একবারেই অবান্তর।

সমগ্র বিশ্ববাসী পবিত্র মক্কার মহাত্ম ও মর্যাদার কথা স্বীকার করেন। এই পূণ্যভূমিতে মামা ও বুজুর্গ পীর মুর্শিদ হযরত সৈয়দ আহমদ কবির সুহরাওয়ার্দী (রহ.) এর সান্নিধ্য ও সুহবতে থেকে হযরত শাহজালাল শরীয়ত, তরীকত হাকীকত ও মারিফত হাসিল করেন। এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হল বটে কিন্তু শাহজালাল (রহ.) আর ও ইলম, আর ও বেশি তালিম তারবিয়াত হাসিল করতে ব্যাকুল হলেন। জ্ঞানের ও শেষ নেই, আমলের ও শেষ নেই। শাহজালাল (রহ.) এর-

---

৬. আল কুরআন ১৯; ৩৮, ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য ও এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ায় বুযুর্গী হাসিলের পর সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী (রহ.) তদীয় ভাগ্নেয় ও যোগ্য শিষ্য হযরত শাহজালালকে তার খানকা হতে রুখসত দিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করেন। এমর্মে যে, তোমার কামালিয়াত হাসিল হয়েছে এখন আমার নিকট থাকার দরকার নেই। ব্যাঘ্রকে চপেটাঘাতের ঘটনার মাধ্যমে তার ইলমে মারিফেতের কামালিয়াত এর উঁচু স্তরে উপনীত হওয়ায় প্রত্যক্ষ সাক্ষী।[৭]

কোন কোন লেখক ব্যাঘ্রকে চপেটাঘাতের ঘটনাকে আলৌকিক শক্তি বা কারামত হিসেবে না দেখে তাঁর দৈহিক শক্তির কথা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে এ বাংলার মূলুকে ও এমন ঘটনা বহু আছে, যেখানে পল্লী অঞ্চলের কোন ব্যক্তি একক হস্তে ব্যাঘ্র হত্যা করেছেন এবং সেজন্য সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। তারা কেউ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন না ছিলেন অসাধারণ শারিরিক শক্তির অধিকারী।[৮]

শায়খ সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) ও শাহজালাল (রহ.) এর বড় পরিচিতি হচ্ছে- একজন মুর্শিদে বরহক আর অপর জন মুর্শিদ কর্তৃক খেলাফত বা খিরকা প্রদানের উপযুক্ত খলিফা। এ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় অত্যাচারীত হরিণের বিচার প্রার্থী হওয়া এবং শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক জঙ্গল থেকে ডেকে এনে স্বীয়, মুর্শিদের দর্শন মোতাবেক বিচার কার্য সম্পন্ন করা উভয়টাই ওলীর কারামত ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের বাস্তব প্রমাণ। এতে কোন প্রকার দৈহিক শক্তি প্রয়োগ বা লৌকিকতার কোন কিছু নয়।

মাটি আস্বাদন করার উপাখ্যানঃ

হযরত শাহজালাল (র.) এর পীর ও মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে একাধারে ৩০ বছরের কঠোর সাধানায় তিনি কামালিয়াতের শীর্ষস্থানে পৌঁছে ছিলেন। যার ফলে তাঁকে তার মামাও মুর্শিদ এক পর্যায়ে হিন্দুস্তানে (ভারতে) ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষাপট আলোচনার পূর্বে তৎকালীন সময়ের ঐতিহাসিক দিক ও শাহজালাল মানস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের সিংহদ্বার মুসলিম ধর্মপ্রচারক এবং সুফি সাধকদের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা এর পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অংশে আস্তানা স্থাপন করে স্থানীয় লোকদের ইসলামের সাম্য এবং সরল জীবন দর্শনের দিকে আহবান জানাতে থাকেন। ঘন বসতিপূর্ণ উপমহাদেশকে তারা মনে করলেন ইসলামের শান্তি ও সাম্যের বীজ রোপনের উর্বরক্ষেত্র। ভারতের মূর্তি পুজার অনুষ্ঠান ও তাঁদের এদেশে আকর্ষণের এক প্রধান হেতু ছিল। কারণ তারা সাকারের পরিবর্তে নিরাকার সত্তার আরাধনা প্রতিষ্ঠাকে মনে করতেন জীবনের অন্যতম মহান ব্রত ও সাফল্য।[৯]

---

৭. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, জালালাবাদের কথা, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, ২সং) পৃ ১১
৮. প্রাগুক্ত পৃ ২৭
৯. হযরত শাহজালাল কুনিয়াজী (রহ.) পৃ ২৮

সুফিসাধকরা মূর্তি পুজার জন্য ভারতকে মনে করতেন অন্ধকার দেশ। দেব দেবী ও মুর্তিপুজার বিরুদ্ধে শৈশব থেকে বিরুদ্দবাদী ছিলেন মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র কাবাগৃহ থেকে ৩৬০ টি মূর্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত সর্ব প্রথম ঘর কাবা শরীফকে মুক্ত করেছিলেন। তাদেরই সুযোগ্য উত্তরসুরী ওলিকুল শিরমনি ইসলামের মহান সিপাহসালার হযরত শাহজালাল (রহ.)। তিনি তাঁর মুর্শিদের দিক নির্দেশনায় তাওহিদ, রিসালত, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সুমহান বাণী নিয়ে ভারতে আগমনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে নেন।

ড. ওয়াইজ বলেন হযরত শাহজালালের মাতুলও মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী তাঁকে বললেন, এগিয়ে যাও পৃথিবী পর্যটন কর যে পর্যন্ত না এমন ভূমি পাও যার রং ও গন্ধ এ মাটির অনুরূপ। সেরূপ ভূমি নিজ আবাসগৃহ রূপে তিনি স্থির করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন।[১০]

সৈয়দ মুর্তাজা আলী তার হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস গ্রন্থে লেখেন- তোমার আর আমার কাছে থেকে ইবাদতের প্রয়োজন নেই, তুমি হিন্দুস্তানে গিয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার কর। তৎপর তার হোজরা থেকে এক মুষ্টি মাটি তুলে হযরত শাহজালালের হাতে দিয়ে বললেন ঠিক এই বর্ণের এই গন্ধের এই স্বাদের মাটি যেখানে পাবে বুঝবে সেই স্থান পবিত্র।

তুমি সেখানেই থাকবে। সে স্থানই তোমার সাধন ভূমি। যাও বৎস তোমাকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিলাম।[১১]

ড. শহীদুল্লাহ 'সিলহেটের পীর হযরত শাহজালাল' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, শাহজালাল পীরের আদেশে সফরে রওয়ানা হন। পীর সাহেব তাঁকে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে বললেন যেখানে এ মাটির মত রং ও স্বাদের মাটি পাওয়া যাবে সেখানে যেন তিনি বসবাস করেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) মুর্শিদ প্রদত্ত মাটিটুকু তার এক শাগরিদ চাষনি পীরকে দিলেন যেন যেখানেই তরা গমন করেন, সেখানকার মাটি যেন তিনি আস্বাদন করেন।

মৃত্তিকা বিজ্ঞানী চাষনি পীর মাটি বহন করতেন এবং নূতন যে স্থানে শাহজালাল (রহ.) যেতেন সেখানকার মাটি জিহবা দিয়ে চেটে আস্বাদন করে দেখতেন যে, শাহজালাল (রহ.) এর মুর্শিদের গৃহের মাটির অনুরূপ কিনা সে জন্য তার নাম রাখা হয় চাষনী পীর (তার প্রকৃত নাম অজ্ঞাত)। তাঁর সমাধি রয়েছে সিলেট শহরের উত্তর পূর্বদিকে গোয়াইপাড়াতে। অধূনা মৃত্তিকা বিজ্ঞানীর সাথে চাষনী পীরকে তুলনা করা যায় বলে আমি মনে করি। চাষনি পীর কর্তৃক জিহবা দিয়ে মাটি চোষণ করার গল্পটি খুবই রসালো ও চিত্তাকর্ষক।

---

১০. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা, ১৮৭৩ইং, পৃ- ২৭৮।

১১. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ০৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী লেখকদের মধ্যে অনেকেই উপখ্যানটি নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। এবং বিভিন্ন ভাবে স্বীয় চিন্তা ধারা থেকে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য মাটি চোষণ করার কাহিনীটি সিলেটের জনমনে অত্যন্ত বদ্ধমূল। স্থানীয় মানুষেরা উপাখ্যানটি সত্য বলে মনে করেন বিশেষতঃ সিলেট শহরে গোয়াইপাড়ায় অবস্থিত চাষনী পীরের মাযার উপাখ্যানটির সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করে।

সম্ভবত জিহবা দিয়ে চুষে তুলনা করে দেখার কথা শাহজালাল (রহ.) এর নির্দেশ না ও হতে পারে। তবে ভক্তি প্রবর অতিভক্তির জন্য তা করেছেন বলে মনে হয়। কেউ কেউ শাহজালাল (রহ.) এর মামা ওমুর্শিদ সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দীর স্থলে সৈয়দ সুলতান আহমদ ইয়াসভীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, একদিন তিনি (শাহজালাল) রওশন জমির বা জ্যোতির্ময় আত্মা শাহ আহমদ ইয়াসভীর কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন যেহেতু তিনি আল্লাহর পথ নির্দেশে জিহাদে আকবরএ কৃতকার্য হয়েছেন, অতএব, অনুরূপ সাহায্য ও সাহস তাঁর উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করলে তা দিয়ে তিনি জিহাদে আসগরে কৃতকার্যতা অর্জনে আগ্রহশীল এবং যেখানে দারুল হরব আছে বিজয় করে গাজী বা শহীদের দরজা অর্জন করা তাঁর ইচ্ছা।[১২] শাহজালাল (রহ.) এর প্রস্তাব শুনে মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ ইয়াসভী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন এবং ৭০০ শাগরিদ শাহজালাল (রহ.) এর অনুগামী হতে নির্দেশ দেন।

শাহজালাল (রহ.) তখন কোথায় ছিলেন এবং কোথা থেকে তিনি প্রথম শাগরিদদের নিয়ে জিহাদে আসগরে অংশগ্রহণ করতে বের হন সে বিষয়ে ও মতভেদ আছে। অধিকাংশ জীবনী লেখকের মতে তিনি পবিত্র মক্কা হতে বের হন। তাদের প্রায় সকলেই (মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার সহ) বর্ণনা করেছেন যে, সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মামা ও মুর্শিদ।

কেউ কেউ একথা স্বীকার করেন তবে তারা বলেন তিনি পবিত্র মক্কার নয় পাঞ্জাবের মুলতান এবং উঁচে বসবাস করতেন। আবার কেউ কেউ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে শাহজালাল উঁচ্ থেকে সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দীর দোয়া নিয়ে ইসলাম প্রচারে বের হন।[১৩]

এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যা শাহজালাল (রহ.) এর অধিকাংশ জীবনী লেখকের মতামত যে, শাহজালাল (রহ.) এর প্রকৃত মুর্শিদ এবং মামা হচ্ছেন সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী এবং তার সাধনা ক্ষেত্র পবিত্র মক্কা। তিনি পবিত্র মক্কাস্থিত হুজরা তথা খানকার মাটি দিয়ে তাকে হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য দেয়া ও নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। উল্লেখ্য ঐতিহাসিক অনেক বিষয়ে দ্বিমত থাকে, দ্বিমত থাকাটা স্বাভাবিক তবে অধিকাশের মতামত কে শ্রদ্ধা জানাতে হয় এবং তা পরিশেষে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে থাকে।

---

১২. Mohammad Gaushi Maunduvi Gulzar-E-Abrar Asiatic Society of Bengal Fiolio. 41, Calcutta 1913, p- 41.
১৩. হযরত শাহজালাল কুনিয়াজী (রহ.),পৃ- ২৯

Dhaka University Institutional Repository

শাহজালাল মুজাররদ (রহ.):

৯১১ হিজরীর হোসেন শাহী শিলা লিপিতে শাহজালাল কে শায়খ জালাল মুজাররদ বলা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণনুসারে মুজাররদ শব্দটি বাবে তাফয়িল হতে ইসমে মাফয়ুল এর রূপ। অভিধানিক অর্থে কোন বস্তু হতে মুক্ত বা খালি থাকা।

যেহেতু তিনি বিবাহ মুক্ত জীবন তথা চিরকুমার ছিলেন বিধায় উহা তাঁর নামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দরবেশ শাহজালাল দার পরিগ্রহ করে সংসার বেড়াজালে আবদ্ধ হতে চাননি। চিরকুমার থাকা অবশ্য আল্লাহর রাসুলের সুন্নাতের খেলাফ। যেহেতু বিবাহ রাসুল পাক (সা.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও গুরুত্ব সসম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন-

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان له وجاء–

হে যুব সমাজ যখন তোমাদের কেহ বিবাহ করার সামর্থ রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা ইহা দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।

আর যে ব্যক্তি অপারগ বিবাহের (খরচ ও স্ত্রীর ভরণপোষণের) সামর্থ রাখে না তার কর্তব্য হবে রোযা রেখে যাওয়া। ধারাবাহিক রোযার দ্বারা তার কামরিপুর দমন সাধিত হবে। যৌন উত্তেজনা প্রশমিত হবে।[১৪]

শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (র.) সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে তথা মুশাহাদা - মুরাকাবা ও দুর্গত মানবতার সেবায় নিজেকে এমনিভাবে উৎসর্গ করেছিলেন যে, তিনি নিজ আরাম আয়েশ সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে সহজ সরল জীবন যাপন করেছিলেন। তার নেক দোয়া, ফয়েজ বরকত প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেখা করে মানুষ যে সমস্ত হাদিয়া তোহফা প্রদান করত তিনি সব কিছু গরীব দুঃখী তথা আর্ত মানবতার সেবায় দান করে দিতেন। এ বিষয়ে আল্লামা শেখ ছাদী (রহ.) এর একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য

'ত্বরিকত বযুজ খেদমতে খলক নিস্ত/ কে তাছবিহ ও সাজদা ও দলক নিস্ত

অর্থাৎ- আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির পথ লুকানো রয়েছে মানব সেবার মাঝে।

পাবে নাকো স্রেফ সেজদা, তাছবিহ আর জুব্বা জায়নামাযে।[১৫]

বিবাহ মুক্ত জীবন যাপন সংসার বিরাগী (মুজাররদ) হওয়া এটা কেবল তাঁর জন্যই তিনি বেছে নিয়েছিলেন অন্য কারও জন্য তিনি উহা আদর্শ হিসেবে কখনও তুলে ধরেননি।

বরং সঙ্গী সাথীদের বিবাহের জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি সার্বক্ষনিক আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও খেদমতে খালকে এমনিভাবে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন যে, বিবাহ করার মত অবকাশ, সামর্থ, চিন্তা চেতনা, তার মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত ছিল।

---

১৪. আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবন ইসমাইল, আল-বুখারী, আল-জামে, আল-সহীহ (করাচি, কাদিমী কুতুবখানা, মুকাবিল আরামবাগ ১৩৮১হি. ২খ, ২সং) পৃ-৭৫৮

১৫. সম্পাদনা পরিষদ, রাগীব আলী (সিলেট, আগস্ট ২০০১, ১সং) পৃ- ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা যায়েজ নয়। বিধায় শাহজালাল (রহ.) কখনও সুন্নতে নববীর বরখেলাফ করেননি। তিনি শুধু মাত্র পীর ছিলেন না, মস্তবড় আলিমও ছিলেন। ইসলামী শরীয়ার সিদ্ধান্ত হচ্ছে সর্ব প্রকার শারিরিক আর্থিক ও মানসিক সামর্থ থাকলে বিবাহ করা অবশ্য কর্তব্য। আর যদি শারীরীক, আর্থিক ও মানসিক সামর্থ না থাকে তবে বিবাহ করা নাজায়েজ।

স্ত্রীর প্রতি জুলুমের আশংকা দেখা দিলে অর্থাৎ তার বৈবাহিক অধিকার সমূহ পূরণে অসমর্থ হলে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরিমী আর আশংকা নিশ্চিত হলে এ ক্ষেত্রে বিবাহ করা হারাম।[১৬] (শামী ২য় খন্ড)

বিশ্বের আর কোন মহাপুরুষ মনীষির ক্ষেত্রে 'মুজাররদ' আখ্যা আছে বলে মনে হয়না এজন্য ওলীকুল শিরমনি হযরত শাহজালাল (রহ.) দুনিয়ার সকল ওলী-আউলিয়াদের মধ্যে একজন ব্যতিক্রম ধর্মী মহান দরবেশ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিবাহ করে মানুষ সন্তান লাভে পিতা হয়ে ধন্য হয়। ব্যতিক্রম হযরত শাহজালাল (রহ.)তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নাহয়েও বাংলাদেশ ও আসাম অত্র অঞ্চলের সকল মুসলমান নর নারীর পিতা ও আউলিয়াদের সম্রাট। এসব অঞ্চলে তিনি ও তাঁর সঙ্গী সাথী ৩৬০ আউলিয়ার একনিষ্ঠ ইসলামের খিদমতের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা ভরে মানুষ সম্ভবতঃ তার জীবদ্দশা থেকে বাবা শাহজালাল আউলিয়া ধ্বনি উচ্চারণ করে আসছে এবং এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত অবধি চলবে।

কবির ভাষায়-

"সিলেট প্রথম আজান ধ্বনি বাবায় দিয়েছে
সেই আজানে পাথর গলিয়া পানি হইয়াছে।"

সীরাত, ইসলামের ইতিহাস এবং ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি তথা উছুলুলফিকহ গ্রন্থের কোন কোন বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন কোন বিষয় নাজায়েজ কিন্তু আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের জন্য তা জায়েজ করে দেয়া হয়েছে (ইলহামের মাধ্যমে)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমাদের মাজহাবের স্বনামধন্য ইমাম আজম আবু হানিফা নু'মান বিন ছাবিত (জন্ম ৮০ হি., ওফাত ১৫০ হি.) এবং খায়রুত তাবিয়িন (সর্বোত্তম তাবিয়্যিন) আশিকে রাসুল হযরত ওয়ায়েস কুরনী (রহ.) উভয়ের জীবনী পর্যালোচনা করলে উল্লেখিত বিষয়টুকু দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১. নামাজে আরবীতে কেরাত পাঠ করতে হয়। যেহেতু আল্লাহর নির্দেশে- অর্থাৎ 'পবিত্র কুরআন থেকে সহজসাধ্য আয়াত দ্বারা নামাজ সম্পন্ন কর।'[১৭]

অন্য যে কোন ভাষায় তা আদায় করলে হবে না। যেহেতু পবিত্র কোরআনের সরাসরি নির্দেশ। ব্যতিক্রম আমাদের মাজহাবের ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর ক্ষেত্রে তাঁর মাতৃভাষা ফার্সীতে নামাজে কেরাত পড়া তার জন্য জায়েজ ছিল।

---

১৬. সম্পাদনা পরিষদ, বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল (ঢাকা, ইফাবা, জুন ২০০৫ইং, ১সং) পৃ ২৩
১৭. আল কুরআন ২৯: ২০

Dhaka University Institutional Repository

২. নিজ হাতে শরীরের কোন অংশ কেটে ফেলা বা ভেঙে দেয়া তথা অঙ্গ হানির অধিকার শরীয়ত কাউকে দেয়নি। ব্যতিক্রম হযরত ওয়েছ ক্বরনী (রহ.) তার জন্য উহা জায়েজ ছিল বরং এজন্য তিনি আল্লাহ তা'লা ও তদীয় রাসুল (সা.) এর নিকট প্রশংসীত ও পুরস্কৃত।

এ দুটো ঘটনা একটু সবিস্তারে আলোচনা করছি এজন্য যে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর (মুজাররদ) চির কুমার জীবন যাপনের স্বীকৃতি ও অনুমতি অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। এতে আশ্চর্য বা মর্মাহত হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

আমাদের মাজহাবের ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তিনি পবিত্র কুরআনের ফাছাহাত বালাগাত (বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা) বিভোর হয়ে হুজুরী ক্বালবে মুশাহাদ ও মুরাকাবার মাধ্যমে যখনই আরবীতে কেরাত পাঠ আরম্ভ করতেন সাথে সাথেই বেহুশ হয়ে ঢলে পড়তেন। যেহেতু তিনি আপাদমস্তক আল্লাহর তাওহিদের সাগরে ডুবন্ত ছিলেন, আল্লাহর সত্তা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তার দৃষ্টিপাত হত না। সে সময়ে ও প্রশ্ন উঠেছিল। তিনি আরবী ব্যতিরেকে ফার্সীতে কিভাবে কেরাত পাঠ করে থাকেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে স্বীয় মাতৃভাষা ফার্সীতে কেরাত পাঠের অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়েছিল। তাই এ ব্যপারে তার প্রতি কোন প্রকার অপবাদের অবকাশ নেই।[১৮]

আশিকে রাসুল হযরত ওয়ায়েছ করনী (রহ.) হযরত ওমর (রা.) কে এক পর্যায়ে জিজ্ঞস করলেন যে, আপনি তো আল্লাহর রাসুলের শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও বন্ধু, যখন ওহুদ যুদ্ধে হুজুর পাক (সা.) এর দান্দান মোবারক শহীদ হল, তখন আপনার দান্দান (দাঁত) কেন ভেঙ্গে ফেললেন না? একথা বলে ওয়াসকুরনী স্বীয় দাঁতগুলো হযরত ওমর (রা.) কে দেখালেন তার প্রতিটি দাঁত ছিল ভগ্ন। তিনি প্রথমেই একটি দাত শহীদ করলেন তাঁর পর খেয়াল হল সম্ভবত: এ দাঁতটি শহীদ নাও হতে পারে। তার পর দ্বিতীয়টি এমনিভাবে বত্রিশটি দাঁত ভেঙ্গে শহিদ করেন।[১৯]

প্রকাশ থাকে যে, শরীয়ত অঙ্গহানি করার অধিকার তো কাউকে দেয়নি, তাহলে কোন আইনের বলে তিনি স্বীয় বত্রিশটি দান্দান শহীদ করলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহা শরীয়ার আইনের চরম লঙ্গন। অথচ এ বিশ্ব বিখ্যাত আশিকে রাসুল (সা.) স্বয়ং মহানবী কর্তৃক 'খাইরুত তবিয়ীন' ও রাসুল (সা.) এর জুব্বা প্রাপ্তির মত বিরল সম্মাননার অধিকারী হলেন। তাঁর মহত্ত্বতা সম্পর্কে স্বয়ং হুজুর পাক (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছেন যার সুপারিশে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনু রবিয়া ও মুদ্বর গোত্রের ভেড়ার পশম সম পরিমাণ অসংখ্য গোনাহগার উম্মতকে ক্ষমা করে দেবেন। সাহাবায়ে কেরাম বারবার তার পরিচিতি জানতে চাইলে তিনি বলেন- ওয়ায়েস করনী যিনি করণের বাসিন্দা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিশিষ্ট সাহাবাগণ হযরত ওমর ও আলী (রা.) এর মাধ্যমে জুব্বা মোবারক পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর নিকটে। এমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রকৃত মাহবুব ও মকবুল বান্দাদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য স্বীয় কানুন পর্যন্ত পাল্টিয়ে দিয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

---

১৮. আহমদ শায়েখ মুল্লা জীয়ন (রহ.) ইবন আবি সাঈদ ইবন উবায়দুল্লাহ, আল মালায়, নুরুল আনোয়ার মা'য়া কামরিল আকমার (দিল্লী- আল মুজতবা মাতবা ১৩৫৯হি., ১সং) পৃ- ১২

১৯. মোঃ বরকতুল্লাহ, মৌলভী আনওয়ারুল আতকিয়া উর্দু অনুবাদ তাজ কিরাতুল আউলিয়া (মুল কিতাব গ্রন্থকার হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার) ১৩৮০ হিজরী মতবায় কাইয়ুম খাঁন, পূর্ব কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ- ১৫

Dhaka University Institutional Repository

শাইখুশ শুয়ুখ শাহজালাল (রহ.) এর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর এ ধরণের কানুনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে প্রতিয়মান হয়। যার ফলে তিনিই একমাত্র বিশ্বনন্দিত ওলী যিনি 'মুজাররদ' হিসেবে সার্বজনীন পরিচিত।

হযরত শাহজালাল (রহ.) পবিত্র কোরআন ও হাদীসে নববীর আলোকে জীবন যাপন করতেন। বেগানা মহিলা থেকে নিজেকে সব সময় মুক্ত রাখতেন। রাস্তায় চলার সময় একখানা চাঁদর দিয়ে মুখ আচ্ছাদন করে রাখতেন। যাতে কোন পথচারী নারী তার দৃষ্টিতে পতিত না হয়। সারাটা জীবন তিনি নারী সংসর্গ পরিহার করে চলেছেন। পর্দার অনুশাসনের ব্যাপারে বিশেষতঃ তিনি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। মাত্র তিন মাস বয়সকালে তিনি মাতৃহারা হন। অতঃপর নিকটাত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর খানকায় রিয়াজত, মেহনত, মুবারাকা, মুশাহাদা ও খিদমতে খালকে নিজেকে কুরবান করেছিলেন, বিধায় তিনি শায়খুশ শুয়ুখ বা শায়খুল মাশাইখ, মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তার খানকায় নারী প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।[২০]

অদ্যাবধি তার ওফাতের পরেও মাজারের উপরে মহিলা প্রবেশ সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। আবশ্য মাজারের নীচে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র ইবাদতগৃহ রয়েছে।

---

২০. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.), পৃ-১৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়ামন ভ্রমণ ও উপমহাদেশের পথে হযরত শাহ জালাল (রহ.)

ইয়ামন রাজ্য পরিচিতিঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পূর্বপুরুষদের আবাসস্থল ইয়ামন। বিশ্বনন্দিত আশিকে রাসুল (সা.) হযরত ওয়াইস ক্বরনী (রহ.) ইয়ামনেরই বাসিন্দা ছিলেন। যখন রাসুলে পাক (সা.) ইয়ামনের অভিমুখী হতেন তখন বলতেন এদিক থেকে আমার মুহাব্বাতের সুগন্ধি আসছে।[২১]

তিরমিজী শরীফে আবওয়াবুল মানাকিব অধ্যায়ের 'ফি ফাদ্বলিল ইয়ামন' পরিচ্ছেদে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস। নবী করিম (সা.) ইয়ামন বাসীদের মহাত্মতা বর্ণনা করতে গিয়ে এরশাদ করেন- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন ইয়ামন বাসীরা এসেছে তাদের হৃদয় বড়ই কোমল। ঈমান রয়েছে ইয়ামন বাসীদের মধ্যে এবং ধর্মীয় প্রজ্ঞা রয়েছে ইয়ামন বাসীদের মধ্যে।

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন- হে আল্লাহ আমাদের শামে ও আমাদের ইয়ামানে আমাদের জন্য বরকত ও কল্যাণ দান করুন। তারা বললেন যে, আমাদের নজদের জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করুন। তিনি বললেন তথায় বিপর্যয় ও ফেৎনা প্রকাশ পাবে। অথবা তিনি বলেন তথা হতে শয়তানের শিং বের হবে।[২২]

হযরত ওয়ায়েস করনী (রহ.) এর মত নবী প্রেমিকের এমনি এক মহিমান্বিত দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.)। যে কারণে তার মধ্যে ঈমানের এতই দ্বীপ্তি ছিল যে তার রওশনীতে দেশ দেশান্তর আলোকিত হয়েছিল।

কোন সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি, গোষ্টি, বংশ বা কোন স্থানের পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। কোন পরিবেশে হযরত শাহ জালাল (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁর পূর্ব পুরুষগণ প্রভাবান্বিত হন, তা না জানলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী জানা যাবে না। আর এজন্যই এখানে ইয়ামন রাজ্য পরিচিতি নিয়ে আলোচনার সূচনা। এ বিষয়ে জানতে হলে আরবদের প্রাচীন রাজ্য সমূহের বৃত্তান্ত জানা দরকার। শিবলী নোমানী ও আল্লামা সুলায়মান নদভীর সিরাতুন্নবী (সা.) এর আলোকে আলোচনা করছি। তাঁরা আরবের প্রাচীন রাজ্য সমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন যথা- (১) মাঈনী রাজ্য (২) সাবায়ী রাজ্য (৩) হাদ্বরামাউত রাজ্য (৪) কাতবানী রাজ্য (৫) নাবেতী রাজ্য।

এ রাজ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ।

১. মাঈনী রাজ্যঃ মাঈন ইয়ামন দেশের একটি স্থানের নাম। একদা ইহাই এরাজ্যের রাজধানী ছিল। এ রাজ্যটি দক্ষিণ আরবে অবস্থিত ছিল। ইহার প্রধান নগর ছিল মায়ীন ও কারণ বা করণ। এই স্থানেই হযরত ওয়ায়িস করনী (রহ.) জন্ম গ্রহণ করেন বলে ড. ব্লক ও জনাব নুরুল হক দশঘরীর ধারণা।[২৩] মীয়ামী রাজ্য ঈশাব্দ পূর্বে ৫ম/ ৮ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

---

২১. আক্তার শায়খ ফরিদ উদ্দীন, তাজকিরাতুল আউলিয়া (ফার্সি) উর্দু অনুঃ আনওয়ারুল আতকিয়া, পৃ-১৩।

২২. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবনে সাওরাতা, আত-তিরমিযি ইমামুল আল্লামা, আল-জামে আস-সহীহ লিতিরমিযি, (দেওবন্দ মুখতার এন্ড কোম্পানী নাহিয়াল ইসলামী কুতুব দেওবন্দ, ১৯৮৫) পৃ- ২৩১, ২৩২।

২৩. আল ইসলাহ, (সিলেট ফেব্রুয়ারি, বৈশাখ- আশ্বিন, ১৩৬৪বাংলা) পৃষ্ঠা- ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

২. সাবায়ী রাজ্যঃ ঈশাব্দ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের হাজার বৎসর পূর্বে পশ্চিম আরবে যে 'হিময়ারী' ও 'সাবায়ী' রাজ্য দুটির অস্তিত্ব ছিল ইহা গ্রীষ্মের বৃষ্টিপাতের দরুন কৃষিকাজের উপযোগী ছিল। এখানকার বহু স্মৃতিফলক ও জমকালো প্রাসাদ সমূহের ধ্বংসস্তুপ দেখে পাশ্চাত্য পন্ডিতরা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এই সব রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। রাজা-বাদশাহের স্থলে ইয়ামনে বড় বড় সর্দার রয়ে গিয়েছিল তাদিগকে কাইল অথবা মিকওয়াল বলা হত। এই 'সাবা' রাজ্যের রাণী বিলকিসের কথা কুরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছে। ইহা হযরত সুলায়মান (আ.) এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

৩. হাদরামউত রাজ্যঃ ইহা ইয়ামন দেশের একটিস্থান। এই নামেই রাজ্যের নাম ছিল।

৪. কাতবানী রাজ্যঃ এডেনের একটি নগরীর নাম। এই নামেই রাজ্যের নাম ছিল। ইহা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

৫. নাবেতী রাজ্যঃ হযরত ইসমাঈল (আ.) এর এক পুত্রের নামে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

ঐতিহাসিকগণ আরব জাতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে হযরত ইসমাইল (আ.) এর বংশধরগণ অন্যতম। ইয়ামনের অধিবাসীগণ ও মদীনার আনসারগণ কহতান বংশীয় খাঁটি আরব। তৃতীয় বংশটি আরবের ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিসমূহ যথা 'তুসম' ও 'জুদাইস'।

আরব দেশের কোন কোন এলাকা যথা ইয়ামন দেশ এক সময় উন্নতির চরমে পৌছেছিল। যে পর্যন্ত ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ইয়ামনের প্রাচীন যুগের ভগ্নাবশেষ এবং শিলালিপি মুদ্রা ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন, তাঁরা একদা ইয়ামনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম বিকাশের কথা স্বীকার করেন। আরব ঐতিহাসিকগণ দাবী করেন যে, এক সময় ইয়ামন দেশ এতটুকু উন্নতি করেছিল যে, সেখানকার শাসক সম্প্রদায় সমগ্র ইরানেও আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল।

ইতিহাস ও কবি সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎ ঃ

আরব কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের কবিতা ও সাহিত্যে ইয়ামন দেশের যে সমস্থ প্রাসাদের উল্লেখ করেছেন, সেগুলির সংখ্যা অনেক।[২৪]

ইয়ামন ও ইসলাম

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইয়ামনের নাম উল্লেখ করে দোয়া করেছেন। তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত দোয়া ইয়ামন বাসীদের উপলক্ষ্য করে এবং তাদের মাহাত্মের বর্ণনা রয়েছে হাদীস শরীফে। রাসুল পাক (সা.) এর দোয়া- 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি ইয়ামানিনা'' অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাদের ইয়ামনে আমাদের জন্য বরকত দান করুন। সিহাহ সিত্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিতাব ছহীহ মুসলিম শরীফে ইয়ামন বাসীদের মধ্যে ঈমানের গুণের প্রাধান্য সম্পর্কে আলাদা অনুচ্ছেদ লিখেছেন ইমাম আবু হোসাইন মুসলিম ইবনুল হুজ্জাজ (রহ.) নিম্নোল্লিখিত শিরোনামে বাবু তাফাদুলি আহলিল ইয়ামন ফীহি ও রুজহানু আহলিল ইয়ামন ফিহি। উক্ত অনুচ্ছেদের হাদিসে বলা হয়েছে যার অর্থ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ইয়ামন বাসিরা এসেছে তাদের হৃদয় বড়ই কোমল। ঈমান রয়েছে ইয়ামন বাসীদের মধ্যে।

২৪. শিবলী নুমানী ও সুলায়মান নদভী আল্লামা, সিরাতুন্নবী, অনুদিত মাওলানা মুহি উদ্দিন খান, (ঢাকা প্যারাডাইজ লাইব্রেরী ১৯৭৪/ ১৯৯৭, ১ ও ২ খ, ২সং, পৃ- ১১০।)

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, হিজরতের অনেক পূর্বেই ইয়ামনে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল।

রাসুল করীম (সা.) এর দাওয়াতের ফলে ইয়ামনের হামদান পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলে রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ পাকের শোকরানা সিজদা করেন ও দু'বার এরূপ দোয়া করেন। হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হউক এই পরিবার জনবহুল ও প্রভাবশালী ছিল। হযরত আলী (রা.) হযরত খালিদ (রা.) ও হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) ও হযরত আবু মুসা আল আশয়ারী (রা.) প্রমুখ সাহাবী রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশে ইয়ামেনে ইসলাম প্রচার করেন। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) কে ইয়ামনের প্রাদেশিক শাসন কর্তা হিসেবে পাঠাবার সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, "তুমি কিসের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবে?" তিনি বললেন- কুরআন শরীফের ভিত্তিতে। আবার জিজ্ঞেস করলেন- যদি এতে ফয়সালা না পাও, উত্তরে তিনি বললেন পবিত্র হাদীসের ভিত্তিতে। যদি এতে ফায়সালা না পাও? তদুত্তরে তিনি বললেন- "এগুলোর আলোকে নিজস্ব রায় দ্বারা" ফয়সালা উদ্ভাবন করব। এজবাব শুনে রাসুল কারীম (সা.) খুশি হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

অতঃপর ইহা ইসলামী আইনের মুলনীতি (কিয়াস) হিসেবে গৃহীতহয়েছে। ইসলামের সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক ইয়ামনের।

প্রত্যেক জিনিষের ভাল মন্দ দু'টি দিক রয়েছে। কুরআন মাজীদে উল্লেখিত 'সুরা ফীলে' বর্ণিত আবাবিল পক্ষীদ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রস্তরে ইয়ামনের তৎকালীন খৃষ্টান বাদশাহ আবরাহার হস্তীবাহিনীকে পর্যদুস্ত করে কিভাবে আল্লাহর পবিত্র কা'বাকে রক্ষা করেছিলেন সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সুরাতুল ফিলে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। যার প্রেক্ষাপট হচ্ছে আবরাহা পবিত্র কা'বা গৃহের সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্টে ঈর্ষান্বিত হয়ে ইয়ামনের রাজধানী সানআ'য় পবিত্র কা'বার অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করে এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে ঘোষণা দেয় ঐ বছর থেকে সবাই সানআ'র কাবায় হজ্জ করতে হবে। জন সাধারণ তার এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে অপমানিত করে। আরবের কেনানা গোত্রের কিছু লোকেরা গোপনে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে। পরিশেষে সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে যার ফলে সে সুসজ্জিত বিরাট হস্তি বাহিনী দ্বারা কা'বা শরীফকে ধ্বংশ করার লক্ষ্যে অভিযান চালায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবরাহা ও তার হস্তি বাহিনীর করুণ পরিণতি সম্পর্কে বলেন- অর্থাৎ 'অতপর তাদেরকে ভক্ষিত তৃন সাদৃশ্যের মত করা হল।'[২৫]

মসুর ডাল থেকে সাইজে বড় এবং চানাবুট থেকে সাইজে ছোট। কঙ্কর, যাতে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল উপর থেকে আবাবিল পাখি নিক্ষেপ করছিল, যা হেলমেট পরিহিত লৌহবর্মকে ছেদ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা যাকে ইসলামের ইতিহাসে 'আমুল ফিল' বলা হয়। আর সেই ঘটনা সংঘটিত বছরই হুজুর পাক (সা.) এর জন্মের বছর। [২৬]

---

২৫. আল কুরআন- ৩০ ঃ ৫
২৬. আস সুয়ুতি জালাল উদ্দিন, আব্দুর রহমান, শায়খুল ইসলাম, তাফসীর জালালাইন (মুখতার এন্ড কো. দেওবন্দ ইউ.পি, ১৩৭৬ হি.) পৃ- ৫০৭।

Dhaka University Institutional Repository

সম সাময়িক ইয়ামন রাজ সম্বন্ধে ইবনে বতুতার বৃত্তান্ত নিম্নরূপঃ ইয়ামনের সুলতান নাসির উদ্দিন আলী ছিলেন রাসুল (সা.) এর বংশধর। দরবারের সময় এবং অভিযানের সময় তিনি বিশেষ জাকজমক পছন্দ করেন। কাজী আমাকে তার কাছে নিয়ে গেলে আমি তাঁকে সালাম করলাম। সালামের রীতি অনুসারে প্রথমে তর্জনী দ্বারা মাটি স্পর্শ করে সে তর্জনী মাথায় ঠেকিয়ে বলতে হয়। খোদা শাহানশার হায়াত দরাজ করুন। ইবনে বতুতা ১৩৩০ সালে ইয়ামন সফর করেন। সুতরাং নাসিরুদ্দীন আলী হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাথী শাহজাদা আলী (রহ.) এর ছোট ভাই বা ভাতিজা হয়ে থাকবেন। নামটিতেও অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায়। এভাবে সুলতান ও শাহজাদা আলী (রহ.) এর উপাখ্যানটির সত্যতা ঐতিহাসিক মাপকাঠিতেও উত্তীর্ণ হল।

উল্লেখ্য যে, রসুলিয়া রাজত্ব যার পঞ্চম নরপতি ছিলেন- আলী (১৩২১-৬৩), রাজত্বকাল নিজেদের মুক্ত করেছিলেন ১২৩৯ ঈসায়ী মিশর থেকে এবং পনরো শতাব্দী পর্যন্ত ইয়ামন শাসন করেছেন।[২৭]

সিলেটের একশত একজন গ্রন্থে উল্লেখ আছে- শাহজালাল (রহ.) আপন মামা ও মুর্শিদের দোয়া নিয়ে গুটি কয়েক সহচর নিয়ে ইয়ামেনের পথে রওয়ানা দেন। উদ্দেশ্য ছিল জন্মভূমি দর্শন এবং মাতা-পিতা ও দাদার মাজার জিয়ারত। সে সময়ে ইয়েমেনের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান ওমর আশরাফ, ১২৯৬ সালে তিনি শাহজালালের আধ্যাত্মিক শক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁকে রাজ প্রাসাদে আমন্ত্রন জানান ও বিষ মিশ্রিত শরবত দ্বারা আপ্যায়িত করেন। শাহজালাল (রহ.) বিসমিল্লাহ বলে শরবত পান করেন। খোদার কি লীলা সুলতান ওমর আশরাফের শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয় ও তিনি আকস্মাৎ মারা যান। এ ঘটনার পর ইয়ামনের শাহজাদা শায়খ আলী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি রাজ্যপাঠ ত্যাগ করে শাহজালালের সহচর হিসেবে ইয়েমন ত্যাগ করেন। তখন মালিক আশরাফের ভাই মুরিদ ইয়ামনের সিংহাসনে বসেন। Gibb's History of Yemeni dynesty তে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।[২৮]

উপমহাদেশের পথে হযরত শাহজালাল (রহ.)

হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে 'জন্ম ভূমি থেকে চিরবিদায় নিয়ে হযরত হিন্দুস্থানের পথে পাড়ি দিলেন। ইতিমধ্যে তার কামালিয়াত প্রাপ্তির খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গী জুটলো বার জন মুরিদ। একজন হলেন মৃত্তিকার তহবিলদার চাশনি পীর। হযরত প্রথম তার পূর্ব পুরুষের বাসভূমি ইয়েমেনে গমন করেন। তৎকালীন রাজা একজন চতুর রাজনৈতিক ছিলেন। হযরতের আগমনের বার্তা শুনে তিনি তার উযীরদের বললেন 'বহুদিন থেকে আমার খায়েশ একজন কামিল দরবেশের মুরিদ হয়ে তার খেদমত করার' তবে আমি প্রথমে পরীক্ষা করতে চাই তিনি প্রকৃত কামিল দরবেশ কি না।

---

২৭. দেওয়ান হযরত শাহজালাল (র.) পৃ. ৫২।

২৮. সিলেটের একশত একজন, পৃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ তখন একপাত্র শরবতে বিষমিশিয়ে হযরতকে পান করতে পাঠালেন। হযরত দৈব বলে সমস্ত কিছু বুঝতে পারলেন। তিনিস্বচ্ছন্দ চিত্তে শরবত পান করে বললেন ভালমন্দ সব নিজের কপালে লিখা আছে। যে যাহা মনে করে সে সেরূপ ফল পায়।

ফকিরের জন্য এই শরবত শারাবান তাহুরা; কিন্তু দাতার পক্ষে ইহা প্রাণান্তকারী হলাহল। শরবত পানে হযরতের কোন অনিষ্ট হলনা, কিন্তু এদিকে ইয়ামনের বাদশাহ হঠাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হন। যুবরাজ শায়খ আলী তখন পিতার জানাজা শেষ করে হযরতের কাছে মুরিদ হয়ে তাঁর অনুগামী হতে চাইলেন। হযরত বললেন তোমার কর্তব্য রাজ্য পরিচালনা। তুমি দয়ালূ ও ন্যায় পরায়ন ভূ-পতি রূপে রাজদন্ড পরিচালনা করা। কিন্তু পিতার অপমৃত্যুতে রাজ পুত্রের মনে বিরাগ এসে গিয়েছিল। তিনি আর রাজ কার্যে মনোযোগ দিতে পারলেন না। অবশেষে তিনি গোপনে হযরতের অনুসরণ করলেন ও চতুর্দশ দিবস ভ্রমনের পর হযরতের সান্নিধ্যে উপনীত হলেন। হযরত তখন তার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে তাঁকে অনুগমন করতে অনুমতি দিলেন। যুবরাজ আলী বিলাস ভোষন ও রাজ প্রাসাদের আনন্দ কোলাহল থেকে দুরে রেখে নিজেকে ধর্মকার্যে সমর্পন করলেন। হযরত প্রথমে যে বারজন সহচর সহযাত্রা করেন এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হাজী ইউসুফ, হাজী খলিল ও হাজী দরিয়া।[২৯]

আল্লাহ এমনি ভাবে তার প্রিয় বান্দাদেরকে তাঁরই দিকে টেনে নেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) শায়খ আলীর জন্য দোয়া করলেন এবং ইয়ামনে অবস্থান করেই পিতৃ রাজ্য পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি এই বলে নছিহত করেন - (১) প্রজা সাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে (২) তাদের প্রতি জুলুম করবেনা (৩) তাদের ন্যায্য দাবীগুলো মেনে নিবে (৪) ন্যায় বিচার করবে (৫) সকল কাজে আল্লাহর আইনকে প্রাধান্য দিবে। এ পাঁচটি নছিহত বাক্য দ্বারা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কয়েকটি মাত্র কথায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূলনীতির উল্লেখ করত ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দান করে তিনি এবার গন্তব্য স্থলের দিকে যাত্রা করলেন। ইয়ামন বাসী বলল 'আল বিদা' শাহজালাল (রহ.)। এইবার চিরদিনের জন্য ভারতের পূর্বাংশে বসতি স্থাপন করার জন্য মুর্শিদের প্রদর্শিত দিক নির্দেশনায় তিনি ইয়ামন ত্যাগ করলেন। হযরত শাহজালাল (র.) মন ও হয়ত বলল 'আল বিদা আল ইয়ামন'।

এই ভাবেই এখানে ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো ইয়ামনের শাহজাদা শায়খ আলী ইয়ামন রাজ্য শাসনে রাজী হলেন বটে, কিন্তু এতে তার মন বসল না। হযরত শাহজালাল যখন পাক ভরতের পথে যাত্রা করলেন, তখন ইয়ামন হতে আরও কয়েকজন ভক্ত তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলেন। তন্মধ্যে হযরত শাহ তাজ উদ্দিন কুরায়শী তদীয় ভ্রাতা হেলিম উদ্দিন কুরায়শী (রহ.), মুহাম্মদ আয়ুব ইয়ামানী (রহ.) আরিফ ইয়ামনী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

হযরত শাহজালাল (রহ.) ভাগ্নেয় হযরত শাহপরান (রহ.) যদি মক্কা শরীফে অবস্থান না করে তাহলে তিনি ইয়ামন হতে মাতুলের সঙ্গী হন বলে ধারণা করা যায়।[৩০]

---

২৯. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৭, ৮।

৩০. হযরত শাহজালাল (রহ.), পৃ- ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাগদাদ ও দিল্লির পথে হযরত শাহজালাল (রহ.)

ইয়ামন হতে বিদায় নিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) ভারতের দিকে অগ্রসর হন। পথে তিনি বাগদাদ গজনী প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন। ঐতিহাসিক বাগদাদ নগরী, যা "মদীনাতুস সালাম" বা নিরাপত্তার নগরী হিসেবে খ্যাত। বাগদাদ ফার্সী শব্দ বাগ অর্থ বাগান এবং দাদ অর্থ জ্ঞানী গুণীজন। জ্ঞানী গুণীজনের উদ্যান ঐতিহাসিক বাগদাদ নগরী অধুনা সাম্রাজ্যবাদী ইহুদি নাছারা চক্রের থাবায় চরমভাবে বিপর্যয় গ্রস্ত। যুগে যুগে ইসলাম বিরোধী এ চক্রের হাতে বাগদাদে রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার হামলার পর সাম্রাজ্যবাদী বুশ ও তার দোসরগণ আল কায়দার সাথে মরহুম সাদ্দাম হোসেনের সংশ্লিষ্টতা এবং পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর অভিযোগ উত্থাপন করে। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকগন বার বার ইরাক পরিদর্শণ করে ও সত্যতা খুঁজে পাননি। কিন্তু তাতে আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের কিছু আসে যায় না। সেই নেকড়ে আর মেষ শাবকের গল্পের মত কিছু খোড়া অজুহাত হাতে নিয়ে আমেরিকা ও বৃটেনসহ ক'টি দেশ ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ ইরাক আক্রমন করে। পরাশক্তিগুলোর যৌথ আক্রমনে ৯ এপ্রিল বাগদাদের পতন ঘটে। হাজারো বছর পূর্বের মহামূল্যবান দুর্লভ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ইরাক আজ তলাবিহীন ঝুড়ি ও শশ্মানে পরিণত হয়েছে। নূন্যতম মানবাধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। নারীনির্যাতন, ধর্ষণ, আবু গরীব কারাগারের বন্দী শিবিরের অমানবিক নির্যাতনের নগ্ন ছবি ও ঘটনা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বার বার ছাপা হয়েছে। তবুও বিশ্ব বিবেক সাড়া দেয়নি বিশেষতঃ মুসলিম জাতি তাদের সেবাদাসে পরিণত হওয়ায় এ ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ইরাকের অর্থনীতিকে পঙ্গুকরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ তৈল লুন্ঠনই তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য। ইরাকের স্বাধীনতা প্রদানের নামে আজও চলছে নারকীয় তান্ডব। জানিনা কবে এর অবসান ঘটবে। আব্বাসীয় যুগে খ্যাত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বাগদাদ নগরী যাকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ The Golden age of Islamic civilization আখ্যা দিয়েছেন। সেই পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি বাগদাদ সেখানে নবী, রাসুল, ওলী আউলিয়া মাজহাবের ইমাম সহ অনেকের জন্ম ও পবিত্র মাযার রয়েছে। বিশেষ করে ওলীকুল শিরমনী কুতুবে রাব্বানী মাহবুবে সুবহানী বড়পীর দস্তগীর মহীউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর পবিত্র মাজার বাগদাদ নগরীতে অবস্থিত। সেখানে বৃষ্টির মত বোমাবর্ষনের আওয়াজ আজও শুনা যাচ্ছে। হত্যা, ধর্ষণ, খুন খারাবী, রাহাজানী নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুশ প্রশাসন তাদের পুতুল সরকার বানিয়ে নিরাপত্তার নামে হাজারো হাজারো মার্কিন সেনা এখনো মোতায়েন করেছে এবং নূতনভাবে তার দেশ থেকে আমদানী করছে। সেই পবিত্রনগরী আজ ইহুদী নাছারা চক্রের ও তাদের মিত্রদের অবাধ

Dhaka University Institutional Repository

বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মনে হয় তারা ফিলিস্তিনি কায়দায় ইরাকীদের তাদের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে দ্বিতীয় ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়।

১২৫৮ সালে যখন হালাকুখান আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহকে হত্যা করে বাগদাদে নৃশংস হত্যাকান্ড চালাচ্ছিল, তখন হযরত শাহজালাল (রহ.) বাগদাদে উপস্থিত ছিলেন।

ইবনে বতুতার সফরনামায় বর্ণিত আছে-

اخبرني رحمه الله انه ادرك الخليفة المعتصم بالله العباسي ببغداد وكان بها قتله واخبرني اصحابه بعد-

শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালালের (রহ.) সঙ্গে ইবনে বতুতা সাক্ষাৎ করার জন্য যখন সিলেট এসেছিলেন তখন স্বয়ং শাহজালাল (রহ.) তাঁকে বলেন হালাকু খান কর্তৃক আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহকে যখন নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় তখন তিনি নিজে বাগদাদে উপস্থিত ছিলেন। [৩১]

মুহাম্মদ গাউসির বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) ৭০০ জন অনুচর সঙ্গে করে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে দেশ পর্যটনে বের হন।

কিন্তু সিলেটের জনশ্রুতি এবং এ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থগুলোতে দেখা যায় যে, তিনি ১২ জন সঙ্গী সহকারে আরব দেশ থেকে রওয়ানা হন। উল্লেখ্য হযরত শাহজালাল (রহ.) সঙ্গীয় আউলিয়া বাহিনী মামুলী তাসবীহ ধারী ফকিরের দল ছিলেন না। তাঁদের হাতে তাসবীহর সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার ও থাকত। অন্যায়, অসত্য এবং জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন ক্রমাগত। আরব থেকে আসার পথেও তারা খন্ড খন্ড যুদ্ধ জেহাদে লিপ্ত ছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর তলোয়ার তাঁর খানকায় আজও সমাদরে সংরক্ষিত আছে। ভারতে প্রবেশের পূর্বেও তাঁর আওলিয়া বাহিনী কয়েকটি ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়।

হযরত শাহজালাল (রহ.) কোন পথে ভারতে প্রবেশ করেন। সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। কারো কারো মতে তিনি খায়বার গিরিপথ হয়ে কারো কারো মতে তিনি বেলুচিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি আরব দেশ থেকে যে ৭০০ জন আউলিয়া সমভিব্যাহারে রওয়ানা হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতে আসে নি, বিধর্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন অঞ্চল বিজিত হলে তিনি একজন সঙ্গীকে সেখানে খলিফা নিযুক্ত করে আসতেন। তারা সেখানে শান্তি স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করতেন। ভারতে প্রবেশ করে দিল্লীর পথে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি মুলতান অবস্থান করেন। মুলতান তখন মুসলিম রাজ্যে একটি সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। ইতিমধ্যে সেখানে কয়েকজন কামিল দরবেশ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রভাবে এতদঞ্চলের লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

ইতিমধ্যে শাহজালাল (রহ.) এর কামালিয়তের কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেছে। ফলে সমরকন্দ থেকে সৈয়দ ওমর, রোম হতে করিমদাদ, বাগদাদ হতে নিজাম উদ্দিন, জয়নুদ্দীন আব্বাসী, কিরমান শাহ হতে অন্য এক নিজামুদ্দীন আরব হতে জাকারিয়া ও শাহ দাউদ

৩১. হযরত শাহজালাল (র.) দলিল ও ভাষ্য) পৃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তান হতে শাহ গাবরু গাজনি হতে মাখদুম জাফর ও সৈয়দ মুহাম্মদ প্রমুখ তার অনুগামী হলেন।[৩২] ইম্পোরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বাগদাদ হতে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি আফগানিস্তানে আগমন করেন। এখানে অবস্থান করার জন্য তার নামেই জালালাবাদ শহরের নামকরণ করা হয়েছে।

এদের নিয়ে তিনি হিন্দুস্তানে প্রবেশ করেন এর পর পাকিস্তানের মুলতানে এসে উপস্থিত হলে সেখান থেকে আরিফ, গুজরাট থেকে জুনায়েদ, আজমীর শরীফ থেকে মুহাম্মদ শরীফ, দাক্ষিণাত্য থেকে সৈয়দ কাসিম, মধ্য প্রদেশের নার্নুল থেকে হেলিম উদ্দিন প্রমুখ তার মুরিদ হয়ে তার সঙ্গে চললেন। হযরত ক্রমাগত পূর্বদিকে অগ্রসর হন, তাঁর শিষ্য সংখ্যা দিনদিন বাড়ে। দীর্ঘ পথ যাত্রার পর হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লীর মাটিতে পা দিলেন শাহজালাল। সঙ্গে অনুগামী দরবেশ দল দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু বালি রাশির স্তুপ পায়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তিনি পেরিয়ে এসেছেন আরব মরুভূমি। তারপর পার হয়েছেন আফগানিস্তানের বনরাজি। নিদাঘ ক্লান্ত দিবার অবসানে আশ্রয় নিয়েছেন খেজুর গাছের তলে বা যাযাবর বেদুইনের তাবুতে। তারপর অভ্রংলিহ হিন্দুকুশ পর্বত মালার বুক চিরিয়ে এগিয়ে এসে একে একে পাড়ি দিয়েছেন কান্দাহারের বরফগলা নদী, চিনার আঙ্গুরের সবুজ ক্ষেত, আখরোট বাদামের গাছে ছাওয়া বহু সীমান্ত জনপদ পদব্রজে। শীতের কুহেলী এড়াতে কখন ও আশ্রয় নিয়েছন সরাইখানায়। কখনও রাত কাটিয়েছেন মসজিদের উন্মুক্ত চত্বরে। অনুগামী দরবেশরা এগিয়ে দিয়েছেন নিজেদের গায়ের কম্বল হযরতের পথশ্রমের কষ্ট লাঘব করতে। তাঁরা হিম ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সেবা করার উদগ্র আকাঙ্খায়। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেননি সদা হাস্যময় দরবেশ। তিনি শুধু এক মনে হাতের তাসবিহ জপেন। মুরিদদের দেন উপদেশ। শীতগ্রীষ্ম তাঁর গায়ে আচঁড় কাটতে পারে না। তিনি শুধু আল্লাহ তালার নাম ইয়াদ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেন। তিনি যখন দিল্লি নগরীতে পৌছলেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ দরবেশ নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫) দিল্লীর প্রান্তে বাস করছিলেন।[৩৩] তার পিতা গজনীর আহমদ বদায়ুনে বসতি স্থাপন করেন। বদায়ুনেই নিজাম উদ্দিন (রহ.) এর জন্ম হয়। (৬৩১ হিঃ)।

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দিল্লী উপস্থিতি এবং নিজামুদ্দীন আউলিয়া কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। মুলতানে হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন রওয়ানা হলেন, তখন দরবেশ আরিফ মুলতানী (রহ.) ও তার সঙ্গী হলেন। মুলতান হতে হযরত শাহজালাল (রহ.) সদলবলে দিল্লী আগমন করেন। এইবার হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

ইব্রাহীম বিন আদহাম (রহ.) যেভাবে সিংহাসন ত্যাগ করে একদা আল্লাহর রাহে ফকীরি গ্রহণ করলেন, ইয়ামনের শাহজাদা শারখ আলী ইয়ামনী (রহ.) পিতৃসিংহাসন পরিত্যাগ করে পথিমধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী হয়ে তার সান্নিধ্য কামনা করলেন।

---

৩২. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ ৭, ৮।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৯

Dhaka University Institutional Repository

এবার তার আবেদন বিফলে গেলনা। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী হয়ে গেলেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন তখন দিল্লির সিংহাসনে সমাসীন। সুলতান ইয়ামান রাজসহ তাঁর দলীয় দরবেশদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা যেখানে অবস্থান করতেন তাহা 'ইয়ামনী মহল্লা' নামে অভিহিত হত। এই সময়ে আরও বহু রাজা-বাদশাহ দিল্লীতে অবস্থান করতেন।

'ফেরেশতা' নামে সুপরিচিত মুহাম্মদ হিন্দুশাহ (জ.১৫৭০ খ্রি:) ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ''আইন উদ্দীন বিজাপুরীর ইতিহাস ছাড়া ও তাবাকাতে নাসিরীসহ সেই যুগের অন্যান্য ইতিহাসে লেখা আছে যে, গিয়াস উদ্দিন বলবন প্রায়শই দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন যে, তার রাজত্বকালের সর্বোচ্চ গৌরবময় ব্যাপার এই যে, তুর্কিস্থান মাওরাউন্নাহার, খুরাসান, ইরাক আজম, আযার বাইজান, ইরান ও রোম প্রভৃতি দেশের পঞ্চদশাধিক সুলতান দিল্লীর দরবারে সম্মান জনক আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছেন।

এদের প্রত্যেকের রাজকীয় ভাড়া ও প্রাসাদ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল। এসব বহিরাগত রাজারা শহরের যেসব এলাকায় বাস করতেন, সেই সব এলাকা বা মহল্লা তাদের নামে পরিচিত হয়েছিল। যেমন আব্বাসী মহল্লা, রুমী মহল্লা, সমরকন্দী মহল্লা ও ইয়ামনী মহল্লা প্রভৃতি। এইসব সুলতানের সঙ্গীদের মধ্যে সে যুগের মধ্য-এশিয়ার কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীও ছিল। এইজন্য গিয়াসসুদ্দিন বলবনের সময় দিল্লীর দরবার সৌষ্ঠব ও সভ্যতার জগতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য হত। এই বিবরণের মাধ্যমে তৎকালীন ইয়ামন রাজ শাহজাদা শায়খ আলী ইয়ামনীর দিল্লি অবস্থানের নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। দিল্লী হতে শাহজালাল (রহ.) বাংলাদেশে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ) শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে একজোড়া কবুতর উপহার দেন। এইগুলির বংশধর ''জালালী কবুতর'' নামে আজও সিলেটে যত্রতত্র উড়িয়ে বেড়িয়ে উভয় দরবেশের সাক্ষাৎকারের প্রমাণ দিচ্ছে। কেবল মানুষ নহে পশু পাখি ও সাক্ষ্য দিতে পারে। এই ঘটনাটি ইহারই প্রমাণ। এই ঘটনার বিবরণ সিলেটের ইতিহাসে এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে।[৩৪]

হযরত নিজামুদ্দীন এর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নান গল্প এবং উপকথা প্রচলিত আছে। এগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত সন্দেহজনক। প্রফেসর মুহাম্মদ হাবিব তার গবেষণা মুলক গ্রন্থে হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.) সম্বন্ধে লিখছেন- তিনি ভোজবাজি প্রদর্শক বা মামুলি ধরণের অলৌকিক শক্তিবাজ ছিলেন না। তিনি কখনো আকাশে বিচরণ করেননি। শুষ্ক এবং স্থির পদে কখনো পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাননি। তার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল একটি প্রেমময় হৃদয়ের শ্রেষ্ঠত্ব, তার অলৌকিকতা ছিল গভীর সহানুভূতিশীল প্রাণের অলৌকিকতা। মানুষের চেহারায় এক পলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই তার মনের কথা তিনি বলতে পারতেন।

নিজামুদ্দিন (রহ.) শাহ ফরিদ উদ্দিন মাসুদ গঞ্জে শাকর এর শাগরিদ ছিলেন। রাজ পরিবারে হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.) এর অত্যাধিক প্রভাব ছিল। তদানিন্তন সুলতান মুহাম্মদ তোঘলক হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.) এর প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। জগতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তের দল হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.) কে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসতো।

---

৩৪. নুরুল আনোয়ার, হোসেন দেওয়ান, হযরত শাহজালাল (রহ.), পৃ ৫৭, ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লীতে অবস্থানকালে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.)এর সাক্ষাত হয়। হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.) এর প্রিয় শাগরিদ আমীর খসরুর বর্ণনা হতে তা পাওয়া যায়।

হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন দিল্লীর উপকণ্ঠে অস্থানা তৈরী করে বাস করছিলেন, ঐ সময়ে হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.) এর এক শাগরিদ শাহজালাল (রহ.) এর নিকট আগমন করেন। তিনি শাহজালাল (রহ.) এর আস্তানা থেকে ফিরে এসে নিম্নরূপ বর্ণনা দান করেনঃ আরব দেশ থেকে একজন সুদর্শন ফকির এসেছেন। তিনি বৃদ্ধ নন। পোশাক পরিচ্ছেদে একজন মাগরিবি বলে মনে হয়। তাঁর ধ্যান, উপাসনা, সাধনা দেখে মনে হয় তিনি একজন উচ্চস্তরের ফকির। লোকজন তার অসাধারণ অলৌকিক শক্তির কথা বলে থাকে তিনি সর্বদাই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নারী সংসর্গ পরিহার করে চলেন। যখন তিনি পথ চলেন তখন তিনি একটি চাদরে মুখ ঢেকে রাখেন। তিনি সোজা পথে চলেন, এদিক ওদিক তাকাননা। তার সম্বন্ধে এগুলো খুব প্রশংসনীয় দিক। কিন্তু তিনি সর্বদা একটি সুদর্শন তরুণ কে তার নিকটে রাখেন। শোনা যায় তরুনটি শাগরিদের মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয়।

শাহজালাল (রহ.) এর চিরকৌমার্যে এবং খানকায় সুদর্শন বালকের উপস্থিতি এবং অন্যান্য বর্ণনায় হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.) এর মনে শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে খানিকটা সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। তিনিদু'জন অনুগত শাগরিদকে বিদেশী ফকিরের খানকায় পাঠিয়ে দেন ভালভাবে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য। শাগরিদ দুজন অত্যন্ত আগ্রহ এবং মনোনিবেশ সহকারে সন্দেহজনক চিত্তে তাঁর সাধনা, ধর্মপরায়নতা এবং অন্যান্য চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক মাধুর্যের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। তারপর ফিরে এসে হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.) কে হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে অবহিত করেন। নিজামুদ্দীন (রহ.) তাঁর অহেতুক সন্দেহের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তিনি স্বয়ং তার আস্তানায় হাজির হন। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। এভাবে সে যুগের দু'জন প্রধান দরবেশের মিলন হল। শোনা যায় হযরত নিজামুদ্দীন (রহ.) তাঁর ন্যায় মহান সাধক সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করার জন্য তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

উক্ত ঘটনাটি সৈয়দ মূর্তাজা আলী নিম্নরূপ বর্ণনা-দেন তারই (নিজাম উদ্দিন (রহ.) এক মুরিদ এসে মুর্শীদ নিজামুদ্দীন আউলিয়াকে বলল, আরব দেশ থেকে এক দরবেশ এসেছেন। তিনি স্ত্রী সঙ্গ বর্জিত, স্ত্রী মুখ দর্শনের ভয়ে তিনি চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে পথ চলেন। আবাসগৃহে তিনি একটি বালককে নিজের কাছে রাখেন এবং তাঁকে অত্যন্ত আদর করেন। এই কথায় নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মনে সন্দেহ জাগরিত হল প্রকৃত দরবেশ না ভন্ড। তিনি শাহজালাল (রহ.) কে আহবান করতে তার এক প্রিয় শিষ্যকে পাঠালেন। হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মনের কথা টের পেলেন মুখে কিছু বললেন না। একটি কৌটায় কিছু তুলা ও প্রজ্জলিত অঙ্গার রেখে কৌটাটি বন্ধ করে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যের হাতে দিলেন। নিজামুদ্দীন (রহ.) কৌটা খুলে হতবাক। কি আশ্চর্য! অগ্নিদার্য্য তুলা জলন্ত আঙ্গারের পাশে পড়ে আছে। তুলার গায়ে আগুনের আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি।[৩৫] শাহজালাল (রহ.) তাঁর মনের অন্যায় সন্দেহের কথা জানতে পেরেছেন বুঝে মনে মনে তিনি লজ্জিত হলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, শাহজালাল (রহ.) দুনিয়ার অমঙ্গলের প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার মধ্যেও নিজের মনুষত্ব রক্ষা করতে পেরেছেন। নিজামুদ্দীন আউলিয়া তখনি ছুটে গেলেন দরবেশের কাছে দুই হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে। দিল্লী মহানগরীর বুকে দুই দরবেশের হল মিলন। নিজাম উদ্দিন (রহ.) এর কাছে ছিল কয়েক জোড়া কাজল রঙের কবুতর। শাহজালাল (রহ.) কে তিনি দুই জোড়া কবুতর উপহার দিলেন। নিজের অন্যায় সন্দেহের জন্য করলেন ক্ষমা ভিক্ষা। শাহজালাল এই কবুতর নিয়ে এসেছিলেন সিলেটে। এই জালালী কবুতর এখন পর্যন্ত সিলেটের কোন হিন্দু মুসলমান বধ করেনা। পূর্ববঙ্গ ও সিলেটের সর্বত্র ও দিল্লীতে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহর কাছাকাছি এই জালালী পায়রা আজও মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। ড. নলীনী কান্ত ভট্টাশীল বলেছেন পূর্ববঙ্গের জন-সাধারণের বিশ্বাস, যদি কাহারও বাড়িতে জালালী কবুতর আসিয়া বাসা বাঁধে তবে বুঝিতে হইবে তাহার সমৃদ্ধির দিন আসিতেছে। আর লক্ষী ছাড়িয়ে যাইবার উপক্রম করিলে কাহারও বাড়ীতে জালালী কবুতরের বাসা থাকিলেও সহসা নাকি তাহারা বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। এই বিশ্বাস হিন্দু মুসলমান জনগনের মধ্যে প্রবল। লেখক ব্যক্তিগত জীবনে বহুবার এই বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। (ভারতবর্ষ পৌষ ১৩৪৮ বাংলা)

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে মুমিন জীবনের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হতে হবে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ বিষয়টি যেহেতু আকাইদ সংক্রান্ত। তাই আকাইদ এর মূলনীতি হচ্ছে প্রকৃত ওলী আউলিয়াদের কর্তৃক সংঘটিত অলৌকিক কর্মকান্ড আল্লাহর ইচ্ছায় তারই প্রদত্ত শক্তি বলে সম্পন্ন হয় বিধায় উহা সত্য বলে বিশ্বাস করতেহয়। 'কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন' এ মুলনীতির আলোকে উহার সামাধান করতে হবে। এমনি ভাবে তাদের পুণ্যময় জীবনের স্মৃতি বহন করে এমন কোন কিছুও আল্লাহর কুদরতের বাইরে নয়। বরং তাও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী বহন করেন এমন অলৌকিক কোন কিছুও তার কুদরতেরই নামান্তর বিধায় আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলীকে সম্মান প্রদর্শন তারাই করে থাকে যারা প্রকৃত ত্বাকওয়ার অধিকারী। যেমন মহান আল্লাহ তালার ঘোষণা- ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب–[৩৬]

কবুতর সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

কবুতরকে উপহার সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করার রহস্য কি হতে পারে এ বিষয় কিছুটা আলোকপাত করছি। হিজরত উপলক্ষে হযরত রাসুল করিম (সা.) মদীনার পথে একটিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। খলিফাতুর রাসুল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তার সঙ্গী হিসেবে তখন তথায় ছিলেন। দুশমনেরা যখন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এদিকে আসছিল তখন রাব্বুল আলামীন তাদের নিরাপত্তার জন্য গুহার মুখে বাবলা গাছের শাখা প্রশাখা প্রসারিত করে দিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। দুটি কবুতর এসে তথায় বাসা বাধে। বর্তমান হরম শরীফের কবুতরগুলো এবং পবিত্র মদিনার জান্নাতুল বাকীর কবুতরগুলো ঐ কবুতরের ই স্মারক মাত্র।[৩৭]

এবংবিধ কারণে সিলেটের হিন্দু মুসলমান জালালী কবুতর বধ করেনা, কবুতর শান্তি কপোত বলে আজও বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। এসব সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দিল্লীতে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সঙ্গে হযতর শাহজালালের সাক্ষাতে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ফাওয়ায়িদুল ফুয়াদ' গ্রন্থে তাঁকে জালালুদ্দীন তাবরিযি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তিনিই হলেন হযরত শাহজালাল। শাহজালাল (রহ.) সম্পর্কিত সকল নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থের তাঁর কথাই বলা হয়েছে।

---

৩৫. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস পৃ- ৯-১০। ৩৬. আল কুরআন ১৭; ৩২
৩৭. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ- ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের পথে হযরত শাহজালাল (রহ.)

১২৫৮ সালের হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংশের পর হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলাদেশের পথে দিল্লী আগমন করেন।[৩৮] দিল্লীতে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) (১২৩৬-১৩২৫ঈ.) এর সহিত তাঁর সাক্ষাৎ লাভের পর তিনি বিদায় নিয়ে পূর্ব ভারতের দিকে রওয়ানা হন। কথিত আছে তিনি বাংলাদেশে পৌছবার পূর্বে ও কয়েকটি ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ৩৬০ আউলিয়ার মধ্যে সুহেল-ই-ইয়ামনে বর্ণিত ২৫২ জন আউলিয়ার যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে বর্ণিত কয়েকজন আউলিয়ার আইডেনটি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মানের বিহার প্রভৃতি স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। যে সকল অনুগামী সেখানে তাঁর সাথী হন, তাদের মধ্যে বিহারের মানের হতে দৌলত মানেরী, মুজাফর বিহারী, মুহাম্মদ বিহারী হেলিম উদ্দিন বিহারী, হাসান উদ্দিন বিহারী, সামস উদ্দিন বিহারী, হুসাম উদ্দিন প্রমুখ দরবেশ ইসলাম প্রচার পূর্বক সোনার গাঁয়ে আগমন করেন। শাহজালাল (রহ.) সাতগাঁওর (হুগলি) নিকট ত্রিবেনীতে সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার এবং সোনার গাঁয়ে সিকান্দর খাঁন গাজীর সহিত মিলিত হলেন।[৩৯]

উল্লেখ্য হযরত শাহজালালের শ্রীহট্ট অভিযান কালে পথে অনেক দরবেশ যোদ্ধা ধর্মযুদ্ধে যোগ দেয়ার মানসে তার অনুগমন করেছিলেন।

এমনি ভাবে আরব হতে হযরত শাহজালাল যে বারজন দরবেশ নিয়ে হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে ধর্ম প্রচারে রওয়ানা হয়েছিলেন বলে কথিত আছে, সেই ক্ষুদ্র দরবেশ মুজাহিদ বাহিনী সিলেট অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত ৩৬০ আউলিয়ার বাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়। যারা ইলমে আমলে আধ্যাত্মিকতায় ও সমরবিদ্যায় সম পারদর্শী ছিলেন। তাদেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও তৎকালীন মুসলিম শাসক বর্গের সহযোগিতায় সর্বোপরি শায়খুল মাশাইখ শাহজালাল (রহ.) এর দিক নির্দেশনায় প্রায় বিনাযুদ্ধে আধ্যাত্মিক শক্তি বলে বলীয়ান আউলিয়া বাহিনীর নিকট তারা পদানত হয়। সেই সময় সিলেট জেলা কামরূপের অন্তর্গত ছিল, যা বর্তমানে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ ও জেলা শহর। বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী নামেও সর্বজন বিদিত, ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পথে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও আউলিয়া বাহিনীর এ অভিযান সফল হয়। যদিও ইতিপূর্বে জালিম শাহী যাদু বিদ্যায় পারদর্শী গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে তৎকালীন শাসক গোষ্টির পরপর দু'টি অভিযান ব্যর্থ হয়েছে বলে কথিত আছে।

---

৩৮. আব্দুল করিম, অধ্যাপক ড. বাক্ষাৎকার দৈনিক ইনকিলাব ২১/২/২০০৩ইং।
৩৯. হযরত শাহজালাল কুনিয়াতি (রহ.) পৃ- ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

সুদূর আরব থেকে চলে আসা ক্ষুদ্র দরবেশ বাহিনী পথিমধ্যে আরও অনুগামী মিলে ৩৬০ জন হলে সম্পূর্ণ অজানা ও অচেনা একটি এলাকায় হাজার হাজার মাইল দূরত্বের পথ অগ্নিবান, যাদু বিদ্যায় পারদর্শী জালিমশাহী ও তার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হাজার হাজার সেনাবাহীনিকে পর্যদুস্থ করে ইসলামের বিজয় নিকেতন উড়ানো ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ৩১৩ জন প্রশিক্ষণ বিহীন নিরস্ত্র যোদ্ধা হুজুর পাক (সা.) এর দিক নির্দেশনায় আল্লাহর গায়েবী সাহায্যে হাজারো হাজারো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অস্ত্র শাস্ত্রে সজ্জিত কাফের কুরাইশ বাহিনীকে পরাজিত করে। এমনি ভাবে আল্লাহর সাহায্যে সুদুর অতীত কাল থেকে যুগে যুগে কতইনা বৃহৎ শক্তিশালী দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন- অর্থাৎ- "কতইনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বড় বড় দলের উপর আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[৪০]

উর্দু 'দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যার' উল্লেখ আছে সোনারগাঁও মে নয়া আছকরি মুছতকির কায়িম হো জানে কে বায়াদ ইয়ে এক কুদরতী বাত থি কে পাঠান বাদশাহ মাশরিকি বাঙ্গাল কি ফতুহাত কো পায়ায়ে তাকমিল থক পৌঁছা কর সিলহেট মে দাখিল হো জায়ে।[৪১]

অর্থাৎ- "তৎকালীন সময়ে সোনারগাও নূতন প্রশাসনিক রাজধানী হওয়ায় পাঠান বাদশাহ পূর্ব বাংলার বিজয় সমাপ্ত করে যার ফলে সিলেট ও এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইহা একটি কুদরতী ব্যাপার।"

---

৪০. আল কুরআন ২: ২৪৯
৪১. উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া (লাহোর, দানিশগা পাঞ্জাব, ১৯৭১ইং, ১সং) পৃ- ২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও হযরত শাহজালাল (রহ.)

ভূমিকাঃ ঐতিহাসিক সত্য কথা হলো একটি দেশের ভৌগলিক অবস্থান, এর রাজনৈতিক জীবন গঠনে এবং এর অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূ-প্রাকৃতিক গঠন প্রণালী ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট সমূহ বাস্ত বিকই দেশের জীবন ও সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। একটি দেশের ইতিহাস সে দেশের ভূগোল জ্ঞান ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ রূপে অনুধাবন করা যায়না।

সুতরাং এদিক থেকে বাংলার ভৌগলিক অবস্থা আলোকপাত করা অত্যন্ত প্রয়োজন একাধিক কারণে বাংলার সামাজিক জীবন চিত্রনে ভুগোল জ্ঞান অপরিহার্য।

প্রথমতঃ মুসলিম শাসনামলেই কেবল বিভাগপূর্ব সমগ্র দেশটি 'বাংলা' নামে অভিহিত হত।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমান শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক সীমানা এর ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক সীমার সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং এ দুটো বাংলা ভাষা ভাষী অধিবাসীদের ভাষাগত ঐক্যের সঙ্গে মিলে যায়। মুসলমান শাসন এভাবে বাঙালী অধিবাসী লোকদেরকে একসাধারণ জীবনের আওতায় একীভূত করে এবং তাদের এক ভাষা ও সংস্কৃতির পটভূমিতে সন্নিবেশিত করে। প্রকৃত পক্ষে, এসময় থেকেই বাঙালী ও বাংলার ইতিহাস শুরু হয়।[১]

বাংলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট সমূহ জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এদেশের প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র বর্তমানের ন্যায় অতীতেও বৈশিষ্টমন্ডিত ছিল যে, তা বাংলার অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাত্রা, আচার, পদ্ধতি ও রীতিনীতিতে একটি ছাপ রেখে যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অতি প্রাচীন দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই তা বিশেষ বৈশিষ্ট মন্ডিত ভৌগলিক এলাকা বলে সুপরিচিত ছিল এবং স্থায়ী ভাবে এ ভুখন্ডে বসবাসকারী জনগোষ্টির একটি ভিন্ন সত্তা বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী একটি দেশের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ। এদেশে স্বাধীন সার্বভৌম ও এর অধিবাসী বাংলা ভাষা ভাষী জনগোষ্টি অধ্যুষিত বিক্ষিপ্ত জনপদের অংশ বিশেষ। এ এলাকার বাইরে ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যের কিছু অংশে মায়ানমার (বার্মার) আরাকানে বাংলা ভাষাভাষীর লোকসংখ্যা প্রায় ২১ কোটি।[২]

---

১. Abdur Rahim, Mhumammad, Social and Cultural History of Bengal (Vol. 1 (1201-1576) Pakistan Historical Socity, Karachi 1963) P-1

২. খান রইছ উদ্দিন কে.এম. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৬) পৃ-২২।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ ভারতের রাজ প্রতিনিধি ১৯০৫ সালে বাংলাকে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা এই দুইভাগে বিভক্ত করেন। এসময় পূর্ব বাংলা নূতন প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পুর্ব বাংলাকে শাসন কাজের সুবিধার জন্য অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে আসামের সাথে যুক্ত করে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর হতে কার্যকর হয়। নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী হলো ঢাকা। এব্যাপারে বাংলাদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজ প্রচন্ড প্রতিবাদ করে এবং লার্ড কার্জনের বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অবশেষে বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে প্রতিবাদের মুখে বাংলা বিভক্তি রহিত করেন এবং পুণরায় বাংলা একটি প্রদেশে পরিণত হয়।[৩]

কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হলে ও বঙ্গদেশ তার পূর্ববর্তী সীমানা ফেরত পায়নি। তখন বিহার, ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায়। নূতন ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গ দার্জিলিং, পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে 'বঙ্গদেশ' গঠিত হয়। আর আসাম পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। এতে করে একদিকে বাংলা ভাষী সিলেট, কাছাড়, শিলচর ও গোয়াল পাড়া জেলা আসাম থেকে যায়।[৪] বৃটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা দেয়। ফলে ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম বাংলা ভারতের একটি রাজ্য এবং পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।[৫] পূর্ববঙ্গ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট অঞ্চল হিসেবে তখন পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হয়। অবশেষে সুদীর্ঘ ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় নয় মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর এদেশ পাকিস্তান হতে পৃথক হয়ে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৬] প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকদের বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গার সর্ব পশ্চিম ও সর্বপূর্ব দু'ধারার মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চল ই আসল বঙ্গ এবং এর প্রায় সবটুকু (২৪ পর গনা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার অংশ বিশেষ ছাড়া) বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত।

বাংলার নামকরণঃ

মুসলিমরাই সর্ব প্রথম বাংলার সমগ্র অঞ্চলকে বাঙ্গালা নামে অভিহিত করেন। বাংলার আদি নাম ছিল বঙ্গ।[৭] প্রাচীন কালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকান্ড আল নির্মাণ করতেন। এ থেকে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি।[৮] দক্ষিণ ভারতীয় লিপিতে বঙ্গাল দেশ পাওয়া যায় এবং বঙ্গাল নামটি নয় শতক হতে প্রচলিত হয়।[৯]

---

৩. Khan; M.H.Dr. An Early History of Technical Paper Manufacture in Bangal, Vol XII. The Eastern Library, Dhaka, 1986, P- 12.
৪. তালিব, আব্দুল মান্নান; বাংলাদেশে ইসলাম আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০ পৃ-১৩, খান রইছ উদ্দিন, কে.এম. পাগ্রুক্ত পৃ-২২
৫. The world Book Encyclopedia. Vol. 11 U.S.A. 1988, P- 58.
৬. Encyclopedia Britannica 15th edition. Voll. 11, U.S.A. 1988, P. 58.
৭. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল (ঢাকা, বাংলা একাডেমী জানুয়ারী ১৯৮৭ ২সং) পৃ- ২১।
৮. মূল ভাষ্যঃ আল হাফাফাত আল ইসলামিয়া ফী বিলাদ আল বাঙ্গাল, (কুষ্টিয়া, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সিলসিলাতুল বহুছ কিসম উলুম আত তাওহীদ ওয়া আদ দাওআত আল ইসলামিয়া, ১৯৯২ইং ২খং, ১সং) পৃ- ১৪।
৯. বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল পৃ- ১৬

Dhaka University Institutional Repository

এতে নিশ্চিত বুঝা যায় প্রাচীন লিপির বঙ্গাল বিবর্তিত হয়ে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়। প্রাক মোঘল যুগে বাঙ্গালা নাম অনেক পাওয়া যায় না। অবশ্য একথা সঠিক যে, দেশের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ শাসক বর্গের কাছে বঙ্গালা নাম চালু ছিল। মোগল আমলে বাংলা নামের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। আকবরের আমলে বাঙ্গালা নাম অঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হয। তার সময় সমগ্র বঙ্গ দেশ সুবই বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়েছিল। ফারসী বাঙ্গালা শব্দ থেকে পর্তুগীজ Bengala এবং ইংরেজী Bengal শব্দ এসেছে।[১০] বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি অবশ্য হিন্দু আমলে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ও এর ব্যবহার ছিল। হিন্দু আমলের এ বঙ্গ বা বাঙ্গালাহ নদ-নদী বেষ্টিত বাংলা পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সে সময়ে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের নাম ছিল রাঢ়।

বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাংশ ও পশ্চিম বঙ্গের উত্তর পূর্বাংশ জুড়ে ছিল পুন্ড্রবর্ধণ, বরেন্দ্র ও লক্ষণাবর্তী। এর রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগর। আজকের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ই সে কালের পুন্ড্রনগর। বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, বৃহত্তর ফরিদপুর ও বৃহত্তর যশোর জেলা নিয়ে গঠিত অঞ্চলের নাম ছিল বঙ্গ। তার দক্ষিণের অঞ্চল পরিচিত ছিল বাঙ্গাল নামে। বৃহত্তর কুমিল্লা ও বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের নাম ছিল সমতট। আর বৃহত্তর সিলেট, বৃহত্তর কুমিল্লা, বৃহত্তর নোয়াখালী ও বৃহত্তর চট্টগ্রামকে একত্রে বলা হতো হারিকেল, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ আবার গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ যা বর্তমানে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটির নিকট অবস্থিত কানসোনা। মাঝে মধ্যে গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাদেশকে ও বুঝানো হতো। যুগে যুগে এসব রাজ্যের সীমানার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে নামেরও।[১১] পাল রাজাদের সময়ে বাংলা বলতে সমগ্র বাংলাকে বুঝানো হতো। অবশ্য একথার স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। পাল ও সেনদের বঙ্গ বলতে বাংলার একটি ক্ষুদ্রাঞ্চলকে বুঝাত।[১২] সেন রাজারা যদিও বাংলার একটি বৃহদংশের উপর শাসন ক্ষমতা চালিয়েছেন, তথাপি তারা নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর (গৌড়ের রাজা) বলতে গর্ববোধ করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বাদশ শতকের শেষভাগেও বাঙ্গালাহ নামটি কেবল বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি মুসলিম শাসনের প্রথম দিকেও বাংলার একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলই বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। সমসাময়িক মুসলিমদের লেখায়ও এ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।[১৩]

গিয়াস উদ্দীন বলবনের আমল থেকে বাঙ্গালাহ নাম মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত হয় এবং বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের জন্য সাধারণত এ নাম ব্যবহৃত হয়। জিয়া উদ্দীন বারনী সর্বপ্রথম মুসলিম লেখক যিনি বাঙ্গালা নাম ব্যবহার করেন এবং এর দ্বারা তিনি বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের কথা বুঝিয়েছেন।[১৪]

---

১০. রাইহ উদ্দিন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (ঢাকাঃ খান ব্রাদার্স এন্ড কোং মে ১৯৯৬ই, ৬সং) পৃ- ২৩।
১১. নাজির আহমদ এ.কে.এম. বাংলাদেশে ইসলামের আগমন (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জানুয়ারী ১৯৯৯, ১সং) পৃ- ৭
১২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী মার্চ ১৯৮২, ১ খং, ১সং, পৃ-২
১৩. প্রাগুক্ত পৃ - ২
১৪. প্রাগুক্ত- পৃ-৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং মুসলিমগণ এর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছিলেন। যেমন আরসা-ই-বাঙ্গালা, ইকলিম-ই বাঙ্গালা, দিয়ারই বাঙ্গালা।[১৫] আরসা-ই-বাঙ্গালাকে সাতগাঁও অঞ্চলে (দক্ষিণ বঙ্গ), ইকলিম-ই বাঙ্গালাহকে সোনারগাঁও অঞ্চলে (পূর্ববঙ্গ) এবং দিয়ার-ই বাঙ্গালাহকে সংযুক্ত সোনার গাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চলে অভিহিত করা হয়।[১৬] এমনকি ইবনে বতুতার পরিভ্রমণ কালে ও (১৩৪৫-৪৬ঈ.) বাঙ্গালা বলতে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গকেই বুঝাত। তখন এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙ্গালী নামে পরিচিত ছিল।[১৭]

পরবর্তী কালে বাঙ্গালাহ ও বাঙ্গালী শব্দ দু'টি এ অঞ্চলের সংগে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের লোকদের প্রতিও প্রযোজ্য হয়। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে এ নামের বিস্তৃতি ঘটে এবং সমগ্র বঙ্গদেশ বাঙ্গালাহ নামে পরিচিত হয়। তাঁর আধিপত্যের ফলে লক্ষণাবতী ও বাঙ্গালা একত্রীভুত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন। তিনি এ যুক্ত অঞ্চলগুলোকে বাঙ্গালা নামে এবং অধিবাসীদেরকে বাঙ্গালী নামে অভিহিত করেন।[১৮] তিনি একদিকে দিল্লী থেকে স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেন, যা পরবর্তী দু'শত বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, অপরদিকে বাংলা ভাষা ভাষি জন গোষ্টিকে একটি জাতিতে পরিণত করেন। তিনি এমন একটি নামে পরিচিত করেন যা সার্বজনীন হয় এবং পরবর্তী সাত শত বছর ব্যাপী যে নামে পরিচয় দিতে বাঙ্গালীরা গর্ব অনুভব করে। নতুবা এদেশের নাম হতে পারতো গৌঢ়, সমতট, হারিকেল বা অন্য কিছু। জাতি হিসেবে হয়তো পরিচয় হতো বাঙ্গালী না হয়ে গৌড়, গৌড়ি, সমতটী, হারিকেলী বা অন্য কোন নামে। এর পরে ও দু'বার বাংলার মানচিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বশেষ ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে আজকের বাংলাদেশ নামক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। মোট কথা গৌঢ়, বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ়, বরেন্দ্র সমতট, হারিকেল, গঙ্গারিডি এরকম ভিন্ন ভিন্ন জনপদই কালক্রমে অনেক ভূ-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত আজকের বাংলাদেশ।[১৯]

বাংলার সীমানা ও আয়তনঃ

প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন শাসনামলে যুগে যুগে বাংলার আয়তন ও সীমানা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে। এদেশের সীমানা কখনো যুদ্ধে জয়লাভ করে বৃদ্ধি হয়েছে। কখনো সীমানা হ্রাস পেয়েছে পরাজিত হওয়ার পর। যুগে যুগে এভাবে বাংলার আয়তন ও সীমানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে।

এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

বর্তমান বাংলার সীমানা পশ্চিম ভারতের পশ্চিম বঙ্গ পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও মায়ানমার (বাঁধ) উত্তর ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, মেঘালয়, অরুনাচল ও আসাম রাজ্য এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এর আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল বা ১,৪৩,৯৯৮.২৬ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। এর অবস্থান ২০°৩৪ ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০°১ ও ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।[২০]

---

১৫. বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ- ২
১৬. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ- ৩
১৭. প্রাগুক্ত পৃ- ৩
১৮. প্রাগুক্ত পৃ- ৩, ৪
১৯. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা পৃ- ২২
২০. ঢাকা ডায়েরী ১৯৯৯, পৃ- ৩

এমন এক সময় ছিল যখন বাংলা বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলার সমগ্র অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ বুঝাতো। আবার কখনো বাংলাদেশ বলতে সমতট, রাঢ়, পুন্ড্রধর্বন, গৌড় ও তাম্রলিপ্তিকে বুঝাতো। মহাভারতের যুগে যোদাগিড়ি, পুন্ড্র কৌশকী কাছ সুহ্ম, প্রসুহ্ম বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি এসব স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।[২১]

কোন কোন ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, বঙ্গ মুলত তাম্রলিপ্ত পুন্ড্র ও সুহ্মম সংলগ্ন দেশ। পরবর্তীকালে গঙ্গা ভাগীরথী। যশোর এবং এর চতুর্দর্দিকের অঞ্চল গুলো কোন এক কালে বঙ্গ হতে স্বতন্ত্র ভাবে উপবঙ্গ নামে আখ্যায়িত হতো। এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে মধ্যযুগে রচিত 'দ্বিগ বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে।[২২]

সুতরাং প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ধারণ করে নির্দেশ করা যায়না। কারন আমরা বর্তমান কালের বাংলা বলতে যে সকল অঞ্চলকে বুঝি তা প্রাচীন কালে এসকল অঞ্চলের কোন একটি নাম ছিল না। এসব অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এ সমস্ত এলাকার স্বাধীন রাজ্য ছিল একাধিক। এদের নামের মধ্যেও আবার বিভিন্ন সময় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন দক্ষিণ ও পূর্বাংশে বঙ্গ, সমতট হারিকেল ও বঙ্গাল, উত্তরাংশে পূন্ড্র বরেন্দ্র এবং পশ্চিমাংশে তাম্রলিপ্তি বাঢ় ও কজঙ্গল পশ্চিমাংশে দন্ড্র ভূক্তি ও সূহ্ম নামে ও অভিহিত হতো। এছাড়া কোন এক সময় উত্তর ও দক্ষিণাংশ গৌড় নামে ও আখ্যায়িত হতো।

সুতরাং আমরা এভাবে মোটামুটি প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্দেশ করতে পারি। যেমন পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই,পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

সাধারণতঃ এ সীমানার মধ্যবর্তী অঞ্চল বাংলা নামেই সুপরিচিত।[২৩] গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বঙ্গরাজ্য 'মগধ' সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পুণরায় সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বঙ্গরাজ্য উদ্ধার করেন। আর বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জনপদ গুলোকে একত্র করার প্রচেষ্টা করেন শশাঙ্কের পরে এ বংলা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল যেমন গৌড়, পুন্ড্র ও বঙ্গ। [২৪]

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তখনকার বঙ্গ রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন কর্ন সুবর্ণ, সমতট, পুন্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি ও কামরুপ। তাছাড়া সেন বংশের রাজত্বকালে বল্লাল সেনের সময় বঙ্গ রাজ্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছিলঃ যেমন মিথিলা, রাঢ়, (পশ্চিমবঙ্গ) বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) রাগড়ী বা বকদ্বীপ,[২৫] (মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ) ও বঙ্গ (পূর্ব বঙ্গ)।

---

২১. ফজলুল হাসান ইউসুফ, ড. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (ঢাকা ইফাবা, ১৯৮৬) পৃ-১

২২. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃ- ৩৪

২৩. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃ- ১২ A.K.M Shamsul Alam, DR. Sculptural Art of Bangladesh. P-22

২৪. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা. পৃ- ১৩

২৫. বাংলাদেশে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ- ১

Dhaka University Institutional Repository

তবে মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে ও সমগ্র বঙ্গ অঞ্চল পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু নামের ব্যাপারে কিছুটা প্রভেদ দেখা যায়।

যেমন- (১) রাঢ় অঞ্চল- গঙ্গার দক্ষিণ ও হুগলি নদীর পশ্চিম ভাগ পর্যন্ত।

(২) বাগড়ী গঙ্গা ও ব্রম্মপুত্র নদীর বদ্বীপ,

(৩) বঙ্গ - বদ্বীপের পূর্বদিকের স্থান সমূহ।

(৪) বরেন্দ্র গঙ্গা বা পদ্মার উত্তর মহানন্দার পূর্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিম দিক।

(৫) মিতিলা মহানন্দার পশ্চিম দিকে অবস্থিত।[২৬]

কিন্তু সেন ও পাল বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে বঙ্গের আয়তন সংকুচিত হয়ে যায়। এযুগে বঙ্গ জনপদ গাঙ্গেয় উপত্যকায় পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। হেমচন্দ্র রচিত চিন্তমনি নামক অভিধান থেকে জানা যায় যে, ব্রম্মপুত্র নদীর উপকূল বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত ছিল। যখন পাল বংশ দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে তখন বঙ্গ জনপদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ বৃঙ্গনামে সুপরিচিত লাভ করে। উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমানায় ছিল পদ্মা আর দক্ষিণের বদ্বীপ অঞ্চল ছিল দক্ষিণ বা অনুত্তর বঙ্গ। এর দীর্ঘকাল পরে বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের আমলেও বঙ্গে দু'টি বিভাগ পরিলক্ষিতহয়। এখানকার বিক্রমপুর পরগনা এবং এর সঙ্গে আধুনিক ইদিলপুর পরগনায় সামান্য অংশ মিলে বিক্রমপুর ভাগ হয়েছিল। অন্যভাগের নাম ছিল নাভ্যমন্ডল। বরিশাল জেলা সহ আরও পূর্ব দিকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার নাম নভোমন্ডল ছিল। মেঘনা নদীর মোহনা ও নাভ্যমন্ডলের অন্তর্গত ছিল।[২৭]

ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বারনীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, যে সুলতানী শাসন প্রাক্কালে বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং মুসলমানগন এর পৃথক পৃথক নামকরণ করেছিল। যেমন ইকলিমই বাঙ্গালা, আরসা-ই বাঙ্গালা এবং দিয়ারই বাঙ্গালা। ড.কে. আর কানুনগো ইকলিম-ই-বাঙ্গালাকে সোনারগাঁ অঞ্চল বা পুর্ববঙ্গ, আরসাই বাঙ্গালাকে সাতগাঁও অঞ্চল বা দক্ষিণবঙ্গ এবং দিয়ারাই বাঙ্গালাকে সংযুক্ত -সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করেন।

ইলিয়াছ শাহ বাংলার শাসন কেন্দ্র তিনটি যেমন সাতগাও, লখনৌতি, ও সোনারগাঁও এর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি মূলতঃ বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৮] Dr. Muhammad Abdur Rahim তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এরূপে সুলতান ইলিয়াছশাহ বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠাতা রূপে পরিগনিত হন। এরফলে বাংলার সমগ্র এলাকা একীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙালী জাতির রাজনৈতিক সামাজিক ও ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হয়। এসময় থেকেই তেলিয়াগছি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ বাঙ্গাল, একটি সাধারণ নামে পরিচিত হয়।[২৯]

---

২৬. আবদুল জলিল, সুন্দর বনের ইতিহাস, (দিকদ্যান পাবলিশার্স, ঢাকা ১৩৭৬) পৃ- ৫৮।

২৭. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃ-৩৪

২৮. Jadunath Sarkar (ed) History of Bangla Vo.11, Muslim period (1200-1757) Published by The University of Dacca. Dacca 1948. P- 67.

২৯. Hasan Askir, Bengal past and present Vo. LXVII. Calcutta. P-38, দৈনিক ইত্তিফাক ২৯ জুলাই, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, মুসলিম শাসনের প্রাককালে বাংলার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অঞ্চলগুলোকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা সফলকাম হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকগণ বাংলার ভৌগলিক আয়তন ও সীমারেখা সম্বন্ধে বর্ণনা করেন যে দ্বিতীয় ইকলিমে[৩০] সুবা বাংলা [৩১] অবস্থিত চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়া গিরি[৩২] অর্থাৎ পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরে পর্বত থেকে সুবার দক্ষিণ সীমান্তসহ সরকার মানদারান [৩৩] পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ প্রসস্ত।

বাদশা আকবরের শাসন প্রাক্কালে কালা পাহাড়[৩৪] কর্তৃক উড়িষ্যার বিজয়ের পর উক্ত সুবা দিল্লির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সুবে বাংলার অংশ এ অঞ্চলকে করা হয়। এতে সুবে বাংলার আয়তন দৈর্ঘ্য ৪৩ ক্রোশ এবং প্রস্থে ২০ ক্রোশ বৃদ্ধি পায়। এ সুবার উত্তর ও পূর্ব দিকে উচ্চ পর্বত মালা ও দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্র এবং পশ্চিমে সুবে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ঈশা খান সম্রাট আকবরের শাসন প্রাক্কালে পূর্ব দিকের প্রদেশ সমুহ জয় করেন এবং সুবে বাংলার অর্ন্তভূক্ত করেন।[৩৫] আবুল ফজল সুবে বাংলার ভৌগলিক সীমারেখা সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন- তার মতে বাংলা দ্বিতীয় (ইকলিম) অঞ্চলে আবত্তি এবং চট্টগ্রাম থেকেগর্হি (তেলিয়াগর্হি) পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য চারশত ক্রোশ। এর পূর্বে ও উত্তর সীমার পাহাড় পর্বত, দক্ষিণে সাগর ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এদেশের প্রান্ত সীমা রয়েছে কামরুপ ও আসামে[৩৬] সম্রাট জাহাঙ্গীর তার 'তুজুক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন বাংলা দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং এটা একটা বিশাল দেশ। সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়া গার্হি পর্যন্ত ৪৫০ ক্রোশ এর দৈর্ঘ্য এবং উত্তরের পর্বতমালা থেকে মান্দারান অঞ্চল পর্যন্ত ২২০ ক্রোশ এর প্রস্ত।[৩৭]

মোগল যুগে সুবে বাংলা, সাতগাঁও মাহমুদাবাদ, ফতেহাবাদ, খালিফাবাদ, প্রভৃতি ১৮টি সরকার বা বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বাংলার শেষ নবাব সিরাজ উদ দৌলার আমলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে ছিল বাংলাদেশ।[৩৮]

---

৩০. মুসলমান ভূগোলবিদ ও জ্যোতির্বিদগণ সমগ্র পৃথিবীকে জলবায়ু ও আবহাওয়ার ভিত্তিতে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। আর প্রত্যেকটি আবহাওয়াভুক্ত অংশকে এক একটা 'ইকলিম' নাম দিয়েছেন। দ্বিতীয় ইকলিম বা আবহাওয়াভুক্ত এই বাংলা অঞ্চল। ছিল। আইন ই আকবরী জ্যারেট কর্তৃক অনুদিত ৩য় খন্ড পৃ- ৪৩ উদ্ধৃত গোলাম হোসেন সলীম, রিয়াজুস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ, আকবর উদ্দিন অনুদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৪, পৃ-০৮।

৩১. সুবা নামের উৎপত্তি বাদশাহ আকবরের শাসনামলে সূচনা হয়। তিনি তার সাম্রাজ্যকে প্রশাসনিক ভাবে দশশালা বন্দোবস্তের সময় রাজস্ব বিভাগগুলোকে বিভিন্ন সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। পুনরায় এ রাজস্ব বিভাগগুলোকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক রাজ বিভাগে ভাগ করেছিলেন। কিন্তু সুবা সর্বোচ্চ রাজস্ব বা প্রশাসনিক বিভাগ ছিল। যেমন কতকগুলো নিয়ম নীতি নিয়ে একটি সরকার গঠিত হতো। কতকগুলো মহল বা পরগনা নিয়ে একটি দপ্তর গঠিত হতো। মহল বা পরগনা মোগল সম্রাটদের অধিন স্থানীয় প্রধানদের অধীনস্থ এক একটি রাজস্ব বিভাগের প্রাথমিক স্তর ছিল। আর সুবা ছিল সর্বোচ্চ স্তর। 'আইন-ই-আকবরী' জ্যারেট কর্তৃক অনুদিত ২য় খন্ড পৃ-১১৫, তাবকাতে নাসিরী পৃ, ১৪৮, ১৬২ উদ্ধৃত বাংলার ইতিহাস প্রাগুক্ত পৃষ্টা- ৮।

৩২. একটি গিরিপথের নাম তেলিয়াগিরি। এর উত্তরে গঙ্গানদী ও দক্ষিণে রাজমহল। আগে এ গিরি পথে বাংলায় প্রবেশের জন্য সামরিক কৌশলের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আইন-ই আকবরী (জ্যারেট) ২য় খন্ড পৃ- ১১৬।

৩৩. সরকার মানদারানের সীমানা হলো অর্ধ বৃত্তাকারে পশ্চিম বীরভূমের নাগোর থেকে রানীগঞ্জ হয়ে দান সোমনদী দামোদর বর্ধমানের উপর দিয়ে খন্ড কোষ, চন্দ্রকোন, জাহানাবাদ (পশ্চিম হুগলি জেলা) হতে রূপ নারায়ন নদীর মুখে (মন্ডঘাট' পর্যন্ত বিস্তৃত। আইন-ই আকবরী ২য় খন্ড (জ্যারেট) পৃ- ১৪১ উদ্ধৃত, বাংলার ইতিহাস প্রাগুক্ত পৃ- ৮।

৩৪. বাংলার সুলতান সুলায়মান কররানী প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন কালা পাহাড়, দক্ষিণ উড়িষ্যার পূঠার জগন্নাথ মন্দিরে প্রসিদ্ধ বিজেতা আইন-ই-আকবরী (জ্যারেট) ১ম খন্ড, পৃস- ৩৭০, ২য় খন্ড পৃ- ১২৮।

৩৫. গোলাম হোসেন সলীম, বাংলার ইতিহাস, প্রাগুক্ত- পৃঃ ০৮

৩৬. আইন-ই- আকবরী ২য় খন্ড (সরকার অনুদিত) পৃ- ১৩০-৩১, মোহাম্মদ রহিম ড. প্রাগুক্ত পৃ-৫

৩৭. খান আহমদ সৈয়দ (সম্পা. তজুক-ই-জাহাঙ্গীর) বোজারের উর্দু অনু. পৃ- ২২৯।

৩৮. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ- ১

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে বাংলা পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল যেমন বর্ধমান প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম আর এ পাঁচটি বিভাগের অধীনে ২৭টি জেলা ছিল।[৩৯]
অর্থাৎ প্রকৃত বাংলা বলতে এ পাঁচটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাকে বুঝানো হতো। বিভিন্ন জেলাগুলো প্রত্যেকটি বিভাগের অধীনে ছিল। যেমন- বর্ধমান বিভাগ, বর্ধমান, বাকুড়া, বীরভূম, মেদেনীপুর, গুহলি ও হাওড়া প্রভৃতি।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ, চব্বিশ পরগনা, কলিকাতা, নদীয়া, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও খুলনা। রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। ঢাকা বিভাগ, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ইত্যাদি।[৪০]

তাছাড়া উত্তর বঙ্গ কুচবিহার ও পূর্ব বাংলার সীমান্তে এ দুটি দেশীয় রাজ্য ছিল। এ সময় বর্তমান ভারতের আসাম ও বিহার প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কিছু কিছু অংশ যেমন সিলেট, কাছাড় গোয়ালপাড়া, মানভূম জেলা ও সিংভূমের ধল ভূম পরগনা সংযুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালের আগে বঙ্গদেশই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের বৃটিশ শাসনের একটি প্রদেশ।[৪১]

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর সমস্ত বাংলা দু'ভাগে বিভক্ত হয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গ, অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গ যা ভারতের আওতাভুক্ত হয়। পূর্বভাগ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তভূক্ত হয়।[৪২] সে সময়ে এর সীমানা ছিল উত্তরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের জলপাই গুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য ও বার্মা। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ।

পরবর্তী কালে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ পূর্ব পাকিস্তান তথা উপরিউক্ত সীমানা সমৃদ্ধ ভূখন্ডই স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি লাভ করে।

ভূ প্রকৃতি গঠন জলবায়ু ও এর প্রভাব

আইনই আকবরীতেবাংলায় যে ভৌগলিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে ভারত বিভাগ পূর্ব (১৯৪৭ সালের পূর্বের বাংলাদেশ) বাংলার ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার উত্তর দিক দিয়ে বয়ে গেছে হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী। বঙ্গোপসাগর বিধৌত এর দক্ষিণাঞ্চল এবং বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও অন্যান্য বন্য প্রাণীর আবাস ভূমি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দর বনের দক্ষিণে শেষ সীমারেখা টেনেছে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে এ প্রদেশকে উর্বরা ও শস্য শ্যামলা করে তুলেছে। এর পূর্ব সীমার গারো খাসিয়া জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বতরাজি অবস্থিত। খরস্রোতা গঙ্গা, মহানন্দা ও এদেশের বহুশাখা প্রশাখা এর পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত এবং রাজমহলের পাহাড়, ঝড়খন্ডের বনাঞ্চল, বীরভূম, সাওতাল পরগনা, সিংহ ভূমি, মানভূম ও ময়ুর ভঞ্জের জঙ্গলাকীর্ণ মাল ভূমি এর পশ্চিম সীমানা বেষ্টিত।[৪৩]

---

৩৯. প্রাগুক্ত পৃ- ০১।
৪০. খন্দকার ফজলে রাব্বি, বাংলার মুসলমান (মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক অনুদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮ পৃ-৪-৫।
৪১. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ- ১-২
৪২. প্রাগুক্ত পৃ- ২
৪৩. Social and Cultural history of Bangal vol. 1 P.1

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনন্য। বাংলা হলো পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলের বেশীর ভাগ ভূ-ভাগ ই পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রম্মপুত্র, গঙ্গা, ভাগীরথী ইত্যাদি নদ-নদী বিধৌত পলিদ্বারা গঠিত। অধিকাংশ বাংলার ভূ-ভাগেই অপেক্ষাকৃত নতুন বা নব্য ভূমি। তবে সম্পূর্ণ ভূ-ভাগ নতুন নয়। পশ্চিমাংশের বেশ কিছু অঞ্চল প্রাচীন বা পুরা ভূমি বিদ্যমান। বাংলার পশ্চিমাংশের প্রাচীন ভূমিরাজ মহলের দক্ষিণ থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহলের সাওতাল পরগনা, মানভূম, সিংহভূম, ধনভূমের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল এ প্রাচীন ভূমির অন্তর্গত উত্তর বাংলায় এ প্রাচীন ভূমির একটা অংশ।[৪৪] অপরাংশের চেয়ে কিছুটা উচু। উত্তর রাজশাহী, ফওড়া, পূর্ব দিনাজপুর এবং রংপূরের পশ্চিমাঞ্চল ব্যাপী অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চল-ই হলো ইতিহাস বিখ্যাত বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রস্থল।

বাংলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের প্রাচীন ভূমির বন্দনীটুকু বাদ দিলে বাকী সবটুকু অঞ্চল (চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা পার্বত্য অঞ্চল ব্যতিত) নব্যভূমি এবং এটা গঙা, পদ্মা, ব্রম্মপুত্র ও তার শাখা প্রশাখা নদী পলি মাটি দ্বারা বিধৌত। এদিকে সিলেটের পুর্বাঞ্চল ময়মনসিংহের মধুপুর গড় ঢাকার ভাওয়ালের গড়, পার্বত্য ত্রিপুরা, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ব্যতিত পূর্ব বাংলার সবটুকু ভাগই নব্যভূমি। অঞ্চল। তবে এর মধ্যে ঢাকা ময়মনসিংহ, ফরিদ পুরের সমতল ভাগ ও সিলেটের অধিকাংশ ভূমি তুলনামূলকভাবে প্রাচীন। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনার সমতল ভূমি অঞ্চল আরও নাভ্যভূমি অঞ্চল। সে কারণে এ অঞ্চলকে নভ্যমন্ডল বলা হয়।[৪৫] সুতরাং ভৌগলিক গঠনের দিক থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকের কয়েকটি প্রত্যন্ত ব্যতিত বাংলাদেশ একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি ও পলিমাটির দেশ।

প্রকৃতি ও জলবায়ুঃ নানাদিক বিদীর্ণ অসংখ্য নদীনালা ও পলিমাটির দেশ বাংলার সমতল ভূমি বছরের প্রায় অর্ধেক সময় জলে প্লাবিত থাকতো। বাংলাদেশেকে নদ-নদী প্রাকৃতিক শোভায় সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে। বর্ষার মৌসুমে নদীগুলোর দু'কুল ছেপে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এদেশে বর্ষাকাল প্রায় ছ'মাস ব্যাপী স্থায়ী হয়। এর আবহাওয়া বাংলাদশের অন্যতম ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য। বিষুব রেখার উত্তরে দেশটি অবস্থিত। এদেশের উপর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি চলে গেছে। এ কারণে এখানকার আবহাওয়া মৃদু ও নাতিশীতোষ্ণ। মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। তাই এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং বায়ু মন্ডল রয়েছে আদ্র জলীয় বাস্প পূর্ণ।

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে কাল বৈশাখী, ঘুর্ণিঝড় সাইক্লোন, জলোচ্ছাস মাঝে মাঝে প্রলয়ঙ্কারী আকার ধারণ করে। এতে করে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি সাধিত হয়।[৪৬]

আবুল ফজলের মতে এ প্রদেশে গ্রীষ্মের গরম ছিল মৃদু এবং শীতকাল ছিল ক্ষণস্থায়ী। মে মাস হতে বৃষ্টিপাত শুরু হতো। ছ'মাস কিংবা আর বেশী সময় ধরেবৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতো। সারা দেশে সে সময় জল প্লাবিত থাকতো।[৪৭]

অদ্যাবধিও এ আবহাওয়া পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট। ফলে এ অঞ্চলকে বলা হয় ভাটি অঞ্চল বা জোয়ার ভাটার দেশ। তবে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এদেশের জলবায়ুর উপর বেশী হওয়ায় বাংলাদেশের জলবায়ু বলা হয় ক্রান্তিয় মৌসুমী জলবায়ু।

---

৪৪. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃ-২৪
৪৫. প্রাগুক্ত পৃ-২৫
৪৬. প্রাগুক্ত পৃ-৩০
৪৭. আইন ই আকবরী (সরকার অনু.) ২খ, পৃ-১৩২। Social and cultural history of Bangal, Vol. 1, p.16

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-প্রকৃতির প্রভাবঃ

স্বভাত ভূ প্রকৃতি ও আবহাওয়া বাংলাদেশের অধিবাসীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করছে। এদেশের অধিবাসীদের উপর মৃদু আবহাওয়া প্রকৃতিগত ভাবে শান্ত ও কোমল স্বভাব সুলভ গড়ে তুলেছে। বিশেষ ভাবে এদেশের মানুষের মায়া মমতায় এবং তাদের পরিবারিক জীবনের ঘনিষ্টতায় এ প্রকৃতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়।[৪৮] সুতরাং সহস্র নদীর স্রোত ধারায় বিধৌত উর্বরা ভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রকৃতিগত ভাবে এদেশের মানুষকে হাসি খুশি কোমল হৃদয়বান শান্ত প্রকৃতির করেছে। তেমনি কোমল অন্তকরণে চমৎকার মায়া মমতায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সম্পর্ককে মধুময় করে তুলেছে। তাদের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি অপরিমিত স্নেহ, মায়া মমতা, ভালবাসা যেন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে একান্নভুক্ত পরিবার সৃষ্টি করছে।

কেবলমাত্র তাই নয়, নদীর প্রচন্ড স্রোত ঝড়ঝঞ্ঝা, প্লাবন, প্রাকৃতিক দুযোগ মহামারী ইত্যাদি যেন এদেশের মানুষকে দুর্দান্ত সাহসী ও শক্তিশালী করে তুলেছে। বাংলাদেশএখন যেমন অতীতে ও তেমনি বেশির ভাগ লোকগ্রামে বসবাস করতো। এর মূলে রয়েছে প্রকৃতির উদার অবদান। কেননা বাঙালীদের কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনে প্রকৃতির বদান্যতা ছিল অপরিসীম।[৪৯]

বাংলার ভৌগলিক পরিবেশই এদের অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক, পরিচ্ছেদ, বাসস্থান, আচার ব্যবহার ইত্যাদি স্বকীয় বৈশিষ্টতা দান করেছে। ধান এদেশের প্রধান কৃষি দ্রব্য, আর প্রচুর মাছ নদী নালা খাল বিল সরবরাহ করছে। সুতরাং ভাত মাছ বাংলার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। আবার এদেশের মানুষকে বন্যা ঝড়, তুফান, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি প্রকৃতির বিরুপতার সাথে যুদ্ধ করেই বেচে থাকতে হয়। সুতরাং এ কারণেই সংগ্রাম শীলতা বাংলার মানুষের প্রকৃতিতে আর এক বৈশিষ্ট বিদ্যমান।[৫০]

আবুল ফজল তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, বাংলার অসংখ্য নদ-নদী ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, করতোয়া, মহানন্দা, এবং যুগযুগ দরে এদের শাখা প্রশাখা বাঙালী অধিবাসীদের জীবনে একগুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকরছে।[৫১]

ধর্ম ঃ

জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রন স্থল হল বাংলায়, বাংগালীরা মৌলিকভাবে সমজাতীয় নয়, তারা নানা জাতির সংমিশ্রণ। সুতরাং এখানে বিভিন্ন ধর্ম দৃষ্টিগোচর হয়। তবে বেশীরভাগ লোক ইসলাম ধর্মের অর্থাৎ শতকরা ৯০জন মুসলিম। অবশিষ্ট হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান। [৫২] বাংলা এদেশের ভাষা মুখের ভাষা। এ ভাষায় নিজস্ব ছাপার অক্ষর ও উপভাষা রয়েছে। এদেশের বাংলা ভাষা হাজার বছরের অধিক কাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত।[৫৩]

---

৪৮. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃ- ৩০
৪৯. Social and cultural history of bengal p-33, 34
৫০. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, পৃ- ৩১
৫১. আইন-ই- আকবরী (সরকার অনুমোদিত) ২য় খন্ড পৃ- ১৩৩
৫২. An early History of Technical Paper Manufacture in Bangladesh, P-21
৫৩. Chatergy S-K. The Origion and development of the Banglai Language London 1970, p-1

অধিবাসীঃ

এদেশে দশ হাজার বছরের আগে মনুষ্য বসতি ছিল বলে কোন প্রমাণ পওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন। এদেশ সমুদ্র গর্ভ থেকে আস্তে আস্তে পলি মাটি দ্বারা গঠিত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, এদেশের সবটুকু সমুদ্র গর্ভ থেকে উত্থিত হয়নি। কারণ এতে যে, প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয়, আর্যরা এদেশে আসার আগে অন্তত চারটি জাতির বসতি ছিল। নিগ্রিটো, অষ্ট্রো এশিয়াটিক, দ্রাবিড়, ভোট চীনিয় এরা এদেশের অধিবাসী বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।[৫৪]

বিভিন্ন জাতিঃ

এদেশে নিগ্রোদের মতো দেহ গঠন যুক্ত এক আদিম জাতির বসবাসের কথা জানা যায়। কালের বিবর্তনে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। এর পর এখন থেকে প্রায় দশহাজার বছর আগে ইন্দোচীন থেকে আসামের পথে অষ্ট্রিক বা অষ্ট্রো এশিয়াটিক নামক এক জাতির লোক এদেশে নিগ্রিটোদের পরাজিত করে তাদের উৎখাত করে। তবে হয়ত তাদের সমূল নিবংশ করা সম্ভব হয়নি। তাদের কিছু কিছু লোক এদিক সেদিক পালিয়ে ও বিজয়ীদের বশ্যতা স্বীকার করে থেকে যায়। এই অস্ট্রিক জাতির পূর্ব পুরুষই পরবর্তীকালের কোন, বিল, সাওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতি।

বাংলা ভাষাও সংস্কৃতিতে এদের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ অষ্ট্রো এশিয়াটিক জাতির কিছু পরে বা সমকালে এখন থেকে আনুমানিক পাঁচ হাজার বছরেরও আগে এদেশে দ্রাবিড় জাতির আগমন হয়। তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি ছিল উন্নততর। তাই তারা সহজেই এদেশের প্রাচীন অধিবাসী অস্ট্রো এশিয়াটিক গোষ্টিকে পরাজিত করে বসতি বিস্তার করতে সমর্থ হয়। নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠির সংমিশ্রণে তখনকার বঙ্গ জনগোষ্ঠির সৃষ্টি। সংখ্যায় এই জনগোষ্ঠিই বাঙালী জনসাধারণের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি।

এর পর আসে আর্যরা। আর্যদের সমসাময়িক কালে বা তার কিছু আগে ও পরে মঙ্গোলিয় বা ভোটচীনার জনগোষ্টি এদেশে আসে। বাংলার উত্তর ও উত্তরপূর্বসীমান্ত অঞ্চলে এদের অস্তিত্ব এখনো রয়েছে। গারো, কোচ, টিপরা, চাকমা, মারমা এসব উপজাতি এ গোষ্টিরই বংশধর। বাংলার মানুষের রক্তে এদের মিশ্রন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এছাড়া তিব্বত বার্মা, গোষ্টীর প্রভাব ও একেবারে নগন্য নয়। আগতদের মধ্যে আর্যদের প্রভাবই বর্তমানে বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আরো অনেক পরে ক্রমান্বয়ে আরব, তুর্কি, মোঙল, ইরানী, আফগানি প্রভৃতি জাতির লোক এদেশে লীন হয়ে গেছে। এদেশের জনগণের রক্তে এসব জাতির রক্তের সংমিশ্রনঘটেছে। বস্তুতঃ বঙ্গবাসী একটি শংকর জাতি। বহিরাগতদের মধ্যে দ্রাবিড়দের রক্ত ও সভ্যতার উপাদানই বেশির ভাগ পাওয়া যায়।[৫৫]

---

৫৪. আমাদের সুফিয়ায়ে কেরাম, পৃ ২৫

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে।

সংক্ষিপ্ত তথ্যঃ

সরকারী নাম ঃ সরকারী নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, রাজধানী, ঢাকা।

সরকারঃ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা; রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

ভৌগলিক অবস্থানঃ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশ ২০° ৩৪ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬° ৩৮ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে ৮৮° ০১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২° ৪১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব-পশ্চিমে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি ৪৪০ কিলোমিটার এবং উত্তর-উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৭৬০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। সময় + ৬.০০ ঘন্টা গ্রীনিচ মান সময়।

আয়তন ও সীমাঃ বাংলাদেশের আয়তন, ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর ১৯৯৬-৯৭ সালের তথ্য অনুসারে দেখা যায় বাংলাদেশের নদী অঞ্চলের আয়তন ৯,৪০৫ বর্গ কিলোমিটার। বনাঞ্চলের আয়তন ২১,৬৫৭ বর্গ কিলোমিটার। নদী ও বনাঞ্চল বাদে বাংলাদেশের ১,১৬৫৯৮ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিন অংশে উপকূল অঞ্চলে বিশাল এলাকা ক্রমান্বয়ে জেগে উঠেছে। ভবিষ্যতে দক্ষিণ অংশের প্রসার ঘটালে বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধি পাবে।

সীমাঃ বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর অপর প্রায় তিন দিকই পাশ্ববর্তী ভারতের বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গঃ উত্তরে ভারতীয় রাজ্য পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং সেই সঙ্গে মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আন্তর্জাতিক স্থল সীমার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪০০ কি.মি। রেখার দৈর্ঘ্য ৪৮৩ কিলোমিটারের অধিক। ভূখন্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল (২২.২২ কি.মি) এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০.৪০ কি.মি) পর্যন্ত।

প্রশাসনিক এককঃ

বিভাগ ৬. ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট। জেলা ৬৪ উপজেলা ও থানা ৪৯৭ ইউনিয়ন ৪,৪৯০ মৌজা- ৫৯, ৯৯০, ৮৬,০৩৮ সিটি কর্পোরেশন ৬ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল) পৌরসভা ২২৩ (২০০১ সালের তথ্য অনুসারে)।

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-প্রকৃতিঃ

বাংলাদেশ পলল ঘটিত একটি আদ্র অঞ্চল। বাংলাদেশের ভূখন্ড মূলতঃ গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র, মেঘনা নদীঘটিত সুর্ববৃহৎ মূলতঃ গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র, মেঘনা নদী ঘটিত সুবৃবৎ দ্বীপের সমন্বয়ে সৃষ্ট। বঙ্গীয় বদ্বীপ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপগুলোর একটি। একটি বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্যে বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে দেশের মধ্য অঞ্চলের মধুপুর গড়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি এবং উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত কিছু পর্বতসারী। দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ ভূমিই সমুদ্র সমতল থেকে তিন মিটারের চাইতেও কম উঁচু এবং প্রতি নিয়ত বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। সর্বোচ্চশৃঙ্গ বিজয় (তাজিংডং) এর উচ্চতা ১,২৮০ মিটার এবং এটি রাঙ্গামাটি জেলার সাইচল পর্বত সারির অন্তর্ভূক্ত।

নদীমালাঃ

প্রধান নদীগুলোশাখা ও উপনদী সহ প্রায় ৭০০ নদী রয়েছে। এই নদীগুলো আবার তিনটি বৃহৎ নদী প্রণালীর অন্তর্ভূক্ত, গঙ্গা পদ্মা প্রণালী, ব্রম্মপুত্র যমুনা নদী প্রণালী ও সুরমা, মেঘনা নদী প্রণালী। দেশের দক্ষিণ পূর্ব অংশের পাহাড়ী এলাকার নদীগুলো সামগ্রিক ভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদী প্রণালী হিসেবে চিহ্নিত। গঙ্গা, পদ্মা, ব্রম্মপুত্র, যমুনা, সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা,কর্ণফুলী, পুরাতন ব্রম্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, তিস্তা, আত্রাই, গড়াই, মধুমতি, কপোতাক্ষ, রূপসা, পশুর, ফেণী ইত্যাদি অন্যতম প্রধান নদী।

জলবায়ুঃ

বাংলাদেশের জলবায়ূ ক্রান্তীয় মৌসুমী ধরণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা শীতকালে যথাক্রমে ২৯সে. ও ১১সে. এবং গ্রীস্মকালে যথাক্রমে ৩৪ সে. ও ২১ সে.। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১,১৯৪ থেকে ৩,৪৫৪ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা ৮০ থেকে ১০০% (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) এবং সর্বনিম্ন আদ্রতা ৩৬% (ফেব্রুয়ারী-মার্চ)।[৫৫]

---

৫৫. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (ঢাকা, মার্চ ২০০৩, ৬ খন্ড ১ সং) পৃ- ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম প্রচারের সূচনা

ইসলাম প্রচার মূলক ধর্ম। আত-তাবলিগুল ইসলামী তথা ইসলাম প্রচার কার্য হচ্ছে আল্লাহ তালা প্রদত্ত খিলাফত আর নবীও রাসুলগণ হচ্ছেন তাঁরই খলিফা বা প্রতিনিধি। পর্যায়ক্রমে নায়িবে নবী হিসেবে স্বীকৃত প্রকৃত আলিমগণ ই হচ্ছেন নবী ও রাসুল গণের প্রতিনিধি। দ্বীনের আহকাম, বিধানাবলী ও শিক্ষাদীক্ষাকে অন্যের নিকট পৌছিয়ে দেয়াই হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাবলিগ। দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বিভিন্নভাবে তাগিদ এসেছে। মহান আল্লাহর শেষ নবী, নবী ও রাসুলদের ইমাম হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন ইসলামী শরীয়তের মুল কান্ডারী, ধারক-বাহক। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত রাসুল (সা.) প্রদর্শিত তাবলীগ তথা দ্বীনের যথার্থ প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে যাবতীয় অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি নিরসন করে লোকদেরকে সহজেই সুপথে আনা যায়। ইসলামের যথার্থতা ও মর্মবাণী উপলব্ধি করে দ্বীনের জন্য শত সহস্র আম্বিয়া কেরাম শাহাদত বরণ করেছেন, গুরুতর আহত হয়েছেন, পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীন ও আউলিয়ায়ে কেরাম এ পথের সত্যিকার উত্তরাধিকারী হিসেবে সত্যের মশাল হাতে নিয়ে দেশ-দেশান্তর ছুটে যান। যা হউক অত্র পরিচ্ছেদে ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্ব নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম ওহী ও তাবলিগের সূচনা

হেরাগুহায় নির্জন অবস্থানঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব কালে ও পবিত্র কাবায় ৩৬০টি প্রতিমা রক্ষিত ছিল। আরবের বিভিন্ন বংশ ও গোত্র ঐ সব দেবতাও প্রতিমার পুজা করত। আল্লামা সোলাইমান নদভী তাঁর রচিত আরদুল কুরআন, দ্বিতীয় খন্ড ও সীরাতুন নবী ৪র্থ খন্ডে বিভিন্ন আরবী নির্ভরযোগ্য দুর্লভ কিতাব হতে অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তার একটি বিবরণী তালিকা প্রদান করেছেন।[৫৬] উহার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করা হল।

আরব জাতির করুণ দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করে মহানবী (সা.) এর পূত পবিত্র অন্তর অতিশয় চিন্ত ক্লীষ্ট ও অস্থির থাকত। রাসুল (সা.) দিবারাত্র চিন্তা করতেন এমনকি ব্যবস্থা করা যায় যাতে তাদের সংশোধন হতে পারে। কিন্তু রাসুল (সা.) কোন পথই পাচ্ছিলেন না, মানুষের ঐ পাপ পূর্ণ কলুষিত জীবন যাপনকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করছিলেন। এ সময় তাঁর দেশবাসী যে সমস্ত অন্যায় অত্যাচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল উহাতে তিনি মনক্ষুন্ন হয়ে নির্জন অবস্থান গ্রহণ করছিলেন। তাঁর এ নির্জনতার স্থান ছিল পবিত্র মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহার নির্জন স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহর ধ্যানে ও উপাসনায় দিবারাত্রি কাটাচ্ছিলেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভের প্রত্যাশায়। শেষ পর্যন্ত সেই নির্জন অবস্থায় একদিন আল্লাহ্ তালা তাকে ওহীর নেয়ামত দানের সৌভাগ্য প্রদান করলেন এবং তাঁকে দুনিয়াবাসীকে হেদায়াতের মর্যাদা পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব দান করলেন। পবিত্র রমদ্বান মাসে শবে কদরের রাত্রিতে সমগ্র কুরআন, অবতীর্ণ করেন। ২৫ অথবা ২৭ রমদ্বানে তাঁর নিকট প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৪০ বৎসর। তখন ছিল খৃষ্টিয় ৬১০ সাল। পবিত্র কোরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। সর্ব প্রথম অবতীর্ণ কোরআনের আয়াত হিসাবে বিশুদ্ধ অভিমত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) (মৃ. ৯১১ হি.) 'আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআনে' উল্লেখ করেছেন।[৫৭]

ইসলাম প্রচারের প্রথম নির্দেশঃ

প্রথম ওহীর পরে কিছুদিন ওহীর ধারাবাহিকতা বন্ধ থাকে। ঐ ঘটনার চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর তাঁর নিকট পুণরায় ওহী নাজিল হয়।

এ মর্মে সহীহ্ বুখারীতে জাবির বিন আবদিল্লাহ আনসারী ফাত্বরাতুল ওহী এর আলোচনা কালে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি পথ চলতেছিলাম। হঠাৎ আমি আসমান হতে আগত একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি দৃষ্টি তুলে দেখলাম সেই ফিরিশতা যিনি হেরা গুহায় ইতিপূর্বে আমার নিকট আগমন করেছিলেন যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থানে একটি আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। আমি উহা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি ও দ্রুত পদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বলি: আমাকে চাঁদরে আচ্ছাদিত কর, আমাকে চাদরে আচ্ছাদিত কর। ইহা শুনে আমার স্ত্রী আমাকে চাদরে আচ্ছাদিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন।[৫৮]

ওহে চাদর আচ্ছাদন কারী ওঠ এবং মানুষকে অবহিত ও সাবধান কর। স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসায় নিজের জামা কাপড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখ এবং সর্ব প্রকার নাপাকীহতে দুরে থাক্ ইহার পর হতে ওহীর ধারা অব্যাহত থাকে।

নবী করিম (সা.) হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্তহয়ে প্রথমে গোপনে গোপনে উহা প্রচার করতে থাকেন। যেহেতু ইসলাম প্রচার মূলক ধর্ম সেহেতু পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে। রাসুলের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিল-

---

৫৬.

ক্রমিক	মুর্তির নাম	সংশ্লিষ্ট পুজারী কবীলার নাম
০১	লাত	কবীলা সকীফ
০২	উযযা	কোরাইশ, বনু শাবান বিন জাবির
০৩	মানাত	কাবায়েল উল খজরয এবং সাধারণ আরব
০৪	ইয়াগুছ	বনু মাদহজ ও জায়শখালা
০৫	ইয়াউক	বনু হামদান ও খাঁওয়ান বালী।

প্রভৃতি ৫৯টি মুর্তির নাম উল্লেখ ছাড়াও ইয়ামান ও ও হিজাযের জাহিলিয়াত কালের পুরার্কীর্তির যেসব শিলালিপি পাঠোদ্ধার করেছেন ঐগুলো হতে (৬০) আলমুক্হ (৬১) উশতার (৬২) নুক্সার (৬৩) কীনন ইত্যাকার আরও অনেক প্রতিমার নাম ও ঠিকানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে পানিপথী শাইখ মুহাম্মদ ইসমাইল, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, মুহি উদ্দীন শামী অনুদিত (ঢাকা, ইফাবা, নভেম্বর ২০০৪, ১সং) পৃ- ১২, ১৩, ১৪, ১৫।

৫৭. আস সুয়ুতী জালাল উদ্দিন আবদুর রহমান, আল ইতকান ফি উলুমির কুরআন। (দিল্লি, কুতুবখানা ইশায়াতুল ইসলাম, ১ম সং, পৃ- ৩১।

৫৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, আল-জামে, আস-সহীহ, (করাচীঃ কদীমী কুতুবখানা, মুকাবিল আরামবাগ ২খ, ২সং) পৃ- ৭৪০।

Dhaka University Institutional Repository

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك– وان لم تفعل فما بلغت رسالته– والله يعصمك من الناس–

অর্থাৎ- হে আল্লাহর রাসুল, তোমার রব বা প্রতিপালক প্রভু তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তা (বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার কর) আর যদি তুমি না কর, তবে তুমি তার প্রেরিত বাণী প্রচার করলে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন অর্থাৎ- এই প্রচারকার্যে কেউ তোমাকে নিরস্ত করতে বা তোমার প্রাণনাশ করতে পারবে না।[৫৯]

মুসলমানদের প্রতি ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহর আদেশ আছে-

ولتكن منكم امة يدعون الي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون–

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন সম্প্রদায় হওয়া চাই যারা মঙ্গল অর্থাৎ- ইসলামের দিকে লোকদের আহবান করবে, সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর এরাই হবে সফলকাম।[৬০]

পরিশেষে যে ইসলাম সকল ধর্মের উপর জয়ী হবে তার ভবিষ্যৎ বাণী কুরআন পাকে রয়েছে।

هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله–

অর্থাৎ- তিনি আল্লাহ যিনি রাসুলকে পথ প্রদর্শন এবং সত্য ধর্মের সঙ্গে পাঠিয়েছেন যেন সেই ধর্মকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন।[৬১]

উল্লেখ্য ইসলাম প্রচারের ধারা ছিল প্রথমে গোপনে গোপনে। এ প্রচার কার্য অব্যাহত থাকে। রাসুল পাক (সা.) এর প্রতি নির্দেশ ছিল ইসলাম প্রচারের। সেই নির্দেশ পালনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি তাঁর নিজগৃহ হতে এ প্রচার কার্য শুরু করেন। হেরা গুহা হতে ঘরে ফিরে এসে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরার নিকট সব ঘটনা খুলে বলেন মুলতঃ এর পর হতেই নবী করিম (সা.) দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাই সর্ব প্রথম খাদিজাতুল কুবরা ইসলামে দীক্ষিত হন। অতঃপর কিশোরদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) ও যুবকদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বাধীন ক্রীতদাসদের মধ্যে হযরত জায়েদ বিন হারিসা (রা.) এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে হযরত বিলাল (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬২]

প্রকাশ্যে প্রচারের নির্দেশ এবং উহার বাস্তবায়নঃ

যখন মহানবী (সা.) এর এমনি ভাবে প্রচার কার্য পরিচালনার তিন বৎসর অবিবাহিত হয়ে চতুর্থ বর্ষের সূচনা হয় তখন আল্লাহ তালা তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, এখন প্রকাশ্যে সত্যের বাণী প্রচার করুন। তখন ই তার উপর এবং তার সাহাবীদের উপর নেমে পড়ে নির্মম নিপীড়ন নির্যাতন। প্রকাশ্য ইসলাম প্রচারে আল্লাহর নির্দেশ ছিল, অর্থাৎ- "অতএব, হে রাসুল তোমাকে যে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে তাই খোলাখুলি ভাবে তথা প্রকাশ্যে অতিশয় পরিস্কার করে মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দাও এবং মুশরিকদের কথার প্রতি কোনরূপ কর্ণপাত করনা।"[৬৩]

---

৫৯. আল কুরআন ৭ : ৬৭
৬০. আল কুরআন ৪: ১০৪
৬১. আল কুরআন ২৮; ৯
৬২. আব্দুর রউফ নাহেব ফাদিরী, দানাপুরী হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত আলাহস সিয়ার ফি হুদা খাইরিল বাশার মাকতাবা থানভী ১সং, কুতুব খানা রাশিদিয়া, ঢাকা, ১সং, তা.বি) পৃ- ১৬।
৬৩. আল কুরআন- ১৪:৯৪

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের পর পরই দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়- "হে মুহাম্মদ (সা.) তোমার নিকটাত্মীয়গণকে তাদের শিরিক ও প্রতিমা পূজার দরুন আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে অবহিত ও সাবধান করে দাও। আর যে সমস্ত মুমিন তোমার আনুগত্য স্বীকার ও অনুসরণ করছে তাদের সহিত অতিশয় বিনম্র ও মানবতা সুলভ আচরণ কর। আর যারা সাবধান করা সত্ত্বেও তোমার কথা না মানে তাদিগকে বলে দাও যাকিছু তোমরা করছ সে সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নেই। শক্তিধর দয়ালু আল্লাহর উপর নির্ভর কর (এই মুশরিকরা তোমাদের কিছু করতেপারবে না।"[৬৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন হযরত নবী করিম (সা.) উপরোক্ত আয়াত নাজিল হবার পর কোরাইশদের ডাকলেন। সাধারণ আভিজাত সকলেই তার আহবানে সাড়া দিয়ে একত্রিত হলেন। নবী করিম (সা.) কুরাইশদের প্রত্যেকটি উপগোত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "হে বনু কাব বিন লুয়াই। তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বাঁচাও। হে বনু মুররাহ! তোমরা নিজেদেরকে দোজখের অগ্নি থেকে বাচাও। হে বনু আবদে শামস। তোমরা দোযখ হতে আত্ম রক্ষা কর, হে বানু আবদে মনাফ! তোমরা দোযখ হতে আত্ম রক্ষা কর। হে বনু হাশেম তোমরাও জাহান্নাম হতে নিস্কৃতি লাভের পথ বেছে নাও। হে বনু আব্দুল মুত্তালিব তোমরাও জাহান্নাম হতে নিস্কৃতি লাভের পথ বেছে নাও। হে ফাতিমা, তুমি ও তোমাকে জাহান্নাম হতে হেফাজত করার ব্যবস্থা কর। তোমরা দ্বীনের দাওয়াত কবুল না করলে আমার পক্ষে কিছুই করবার নেই। আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারব না।"[৬৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে হুজুর (সা.) কুরাইশদেরকে লক্ষ করে বললেন- "হে কুরাইশগণ । তোমরা ঈমান এনে জাহান্নাম হতে নিরাপত্তা লাভ করো। অন্যথায় আমি আল্লাহর আযাব ও গজব হতে তোমাদের কে রক্ষা করতে পারব না, হে বনু আব্দে মানাফ। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রেহাই দিতে পারব না। হে আব্বাস! হে ছুফিয়া! (হুজুর (সা.) এর চাচা ও ফুফু) আমি আল্লাহর ক্রোধ হতে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবনা। যদি তোমরা ঈমান গ্রহণ না কর। হে ফাতিমা আমার সম্পদ হতে যা ইচ্ছে নিয়ে যাও, কিন্তু ঈমান গ্রহণ না করলে আল্লাহর আযাব ও গজব হতে আমি তোমাদেরকে বাচাতে পারব না।"
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) যখন আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং সর্বাগ্রে তার স্ববংশ ও সুগোত্রীয়দের কে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি কুরাইশদেরকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে জমায়েত করলেন।
হুজুর (সা.) পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "আচ্ছা যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, পাহাড়ের ঐ দিক হতে একদল শত্রু অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে -

---

৬৪. আল কুরআন, ১৯:২১৫
৬৫. পানিপথি ইসমাইল শায়খ, মুহাম্মদ মুহি উদ্দিন অনুদিত ইসলাম প্রচারের ইতিহাস (ঢাকা, ইফাবা, নভেম্বর ২০০৪) পৃ- ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদেরকে হত্যা ও লুণ্ঠন করার জন্য আসতেছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল অবশ্যই বিশ্বাস করব। কেননা, তোমাকে আমরা কোনদিন মিথ্যা কথা বলতে শুনিনাই। হুজুর (সা.) ফরমালেন, তাহলে তোমরা জেনে রাখ, যদি তোমরা ঈমান গ্রহণ না কর, তা হলে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এতদশ্রবনে আবু লাহাব বলে উঠল তুমি ধ্বংস হও, এজন্য কি তুমি আমাদেরকে একত্র করেছিলে?

নবী করিম (সা.) এর প্রচারের বিরুদ্ধে উত্থিত ইহাই ছিল প্রথম আওয়াজ। আবুল লাহবের সেই গালমন্দে মহানবী (সা.) নীরব রইলেন কিন্তু আল্লাহ নীরব রইলেননা। আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর নিন্দা বাদে আল্লাহ সুরাতুল লাহাব অবতীর্ণ করেন।

কোন কোন বর্ণনায় ঐদিন আবুল লাহাব এক মুষ্টি পাথর কণা উঠাইয়া মহানবী (সা.) এর উপর ছুড়ে মেরেছিল। যার উত্তরে আল্লাহ বলেন তোমার উভয় হাত ভেঙ্গে যাক। আবু লাহাব বদরের যুদ্ধের ৭ম দিন কলেরায় মারা যায়। তার লাশ পচে ফুলে যায়। কোন আত্মীয় এতে হাত লাগায় নাই। যখন এর গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন দুর হতে পাথর নিক্ষেপ করে লাশ ঢেকে ফেলা হয়। তার স্ত্রী মহানবীর (সা.) চলার পথের রাস্তায় কাঁটা পুঁতে কষ্ট দিত। একদা জঙ্গল থেকে কাঠের বোঝা বহন করে নিয়ে আসছিল। রশির গিরা তার গলায় আটকিয়ে যায়। যার দরুন তার মৃত্যু হয়।

নবী করিম (সা.) এর প্রতিরোধহীন দাওয়াতী জীবনঃ

সুদীর্ঘ তেরটি বছর নবী করিম (সা.) পবিত্র মক্কায় দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। অথচ ইহাতে মাত্র কয়েকজন লোক মুসলমান হয়েছিলেন। এখানে পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে দাওয়াতী কাজের প্রতিকুল। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ মুশরিকদের পাশবিক নির্যাতনে শিকার হয়েছেন এই সময়ে। এই সময়ে তাঁরা বিরোধিদের কোনরূপ প্রতিরোধ করেন নাই, বস্তুত প্রতিরোধ করার শক্তিও ছিল না। অবশ্য মধ্যখানে একবার তায়েফগমন করেছিলেন দাওয়াতী কাজে। সেখানে যারপর নাই নির্মম নির্যাতনে রঞ্জিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি ধ্বংস কামনা না করে বরং দোয়া করেছিলেন জাতির জন্য- 'হে আল্লাহ তুমি আমার জাতিকে হেদায়ত দান কর কেননা তারা অবুঝ।'

দাওয়াতী কাজ তথা ইসলাম প্রচারের জন্য মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এর লক্ষ্য হল আত্ম ভোলা মানব জাতিকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়া এবং একাজে তাদেরকে আকৃষ্ট করা। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ অথবা জাগতিক কোন স্বার্থ হাসিল করা উদ্দেশ্য হতে পারেনা। প্রিয় নবীজির (সা.) পবিত্র জীবনের দিকে একটু দৃষ্টি দিলে ব্যাপারটা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে যায়। দ্বীন প্রচারের এ মহান ব্রত থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য সমগ্র আরবের প্রেসিডেন্ট বানানোর লোভ দেখিয়েছিল, দেশের সেরা সম্পদশালী করার লোভ দেখিয়েছিল, দেশের সর্বাধিক সুন্দরী কে নবীজির (সা.) এর চরণে উৎসর্গ করার প্রস্তাব করেছিলেন; অথচ প্রিয় নবী (সা.) সব কিছুই ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। শুধু তাদের নিকট

Dhaka University Institutional Repository

একটি জিনিষ চাইলেন- হে লোক সকল! তোমরা শুধু বলো আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই (আমি মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।

এ ঈমান এনো, তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে ইহ-পরকালিন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যাবে। আমি শুধু ইহাই তোমাদের কাছে চাই, আর কিছু চাই না, বস্তুত নবী, রাসুল, সাহাবা, তাবেয়ীন, আউলিয়া, নায়েবে নবী তথা আলেমগণ এ মহান ব্রতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। ওরাসাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের উত্তরাধিকারী প্রকৃত নায়িবে নবী আলিম সমাজের উপর বর্তমানে এ মহান দায়িত্ব অর্পিত। বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে হাজারো নির্যাতন নিষ্পেষন ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে কিভাবে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে যুগে যুগে দায়ী ও মুবাল্লিগ, উলামায়ে দ্বীন, সুফিয়ায়ে কেরাম, নবী, রাসুল, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী গণের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন ও এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত অবধি চলমান থাকবে।

ইসলামের আবির্ভাব ও প্রাথমিক যুগে এর প্রচার

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সত্য ধর্ম ইসলামের শেষ প্রচারক এবং তাওহীদ বাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ শিক্ষক। চল্লিশ বছর বয়সে নবুওত প্রাপ্তির পর ২৩ বছর ধরে তিনি সত্য ধর্মপ্রচার করেন এবং শেষের তের বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব মানবের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের সুষ্ঠ ও আদর্শ পরিচালনার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। তিনি মানুষকে আল্লাহর নির্ধারিত পথে পরিচালনা করে মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করে যান। তাই দেখা যায় তার ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাদের পর তাবেয়ীন তাঁদের পর তাবে তাবেয়ীন তাওহীদ ও রিছালাতের বাণী নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।[৬৬]

বিভিন্ন দেশে ইসলামঃ

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে আরবের মুসলিম বণিকরা ও গুরুত্বপূণ তাবলিগি দায়িত্ব পালন করতেন। তাই দেখি ইসলামের সত্য বাণী পশ্চিমের আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে মরক্কো, স্পেন ও পর্তুগাল থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চল সহ চীন দেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে অবশ্য মুসলিম বিজেতাদের ভূমিকাও কম ছিল না। কিন্তু এমনও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে মুসলিম বিজয়ের কারণে নয়, ইসলামের ধারক বাহক প্রকৃত নায়েবে নবী তথা-

---

৬৬. আমাদের সুফিয়ায়ে কেরাম, পৃ- ৩১

Dhaka University Institutional Repository

ওলামায়ে দ্বীন এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। তাদের নিজস্ব চরিত্র মাধুর্য তাঁদের ধর্ম প্রচারের প্রধান সহায়ক ছিল। অস্ত্র ও গ্রন্থের সহায়তা তাদের বড় একটা প্রয়োজন হয়নি। সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব দক্ষিণ এশীয় দেশ সমূহ বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ সমূহ জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালোয়েশিয়া, মালদ্বীপ এসব অঞ্চলে এবংসুদুর চীনদেশ পর্যন্ত এই নিঃস্বার্থ প্রচারকদের মাধ্যমে ইসলামের তাওহীদ বাণী প্রচারিত হয়।

চীন দেশে ইসলামঃ

রাসূল করিম (সা.) সাহাবীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়ে দিতে। তিনি বিভিন্ন দেশের তৎকালীন শাসকদের কাছেও ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রন জানিয়ে দাওয়াতপত্র পাঠিয়েছেন। তিনি রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে, পারস্যের সম্রাট পারভেজের প্রতি, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর প্রতি, মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার কিবতিদের বাদশাহ মুকাওকাসের প্রতি, বাহরাইনের বাদশাহ মুনজির ইবনে সাওয়া আবদীর প্রতি, ওমানের বাদশাহ আবদ ইবনে জুনুনদার ও তার ভাই বাদশাহ জায়কার ইবনে মুমুনদারের প্রতি, ইখামার বাদশাহ হাওযার প্রতি, দামেশকের অধিপতি হারেস ইবনে আবূ শামস গাস্সানীর প্রতি এরূপ ফরমান পাঠান। পূর্ব দিকে চীন দেশের তদাত্তীন সম্রাট তাইসুঁঙ এর কাছে অনুরূপ একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। পত্র খানির কথা অধ্যাপক H.G. Wells তার A Short History of the world গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পত্র খানি এরূপ To the monarch (Tai -sung) also come (in A.D. 628) messengers from Muhammad (S.M) They came to canton on a trading ship. They have sailed the whole way from Arabia along the indian coasts. Unlike Heraclius and Kavadh tai-sung gave their envoys a courteous hearing. He expressed his interest in their theological ideas and practices and assisted them to build a mosque in canton. A mosque survives, it is said, to this day. The oldest mosque in the worlds ক্যান্টন শহরে প্রায় দেড় হাজার বছর পুরানো জনৈক সাহাবীর মাজারের অস্তিত্ব থেকে একথার সত্যতা প্রমানিত হয়।

চীন দেশেও তার আশে পাশে যে ইসলাম ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়েছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই। খান বাহাদুর মুহাম্মদ হুসেন তাঁর 'আজায়েবুল আসফার' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় নবম শতাব্দীর পর্যটক আয়রাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ চীনের ফুচু শহরের তদানীন্তন শাসকের জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে প্রায়, দেড়লক্ষ মুসলিম নিহত হয়। এদের সবাই ছিল বিদেশাগত।

মালদ্বীপে ইসলামঃ

ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমন কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন যে, আরাকানে তিনি বাংলা ও ইন্দোনেশিয়ায় মুসলিম দের কলোনী দেখেছিলেন। মালদ্বীপে তিনি এক বাঙালী মুসলিম রাজ

Dhaka University Institutional Repository

বংশের জনৈকা মহিলাকে রাজত্ব করতে দেখেন। তাঁর ভাষায়ঃ পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, মালদ্বীপ দ্বীপ পুঞ্জের শাসন কর্তৃত্ব রয়েছে খাদিজা নাম্মী জনৈক মহিলার হাতে। তিনি সুলতান জালালুদ্দীন উমর ইবনে সুলতান সালাহ উদ্দীন সালেহ বাঙ্গালীর কন্যা। তাঁর দাদা ও বাদশাহ ছিলেন, পিতা ও বাদশাহ ছিলেন। পর পর তারা মালদ্বীপে রাজত্ব করেন।[৬৭]

ভারত, বার্মা ও আরকানে ইসলাম

ভারতবর্ষে রাসুল (সা.) এর জীবদ্দশায়ই ইসলামের বাণী এসে পৌঁছে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকুলে মালাবর রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচারিত হয়। শায়খ জায়নুদ্দীনতাঁর 'তুহফাতুল মুজাহিদিন ফী বায়ন্বে আহওয়ালিলি বারতাকালীন', নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের মালাবার রাজ্যের রাজা চেরুমল পেরুমল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে পবিত্র মক্কায় গমন করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সময় মালাবরে বহু পৌত্তলিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

এ সময়ে ইসলামের সত্যবাণী বাংলায় ও প্রবেশ লাভ করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট উপমহাদেশের জনৈক শাসক এক ডেকচি 'আদা' উপহার পাঠিয়েছিলেন বলে একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। হাদিসটি এরূপ-

Sarbatak. King of Kunj (India) sent an earthenware full of ginger to Hazrat Muhammad (sm.) the propet (peace be on him) as presents according to a narration by Abu sayeed Khudri (R.) it is also reported that Hazrat Muhammad (sm.). The prophet (peace be on him) sent Hudhye usama and sohayb to the king inviting him to accept Islam. He had embraced Islam Sarbatak also said I saw the Prophet's face. First in Mecca and thene in Medina. He was very handsome faced and midle sized man.[৬৮]

এ হাদিসটি কতখানি নির্ভরযোগ্য তা বলা যায় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবৎকালেই যে সমুদ্র পথে আগত বহিকদের মাধ্যমে তাওহীদের বাণী বাংলায় আসে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কারণ দেখা যায় হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের বছর তিনেকের মধ্যেই হযরত ওমর ফারুকের খেলাফত কালে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন। তারা বাণিজ্য ব্যাপদেশে এ দেশে আসেন। তারা এসেছিলে কেবল সত্যধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় প্রাথমিক যুগের এসকল ইসলাম প্রচারক উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সহজ সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাদের প্রচারকার্যের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই ধর্মভেদ জর্জরিত এদেশের নির্যাতিত ও নিপিড়ীত জন সমাজের সম্মুখে এক নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলের দিকে দিকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে এক নীরব সমাজেও সংস্কৃতিতে বিপ্লবের পরিবেশ গড়ে উঠে।[৬৯]

---

৬৭. খান বাহাদুর মুহাম্মদ হুমায়ুন আযামিযুল আসফার, ইবনে বতুতার গ্রন্থের অনু. (দিল্লি ১৯১৩, ২ খ, ২ সং), পৃ- ৩৮৯।
৬৮. Nurul Haque Md. Arab Relationship with Bangladesh. M. Phil D.U. 1980 Mss. P- 54.
৬৯. আব্দুল গফুর, মহানবীর যুগে উপমহাদেশ, অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৮), পৃ- ৪৯-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

আরব বনিক প্রচারকদের চেষ্টায় হিজরী প্রথম শতকেই (খ্রিস্ট্রীয় সপ্তম শতাব্দী) ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকুলীয় বন্দর সমূহের সাথে সাথে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ উপকুলীয় অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের উপকুলীয় বন্দর সমূহে ইসলামী ভাবধারার আমদানী হয়। আরবরা ভারত থেকে প্রধানত গরম, মসলা, হাতীর দাঁত ও নানাবিধ রত্ন ইউরোপে রপ্তানী করত। গরম মসলা উৎপন্ন হত ভারতের দক্ষিণ এলাকায় এবং সরন্দ্বীপ বা সিংহলে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ হাতির দাঁতের জন্য বিখ্যাত ছিল। আলেকজন্ডারের ভারত আক্রমণ কালে বঙ্গ রাজ্যের চার হাজার সুসজ্জিত রণ দক্ষ হস্তী বাহিনীর কথা গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা হতে জানা যায়। আরবী ইতিহাস গ্রন্থে বঙ্গরাজ দেব পালের (৮১০-৮৪০) পঞ্চাশ হাজার রণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হস্তির উল্লেখ দেখা যায়।[৭০]

একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়ে লেখা চর্যাপদ গুলোতে হাতীর উল্লেখ থেকেও এ অঞ্চলে হাতীর বিদ্যমানতার কথা প্রমানিত হয়। চৌদ্দ শতকের পরিব্রাজক ইবনে বতুতার ভ্রমন কাহিনীতে 'আরখং' (আরাকান) ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে হাতীর প্রাচুর্যের উল্লেখ রয়েছে। ষোল শতকের ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আইন-ই আকবরীতে উল্লেখিত হয়েছেঃ বাঙ্গালার পূর্ব দক্ষিণে 'আরখং' (আরাকন) নামে একটি বিরাট দেশ আছে। চাটগাঁও তার সামুদ্রিক বন্দর। এখানে প্রচুর হাতী পাওয়া যায়।[৭১] কাজেই সে সময় হাতীর দাঁত যে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানী হতো এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না এতে প্রমাণিত হয় যে, আরব দেশীয় মুসলিম বনিকদের চট্টগ্রাম বন্দরে আসা-যাওয়া ছিল। এতদঞ্চল অতিক্রম করে সুদূর চীন দেশেও তাদের যাতায়াত ছিল, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশেষ করে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগর ছিল সমুদ্র পথে যাতায়াতের একমাত্র পথ। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) ও সাতগাঁও (গঙ্গানদীর তীরবর্তী হুগলীর অদুরে সপ্তগ্রাম) ছিল আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর।[৭২]

বাংলাদেশে ইসলাম

খ্রিষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় পতাকা বহন করে নিয়ে আসেন। আরব মুসলমানদের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিল তার ও পুর্ব থেকে। প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক সূত্রে আরব বনিকগণ এদেশের আগমন করেছিরেন। বহু পূর্বেই আরবগন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশ গমন করেছিলেন। এজন্যই আরবগন সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে পৃথিবীর সেরা জাতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল।

---

৭০. মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, কলিকাতা পৃ- ৫২।

৭১. আযায়িবুল আসফার, পৃ- ৫২

৭২. বাংলাদেশ ইসলাম, পৃ- ৫৫-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরব বণিকগণ সমুদ্র পথে চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, সুমাত্রা যাওয়ার পথে চট্টগ্রামে যাত্রা বিরতি করতেন এবং এখানে ব্যবসায়িক আদান প্রদান হতো। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে এবং হিজরী প্রথম শতকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায়ই সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে দক্ষিণ চীনে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় আরবের মুসলিম বনিকগণ ও ধর্ম প্রচাকরগণ কর্তৃক এদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা ঘটে। ৭১২ খ্রিঃ আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে আরবদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের ফলে ভারতে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়।[৭৩] তাছাড়া ভারত বর্ষের সঙ্গে আরবদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে ইসলাম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্টপোষকতা লাভ করে।

ইসলামের আবির্ভাব কালে বাংলাদেশ

449281

ইসলামের আবির্ভাব ঘটে ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৬১০ ঈসাব্দে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি কুরআন নাজিলের মধ্য দিয়ে আরবে প্রথম ইসলামের যাত্রা শুরু হয় এবং তাঁর অবশিষ্ট ২৩ বছরের জিন্দেগীতে তা আরবের ভেতরে ও বাইরে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় বিপ্লবী ইসলামের জোয়ারে আরবের ভেতর ও বাহির আন্দোলিত হতে থাকলে হয়ত উক্ত জোয়ারের তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের সমুদ্র বিধৌত উপকূল ভাগে।

ইসলামের আবির্ভাবকালে বাংলাদেশ তথা স্বাধীন ও সার্বভৌম গৌড় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন রাজা শশাঙ্ক। তিনি ৬০৬ ঈসায়ী ক্ষমতাসীন হন। তাঁর রাজধানী ছিল পশ্চিম বাংলার বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের 'কর্নসুবর্নে;। উত্তর বাংলা পশ্চিম বাংলা, দন্ডভুক্তি, উড়িষ্যার উৎকল ও কঙ্গোদ, বিহারের মগদ, কামরূপ প্রভৃতি রাজ্য পর্যায়ক্রমে তাঁর অধিকারে আসে। পশ্চিমে তিনি বারানসী পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত করেন। ৬৩৭ ঈসায়ী তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক গৌড় রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্টিত ছিলেন বলে জানা যায়। উত্তর ভারতের তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন মহারাজা হর্ষবর্ধন। তিনি শশাঙ্কের সম সাময়িক কালে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ৬৪৭ ঈসাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৭ম শতাব্দীর পূর্বে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের পাশাপাশি বঙ্গ রাষ্ট্র নামে অন্য একটি স্বাধীন রাজ্য ও বিদ্যমান ছিল। ষষ্ট শতাব্দীর শেষ দিকে সেটিকে দক্ষিনাত্যের চন্দ্রুকা বংশের রাজা কীর্তিবর্মন দখল করেছিলেন। ভিন্নমতে, রাজা শশাঙ্ক সেটিকে গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে ফেলেছিলেন।[৭৪]
কখন কিভাবে বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব শুরু হয়, তা সঠিক রূপে নিরূপন করা যায়না। তবে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় বাংলায় ইসলামের দাওয়াত এসে পৌছে। জানা যায় মহনাবী (সা.) এর মামা সাহাবী আবু ওয়াক্কাস (রা.)[৭৫] ইসলাম প্রচারক হিসেবে সমুদ্র পথে বাংলায় আগমনকরেন। ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক ছিল মহানবী (সা.) এর আবির্ভাববের বহু পূর্ব থেকেই ঐতিহাসিক এলফিনস্টোনের ভাষায়, হযরত ইউসুফ (আ.)- এর সময় থেকেই ভারতের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল চমৎকার।[৭৬]

৭৩. রইছ উদ্দিনঃ আ.ন.ম বাংলাদেশ ইসলামের আবির্ভাব (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাতাশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৮৭) পৃ-১৬৭।
৭৪. নুরুল করিম অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ও আবুল কালাম, দাখিল ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, জানুয়ারী ২০০৪, ২সং) পৃ- ১৬৮।
৭৫. মহানবী (সা.) র মামার নাম হযরত আবু ওয়াক্কাস (রহ.) তার পূর্ণ নাম ছিল হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব ইবনে আবদে মনাফ। তিনি ছিলেন মহানবী (সা.) এর মাতা আমিনার আপন চাচাত ভাই। হেলাল মাদির, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা ইফাবা, এপ্রিল জুন ২০০০ ৩৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ- ৮২
৭৬. এলিফিনস্টোন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, উদ্ধৃত বাংলা ও বাংগালী আব্দুল মান্নান মোহাম্মদ, (ঢাকা সৃজন প্রকাশনী ১৩৯৭ ১সং) পৃ- ৯৭।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঐতিহসাকি 'K.A Nizami' তার Arab Acounts of India' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন India's relations with Arab world go back to hoary past. Long before the rise of Islam, there was brisk commercial contact between India and Arabia and the Arab traders carried Indian goods to the European markets by way of Egypt and Syria. Elphinstone has rightly observed that from the days of Marco polo and Vasco de gama the Arabs were the captains of Indian commerce. There were large number of Arab colonies on the western coast of India and many Indian settlements in the Arab countries, Ubulla, for instance, was know as ard-ul-Hind on account of the large number of Indians who inhabited that region. When Islam spread and the Arabs got converted to Islam, these colonies continued to flowrish as before the Indian rajas appointed Muslim Judges, known as hunarman, to decide their cases and provided all facilities to them to oranize their community life. Commercial contact led to cultural relations and while large number of Arab navigational and other terms were adopted by the Indians, Indian custom, institutions and practices found their way to Arabia' philologists have traced there sankrit words misk (musk), zanjbil (ginger) and Kafur (camphor) in the Quran.[৭৭]

আরবীয় ও ভারতী য়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণেই। জানা যায়, রাসুল (সা.) সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী উপহার পেয়েছিলেন ভারতীয়দের পক্ষ থেকে। এমনকি একজন ভারতীয় রাজার পক্ষ থেকে আচার উপহার পেয়েছিলেন। একদা রাসুল (সা.) হযরত আয়শা (রা.)'র অসুস্থতার সময়ে আরবে অবস্থানরত একজন ভারতীয় চিকিৎসককে রোগ সম্পর্কে অবহিত করান। ইমাম বুখারী (রহ.) এর বর্ণনায় উক্ত বিবরণ জানা যায়। অপরদিকে হযরত ইমাম হোসাইনের স্ত্রী শহরবাণু।[৭৮] আরবগন ব্যবসা বাণিজ্যে পরদর্শী ছিল মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব থেকেই। তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপকরণ ছিল মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব থেকেই। তাদের জীবিকা নির্বাহরে প্রধান উপায় ছিল ব্যবসা। এজন্য তাদের বাণিজ্যিক বহর ছিল শক্তিশালী। বিশ্বের নানা দেশের মত এ উপমহাদেশের সাথে গড়ে উঠেছিল তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক।[৭৯]

---

৭৭. Nizami K.A.(DR. Md. Zakied) Arab account of India) During the fourteeenth century) Idarah-1 Adabiyat-1 Aligarah Delhi 1981, p - V.

৭৮. K.A. Zakied সম্পাদিত Arab Account of India গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক K.A Nizami ঐতিহাসিক হবসে খাত্রিকালের বয়াত দিয়ে লিখেন, হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর পুত্র ছিলেন হযরত ইমাম জয়নুল আবেদানের মাতা শহরবানু (যার নামকরণ করা হয় পরবর্তীতে শাফিনা)তৎকালীন পারস্য সম্রাট ইয়াজদেগারদ এর কন্যা ছিলেন। মুসলিম সৈন্যের হাতে নিহত হন ইয়াজদেগারদ। এ বিষয়ে মন্তব্য হচ্ছে ইমাম হোসাইনের অন্য স্ত্রী হয়তো ছিলেন ভারতীয়।

৭৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, (ঢাবি, সংখ্যা-৮৯, অক্টোবর ২০০৭) পৃ-১১৮

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই বাংলাদেশের সাথে আরবীয় মুসলমানদের যে প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। প্রত্নতাত্তিক প্রমাণ (Archaeological evidence)

২। আরবের ভৌগলিক বিবরণ (Geographical description of Arab)

৩। কিংবদন্তী ভিত্তিক প্রমাণ (Evidence on the basis of tradition)

১। প্রত্নতাত্তিক প্রমাণ (Archaeological evidence) ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র, আরব ভৌগলিকদের বিবরণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সাহায্যে প্রাথমিক যুগে বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদগন দু'টি আরবীয় মুদ্রা আবিস্কার করেছেন। একটি রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর এবং অন্যটি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে। ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটি আব্বাসীয় খলিফা হারুন উর রশীদ কর্তৃক মোহাম্মদীয় টাকশাল কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়।[৮০] ময়নামতিতে প্রাপ্ত মুদ্রাটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না, কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ খননের সম্পূর্ণ বিবরণ এখনো প্রকাশ করেনি। তথ্যের অভাবে মুদ্রাটি শনাক্ত করা যায়নি। আমার মনে হয় এ মুদ্রাটি আব্বাসীয় যুগের। ড. এনামুল হক পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির উপর নির্ভর করে বলেন 'হিন্দু সভ্যতার কোন কোন প্রাচীন কেন্দ্রে এই প্রাচীন যুগের আরব পারস্যের মুসলিম সাধক ও ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমাদের বিশ্বাস এরূপ কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে খলিফার এ মুদ্রা আনীত হয়। সম্ভবত যিনি এই মুদ্রাসঙ্গে নিয়ে তথায় প্রচার করতে গমন করেন তিনি বৌদ্দদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তার মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল। যেরূপেই হউক পাহাড়পুরে আবিস্কৃত খলিফার এ মুদ্রাটি অন্তত খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গের সহিত ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করতেছে।[৮১]

ড. এনামুল হক আরও বলেন- খলিফার মুদ্রাটি তাঁরই রাজত্বকালে পহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারে এসে পৌছে থাকবে। কেননা তখনকার দিনে পূর্ববর্তী খলিফার মুদ্রা পরবর্তী খলিফার যুগে চলতনা। মুদ্রা তখন ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি প্রধান নিদর্শন ছিল বলেই এরূপবিধান দেশে প্রচলিত ছিল। তাই লোকে অনেক সময় 'খুৎবা (সাপ্তাহিক ধর্ম বক্তৃতা) ও 'সিক্কার' (মুদ্রা) পরিবর্তন দেখিয়ে খলিফার পরিবর্তন মেনে লইত। তাহলে বলতে হয় খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদেই এ মুদ্রাটি বঙ্গে আগমন করেছিল। এই মুদ্রাটি যদি ধর্মপালের রাজত্বকালে পাহাড়পুরে নাও এসে থাকে, ইহাযে খলিফা হারুনুর রশীদের (৭৮৬-৮০৯খ্রিঃ) অন্যূন এক শতাব্দীর মধ্যে পাহড়পুরে এসে পৌছেছিল। তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর পাহাড় পুরের বৌদ্ধ বিহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সেই প্রাচীন যুগে সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্র ধরে একদেশের টাকা অন্য দেশে যেত। পাহাড় পুরের বৌদ্ধ বিহারে সেই সূত্রে খলিফার টাকা পৌছে ছিল বলে মনে হয় না।

---

৮০. Dikshit K.N. Memoirs of the Archacological Survey of India (No. 55 Delhi, 1938) P-87.

৮১. এনামূল হক. ড. মোহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম (ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮ইং) পৃ- ১২

Dhaka University Institutional Repository

কেননা পাহাড়পুরের প্রাচীন প্রসিদ্ধি বাণিজ্যের জন্য ছিল বলে এ যাবৎ প্রমাণিত হয়নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ মুদ্রা আবিষ্কৃত হলে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এই মুদ্রার আমদানী হয়েছিল বলে অনায়াসে ধরা যেত। এখন সে অনুমান কারার কারণ দেখা যায় না। খুব সম্ভব এই বৌদ্ধ বিহারটি তখন ধ্বংশ হয়ে গিয়েছিল।[৮২]

ড. আবদুল করিম বলেন নানা কারণে ড. হকের উপরোক্ত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।[৮৩] যেহেতু হারুনুর রশীদ কর্তৃক উৎকীর্ণ হয় সেহেতু এই মুদ্রা খলিফার জীবদ্দশায় বা তার খেলাফতের পরে একশত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে আনীত হয়, এমন মনে করার যথার্থ কারণ নেই। এখনও দেখা যায় বাংলাদেশের অনেক লোক মুসলমানী আমলের সিক্কা টাকা কবচ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং মুসলমানদের বাংলাদেশ বিজয়ের পরে এই মুদ্রা বাংলাদেশে আনীত হয়নি। এই কথা জোর করে বলা যায় না। **দ্বিতীয়তঃ** পাহাড়পুরে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র থাকুক বা না থাকুক সমুদ্র উপকুল ব্যবসায় কেন্দ্রস্থল হতে এই মুদ্রা আভ্যন্তরীন জন সমাবেশে নীত হওয়া অসম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ খ্রিস্ট্রীয় অষ্টম নবম শতাব্দীতে কোন মুসলমান সাধক ও ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন কিনা বা আসা সম্ভব কিনা তা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ এবং **চতুর্থতঃ** এইটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে পাহাড় পুরের মুদ্রাটি ধ্বংশ স্তুপের মাটির উপরিভাগে আবিস্কৃত হয়, খনন কৃত বৌদ্ধ বিহারের কোন নিম্নস্তরে পাওয়া যায় নি। সহজেই বুঝা যায় মুদ্রাটি বৌদ্ধকীর্তি ধ্বংসের পরেই পাহাড় পুরে নেওয়া হয়। মুদ্রাটি বাংলাদেশে কিভাবে প্রবেশ করে। তা সঠিক ভাবে জানার উপায় নেই; কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও এ মুদ্রাটি তেমন সাহায্য করে না।

আরব বনিকগণ ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সাথে তাদের উপর অর্পিত ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব ও পালন করে যেতেন। আর এ কাজকে তারা নিজেদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন। রংপুর জেলার গদ গ্রামে একটি ফার্সী শিলা লিপি আবিস্কৃত হয়েছে যা থেকে উত্তর বাংলার মুসলমান বসতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮৪] তবে ড. আব্দুল করিম বলেন শিলালিপির নির্ভুল পাঠ থেকে জানা যায় যে, 'প্রকৃত পক্ষে এটি মোঘল আমলের শেষে দিকের। ফলে ঐ প্রাচীন যুগের অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে রংপুর মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল বা উত্তর বাংলায় মুসলমানদের কোন বড় বসতি ছিল এ সকল প্রত্মতাত্মিক সাক্ষ্য একথা প্রমাণ করেনা।[৮৫]

খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে বড় ধরণের কোন মুসলিম বসতি রংপুর ছিলনা, প্রাসঙ্গিক কারণে এ মতব্য মেনে নেয়া যায় না। কারণ রংপুর শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ১৯৮৬ সালে লাল মনির হাট সদর থানার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে রামদস মৌজার মজদের আড়া নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ৬৯ হিজরীতে পাওয়া গেছে। যেটি এ যাবত প্রাপ্ত বাংলাদেশে ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। নানা রকম ফুল, নকশা-

---

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ- ১১, ১২
৮৩. আব্দুল করিম,বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল (ঢাকা জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৯, ৪সং), পৃ- ৬২)।
৮৪. মেহরাব আলী, একশত তেইশ হিজরীর শিলালিপি (দিনাজপুর যাদুঘর সিরিজ নং- ৪) পৃ-৬
৮৫. A. Karim, Social History of the Muslim in Bengla (Chittagon 1985) p, 27.

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ ধরণের ইটগুলোতে রয়েছে এবং আরবী অক্ষরে কালিমা তায়্যিবা সহ ৬৯ হিজরী সন লেখা রয়েছে। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে এই মসজিদকে কেন্দ্র করে এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠেছিল। আর ঐ ঐলাকাটি মজদের আড়া নামে সুপরিচিত। ধারণা করা হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে উত্তর বাংলা তথা রংপুর মুসলমানদের শাসনাধীনে না আসলেও মুসলমানদের বড় একটা বসতি গড়ে উঠেছিল তাতে কোন সংশয় নেই।[৮৭]

আরাকান রাজ বংশীয় উপাখ্যান 'রাদজা তুয়ে' বর্ণিত কাহিনী 'চট্টগ্রামে ইসলাম নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ড. আবদুল করিম এভাবে উল্লেখ করেছেন। এই সময়ের শেষ ভাগে কান-রা-দজা-গীর বংশধর মহত ইঙ্গত চন্দয়ত সিংহাসনে আরোহন করেন। এই রাজা ২২ বৎসর রাজত্ব করার পর মারা যান। কথিত আছে যে, তাঁর সময়ে (৭৮৮-৮১০ খ্রি.) কয়েকটি কু-ল বিদেশী জাহাজ রনবী দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে এবং জাহাজের মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠানো হয়। সেখানেতারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।[৮৮]

আরাকানের 'রনভী' (আধুনিক ব্যানরী) দ্বীপের আরবীয় মুসলিম বনিকদের জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনার সাথে প্রাপ্ত এ মুদ্রাগুলোর সম্পৃক্ততা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে, সেগুলোতে মুদ্রাগুলো উল্লেখিত সময়ে (৭৮৮ঈ.) বাংলায় নীত হয়েছিল। ৭৮৮ থেকে ৮১০ ঈসায়ীর মধ্যে বণভী দ্বীপে জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনাটি ও ঘটে। আরব বনিকদল সম্ভবত বাংলার বৃহত্তম নদী গঙ্গার উপকুল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন এবং তাদের দ্বারাই এ মুদ্রাটি পাহাড়পুরের সোম পুর বৌদ্ধবিহারে আমদানি হয়।

শুধুমাত্র ব্যবসা বাণিজ্য করাই আরব বণিকদের লক্ষ্য ছিল না। একই সাথে তাঁরা নিজেদের উপর অর্পিত ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যেতেন এবং তারা নিজেদের ধর্মীয় ও মানবিক একাজগুলোকে কর্তব্য বলে মনে করতেন। সুতরাং প্রাপ্ত মুদ্রা সম্বন্ধে ড. হকের মন্ত ব্যকে একেবারে অমূলক বলে অবজ্ঞা করা যায় না। আরাকানী ঘটনা পঞ্জি হতে অবগত হওয়া যায় যে, ৯৫৩ ঈসায়ী আরাকানের রাজা সুলতান ইঙ্গ চন্দয়স সুরতন বিজয়ে বের হন এবং সে দেশে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন্ রাজার উক্তি অনুসারে তার নাম হয চেত্ত গৌং অর্থাৎ যুদ্ধ করা অনুচিত।[৮৯]

এ সময় আরাকান রাজ কার বা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অনুচিত মনে করেছিলেন? মুসলমানদের সঙ্গে তখন চট্টগ্রামে কি আরবীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? আরবদের প্রভাব প্রতিপত্তি আরাকান রাজ্যের জন্য কি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

এসব সম্ভাবনা কাল্পনিক বলে মনে করা যায় না। সেজন্য কোন কোন পন্ডিত মনে করেন সুরতন শব্দ ''সুলতান'' শব্দের আরাকানী রূপ আর তদনুযায়ী তারা বলেন, তৎকালীন সময়ে চট্টগ্রামের মুসলমানেরা একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিল।[৯০]

---

৮৬. দৈনিক বাংলা (২০ এপ্রিল ১৯৮৬), পৃ-৪
৮৭. জয়নুল আবেদীন মোঃ ও বেগম আফরোজা, মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা- ৮১, ফেব্রুয়ারী- ২০০৫) পৃ- ১৭১।
৮৮. জার্নাল অবদি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৪৪, পৃ- ৩৬। আব্দুল করিম, ড. চট্টগ্রামে ইসলাম (সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা সেপ্টেম্বর ১৯৭০) পৃ, ১৬
৮৯. J.A.S.B 1844, p 36
৯০. A. Haque and A Karim Arakan Rajsabhaya Bangla Sailya (Bangali Literature in the Arakan court) Calcutta. 1935 p, 34.

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে ড. আব্দুল করিম একমত হতে পারেন নি। তিনি বলেছেন চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরবের মুসলমান বনিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমানরা আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিল বলা তা অতিরঞ্জন বৈ কিছু নয়। একটি মাত্র শব্দ 'সুরতন' যার অর্থ পরিস্কার নয়, তার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত আরাকান বংশাবলী পড়ে মনের হয় 'সুরতন' শব্দটি সুলতান এর বিকৃত রূপ নয়।

বরং ইহা অধুনা লুপ্ত কোন এক স্থানের নাম বহন করে।[৯১] গঙ্গার মোহনার সন্নিকটে চট্টগ্রাম বন্দর অবস্থিত ছিল। গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলে এর (চট্টগ্রাম) অবস্থানের দরুন আরব বনিকগন চট্টগ্রামের নাম দিয়ে ছিলেন 'শাতী আল গঙ্গ' (ব- দীপ বা গঙ্গার উপকূল) যা কালক্রমে চাটগাঁও-চট্টগ্রাম নামে রূপান্তরিত হয়।[৯২] গঙ্গার মোহনায় উপকুল ভাগে অবস্থিত থাকায়, এটা ছিল খুব সুবিধাজনক বন্দর। এই বন্দরকে আরব বনিকগণ তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের একটি বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত করে। এদেশের মূল্যবান পন্য দ্রব্যের নিয়মিত সরবারাহ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে চট্টগ্রামে তাদের নিজেদের কিছু লোক অবস্থান করে। এই বনিকদল শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও সম্পদ শালী হওয়ায় বন্দর শহরটি প্রভাবশালী হয়ে উঠে। বিদেশে নিশ্চয়ই একজন দলপতির অধিনে আরব বনিকগন দলবদ্ধভাবে বাস করতো। এ আরব দলপতি ছিল 'থুরাতন'।

আরাকান রাজ 'সুলাতায়িং' স্যান দ্যায়া (৯৫১-৫৭ খি.) তার অভিযানে একেই পরাজিত করেন বলে দাবী করেন। ড. এনামুল হকের 'থুরাতন' শব্দটির সুলতান হিসেবে পাঠ কল্পনা প্রসুত বলে (উড়িয়ে) দেয়া যায় না।[৯৩]

আরব বনিকদের এ প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে ও তাদের প্রভাব এখনো পরিলক্ষিত হয। যেমন চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার ও আরবী ভাষায় ব্যবহারের ফল। একাধিক কদম রাসুলের অস্তিত্ব চট্টগ্রামে দেখা যায়। [৯৪]

এছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন আলকরন সুলক বহর (সুলকুল বহর) বাকালিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে।[৯৫] এসবই চট্টগ্রাম তথা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বনিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। আরবী বনিকদের চট্টগ্রামে বিশেষ করে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগর ছিল তাদের সমুদ্র পথে পূর্বদিকে যাতায়াতের একমাত্র পথ। এদেশ থেকে আরব বনিকদের মাধ্যমে মসলা,সূতি, রেশমী বস্ত্র, হাতির দাঁত, নানাবিধ রত্ন, এসব সামগ্রী চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানী হতো।[৯৬]

---

৯১. বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ-৫৫
৯২. Bernavilli suggests theat the name chittagonj originated from the Arabs. S.N.H Rezvi (ed).
৯৩. Social cultural history of bengal p. 43-44
৯৪. যেমন চট্টগ্রাম শহরের কদম মোবারক, শেখ ফরিদের চশমা, পটিয়া থানার বাগিচার মসজিদ এবং বাশখালী থানার কদমরচুল আব্দুল করিম, পৃ- ৭৯
৯৫. বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ-৫৯
৯৬. বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ- ৫২

সমগ্র আরবে তখন ইসলামের আবির্ভাব একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেজন্য বনিকদের মাধ্যমে এমন একটা সাড়া জাগানো সংবাদ বিদেশের মাটিতে অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকুলী অঞ্চলে আরবীয় উপনিবেশগুলোতে পৌঁছেছে তা সহজে অনুমেয়। বুযুর্গ ইবন সাহারিয়ার মতে, আরবদেশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে সারন্দীপ বাসীরা রাসুল (সা.) এর কাছে দূত পাঠান। কিন্তু হযরত ওমরের খেলাফত কালে এ দূত মদিনায় পৌঁছান। হযরত ওমর (রা.) এর সঙ্গেই সে দূতের সাক্ষাত হয়। ইসলাম, ইসলামের নবী (সা.) এবং সাহাবীদের সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ঐ দূত বেলুচিস্তানের নিকট মাকরান নামক অঞ্চলে ইহধাম ত্যাগ করেন। তার হিন্দু সঙ্গী সরন্দীপ পৌঁছে তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। বিস্তারিত জেনে মানুষের মাঝে ইসলাম সম্বন্ধে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফিরিস্তার মতে, ঐ সময় রাজা ইসলাম গ্রহণ করে।[৯৭]

এ ঘটনার মূলে কতটুকু সত্য নিহিত রয়েছে তা বলা দুস্কর। সত্য মিথ্যা ঘটনার মূলে যাই থাক না কেন তবে এটা নিশ্চিত যে, এ সকল ঘটনা থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন ছিলনা। কারণ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের মতই বাংলাদেশের সাথে আরবদের প্রাচীন কাল থেকেই সম্পর্ক ছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতেই আরবীয় বনিকদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। রিচার্ড সায়মন্ড স্বীয় ভাষায়- 'The culture that now developed in Bengal was entirely different from that of the Hindus. The ports of this country, especially chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the 7th century A.D. and many of the Arab Voyagers and traders had left a permanent eimpress upon the area. Islam, therefore took root very easily in this receptive soil, and the resultant calture was greatly influenced by that of Islamic countires'.[৯৮]

অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব বনিক ও ব্যবসায়ীগন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের উপকুলীয় অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হন। অতঃপর অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বনিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। আরব বনিকদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে ছিল ব্যবসা বানিজ্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তারা বানিজ্যের সাথে সাথে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে নবীর সুন্নাহ বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। আর বনিকগন মনে করেছিলেন যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ইসলাম প্রচার করতে পারলে অপরাপর অঞ্চলে তা আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়বে।

এরূপ যখন পরিস্থিতি তখন দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তদসংলগ্ন অঞ্চলে আরবী বনিকদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে স্থানীয় কিছু লোকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর দরবেশ ও সুফী সাধক ইসলাম ধর্মপ্রচার কল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[৯৯]

---

৯৭. Nizami K.A. (DR M. Zaki (ed) Arabd Account of India (During the fourteenth century. Idarah -1 Adabiyat-I- Aligarh- Delli, 1981, p- 5

৯৮. Richard symonds. The making of pakistan (Allies book corporation. Karachi 1966), p- 197

৯৯. মুহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম, পৃ- ১৬-২০

Dhaka University Institutional Repository

(২) আরবের ভৌগলিক বিবরণঃ (Geographical description of Arab):

আরব মুসলিম ভৌগলিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মুসলমান আরব বনিকদের বাণিজ্য পথ কিংবা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন এদের মধ্যে সর্বাগ্রে সুলায়মানের নাম উল্লেখযোগ্য। সিলসিলাতুত তাওয়ারিখ গ্রন্থ ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়।[১০০] এ বিষয়ে সুলায়মানের পর আরও কয়েকজন ভৌগলিক বিবরণ দেন। কিন্তু সকলেই সুলায়মানের 'সিলসিলাতুত তাওয়ারিখের' উপর নির্ভরশীল। ইবনে খুরদাদ বিহ (মৃঃ ৯১২খৃঃ) তাঁর 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে সর্ব প্রথম আরবদেশ থেকে চীন দেশ পর্যন্ত মুসলমান বনিকদের বাণিজ্য পথের বর্ণনা দেন। তাছাড়া আল মাসুদী (মৃঃ ৯৫৬ খ্রিঃ) এবং আল ইদ্রিছী জন্ম একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে) প্রমুখ।

ভৌগলিকবিদগন ইবনে খুরদাদ বিহকে অনুসরণ করে আরব বনিকদের বাণিজ্য পথের বিবরণ দেন।[১০১] তাদের বিবরণ মতে আরাকান থেকে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী বিকীর্ণ অঞ্চলটি খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে আরব বনিকদের কর্মতৎপরতায় সরগরম হয়ে উঠেছিল।

এসকল আরব ভৌগলিক এবং বনিকগন তাদের বিবরণে এমন একটি দেশ ও বন্দরের নাম বর্ণনা করেছেন যে, দেশকে বাংলাদেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, আর বাংলাদেশের উপকুল বন্দরকে একটি সমুদ্র বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বন্দর সম্পর্কে সর্ব প্রথম আলোচনা করা যাক। পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ সমূহের সাথে আরব মুসলিম বনিকগণ সমুদ্র পথে বাণিজ্য করতে এবং তারা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের যাত্রাপথে আসতো। তারা তাদের পন্যের বেচাকেনা করতো বাংলাদেশের বন্দরে।

এখান হতে শ্যাম (থাইল্যান্ড) হয়ে চীন দেশে পৌঁছত। আরব দেশ হতে চীন পর্যন্ত সমুদ্র উপকুলবর্তী ব্যবসায়িক স্থান গুলোর নাম করন করেছেন আরব ভৌগলিক গন। তাদের দেওয়া বর্ণনা থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, আরব বনিকরা তাদের প্রাচ্য যাত্রার সমন্দর, ওরনা, সীন বা বোসাঙ্গ, আবিনা বা বার্মা পরিদর্শন করে। এখানে সমন্দর নামটি উল্লেখযোগ্য। আরব ভূগোল বিদের প্রদত্ত সমন্দরের বর্ণনা আলোকপাত করলে জানা যায় যে, এটা বাংলার উপকূল অঞ্চলের একটি বন্দর ছিল। ইবনে খুরদাদবিহ (মৃ. ৯১২ খ্রি.) লিখেছেন সমন্দর চাউল উৎপাদন করে এবং 'কামরুপ' ও অন্যান্য থেকে ১৫ ও ২০ দিনের পথে এস্থানে ঘৃত কুমারী কাঠ আমদানী করা হয়।[১০২]

সমন্দর সম্বন্ধে আরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তিনি বলেন, সমন্দর একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান, বাণিজ্য কেন্দ্র ও একটি বড় শহর। এ স্থানে (ব্যবসা বাণিজ্যে) প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। কনৌজের অধীনে এ বন্দরটি। এটি এমন এক নদীর তীরে অবস্থিত কিংবা কাশ্মীর থেকে উৎপন্ন। এখানে চাউল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তথা গম পাওয়া যায়। পনের দিনের ব্যবধানে অবস্থিত কামরুপ থেকে এখানে চন্দ কাট এমন নদী পথে আনয়ন করা হয়, যার পানি সুমিষ্ট।

---

১০০. H.M. Sir, Ellial and John Dowson Professor, The History of India as toldby its own Historians Vol.1, Kitab Mahal Alluhabad, 1964, p-2

১০১. আমীরুল ইসলাম, সৈয়দ বাংলাদেশ ও ইসলাম ১ম খন্ড ঢাকা, ১৩৯৪ পৃ.- ২৪

১০২. S. Muhammad Hussayn nainar Arab Geographer's knowledge of Soulthern India, University of Madras. 1942, p-89

Dhaka University Institutional Repository

উৎকৃষ্টতর চন্দ কাঠ এদেশের যার ঘ্রান মনোরম। কারণ, পর্বতমালার এ শহরে একদিনের ব্যবধানে একটি দ্বীপ রয়েছে যাতে অনেক লোক বসবাস করে এবং সেখানে সমগ্র দেশের ব্যবসায়ীরা যথারীতি যাতায়াত করে সিংহল দ্বীপটি চারদিনের দুরত্বে অবস্থিত। কাশ্মীর নগরীসমন্দর থেকে সাত দিনের ব্যবধানে অবস্থিত। এ নগরী ভারতের সর্বত্র সমাদৃত এবং এটি কনৌজ রাজার আয়ত্ত্বাধীন কাশ্মীর থেকে কামরূপ চারদিনের ব্যবধান এবং কাশ্মীর থেকে কনৌজ সাত দিনের ব্যবধানে অবস্থিত।

এখানে সমন্দর বলা হয়েছে মিঠা পানিকে। এ সমন্দরই শুধু মাত্র স্থান যাকে বাংলার কোন উপকূলীয় স্থানের সাথে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে। এ প্রসংগে A.H. Dani বলেছেন 'আরব ভৌগলিকদের সমন্দর ছিল বাঙলার উপকূলীয় কোন স্থানে অবস্থিত। খুব সম্ভব মেঘনা মোহনায় অবস্থিত।

তাই বহু যুক্তি প্রমাণ দিয়ে ড. এম.এ রহিম প্রমাণ করে বলেন যে, আরব দেশিয় এ ভূগোল বিদ দ্বয়ের (আল ইদ্রিছ ও ইবনে খুরদাদবিহ) মতে 'কামরুত' বা 'কামরুন' অঞ্চল হতে নদী পথে সমুদ্র বন্দর ছিল ১৫ হতে ২০ দিনের পথ। এ স্থানকে আল ইদ্রিছ কামরুত এবং খুরদাদবিহ 'কামরুন' নামে অভিহিত করেন। তবে তাদের উভয়ের আলোচনার মধ্যে মিল রয়েছে যে, এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী যোগ্য ঘৃত কুমারী কাঠ উৎপাদন করে। 'কামরুত' ও 'কামরুন' শব্দদ্বয় কামরুপেরই অপভ্রংশ। আরব দেশিয় ভূগোল বিদগন কামরুপের বর্ণনা বুঝিয়েছেন।

অদ্যাবধি কামরুপে প্রচুর পরিমানে ঘৃত কুমারী কাঠ উদগত হয়। এ নাম ও উৎপাদনের সাদৃশ্য হতে প্রমাণ হয় যে, আরব ভুগোলবিদদের কামরুত বা কামরুন কামরুপ ব্যতিরেকে আর ভিন্ন কোন স্থান নয়। কামরুপ বাংলার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মাধ্যমে সমুদ্র ও সমুদ্র বন্দর গুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল। কামরুপ বাংলার উত্তরে অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ স্থল বিশিষ্ট দেশ। বাংলার বন্দর গুলো ছাড়া সমুদ্রে প্রবেশের ভিন্ন কোন পথ নেই।

সুতরাং মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মাঝ দিয়ে সমুদ্র বন্দরের মুখেনীত না হলে কামরূপের পক্ষে ঘৃত কুমারী কাঠ রপ্তানী করা সম্ভব ছিল না। এ পথে যাতায়তে প্রায় ১৫ হতে ২০ দিন সময় নিত। এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, যদি ঘৃত কুমারী কাঠ রপ্তানী করা হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই ব্রহ্মপুত্র মেঘনার মোহনায় অবস্থিত কোন বন্দর থেকেই হয়ে থাকবে। আরব দেশীয় ভুগোল বিদগন লিখেছেন যে, সমন্দর সাগর উপকুলের প্রবেশ পানে একটি বড় নদীর তীরে অবস্থিত এবং তা মুসালা নামক অপর একটি নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তৎকালে ব্রহ্মপুত্র কামরুপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সোনারগায়ের দক্ষিণেমেঘনার সহিত মিলিত হতো সন্দীপের সন্নিকটে এই সমস্ত নদীগুলোর মোহনায় বিখ্যাত সমন্দর বন্দর অবিস্থত ছিল।[১০৩] আরব ভূগোল বিদগন এদেশেকে 'রাহমী' বা রুহমী নামে আখ্যায়িত করতেন ইবনে খুদাদবিহ বলেন যে, রাহমীরাজ্য অবস্থিত ছিল সমুদ্র তীরে এবং রাহমী ও অন্যান্য রাজ্যের মাঝে তখন যাতায়াত করত জাহাজ যোগে।[১০৪]

১০৩. Social and cultural history of Bengal P-39

১০৪. ইবনে খুরদাদবিহ কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক মৃ. ৩৫০ হি, পৃ- ১৬, উদ্ধৃত : এম.এ রহিম, পুর্বোক্ত পৃ- ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

এটি কানান রাজ্য (কামরূপ) নামে অভিহিত একটি দ্বীপ রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[১০৫] সুলায়মানের বর্ণনা নিম্নে প্রনিধানযোগ্য রুহমী নামক একটি রাজ্যের সীমান্তে এ তিনটি রাজ্য (জুর্জ, বলহার ও তফক) অবস্থিত। যা (রুহমী) জুর্জ রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। রাজা খুব সমাদৃত নয়। জুজের সাথে তিনি যেমন যুদ্ধে লিপ্ত তেমনিই বলাহার সাথেও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত। জুর্জ বলহার ও তাফকের চেয়ে তার অনেক বেশি সৈন্য সামন্ত আছে। কথিত আছে যে, যখন তিনি যুদ্ধে যাত্রা করেন তার অনুবর্তী হয় ৫০ হাজার হাতী।

তাঁর দেশে এমন এক রকম বস্ত্র তৈরী হয় যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এবস্ত্র এতই সুক্ষ্ম ও মিহি যে এর দ্বারা তৈরী একটা পোশাক একটা আঙ্গুরীর ভেতর অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যায়। একাপড় সুতার তৈরী এবং আমরা এর একখন্ড দেখেছি। এদেশে কড়ির মাধ্যমে ব্যবসা চলে এবং কড়িই তার প্রচলিত মুদ্রা । তাদের সোনা, রুপা এবং চন্দন কাঠ আছে এবং সামরা (সোমারস) নামক একটি জিনিস আছে যার দ্বারা মাদাব (মাকার) তৈরী হয়। এ স্থানে রুহমী রাজ্য মূলত পাল বংশের অন্যতম রাজা ধর্মপালের (৭৭০-৮১০খ্রি.) রাজ্য রূপে নির্দেশ করা যায়।[১০৬]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক হাদিওয়ালাই সর্ব প্রথম প্রমাণ করে বলেছেন যে, 'ধরহমী' শাদ ভূলবশত রুহমী লেখা হয় এবং রুহমী রাজ্য পাল বংশীয় রাজা ধর্মপালের রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।[১০৭] আর এ রাজ্য চট্টগ্রাম এলাকায় অবস্থিত।[১০৮]

রুহমী রাজ্যের অবস্থান যেখানেই হউকনা কেন 'রুহমী' সম্পর্কীয় আরব ভৌগলিকদের বিবরণ যে বাংলাদেশের বেলায় প্রযোজ্য সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই। হাতি, অত্যন্ত মিহি ও সুক্ষসূতি কাপড় (যা মসলিনের সঙ্গে অভিন্ন) গন্ডার ও ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে কড়ি প্রচলন ইত্যাদি সকল সূত্রই বাংলাদেশের দিকে নির্দেশ করে। পরবর্তী পর্যটক এবং ঐতিহাসিকদের বিবরণ যেমন ইবনে বতুতার সফর নামা।

মিনহাজ ই সিরাজের তাবকাত ই নাসিরি এবং টমাস বাউটার বঙ্গোপসাগরের উপকুলবর্তী (Countries round the Bayof Bengal) দেশ সমূহের বর্ণনায় বাংলাদেশের অনুরূপ চিত্র ফুটে উঠে।[১০৯]

আরব বনিকগণ বিদেশ ভ্রমনে সপরিবারে বের হতেন না। তারা সুদীর্ঘ ভ্রমনে এমন কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করতেন এবং সংশ্লিষ্ট দেশের মহিলাদের বিয়ে করতেন স্বাভাবিক চাহিদানুযায়ী। অনুমান করা হচ্ছে যে, বহু স্থানীয় মহিলা এভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। ইবনে বতুতার সফরনামায় বিরণ দিয়েছেন যে, তিনি বাংলার ও ইন্দোনেশিয়ার কলোনী আরাকানে দেখেন্ তিনি তখন মালদ্বীপে এক বাঙালী মুসলিম রাজবংশের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন 'পরমাশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই দ্বীপ পুঞ্জের (মালদ্বীপ) বাদশাহ হচ্ছেন খাদিজা নাম্নী জনৈক মহিলা। তিনি সুলতান জালাল উদ্দিন উমর ইবনে সুলতান সালাহ উদ্দিন সালেহ বাঙালীর কন্যা। তাঁর দাদা বাদশাহ ছিলেন অতঃপর তার পিতা বাদশাহ হন।[১১০]

---

১০৫. মাসউদী মুরুজুয যহব, মৃ. ৩৪৬হি. পৃ- ৩২ হতে উদ্ধৃত এম.এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪।
১০৬. Majumdar R.C. (ed) The History of Bengal Vol. 1, The University of Decca, 1963. p- 176.
১০৭. Hadivala S. Stadied in indo Muslim History Bombay, 1939, p- 4
১০৮. বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ- ৫৪
১০৯. বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ- ৫৪
১১০. আজায়িবুল আসফার পৃ- ৩২১।

পূর্ববঙ্গের মুসলিম আধিপত্যের ক্রমবর্ধমানতা বাংলা সাহিত্যে ও ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। এ আধিপত্য এত বৃদ্ধি পায় যে, মুসলমানদের সাথে সংমিশ্রনের ভয়ে পূর্ববঙ্গের ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করে বহু কুলীন ব্রাহ্মন পশ্চিম বঙ্গে গাঙ্গেয় এলাকায় বসতি স্থাপন করে। বাংলা ভাষায় রচিত রামায়ন কাব্যের লেখক চতুর্দশ শতকের কবি কৃত্তিবাস ও তার মতে, এক ভয়ঙ্কর ভীতি ব্রাহ্মন্যদের উৎকন্ঠীত করে তোলে, এর ফলে পূর্ব বাংলায় তারা সুখের জীবন পরিত্যাগ পূর্বক চলে আসে। কবি আরও বলেন যে, তার পূর্ব পুরুষ নারসিংহ ওঝা, তিনি দনুজামর্দন দেবের (সুলতান বলবনের সময়ে সোনার গায়ের একজন জমিদার) একজন সভাসদ ছিলেন, তিনিও পূর্ব বাংলা পরিত্যাগ কারী ব্রাহ্মনদের একজন ছিলেন।[১১১] এতে করে প্রতিয়মান হয় যে, মুসলিম বিজয়ের বহু আগেই পূর্ব বঙ্গে ইসলামের অগ্রগতি হয়েছিল।

(৩) কিংবদন্তি ভিত্তিক প্রমাণঃ (Evidence on the basis of tradition):

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন সুফী সাধকদের জীবন সম্বন্ধে বিকীর্ণভাবে প্রচলিত কাহিনী ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে কোন কোন পন্ডিত অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বহু বিজয়ের বহু আগেই এসব দরবেশ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এসকল কাহিনীতে সুফী সাধকদের অনুশীলিত কারামতি বা অতি মানবীয় ব্যক্তিকে প্রাধন্য দেয়া হয়েছে যুক্তি সংগত কারণেই আধুনিক পন্ডিতদের নিকট এসকল রহস্যময় কাহিনীগুলো গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তবে বর্তমানেও এসকল সুফী দরবেশের মাযার শরীফের সাড়ম্বর উপস্থিতি ও জনসাধারণের বিশ্বাসের গভীরতা দিয়ে এটা নিশ্চিত বলা যায় যে, বিভিন্ন সুফী সাধকগন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

এ পর্যন্ত মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা এ সম্পর্কিত আভাস ইঙ্গিত ও অনুমান ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু এতটুকুতে সন্তুষ্ট ছাড়া আর গত্যন্তর ও নেই। তবে পাক ভারত অভিমুখে মুসলমানদের অভিযান মুহাম্মদ বিন কাসিম থেকে শুরু হয়নি। খলিফা ওমর (রা.) এর যুগ হতেই এর সূচনা হয়েছিল। আরব বনিক, নাবিক ও ধর্ম প্রচারকগণ দ্বারা বাংলাদেশেও ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। কারণ ভারতে আরব মুসলিমানদের অভিযানের কারণগুলোর মধ্যে ধর্ম প্রচারের বিষয়টি ছিল অগ্রগণ্য; কাজেই দেখা যায় খ্রিষ্টীয় ৭ম হতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামের প্রত্যেক্ষ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা কিভাবে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন তার সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ এখনো জানা যায় না। এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও একাদশ শতকের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে ও পরে যে সকল সুফী দরবেশ বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে এসেছিলেন বলে কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি রয়েছে তাদের কয়েকজন হলেন নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

(১) বাব আদম শহীদ (রহ.) বিক্রমপুরের রাজা বল্লাল সেনের সময়ে (১১৫৮-১১৭৯ ঈ.) আগমন।

(২) শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী ৪৪৫ হিজরী মোতাবেক ১০৫৩ ঈসায়ী আগমন।

(৩) শাহ মাখদুম রূপোস আগমন রাজশাহী জেলা (১২৮৮ঈ. ১৩৩০ রাজশাহীর দরগা পাড়ায় ইন্তেকাল।

(৪) শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (Shah Niamatullah Buttsikon.

(৫) শাহ সুলতান মাহী সওয়ার (Shah SultanMahisowar)

(৬) মাখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ (Maksdum Shah Daulah Shahid)

(৭) হযরত বায়েজিদ বিস্তামী (মৃ. ৮৭৪ খ্রীঃ) Hazrat Bayzid Mustami)

(৮) শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিজি (মৃ. ১২২৫ ঈ.)

(৯) শায়খ শরফুদ্দিন আবুতাওয়ামা (মৃ. ১৩০ ঈ.)

(১০) হযরত শাহজালাল (রহ.) (মৃ. ১৩৪৭ ঈ.) প্রমুখ।

ইসলাম প্রচারে তাঁরা ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জবিন যাপনে অভ্যস্থ। ইসলাম প্রচার কার্যে তাদের একনিষ্টতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই জাতি, বর্ণ ও ধর্মভেদ জর্জরিত এদেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনসমাজের সম্মুখে নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ক্রমে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আলো। এতে নীরব ইসলাম প্রচারের জন্য গড়ে উঠে এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। [১১২]

এস.এম. তাইফুর বলেছেন-

Another equally important factor which led to the increase of Muslim population was the missionary and proselytising zeal of the great sufis who preached the principles of Islam. In fact, the missionary activities were first started by Arab navigators and merchants long before the conquest of Bengal by Bukhtiyor khalgi. The sufis came from the west rorcling perilous journeys and sacrificing everything dear precious in life only to raise the degraded Hindus of Bengal to the high standard of Islamic civilization. The masses of Bengal were then groaning under the heels of the hexahedron Brahmin oligarchy who used them as helots and outcastes and denied even the elementary rights as human leings.[১১৩]

---

১১১. কৃত্তিবাস রামায়ন ভূমিকা (আত্মকথা) কলিকাতা ১৯২৬, পৃ-২)

১১২. দীন মুহাম্মদ কাজী, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশঃ কিছু ভাবনা (অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ইফাবা, ১৯৮৯) পৃ- ৫।

১১৩. Taifoor S.M. Glimpses of old dacca, Dacca 1956. introduction. p-9

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচারের বিভিন্ন পর্যায়

আলিম, মুজাহিদ ও সুফীয়ায়ে কেরামের ইসলাম প্রচারঃ

এগার শতক থেকে সতের শতক পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সাতশ' বছর এদেশের ইসলামের সুবর্ণ সুযোগ। ইসলাম প্রচারের গতিধারার দিক থেকে একালকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রথম পর্যায় একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এ পর্যায় বিস্তৃত। এসময়কে এদেশের ইসলাম প্রচারের শৈশব ও কৈশোর বলতে পারি।

২. দ্বিতীয় পর্যায় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। একালকে বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের যৌবন কাল বলা যায়।

৩. তৃতীয় পর্যায় পনের ষোল ও সতের শতকে এ প্রচারের ধারা অনেকটা স্থিমিত হয়ে আসে। ইসলাম প্রচারের পথে নানা বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়কে বলা যায় ইসলাম প্রচারের স্থিমিত প্রৌঢ় কাল।

সুফি ও উলামায়ে কেরাম বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের যে ভূমিকা পালন করেন তা বিস্ময়কর। আরব, ইয়ামান, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে এ সুফী ও আলিমগণ বাংলায় আসেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনেক নিজেদের অনুচর বর্গসহ এ অজ্ঞাত ও অপরিচিত দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আবার অনেকে আবহাওয়ার প্রতিকুলতা অগ্রাহ্য করে একাকী এদেশে আসার ঝুকি নিয়েছেন। কেউবা নৌ পথে আবার কেউবা স্থল পথে ও পদব্রজে চলে এসেছেন। চৌদ্দশতকের ভূ পর্যটক ইবনে বতুতা এদিকে বাংলাদেশের খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের সস্তা মূল্য দেখে অভিভূত হয়েছেন। আবার অন্য দিকে বাংলার আবহাওয়াও তাঁকে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন- 'দেশটি ভিজা ও অন্ধকার এবং খোরাসান বাসীদের মতে এদেশ ঐশ্বর্য সম্ভার পূর্ণ জাহান্নাম।'[২]
প্রথম পর্যায়ে আলিম ও সুফীদের দল এদেশে আসেন সমুদ্র পথে। বাণিজ্য ব্যাপদেশে পূর্বাঞ্চলে গমনাগমনে তাঁদের কাছে এখান কার বন্দর গুলো পরিচিত ছিল। এসব আলিম সুফীরসংখ্যা কত ছিল তার সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারবে না। তবে এ ধরণের শতাধিক প্রচারক যে এ যুগে এদেশে এসেছিলেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁদের মধ্যে অনেকের সম্বন্ধে কিছুই শোনা যায় না। এমনকি অনেকের নাম ও জানার উপায় নেই; মূলত তারা নিষ্টা ও আন্তরিকতার শীর্ষে ইসলাম প্রচারকে মহান ব্রত হিসেবে নিজেকে প্রচার বিমুখ রেখেছেন। কিছু সংখ্যক প্রচারক সম্বন্ধে সামান্য বিবৃতি ও কিংবদন্তির মাধ্যমে জানা যায় মাত্র।
প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও শাসকরা অনেকেই সহজে এদের আগমন ও ধর্ম প্রচার মেনে নিতে পারেন নি। তাই তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা এবং নির্যাতন

Dhaka University Institutional Repository

চালানো হতো। সে কারণে তাদের সঙ্গে তাদের অনেক সময় যুদ্ধও করতে হয়েছে। যুদ্ধে অনেকে শহীদ হয়েছেন।

আবার অনেকে তাদের জীবন, চরিত্র, কর্ম ও চিন্তা ধারার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিপুল সংখ্যক জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সুধী ও দরবেশগণ অনেক সময় অলৌকিক কারামত দেখিয়ে ও লোকদের মুগ্ধ ও অনুগত করেছেন। বস্তুত ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ তাওহীদ ও রিছালতের ভিত্তিতে ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই পৌত্তলিক আদর্শহীন নরপূজা ও অবতারবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ও জয়লাভে সমর্থ হয়েছেন। ইসলামের উদার সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নীতির বলেই ব্রাম্মন্যবাদের অস্পৃশ্যতা, বর্নবাদ ও সাম্প্রদায়িক কূপমন্ডতা থেকে উদ্ধার করে এক জমায়াতে একই শ্রেণীভুক্ত সকল মুসলিমকে একও অদ্বিতীয় সাম্যের আদর্শ পতাকাতলে সমবেত হতে সহায়তা করেছে।[১১৪]

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার (৭০১-১২০০ ঈ.)

খ্রিষ্টিয় ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না তবে এতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এদেশে ইতোপূর্বে ইসলামের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে দিনে দিনে তা কেবল বৃক্ষে পরিণত হয়ে ডালপালা ছড়াতে থাকে যাকে ইসলাম প্রচারের শৈশব ও কৈশোর কাল বলা যেতে পারে।

৭১২ ঈসায়ী মুহাম্মদ ইবনে কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজিত হলে উক্ত বিজয়ের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে। এতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করার শক্তি ও সাহস লাভ করে।

এই বিজয়ের বহু পূর্বেই বাংলাদেশে অনেক মসজিদ মাদরাসা গড়ে উঠে। এই বিজয়ের অন্তত ২৪ বছর পূর্বে ৬৯হিঃ / ৬৮৮-৬৮৯ ঈ. বাংলাদেশ অঞ্চলে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঐতিহাসিক প্রমান পাওয়া যায়। উক্ত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ লাল মনির হাটের মজদেরআড়া গ্রামে মজদের আড়া অর্থ হচ্ছে মসজিদের ঘাটি। সম্ভবত এই মসজিদটিকে ঘাটি করে ইসলাম প্রচারকদের প্রচেষ্টা ভারত বর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা ও শাসকগণ ইসলাম প্রচারের আহবান জানিয়ে পত্র লিখেছেন বলে জানা যায়। এ বিষয়ে বাংলাদেশে মুসলমান দের আগমন অধ্যায়ে বিস্তাতির আলোচনা করা হয়েছে।

একাদশ শতাব্দীতে অনেক সুফী দরবেশ এদেশে ইসলাম প্রচার করতে এসেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মাহী সওয়ার (রহ.) শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (রহ.) ও বাবা আদম শহীদ (রহ.) মীর সৈয়দ সুলতান মাহি সওয়ার বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকায় ইসলাম প্রচারে আসেন। ৪৩৯ হিঃ / ১০৪৭ ঈসায়ী। তিনি ছিলেন তাতারিস্তানের বলখ রাজ্যের আমীরের সন্তান। বাংলাদেশে তার আগমন হয় নদী পথে। তিনি প্রথমে সন্দীপ এসে উঠেন। তার পর তিনি ইসলামের প্রচার চালান ঢাকার হরিরাম পুরে।

---

১১৪. আমাদের সুফিয়ায়ে কেরাম, পৃ- ৩৮, ৩৯, ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষ তার প্রচার ক্ষেত্র বগুড়া। এখানে তিনি রাজা পরশুরামকে পরাজিত করে ইসলামের আলো প্রজ্জলিত করেন। মহাস্থানগড়ে তার মাজার বিদ্যমান। প্রবল ধারণা করা হয় এই মহান ওলী 'শাহ সুলতান বলখী' (রহ.) নামে পরিচিত।

শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (রহ.) বলখ রাজ্য হতে বাংলাদেশে আসেন ৪৪৫ হিজরী/ ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর প্রচার ক্ষেত্র ছিল ময়মন সিংহ অঞ্চল। বর্তমান নেত্রকোনার অন্তর্গত 'মদনপুরে' তার সমাধি রয়েছে। তার সঙ্গে এদেশে তার মুরশিদ ও ১২০ জন মুরিদ ও এসেছিলেন। মুরশিদের সমাধি ও তার পার্শ্বে মদন পুরে বিদ্যমান। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও অলৌকিক ক্ষমতায় এ অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটে।

ঈসায়ী দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা বল্লাল সেনের আঠার বছর রাজত্বকালে (১১৬০ ঈ. - ১১৭৮ ঈ.) বাংলাদেশে অনেক ওলী দরবেশ আসেন দ্বীন প্রচারে। এ সময় ঢাকা ও বিক্রম পুর অঞ্চলে প্রচার কার্য চালান বাবা আদম শহীদ (রহ.)। আর বগুড়া অঞ্চলে প্রচার কার্য চালান বাবা আদম (রহ.)। এ দুই ব্যক্তি অভিন্ন কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

এসময়কালে করতোয়া নদীর উপকূল এলাকায় তুরকান শাহ (রহ.) ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। উপকুলবর্তী শেরপুরে তার দরগাহ রয়েছে। বিক্রমপুরে বাবা আদম শহীদ (র.) এর সমাধি ও দরগাহ আজও বিদ্যমান।

বাগদাদের বিশিষ্ট সুফী শাহ মাখদুম রূপোশ (রহ.) বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আসেন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। তিনি এক দল শিষ্যসহ নোয়াখালীর সুনাই মুড়িতে বসতি স্থাপন করেন। নোয়াখালী ও তার আশেপাশে তিনি ইসলাম প্রসার ঘটান এবং বহু দ্বীন প্রচারক তৈরী করেন। তিনি তার অন্যতম শিষ্য সৈয়দ জকিমুদ্দিন হোসাইনি (রহ.) কে শ্যাম পুর এলাকায় স্থলাভিষিক্ত করেন। বাংলার উত্তরাঞ্চলে তুরকান শাহ (রহ.) এর শাহাদত লাভের প্রেক্ষিতে তিনি সেখানে দ্বীন প্রচারের জন্য গমন করেন। ১১৪৮ ঈসায়ী তাঁর প্রচেষ্টায় রাজশাহী ও উত্তরাঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। রাজশাহী শহরের নিকট পদ্মা নদীর উত্তর তীরে দরগাহ পাড়ায় তার সমাধি বিদ্যমান।[১১৫]

বাংলাদেশে ইসলামের বিস্তৃতি ও মুসলিম শাসন

(১২০১ ঈ. - ১৯৭১ ঈ.)

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। একালকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের যৌবনকাল বলা যায়।

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভিক কালে হযরত মাহমুদ শাহ গজনভী (রহ.) পশ্চিম বাংলার মোঙ্গলকোটে ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন। এ কাজে তাঁর সতের জন সঙ্গী তাঁকে সহায়তা করেন।

১১৫. দাখিল ইসলামের ইতিহাস, পৃ- ১৭৪, ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এসময় তকী উদ্দিন আরবী (রহ.) রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন এবং এ জেলার 'মহীসন্তোষ' এলাকায় ইসলামী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন প্রায় একই সময়ে রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালের শেষ সময়ে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযি (রহ.) জন্মভূমি তাবরিজ হতে লখনৌতির পাণ্ডুয়াতে আসেন। পাণ্ডুয়ার বহু হিন্দু তার দাওয়াতে ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি এখানে মৃত্যু বরণ করেন। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী দেওতলা নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এ সময়কালে শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুত্‌শিকান (রহ.) ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন বলে কথিত হয়।

১২০৩ ঈসায়ী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করেন এবং এদেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। রাজা লক্ষণ সেন রাজধানী নদীয়া হতে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং বিক্রম পুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইখতয়িার খলজি তার মুনিব দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দীন আইবেকের অনুকরণে এ অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, স্কুল, কলেজ ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইউওয়াজ খলজির রাজত্বকালে (১২১২ ঈ. - ১২২৭ ঈ.) বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের এক সোনালী যুগ। তিনি আলিম-উলামা, সুফি দরবেশ, আউলিয়া ও বহিরাগত মুসলিম প্রচারকদের খুবই ভক্তি করতেন ও যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

তিনি তাঁদের ভরন পোষণের জন্য বৃত্তি ও জায়গীরের ব্যবস্থা করেন। ইসলামী সমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি বহুসংখ্যক মসজিদ মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে মধ্য এশিয়া হতে অসংখ্য মুসলিম পন্ডিত এবং সুফী দরবেশ বাংলাদেশে আসেন। তিনি তাদের সাদরে গ্রহণ ও তাদের ইসলাম প্রচার কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। তাঁদের আগমনে লখনৌতি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। লখনৌতির শাসনকর্তা নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২২৬-১২২৮ ঈ.) ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদিম। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করেন। একবার তিনি কেবল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই ৫মন স্বর্ণ প্রদান করেছিলেন। ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত সুফিগন সব ধরণের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন বলে ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়।

এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইয়ামন হতে মাখদুম শাহ দৌলত শহীদ (রহ.) পাবনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। ১২৪০ ঈ. হতে ১২৭০ ঈ. সময়কালে তার এ প্রচার কার্য চলে বলে জানা যায়। তার অব্যবহিত পরে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন দেওয়ান সৈয়দ শাহনুর (রহ.)। পাবনা শাজাদ পুর থানায় তার দরগা রয়েছে। এই শতাব্দীতে বাংলার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে বার জন আউলিয়া ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। তাঁদের অন্যতম হযরত বখতিয়ার মৈসুর (রহ.) সন্দীপে বাস করেন। তিনি সন্দীপে ইসলাম প্রচারে অসামান্য অবদান রাখেন। এখানকার রোহিনী নামক স্থানে তার দরগাহ রয়েছে।

হযরত শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (রহ.) ১২৭৮ ঈ. ইলমে দ্বীনের ব্যাপক প্রসার ঘটান সোনার গাঁওকে কেন্দ্র করে। তিনি এখানে উঁচু মানের একটি হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। বহু দুর

Dhaka University Institutional Repository

দুরান্ত হতে ইসলামের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য এখানে শিক্ষার্থীরা ভীড় জমাত সব সময়। এই উচ্চ শিক্ষালয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বসবাসের জন্য একটি আবাসিক হল স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে তার যোগ্য ছাত্র শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মুনিরী (রহ.) ব্যাপকভাবে ইলমে দ্বীনের বিস্তার সাধন করেন। ১২৯০ ঈসায়ী হযরত শাহ সুফী শহীদ (রহ.) হুগলী এলাকায় ইসলাম প্রচারের প্রয়াস পান। ১২৯৮ ঈসায়ী উলুগ-ই-আজম জাফর খাঁ গাজী (রহ.) বাংলার উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমে ইসলাম প্রচার করেন।

খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী (১৩০১ ঈ. ১৪০০ঈ.)

সুলতান শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহ তার শাসনামলে (১৩০২ খ্রি- ১৩২২ খ্রিঃ) ইসলাম প্রচার প্রসারে অসাধারণ অবদান রাখেন। তিনি তার শাসন কার্যের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেন ইসলামের দ্রুত প্রচার প্রসার। এ সময় উত্তর বাংলার বরেন্দ্র অঞ্চলে সৈয়দ নাসিরুদ্দীন শাহ নেক মারদান (রহ.) ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন।

১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত শাহজালাল ইয়ামনী আল মুজাররদ সোনার গাঁও সিলেট ও আসামে ইসলাম প্রচারে বিরাট অবদান রাখেন। ৩৬০ আউলিয়ার সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজা গৌর গোবিন্দকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে পূর্ব বঙ্গ ও আসামে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেন। তাঁর জীবনকাল ১১৯৬ ঈ. হতে ১৩৪৬ ঈ. পর্যন্ত। ১৫০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। সিলেটে তাঁর মাজার অবস্থিত। এসময়কালে সৈয়দ আহমদ তান্নুরী (রহ.) নোয়াখালিতে ইসলাম প্রচার করেন। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৩০৫ ঈ.– ১৩৫০ ঈ.) শেখ আতা (রহ.) দিনাজপুরে এবং মাখদুম শাহ জালালুদ্দিন বুখারী রংপুরে ইসলাম প্রচার করেন। ১৩২৪ ঈসায়ী সৈয়দ আব্বাস আলী চব্বিশ পরগানা ও খুলনায় এবং ১৩২৫ ঈসায়ী আখি সিরাজুদ্দীন (রহ.) গৌড় ও পান্ডুয়ায় ইসলাম প্রচার করেন ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪০ ঈসায়ী এ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) বংশধর মানসুর বাগদাদী (রহ.) তিনি হুগলী জেলার মোল্লাপাড়া গ্রামে বসবাস করেন। তার অধঃস্তন ১৪তম পুরুষ হচ্ছেন ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (১৮৪১ ঈ.-১৯৩৯ঈ.) তার বিখ্যাত মুরিদ হযরত নিছারুদ্দীন (রহ.) ১৮৭৩ ঈ. ১৯৯২ ঈ.) বিংশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে গুরুত্ব পূর্ণ ভুমিকা পালন করেন।

'সোনারগাঁও' এর সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ তাঁর শাসনামলে (১৩৩৮ঈ.-১৩৫০ঈ.) উলামা ও আউলিয়াগনকে ইসলাম প্রচারের সব রকম সহায়তা প্রদান করেন। ১৩৪০খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে শাহ বদর উদ্দিন আল্লামা (রহ.) কাওয়াল পীর (রহ.) শাহ মোল্লা মিসাকন (রহ.) শাহ আশরাফ কাবুলী (রহ.) শাহ বান্দারী সাই (র.) ও শাহ মুবারক আলী (রহ.) ইসলাম প্রচারে

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, ১৩৪২ ঈ.- হতে ১৩৫৮ঈসায়ীর মধ্যে সৈয়দ রিদা ইয়ামনী (রহ.) উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন।

লখনৌতির শাসকর্তা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২ঈ.- ১৩৫৮ঈ.) ও তার পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৮ঈ.- ১৩৯৩ঈ.) ইসলাম প্রচারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

এ দুজন শাসক একনিষ্ট ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন। ফকির দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকদের তাঁরা বিশেষ সম্মান করতেন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন। সিকান্দার শাহের আমলেই পান্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ স্থাপিত হয়। ১৩৫১ ঈ. হতে ১৩৮৮ ঈসায়ীর মধ্যে হযরত রাসাতী শাহ (র.) ও শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (রহ.) কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। এ শতাব্দীর শেষ দিকে সায়িদুল আরেফিন (রহ.) পাটুয়াখালী জেলায় এবং শাহ লংগর (রহ.) ঢাকা জেলায় ইসলাম প্রচার করেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ তার শাসনামলে (১৩৯৩ঈ.-১৪১০ ঈ.) দেশে ইসলামের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি দেশের ভেতরে বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে মক্কাশরীফ ও মদীনা শরীফে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরাফাতের হাজীদের কল্যাণার্থে একটি খাল নির্মাণ করান।

<u>ঈসায়ী পঞ্চদশ (শতাব্দী ১৪০১ঈ.-১৫০০ঈ.) ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী)১৫০১ঈ. - ১৭৫৭ঈ.)</u>

ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়ঃ পনের, ষোল ও সতের শতকে এ প্রচারের ধারা অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে। ইসলাম প্রচারের পথে নানা বাধা-বিপত্তি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়কে বলা যায় স্থিমিত প্রৌঢ়কাল।

ঈসায়ী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কালে বাংলাদেশে হিন্দু জাতির পুনরুত্থানের আন্দোলন শুরু হয় এবং হিন্দুত্ববাদী রাজা গনেশ বাংলার মসনদে আরোহন করে। বিশ্ববিখ্যাত ওলী নুর কুতবুল আলম (রহ.) এর প্রচেষ্টায় স্বল্প কালের ব্যবধানে এ বিপদ কেটে যায়। এ মহান ওলীর প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় গনেশের পুত্র যদু ইসলামে দীক্ষিত হন। এবং 'জালালুদ্দীন' নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। বিগত দুই শতাধিক কাল ধরে চলমান ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই ভয়াবহ চক্রান্তকে নুর কুতবে আলম (রহ.) নস্যাৎ করে না দিলে হয়ত আজকের বাংলার ইতিহাস অন্য রকম লিখতে হত। তাঁর দাওয়াতে বহু পৌত্তলিক হিন্দু ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিম হওয়ার পরে যদু তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামের স্বার্থে ব্যয় করেন। তিনি মক্কা মুয়াজ্জামায় একটি ইসলামী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ তাঁর শাসনামলে (১৪৫৯ ঈ.- ১৪৭৪ঈ.) ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি নিজে একজন ইসলামের পন্ডিত ছিলেন। খুলনা, যশোরও বরিশালে এ শতাব্দী কালের প্রথমার্ধে খান জাহান আলী (রহ.) (১৪৩৭ঈ.- ১৪৫৮ ঈ.) ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন। বাগেরহাটে তাঁর মাযার রয়েছে।

১৪৪০ ঈসায়ী বদর উদ্দিন বদরে আলম শাহিদী এ অঞ্চল এবং শাহ মজলিস (রহ.) বর্ধমান অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। এ শতাব্দীর মধ্যভাগে যায়নুদ্দীন বাগদাদী (রহ.) ও চেহেলগাজী (রহ.) রংপুর ও দিনাজপুরে ইসলাম প্রচার করেন।

এ শতাব্দীতে আরো যারা ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন হুসামুদ্দীন মানিক পুরী (১৪৭৭ঈ.) বাবা সালিহ (রহ.) (১৪৮২-১৫০৬ঈ.) নারায়ন গঞ্জে শাহ সাল্লাহ (রহ.) সোনারগাও এ শাহ আলী বাগদাদী (রহ.) (১৪৮৯ঈ.) ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে।

সুলতান হুসায়ন শাহ এর শাসনামলে (১৪৯৩ঈ. -১৫১৯ঈ.) একদিন শাহ (রহ.) চব্বিশ পরগনায় এবং নুসরাত শাহের শাসনামলে (১৫১৯ঈ. - ১৫৩২ঈ.) শাহ দানিশমান্দ (রহ.) রাজশাহীতে ইসলাম প্রচার করেন। বাদশাহ আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬ ঈ. - ১৬০৬ ঈ.) শাহজামাল (রহ.) জামালপুরে এবং খাজা চিশতী (রহ.) ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন। হযরত জামাল (রহ.) এর নামেই এ অঞ্চলের নাম করণ করা হয়েছে জামালপুর। মুগল শাসনামলে (১৫৭৬ঈ. - ১৭২৭ ঈ.) ইসলামের প্রচার প্রসার এবং কুসংস্কার ও বিদআত দুরীকরণে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৫৫৯ ঈ. হতে ১৬০০ ঈসায়ী কাজী মুওয়াক্কিল (রহ.) ও শাহ নিয়ামতুল্লাহ (রহ.) এদেশে ইসলাম প্রচার করেন।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ (১৬৭০ ঈ.- ১৭২৭ ঈ.) এর শাসনামলে এদেশে ইসলামী চেতনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৭১৫ ঈসায়ী খাজা আনোওয়ার শাহ শহীদ (রহ.) বর্ধমানে ও আব্দুর রশীদ (রহ.) ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন। ১৭৫৭ ঈসায়ী পলাশীর যুদ্ধে মুসলিম শাসনের পতন ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

পলাশী হতে বাংলাদেশ (১৭৫৭ঈ. - ১৯৭১ ঈ.)

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শ চৌদ্দ (২১৪) বছরে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ইতিহাসে চারটি সালের চারটি ঘটনা সর্বাধিক স্মরণয়ি। যথা ১৭৫৭, ১৮৫৭, ১৯৪৭ ও ১৯৭১ ঈ.।

১৭৫৭ ঈসায়ী ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশ দখল করে নেয়। ইংরেজ ও হিন্দুদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। বাংলার পতনের পরে পর্যায়ক্রমে তারা সমগ্র ভারত কেই তাদের করায়াত্ত করে নেয়। এর পর একশত নব্বই বছর ধরে ভারতের অধিবাসীগণ বিশেষ করে মুসলিম গণ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এর শেষ পর্যায়ে মুসলিম গণের সঙ্গে হিন্দু ও অন্যরা যোগ দেয়। কিন্তু ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয়েছে মুসলিমদেরকেই। কারণ তারা মুসলিম দের হাত হতেই শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এতদিন তারা সেই মুসলিম গণের নিকট তাদের ব্যবসার জন্য করুনা ও কৃপা ভিক্ষা করে আসছিল। আজ তারা নিজেরাই সব দন্ডমুন্ডের মালিক, মুসলিম গন ক্ষমতা হারা। ফলে মুসলিম গণকে তারা প্রবল ভাবে সন্দেহ

Dhaka University Institutional Repository

ও নিপীড়নের জালে আবদ্ধ করে রাখে। হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের বাদ দিয়ে তারা কেবল মুসলিম গনের প্রতিই সর্বাত্মকভাবে চালিয়ে যায় তাদের চরম দমননীতি। ফলে তাদের বিরুদ্ধে কেবল নিপীড়িত, অধিকার হারা, মুসলিম জাতিকেই আন্দোলন গড়ে তুলত হয়। মুসলিমগন কর্তৃক নিরবিচ্ছন্নভাবে চলে আসা একশত বছরের কঠোর আন্দোলন ও সংগ্রামের বিস্ফোরণ ঘটে ১৮৫৭ ঈ. সিপাহী বিপ্লবে। গভীর চক্রান্ত ও চরম নৃশংসতায় আশ্রয় নিয়ে ইংরেজরা এই বিপ্লবকে সাময়িক ভাবে থামিয়ে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই বিপ্লব প্রচন্ড ভাবে প্রকম্পিত করে তোলে বৃটিশ সিংহাসন।

সিপাহী বিপ্লবের পরে আরো নব্বই বছর ধরে মুসলিম গণকে কঠোর সংগ্রাম ও অব্যাহত আন্দোলন করতে হয় ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ আনুকল্য প্রাপ্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তারা ক্ষমতা ত্যাগ করে চলে যায়। ভারতের বুকে জন্ম নেয় স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারত।

সম্পূর্নরূপে ইসলামের উপরই কায়েম ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সর্বাধিক অবদান। কিন্তু নির্মম পরিহাস হচ্ছে বাংলার মানুষই নতুন করে পাকিস্তানী শোষনের শিকার হয়। এর পর বাংলার মানুষ সুদীর্ঘ দুই যুগ সংগ্রাম করে জন্ম দেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীনাত লাভ করে। দুইশত চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে যে স্বাধীনতা সুর্য় অস্তমিত হয়েছিল তা দুই শতাধিক বছর কালের সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় পুণরায় উদিত হয় এই একাত্তর সালে।[১১৬]

এক নজরে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন

বাংলাদেশে মুসলিমদের রয়েছে এক গৌরবোজ্জল ইতিহাস। ইখতিয়ার উদ্দিনমুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ ঈসায়ী পলাশী প্রান্তরে মুসলিম রাজ্যের পতন পর্যন্ত পাঁচশত চুয়ান্ন বছরে অসংখ্য মুসলিম শাসক বাংলায় শাসন পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের স্থপতি বখতিয়ার খিলজি একজন নিষ্টাবান মুসলিম ছিলেন। মুসলিম শাসকদের অধিকাংশই ছিলেন দক্ষ শাসক। সোনালী যুগের আমিরুল মু'মিনীনদের মত না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুসলিম শাসকগণ দেশ ও জাতির কল্যাণে যে অবদান রেখেছেন তার মূল্য অনেক। মুসলিম শাসকগণ এদেশে ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে আসেননি। কিন্তু তাঁদের শাসনামলে ইসলামের মুবাল্লিগদের পথ প্রশস্ত হয়। শত সহস্র মুবাল্লিগ আসেন এদেশে। তাঁরা সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে ইসলামের শ্রেষ্টত্ব ও সৌন্দর্য উপস্থাপন করেন।

---

১১৬ প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৬-১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসনের শেষ দিকের ঘটনা প্রবাহ বেদনা দায়ক। দেশ ও জাতির কর্মধারগন এ সময় চরম হিংসা-বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হন। তাঁদের মাঝে প্রতিহিংসা পরায়নতা এক জঘন্যরূপে ধারণ করে। প্রতি পক্ষের শক্তি খর্ব করার জন্য তাঁরা বিদেশীদের সাহায্য নিতেও কুন্ঠাবোধ করেননি। বাংলার মুসলিম শাসনকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়, বাংলা খিলজিদের অধীনে ১২০৩/ ১২০৪- ১২২৭ ঈসায়ী, দিল্লীর অধীনে ১২২৭-১৩৪১ ঈসায়ী, ইলিয়াছ শাহী বংশের অধীনে (প্রথম ধারা) ১৩৪২-১৪১৩ ঈসায়ী গনেশ জালাল উদ্দিনের অধীনে ১৪১৪ ঈসায়ী, ইলিয়াছ শাহী বংশের অধিনে (দ্বিতয় ধারা) ১৪৪২- ১৪৮৭ ঈসায়ী, হাবশী শাসনাধীন ১৪৮৭ - ১৪৯৩ ঈসায়ী, হুসেন শাহী বংশের অধিনে ১৪৯৩-১৫৩৮ ঈসায়ী, পাঠানদের অধিনে (শেরশাহ ও সুরবংশ) ১৫৩৮ - ১৫৬৪ ঈ. করবানী বংশের অধীনে ১৫৫৬ - ১৫৭৬ ঈসায়ী, মোঘল শাসনাধীনে ১৫৭৬ - ১৭৫৭ ঈসায়ী।

এ সুদীর্ঘ সময়ে যাঁরা বাংলার মসনদে সমাসীন ছিলেন, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন ছিলেন যারা আপন বাহু বলে বাংলার সিংহাসনে আরোহন করে দিল্লী সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেন। কিছু সংখ্যক শাসক ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর অবশিষ্ট দিল্লীর দরবার থেকে নিয়োগ পত্র লাভ করে গভর্ণর তথা নাজিম হিসাবে বাংলা শাসন করেন। নিম্নে বাংলার মসনদে সমাসীন মুসলিম শাসকের একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো।

সারণী-১

ক্রমিক নং	নাম	শাসনামল
০১	ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী	১২০৩/৪ - ১২০৬ ঈ.
০২	ইযযুদ্দীন মুহাম্মদ শিরান খিলজী	১২০৬- ১২০৮ ঈ.
০৩	হুসাম উদ্দীন ইওয়াজ খিলজী	১২০৮- ১২১০ ঈ.
০৪	আলী মুর্দান খিলজি	১২১০ -১২১৩ ঈ.
০৫	গিয়াস উদ্দিন ইয়াজ খিলজী	১২১৩ - ১২২৭ ঈ.
০৬	প্রিন্স নাজির উদ্দিন	১২২৭ - ১২২৯ ঈ.
০৭	মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বলকা খিলজী	১২২৯- ১২৩১ ঈ.
০৮	মালিক আলা উদ্দিন মাসউদ জানী	১২৩১ - ১২৩২ ঈ.
০৯	মালিক সাইফুদ্দীন আইবেক	১২৩২ - ১২৩৬ ঈ.
১০	তুগ্রল তুগান খান	১২৩৬ - ১২৪৫ ঈ.
১১	মালিক তামার খান	১২৪৫ - ১২৪৬ ঈ.
১২	মালিক জালালুদ্দীন মাসউদ জানী	১২৪৭ - ১২৫২ ঈ.
১৩	মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন ইউব্যক	১২৫১ - ২২৫৭ ঈ.
১৪	মালিক ইযযুদ্দীন বলবন	১২৫৭ - ১২৫৯ ঈ.

১৫	মালিক তাজ উদ্দীন আরসালান ইউযাবাকী	১২৫৯ - ১২৬৫ ঈ.
১৬	তাতারখান	১২৬৫ - ১২৬৮ ঈ.
১৭	শের খান	১২৬৮ - ১২৭২ ঈ.
১৮	আমিরখান, মুগীসুদ্দীন তুগ্রল খাঁন	১২৭২ - ১২৮০ ঈ.
১৯	সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বোগরাখান	১২৮২- ১২৯০ ঈ.
২০	সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউস	১২৯০ - ১৩০০ ঈ.
২১	সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ	১৩০১ - ১৩২২ ঈ.
২২	নাসিরুদ্দীন ইব্রাহীম	১৩২২-১৩২৪ ঈ.
২৩	বাহরাম খান, বাহাদুর শাহ	১৩২৫ - ১৩৩৬ ঈ.
২৪	ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ কাদার খান	১৩৩৬-১৩৪৯ ঈ.
২৫	আলা উদ্দীন আলী শাহ, ইখতিয়ার উদ্দিন গাজীশাহ	১৩৪৯ -১৩৫২ ঈ.
২৬	শাহ ই বাঙ্গাল শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ	১৩৫২ - ১৩৫৭ ঈ.
২৭	আবুল মুজাহিদ সিকন্দর শাহ	১৩৫৮ - ১৩৯০ ঈ.
২৮	গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ	১৩৯০ - ১৪২২ ঈ.
২৯	সাইফুদ্দীন হামজা শাহ, শিহাব উদ্দিন বারজীদ শাহ	১৪১২ - ১৪১৫ ঈ.
৩০	জালালুদ্দিন আবুল মুজাফর মুহাম্মদ শাহ	১৪১৫ - ১৪৩৪ ঈ.
৩১	শাসসুদ্দীন আবুল মুজাহিদ আহমদ শাহ	১৪৩৪ - ১৪৩৯ ঈ.
৩২	নাসির আবুল মুজাফফর মাহমদ শাহ	১৪৩৯ - ১৪৫৯ ঈ.
৩৩	রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ	১৪৫৯ - ১৪৭৫ ঈ.
৩৪	শামসুদ্দীন আবুল মুজাফর ইউসুফ শাহ	১৪৭৫ - ১৪৮১ ঈ.
৩৫	জালালুদ্দীন আবুল মুজাফফর ফাতেহ	১৪৮১ - ১৪৮৭ ঈ.
৩৬	সুলতান বারবাকশাহ	.... ১৪৮৭ ঈ.
৩৭	সাইফুদ্দীন আবুল মুজাফফর ফিরুজশাহ ২য়	১৪৮৭ - ১৪৯০ ঈ.
৩৮	নাসির উদ্দিন আবুল মুজাফফর মাহমুদ শাহ ২য়	১৪৯০ - ১৪৯১ ঈ.
৩৯	শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহসিদি বদর	১৪৯১ - ১৪৯৪ ঈ.
৪০	আলা উদ্দিন হুসাইন শাহ	১৪৯৪ - ১৫২০ ঈ.
৪১	নাসির উদ্দীন আবুল মুজাফফর নুসরত শাহ	১৫২০- ১৫৩২ ঈ.
৪২	আলা উদ্দিন আবুল মুজাফফর ফিরোজ শাহ	১৫৩২ - ১৫৩৩ ঈ.
৪৩	গিয়াস্ উদ্দিন আবুল মুজাফফর মাহমুদ শাহ ৩য়	১৫৩৩ - ১৫৩৮ ঈ.
৪৪	ফরিদুদ্দীন আবুল মুজাফফর শের শাহ	১৫৩৮ - ১৫৪৫ ঈ.
৪৫	মুহাম্মদ খান শূর	১৫৪৫ - ১৫৫৫ ঈ.
৪৬	গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ	১৫৫৫ - ১৫৬০ ঈ.

৪৭	গিয়াস উদ্দিন আবুল মুজাফফর জালাল শাহ	১৫৬০- ১৫৬৩ ঈ.
৪৮	তাজ খান কররানী	.... ১৫৬৩ ঈ.
৪৯	সুলাইমান খান কররানী	১৫৬৩ - ১৫ ৭৩ ঈ.
৫০	বায়েজীদ খান কররানী	..... ১৫৭৩ ঈ.
৫১	দাউদ খান কররানী	১৫৭৩-১৫৭৬ ঈ.
৫২	খান জাহান হুসাইন কুলীবেগ	১৫৭৬ - ১৫৭৮ ঈ.
৫৩	মুজাফফর খান তুরবাতি	১৫৭৯ - ১৫৮০ ঈ.
৫৪	খান-ই-আজম	১৫৮২ - ১৫৮৪ ঈ.
৫৫	শাহবাজ খান	১৫৮৪ - ১৫৮৭ ঈ.
৫৬	সাঈদ খান	১৫৮৭ - ১৫৯৩ ঈ.
৫৭	মানসিংহ	১৫৯৪ - ১৬০৫ ঈ.
৫৮	কুতুবুদ্দীন খান কোকা	১৬০৬ - ১৬০৭ ঈ.
৫৯	জাহাঙ্গীর কুলি খান	১৬০৭ - ১৬০৮ ঈ.
৬০	শায়খ আলা উদ্দিন ইসলাম খান চিশতী	১৬০৮- ১৬১৩ ঈ.
৬১	কাসিম খান	১৬১৩ - ১৬১৭ ঈ.
৬২	ইব্রাহিম খান	১৬১৭ - ১৬২৪ ঈ.
৬৩	মহব্বত খান	১৬২৫ - ১৬২৬ ঈ.
৬৪	মুকররম খান	১৬২৬ - ১৬২৭ ঈ.
৬৫	মির্জা হেদায়াতুল্লাহ খিদাই খান	১৬২৭ - ১৬ ২৮ ঈ.
৬৬	কাসিম খান	১৬২৮ - ১৬৩২ ঈ.
৬৭	আযম খান	১৬৩২ - ১৬৩৫ ঈ.
৬৮	ইসলাম খান মাশহাকী	১৬৩৫ - ১৬৩৯ ঈ.
৬৯	শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা	১৬৩৯ - ১৬৫৮ ঈ.
৭০	মুয়াজ্জাম খান মীর জুমলা	১৬৫৯ - ১৬৬৩ ঈ.
৭১	দাউদ খান	১৬৬৩ - ১৬৬৪ ঈ.
৭২	শায়েস্তা খান	১৬৬৪ - ১৬৭৭ ঈ.
৭৩	ফিদাই খান (আজম খান)	১৬৭৮ ঈ.
৭৪	শাহ জাদা সুলতান মুহাম্মদ আযম	১৬৭৮ - ১৬৭৯ ঈ.
৭৫	শায়েস্তা খান	১৬৭৯ - ১৬৮৮ ঈ.
৭৬	খান - ই- জাহান বাহাদুর	১৬৮৮ - ১৬৮৯ ঈ.
৭৭	ইব্রাহিম খান	১৬৮৯ - ১৬৯৭ ঈ.
৭৮	আযীমুদ্দীন	১৬৯৭ - ১৭১২ ঈ.

৭৯	খান-ই জাহান	১৭১২ - ১৭১৩ ঈ.
৮০	ফারখুন্দা সিয়ার	১৭১৩ ঈ.
৮১	মীর জুমলা উবাইদুল্লাহ	১৭১৩ - ১৭১৬ ঈ.
৮২	মুর্শিদ কুলী খান	১৭১৬ - ১৭২৭ ঈ.
৮৩	সুজা উদ্দীন মুহাম্মদ খান	১৭২৭ - ১৭৩৯ ঈ.
৮৪	আলাউদ দাওলাত সরফরাজ খান	১৭৩৯ - ১৭৪০ ঈ.
৮৫	আলী বর্দী খান	১৭৪০ - ১৭৫৬ ঈ.
৮৬	সিরাজুদ্দৌল্লা খান	১৭৫৬ - ১৭৫৭ ঈ.

বাংলাদেশের সর্বশেষ মুসলিম শাসক ছিলেন নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা খান। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে তাঁর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৫৫৪ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। দি ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিজয় লাভের পরিনতিতে এদেশের জনগণকে পরাধিনতার শিকলে আবদ্ধ হতে হয়। তাদের উপর নেমে আসে দুর্দিন। ইংরেজরা মুসলিম রাজ শক্তিকে তছনছ করে ফেলে। তাদের সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক শোষণের ফলে মুসলিমদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। দেশে গোলাম বানানোর উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। অপসংস্কৃতি চালূ হয়। অপরনামদর্শী স্বার্থান্ধ ও প্রতিহিংসা পরায়ন নেতৃবৃন্দের ভূল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের ফলে এদেশের গন মানুষকে ইংরেজদের গোলামী করতে হয় ১৯০ বছর।

ঐতিহাসিক গণের উপরোক্ত তথ্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, আরব বনিক ও সুফীদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো পৌঁছে। পরবর্তীকালে অনারব অঞ্চল থেকেও অসংখ্য সুফী এদেশে আগমন করেন। তাদের উপস্থাপিত শিক্ষা ও আচরণ স্থানীয় লোকদের একাংশকে মুগ্ধ করে। তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দয্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এছাড়া মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর ৫৫৪ বছরে প্রায় শতাধিক মুসলিম শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন। ইংরেজরা শাসক কর্তৃত্ব দখলের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম শাসনকর্তারা বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিপূল ভূমিকা পালনের পাশাপাশি আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন।[১১৭]

১১৭.ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা: ইফাবা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫) পৃ ৮৩-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাঃ

বাংলার ইতিহাসে ১৩০০ ঈসায়ী হতে ১৩৩৮ ঈসায়ী পর্যন্ত সময়কাল গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালের প্রথম দিকে লখনৌতির সুলতান শামস উদ্দীন ফিরুজ শাহের অধিনে স্বাধীন ছিল। দিল্লীর লাখজী সুলতানদের আমলে লাখনৌতি বরাবর স্বাধীনতা ভোগ করতেছিল। কিন্তু দিল্লীতে তুগলকের শাসন ক্ষমতা দখল করার পরে তারা লখনৌতি পুণরাধিকার করে। আবার দিল্লিতে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বের মধ্যভাগে ১৩৩৮ ঈসায়ী লখনৌতি স্বাধীন হয়ে যায়। এবার বাংলার স্বাধীনতা দুইশত বৎসর কাল স্থায়ী হয়। শামস উদ্দিন ফিরুজ শাহের সময় হতে বাংলার মুসলিম রাজ্য ও বিস্তৃতি লাভ করে।

প্রধানত এই আমলের প্রথম সুলতান শামস উদ্দীন ফিরুজ শাহের সময়েই এই রাজ্য বিস্তৃতি ঘটে।

প্রচলিত লোক গীতিতে রয়েছে-

হিন্দু আছে লাখে লাখে নাইরে মুসলমান
সিলেটের মোকামে আসি কে দিল আজান।

এই লাইন দুটি সিলেটে ইসলামের আবির্ভাবের কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) এর স্মৃতির প্রতি নিবেদিত মুসলমানদের সিলেট বিজয়ের সঙ্গে শাহ জালাল ও তাঁর শিষ্য সঙ্গীদের নাম জড়িত, অর্থাৎ সিলেট বিজয়ে তাঁদেরও ভূমিকা ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের আগেও সিলেটের সঙ্গে মুসলমানদের যোগযোগ ছিল। তবে এ ছিল নিছক ব্যবসায়িক সম্পর্ক, এর ফলে বাংলাদেশে বা সিলেট কামরূপ আসামে ইসলাম প্রচারের তেমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না।

মুসলমানদের সিলেট বিজয় সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীটি নিম্নরূপ। সিলেটের রাজা ছিলেন গৌড়গোবিন্দ। বুরহান উদ্দীন নামক একজন মুসলমান তাঁর এলাকায় বসবাস করতেন। বুরহান তাঁর ছেলের জন্ম উপলক্ষ্যে (বা আকিকা উপলক্ষ্যে) গরু জবাই করলে একটি চিল হঠাৎ ছোঁ মেরে এক টুকরা গরুর মাংস নিয়ে উড়াল দেয় এবং মাংসের টুকরোটি এক ব্রাহ্মনের ঘরে (বা রাজার মন্দিরে) পড়ে যায়। ব্রাহ্মন এ ব্যাপারে রাজার নিকট নালিশ করলে বুরহান উদ্দিনের হাত কেটে দেয়ার এবং তার শিশু ছেলেকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়। রাজার আদেশ কার্যকর হয়। বুরহান গৌড়ে গিয়ে তৎকালীন সুলতান শামস উদ্দীন ফিরুজ শাহের নিকট এই অন্যায় জুলুমের প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সুলতান তার ভাগনেয় সিকান্দর খান গাজীকে একদল

Dhaka University Institutional Repository

সৈন্যসহ রাজা গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুসলিম সৈন্যরা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে পৌছলে গৌড়গোবিন্দ তাদের বাঁধা দেন। সিকন্দর খান গাজী প্রথম বার পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় বার চেষ্টা করেন কিন্তু এবারও পরাজিত হন। সুলতান তখন সিপাহসালার নাসির উদ্দীনকে সেনা বাহিনীর দায়িত্ব দেন। ইতিমধ্যে দরবেশ (শাহজালাল) তাঁর ৩৬০ জন শিষ্য সঙ্গীসহ বঙ্গ দেশে আসেন এবং তাঁরা ও মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে সিলেট অভিযানে অংশ নেন। মুসলিম সৈন্যরা এবার বিজয় লাভ করে, রাজা গৌড় গোবিন্দ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান এবং সিলেটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরের কাহিনী জনশ্রুতি নির্ভর হলে ও এর সমর্থনে প্রামান্য তথ্য রয়েছে। কাহিনীর খুটিনাটিতে কল্পনার প্রলেপ থাকতে পারে তবে মূল বক্তব্য সত্য। রাজা গৌর গোবিন্দ, সুলতান শামস উদ্দীন ফিরুজ শাহ, সিকান্দর খান গাজী এবং শাহজালাল সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। রাজা গৌড় গোবিন্দ সম্পর্কে প্রমাণ্য তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে সিলেটে প্রচলিত বিভিন্ন লোকগীতি থেকে তার সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যায়। এগুলি হচ্ছে পাগল ঠাকুরের ছড়া, হাসানাথের পাচালী, শান্তিরাণীর বারমাসী এবং গোপীনাথ দত্ত রচিত দত্ত বংশাবলী। এই লোকগীতি গুলো পরীক্ষা করে আধুনিক পন্ডিতেরা মনে করেন যে, গৌড় গোবিন্দ সম্ভবত গারো জাতীয় লোক ছিলেন বা কোন ত্রিপুরা রাজার নির্বাসিতা রাণীর সন্তান ছিলেন। তিনি সিলেটের সিংহবংশীয় কোন একজন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে সিলেট শহর দখল করেন। পরে তিনি খাসিয়া রাজাকে পরাজিত করে এবং লাউড় ও জৈন্তিয়া রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজা গৌর গোবিন্দের চিকিৎসক ছিলেন কবিরাজ চক্র পানি দত্ত। এই কবিরাজের দুই ছেলেকে রাজা সিলেটে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। এরা সাতগাঁও এর দত্তদের পুর্ব পুরুষ।

এই দত্ত পরিবারের একজন গোপী নাথ দত্ত দত্তবংশাবলী রচনা করেন। মুসলমানদের সঙ্গে পরাজিত হয়ে রাজা গৌড় গোবিন্দ পরিবার পরিজন ফেলে আত্ম গোপন করেন। রাজার বিশ্বস্থ ভৃত্য ঝাড়ুরাম (বা ঘাটুরাম) রাজমাতা অর্পনা এবং রাণী শান্তি রাণীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। পরে ঝাড়ুরাম মুসলমানদের হাতে নিহত হয় এবং রাজমাতা ও রানী অনেক দুঃখ কষ্টে কালাতিপাত করেন। শান্তিরাণীর শেষ জীবনের দুঃখের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় শান্তি রাণীর বারমাসী। অতএব, লোকগীতি গুলির সত্যতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না, এই লোক গীতিগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাজা গৌড় গোবিন্দ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।

সুলতান শামস উদ্দীন ফিরুজ শাহেব ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেনা, তার উৎকীর্ণ মুদ্রা ও শিলালিপিতে প্রমাণ হয় যে, তিনি ১৩০১ থেকে ১৩২২ পর্যন্ত লখনৌতির সুলতান ছিলেন, সিকান্দর খান গাজীর নাম ও শিলালিপিতে পাওয়া যায়। শাহজালালের ঐতিহাসিকতা নিয়ে ও প্রশ্নের অবকাশ নেই, তিনি সিলেটেই সমাহিত আছেন। তিনি যে সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহের সমসাময়িক তাঁর প্রমাণ ইবনে বতুতার সাক্ষ্য; মরক্কোর এই বিখ্যাত পর্যটক ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট গিয়ে শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলায় তথা সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সম-সাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাগুলোর বিস্তারিত তথ্য ও প্রামানিক ইতিহাস জানতে হলে তৎকালীন সময়ের শাসক গোষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সময়কার শিলালিপি ও মুদ্রা সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

সিলেটে ইসলামের আবির্ভাব এবং মুসলমানদের সিলেট বিজয় সম্পর্কে যে সূত্রটি প্রাচীন ও প্রমান্য তা হলো একখানি আরবী ও ফারসী শিলালিপি। শাহজালালের সম্মানে উৎসর্গীকৃত। এই শিলালিপিতে মুসলমানদের প্রথম সিলেট বিজয়ের কথা আছে। শিলালিপি খানা ৯১৮ হিজরীতে (১৫১২-১৩ ঈ.) সুলতান আলা উদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ। এতে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, সুলতান ফিরুজ শাহের রাজত্ব কালে ৭০৩ হিজরী সনে (১৩০৩-০৪ খ্রিঃ) সিকান্দার খান গাজীর হাতে 'শ্রিহত' শহরে প্রথম ইসলামের বিজয় হয়।

শিলালিপি খানা ঠিক কোন স্থানে পাওয়া যায় তার উল্লেখ নেই। তবে এটি শাহজালাল (রহ.) এর দরগায় আবিস্কৃত হওয়ার সম্ভবনাই বেশি। কারণ শিলালিপিটি শাহজালাল (রহ.) এর সম্মানে উৎসর্গ করা হয়। এই শিলালিপিতে সিলেট শহর বিজয়ের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। শিলালিপির ফিরুজশাহ ও লখনৌতির সুলতান ফিরুজশাহ এক ও অভিন্ন। শিলালিপিতে উল্লেখিত তারিখে তিনিই ছিলেন লখনৌতির সুলতান।

শিলালিপিখানা ৯১৮ হিজরী সনে (১৫১২-১৩ঈ.) উৎকীর্ণ হলেও এর সাক্ষ্য মতে ৭০৩ হিজরী বা ১৩০৩-০৪ ঈসায়ী সিলেটে ইসলামের বিজয় হয় অর্থাৎ মুসলমানেরা সিলেট জয় করেন। অতএব, সিলেট বিজয় সম্পর্কিত এই প্রাচীনতম সূত্রটি ও ঘটনার দুইশত বৎসর পরের। এতে বুঝা যায় যে, সুলতান আলা উদ্দীন হোসেন শাহের সময় বা ঘটনার দুইশত বৎসর পরে ও মুসলমানদের সিলেট বিজয়ের তথ্য সম্বলিত পুস্তক পুস্তিকা বা অন্যান্য প্রমাণের অস্তিত্ব ছিল যা এখন হারিয়ে গেছে। নতুবা শিলালিপিতে সিলেট বিজয়ের সন তারিখ দেওয়া সম্ভব হতো না। সিলেটে শাহজালাল (রহ.) এর দরগায় দুই খানি আরবী শিলালিপি আছে। প্রথম খানি সুলতান শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহের (৮৭৯-৮৮৬ হি./ ১৪৭৪ - ১৪৮১ ঈ.) রাজত্বকাল উৎকীর্ণ। দুর্ভাগ্য বশত, এটির প্রথম ও শেষ অংশের লিপি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সন তারিখ পাওয়া যায় না, শুধু মসজিদ নির্মাণের কথাটির উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় শিলালিপি খানি সুলতান আলা উদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে ৯১১ হিজরী বা ১৫০৫ -০৬ ঈসায়ী উৎকীর্ণ। এতে বিখ্যাত ও মহান দরবেশ শায়খ জালাল কুনিয়াবীর আদেশে একটি পবিত্র ইমরাত নির্মাণের কথা বলা হয়েছে, এই পবিত্র ইমারতকে বলা হয় দারউল ইহসান।[১১৮]

শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহঃ

লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের সুলতান। ৭০১ হতে ৭২২ হিজরী (১৩০১-১৩২২ ঈ.) পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। আস সুলতান উল আজম শাসসুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মোজাফফর ফিরুজ-

১১৮. সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৃ-১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ আস সুলতান' উপাধি নিয়ে তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন এবং নিজের মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর নাম উৎকীর্ণ করেন।

ফিরুজ শাহের উদ্ভব ও বংশ পরিচিয় নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে < ইবনে বতুতা'র মতে তিনি নাসির উদ্দিন <বুগরা খান> এর পুত্র ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি <সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন> এর পৌত্র। আমীর খসরু বুগরা খানের দু-পুত্রের নাম উল্লেখ করেন কায়কোবাদ ও কায়কাউস। কিন্তু তিনি শামসুদ্দীন ফিরুজের নাম উল্লেখ করেননি। এছাড়া গিয়াস উদ্দীন বলবন পারস্য রীতি অনুসরণ করে তাঁর পৌত্রদের নাম কায়কোবাদ, কায়কাউস, কায়খসরু, কায়মুরস ইত্যাদি রাখেন। কিন্তু ফিরুজ নাম পারস্য রীতির সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ন নয়। তদুপরি কায়কোবাদ, ১২৮৮ ঈসায়ী যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। কায়কাউস কায়কোবাদের ছোট ভাই ছিলেন এবং সে কারণে যদি ফিরুজ কায়কাউসের ছোট ভাই হন তাহলে ১৩০১ ঈ. তার বয়স হবে মাত্র ত্রিশ। ফিরোজের সিংহাসন আরোহনের পর তাঁর দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র রাষ্ট্রীয় কাজে পিতাকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু এবয়সে কোন ব্যক্তি দুজন বা ততোধিক প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র থাকার কথা নয়। এসকল কারণে এবং তাঁর মুদ্রাগুলো যথার্থ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আধুনিক পন্ডিতগণ বলেন যে, শামসুদ্দীন ফিরুজ বলবনি বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। শামসুদ্দিন ফিরুজ কোথাও নিজেকে সুলতানের পুত্র বলে দাবী করেননি, অথচ তার উত্তরাধিকারী পুত্রগণ সকলেই নিজেদেরকে সুলতান বিন সুলতান অর্থাৎ সুলতানের পুত্র সুলতান বলে অভিহিত করেছেন।

<লখনৌতির> শাসনকর্তা বুগরা খান কে সাহায্য করার জন্য বলবন ফিরুজ নামধারী দুজনকে নিযুক্ত করেন। অনুমান করা হয় যে, শাসুদ্দীন ফিরুজ এ দু জনেরই একজন। এ দুজন কর্মকর্তার মধ্যে বিহারের শাসনকর্তা ফিরুজ ইতগীন ছিলেন অধিকতর যোগ্য। সম্ভবতঃ দুজন ফিরুজের মধ্যে ফিরুজ ইতগীনই কায়কাউসের মৃত্যুর পর অথবা শক্তি বলে তাকে সরিয়ে ৭০১ হিজরীতে (১৩০১ ঈ.) সুলতান সামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ উপাধি নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে আরোহন করে সুলতান শাসসুদ্দীন ফিরুজ শাহ তাজ উদ্দিন হাতিম খান, নামক তার এক পুত্রকে বিহারের শাসনভার অর্পন করেন।

নিজের অবস্থা সুসংহত করার পর ফিরুজ শাহ রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে লখনৌতির ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য বিহার, উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা এবং দক্ষিণ - পশ্চিম বাংলার লখনৌর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল < রুকনুদ্দীন কায়কাউস> বাংলার পূর্বাঞ্চলে বিজয়াভিযান শুরু করেছিলেন। কায় কাউসের সে অভিযান ফিরুজ শাহের আমলে শেষ হয়। কথিত আছে যে, কায়কাউস প্রথম বারের মত বঙ্গের খারাজ (রাজস্ব) থেকে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। কিন্তু ফিরুজ শাহের সময়ে <সোনার গাঁও> অঞ্চল (দক্ষিণ - পূর্ব বাংলা) মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি সোনার গাঁও এ একটি টাকশাল স্থাপন করেন। এখান থেকে তাঁর অনেক মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছে। একইভাবে সাতগাঁও বিজয়াভিযান শুরু হয়েছে জাফর খানের নেতৃত্বে কায়কাউসের আমলে এবং তা শেষ হয়েছে ফিরুজ শাহের শাসনামলে। ফিরুজ শাহের একটি

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, জনৈক জাফর খান ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৩ খ্রিঃ) দারুল খায়রাত নামে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। ফিরুজ শাহের ময়মনসিংহ বিজয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কেবল এটুকু জানা যায় যে, তাঁর পুত্র গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর গিয়াসপুর টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রচলন করেন। গিয়াসপুরকে ময়মনসিংহের প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ঐ নামের একটি গ্রামের সাথে অভিন্ন মনে করা হয়। এই টাকশালের অবস্থিতি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ফিরোজের সময়েই ময়মন সিংহে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।

ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে সিকন্দর খান গাজী সুন্দর বন অঞ্চলের হিন্দু রাজা মটুকের বিরুদ্ধে এক সফল অভিযান পরিচালনা করেন সুলতান ফিরুজ শাহের একটি মুদ্রা সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিন প্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রামে আবিস্কৃত হয়েছে।

সিলেট বিজয় ছিল সুলতান শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিলালিপি অনুসারে ফিরুজ শাহ ৭০৩ হিজরীতে (১৩০৩ ঈ.) সিলেট জয় করেন। সিলেট বিজয়ের সাথে বিখ্যাত দরবেশ <হযরত শাহজালাল (রহ.)> এবং সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দিনের নাম জড়িত আছে। সুতরাং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল (সিলেট) উত্তরাঞ্চল (ময়মনসিংহ) এবং দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে (সোনারগাঁও) বিস্তার লাভ করে।

ফিরুজ শাহ খলজীদের বিরুদ্ধে বিহারেও তার ক্ষমতা সুদৃঢ়রূপে ধরে রেখেচিলেন। বিহারে আবিস্কৃত তার আমলের দু'টি শিলালিপি একথা প্রমাণ করে।

আলী মর্দান ও গিয়াস উদ্দিন ইউওয়াজের শাসনামলে বাংলার মুসলিম আধিপত্য কামরুপ, ত্রিহুত ও উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় বিস্তার লাভ করে। কায়কাউসের সময়ে রাজ্য বিস্ত ার পুনরায় শুরু হয় এবং হুগলি জেলার সাতগাঁও অঞ্চলে মুসলিম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু রাজ্য সম্প্রসারণ প্রকৃত অর্থে শুরু হয় ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে। তিনি স্থায়ীভাবে হুগলিকে গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন।

এভাবে বাংলার সুলতানাত সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের আমলে কমপক্ষে পশ্চিমে কোন ও গোগরা নদী হতে পূর্বে সিলেট পর্যন্ত এবং উত্তরে দিনাজপুর রংপুর হতে দক্ষিণে হুগলি ও সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ফিরুজ শাহের ছয়জন প্রাপ্ত বয়স্কপুত্র ছিলেন শিহাবুদ্দীন বুগদা, জালালুদ্দীন মাহমুদ, গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর, নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম, হাতিম খান ও কুতলুখান। এছয় পুত্রের মধ্যে তাজ উদ্দিন হাতিম খান বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন।[১১৯]

ড. কানুনগো ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, ফিরুজ শাহ বেশী বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেন। ঐ সময় তাহার কয়েকজন বয়স্ক ছেলে ছিল। সুলতান তাঁহার উপযুক্ত ছেলেদের এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারের সাহায্যে রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করেন। তাই মনে হয় সুলতান পুত্রদিগকে মুদ্রা প্রচলন করার মতো রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, ফিরুজ শাহের পুত্রগণ কর্তৃক মুদ্রা প্রচলন তাহাদের বিদ্রোহের ফল নয়।

---

১১৯. বাংলা পিডিয়া পৃ ২৯১, ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

বরং পিতা কর্তৃক পুত্রদের সঙ্গে ক্ষমতা ও অধিকার ভাগাভাগির ফল। পিতা ও পুত্রদের সমবেত প্রচেষ্টায় লখনৌতির মুসলিম রাজ্য অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং চারিদিকে মুসলিম রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। এই বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে পাঠকদের সুবিধার জন্য ফিরুজ শাহ ও তাহার পুত্রদের আবিস্কৃত মুদ্রার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হইল।

সুলতানের নাম	টাকশালের নাম	মুদ্রার তারিখ (হিজরী সন)
শামস উদ্দিন ফিরুজ শাহ	লখনৌতি সোনার গাঁও বঙ্গ নাম অস্পষ্ট	৭০২, ৭০৪, ৭১০, ৭১২, ৭১৩, ৭১৫, ৭২০, ৭২২, ৭০৫, ৭১০, -৭০, -৭০, ৭০৫, ৭০১, ৭১৪, ৭১৬।
জালাল উদ্দিন মাহমুদ	লখনেতি	৭০৪, ৭০৭ (বা ৭০৯)
শিহাব উদ্দিন বুগদাদ	লখনৌতি	৭১৭, ৭১৮
গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর	লখনৌতি	৭০১, ৭১৩, ৭২০, ৭২২
	সোনারগাঁও	৭১৭
	গিয়াসপুর	৭২২
	নাম অস্পষ্ট	৭২১

সম্প্রতি ড. পি এল গুপ্ত জালাল উদ্দীন মাহমুদের একটি মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি মুদ্রায় ৭১৪ হিজরী তারিখ পাঠ করিয়াছেন (ন্যামেজমেটিক ডাইজেস্ট) বোম্বাই ভল্যূম ৩, পাঠ- ১ জুন ১৯৭৯ পৃ- ১৩-১৫) জালাল উদ্দীন কুরবান শাহের ৭১৯ হিজরীর একটি মুদ্রা প্রকাশিত হইয়াছে। (ন্যামেজ মেটিক ডাইজেস্ট, (বুম্বাই, ঐ পৃ-১৫) এই একই রকমের একটি মুদ্রা আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং মুদ্রা সংগ্রাহক জহির উদ্দীন আমাকে দেখাইয়াছেন এবং মুদ্রাটির একটি ছাপও আমার কাছে দিয়াছেন। সংগ্রাহক নিজে মুদ্রায় জালাল উদ্দীন বালাকা শাহ পড়ার পক্ষ পাতী এই মুদ্রটিতে তারিখ নাই ন্যামেজমেটিক ডাইজেটে প্রকাশিত মুদ্রাটিতে আমি প্রথম দৃষ্টে জালাল উদ্দীন কবির শাহ পড়ি কিন্তু তারিখটি আমার নিকট স্পষ্ট হয় নাই। তবে এই মুদ্রাগুলি জালাল উদ্দীন মাহমুদ শাহের নয়। আমার মনে হয় এই মুদ্রাগুলি শুদ্ধভাবে পড়িতে পারিলে বাংলার ইতিহাসের এই অংশের পূর্ণমূল্যায়ন করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। মুদ্রাটির পাঠ সম্পর্কে আমি এখনও নিশ্চিত হইতে না পারায় এই খানে মুদ্রাগুলির আলোচনা হইতে বিরত থাকাই শ্রেয় মনে করি। [১২০]

মুদ্রা সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়, যে ফিরুজ শাহের জীবদ্দশায় তার পুত্র জালালুদ্দীন মাহমুদ, শিহাব উদ্দিন বুগদা এবং গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর তাদের নিজ নিজ নামে লখনৌতি টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর সোনারগাঁও গিয়াসপুর টাকশাল থেকে ও মুদ্রা প্রবর্তন করেন।

১২০. বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ- ১৬২, ৬৩

এ মুদ্রাগুলির ভিত্তিতে কোন কোন পন্ডিত বলেন যে, ফিরুজ শাহের পুত্রগণ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং তাঁরা পর্যায়ক্রমে লাখনৌতি শাসন করেছিলেন। কিন্তু ফিরুজ শাহের পুত্রদের মুদ্রা প্রবর্তন তাদের বিদ্রোহের ফল নয়, বরং পিতার সঙ্গে পুত্রদের ক্ষমতা ভাগাভাগির ফল। আসলে শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ কোন বয়সে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহন করেন্ এ সময়ে তার অর্ধজ্ঞান প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ছিল। এঁরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন। পুত্রদের সহযোগিতায় সন্তুষ্ট হয়ে ফিরুজ শাহ তাদেরকে সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ স্বাধীন ভাবে পরিচালনা করার এবং মুদ্রা পরিচালনা করার মতো রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহারের অনুমতি দেন। যদি তার পুত্ররা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন, তাহলে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত এবং সাম্রাজ্যের এই বিস্তৃতি সম্ভব হতো না।

শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ ৭২২ হিজরীতে (১৩২২ঈ.) মৃত্যুবরন করেন। তিনি নিজেকে একজন শক্তিশালী ও উৎসাহী শাসক, অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং দক্ষ কুটনীতিবীদ হিসেবে প্রমাণকরেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি সাহায্য করতেন। এজন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আমলে শুধু সীমানা সম্প্রসারিত হয়নি, সেই সাথে ইসলাম ধর্মের সম্প্রচার ঘটে। উল্লেখ্য যে, সাতগাঁও সিলেট অঞ্চলে তার সময়ে দু'জন প্রখ্যাত সুফী দরবেশের আবির্ভাব হয়। সাতগাঁও এলাকায় শাহ শফী উদ্দীনের ধর্ম প্রচারের ফলে সেখানে মুসলমানদর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ বিখ্যাত দরবেশ পুণ্যাত্মা শাহজালাল (রহ.) এর আবির্ভাব বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল, আসাম তথা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ত্বরান্বিত ও সঠিক পথ নির্দেশনা লাভ করে।[১২১]

জনকল্যাণকর কার্যকলাপঃ সুলতান ফিরোজ শাহ জনদরদী শাসক ছিলেন এবং প্রজাদের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন জনপদ নির্মাণ করেন। ফিরুজ শাহের নামানুসার ফিরোজাবাদ নামে হুগলি জেলার পান্ডুয়া (ছোট) এবং মালদহ জেলার পান্ডুয়ায় (বড়) দুটি প্রাচীন নগরী এখনও বিদ্যমান। অনেকের ধারণা যে, এ দুটি নগরী দিল্লীর তুগলক সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলকের নাম বহন করছে, কিন্তু দিল্লীর সুলতান ইলিয়াস শাহের শাসনামলে (১৩৪২-১৩৫৮ঈ.) বাংলা অভিযান করেন এবং ১৩৫৩ ঈসায়ী গৌড় অবরোধ করেন। সুতরাং নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বাংলার সুলতান ফিরুজ শাহের নাম থেকেই পান্ডুয়ার নাম করণ হয় ফিরুজাবাদ। ফিরুজশাহ ৭২২ হি/ ১৩২২ ঈসায়ী মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ বাংলার ইতিহাসে মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কুটনিতীবিদ হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।[১২২]

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর ইতিহাস পুণর্গঠিনের জন্য আমরা কেবলমাত্র মুদ্রা ও শিলালিপির উপর নির্ভরশীল। তাঁর সমসাময়িক কোন ইতিহাস গ্রন্থ নেই বা পরবর্তী যুগের ইতিহাসেও তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। ফলে তার রাজত্বকাল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু তবুও মনে করা হয় বাংলার মুসলিম রাজ্য বিস্তারে এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তার যে বিশেষ ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।[১২৩]

---

১২১. বাংলা পিডিয়া, (ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ৯খ) পৃ- ২৯১, ৯২।
১২২. মাহমুদুল হাসান সৈয়দ ড. বাংলার ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত) ঢাকা, অধুনা প্রকাশনঃ আগষ্ট ২০০৩, ১সং পৃ- ১৮১।
১২৩. আব্দুর রহীম, মুহাম্মদ, ড. প্রমুখ। বাংলাদেশের ইতিহাস (ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান মার্চ ২০০৩, ১০সং) পৃ- ১৮১, ৮২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সমকালীন বাংলার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ইবনে বতুতার বিবরণ (১৩৪৫-৪৬ঈ.)

বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখর উদ্দীন মোবারক শাহের আমলে মরক্কোর বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন। ইবনে বতুতা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশ সমূহ সফর করে দিল্লীতে এসেছিলেন এবং দিল্লী থেকে তিনি বাংলাদেশে আসেন ১৩৪৫-৪৬ ঈসায়ী। বাংলাদেশে আসার তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সিলেটে গিয়ে শাহজালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। সিলেটে কিছু দিন অবস্থান করে তিনি নদী পথে সোনারগাঁও এ আসেন এবং সেখান থেকে জাহাজ যোগে জাভার পথে যাত্রা করেন। ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে স্বল্প বর্ণনা রয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তদানীন্তন বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির যে অল্প তথ্য তার বিবরণে লিপিবদ্ধ তা খুবই মূল্যবান।

সম সাময়িক অন্য কোন সূত্রে এই ধরণের তথ্যের অভাব ইবনে বতুতার সংক্ষিপ্ত বিবরণকে অধিক মূল্যবান করে তুলেছে।

ইবনে বতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন দক্ষিণ ভারত থেকে সমুদ্র পথে এবং সেই জায়গায় তিনি প্রথম পদার্পণ করেছিলেন, তার নাম 'সাদকাওয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে বতুতার সাদকাওয়ানের সনাক্ত করন নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে সাদকাওয়ান ও হুগলি জেলার সাতগাঁও একই জায়গা, আবার কেউ কেউ সাদকাওয়ান ও চট্টগ্রাম (ছোট গাঁও) অভিন্ন বলে মনে করেন। সাদকাওয়ানের যে বর্ণনা ইবনে বতুতা দিয়েছেন তা থেকে বর্তমানে শেষোক্ত সিদ্ধান্তই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।[১২৪]

চট্টগ্রাম বন্দর অবতরন করে ইবনে বতুতা সিলেটের শাহজালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করে তিনি নদী পথে সোনার গাঁও আসেন এবং সেখান থেকে জাহাজযোগে জাভার পথে যাত্রা করেন।

ইবনে বতুতা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার কায়রো বসরা, সিরাজ, ইস্পাহান, বোখরা, বলখ, সমরকন্দ, হেরাত প্রমুখ বিখ্যাত শহর সমূহ ভ্রমণ করে ভারতে আসেন এবং দিল্লী ও অন্যান্য ভারতীয় শহর পরিদর্শনের পর তিনি বাংলাদেশে আসেন। সুতরাং ধ্বনির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সাতগাঁও ও চাটগাও উভয় শহরের নামের সঙ্গেই সাদকাওয়ানের মিল আছে। তবে বর্ণনার অন্যান্য আনুসঙ্গিক তথ্য বিচারে এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য যখনই কোনতুলনামূলক উক্তি থাকে তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনে বতুতার বর্ণনায় সর্বাগ্রে যে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য সমূহ। বাংলাদেশের প্রাচুর্য ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নিশ্চয়ই ইবনে বতুতাকে অবাক করেছিল। ফলে তাঁর বর্ণনায় বাংলাদেশের খাদ্য সামগ্রীর অল্পমূল্য ও

---

১২৪. N.K. Bhuttasali, Coins and chronology of the early independent Sultan of Bangal, PP- 145-149. ইবনে বতুতার বর্ণনায় সাদকাওয়ান একটি সমুদ্র উপকূল বর্তী বিরাট শহর। সুমদ্রের মিলিত হওয়ার আগেই এই শহরের নিকট গঙ্গা যেখানে হিন্দুরা তীর্থে যায় এবং যমুনা নদী মিলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অল্প ব্যয়ে জীবন যাপনের কথা উল্লেখ পেয়েছে। তিনি, উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের মতো এত প্রচুর চাউল এবং সস্তা খাদ্য সামগ্রী তিনি আর কোথাও দেখেননি। ইবনে বতুতা বাংলাদেশের কিছু খাদ্য সমাগ্রী ও অন্যান্য জিনিষের দাম উল্লেখ করেছেন।

১. বাঙ্গালা (বঙ্গদেশ)

বাঙ্গালা এক বহু বিস্তৃত দেশ। চাউল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এত সস্তা আমি আর কোনও দেশে দেখি নাই। কিন্তু এই দেশ ভাল নয়, অন্ধকারময়। এই জন্য খোরাসানের লোক ইহাকে 'দোযখ পুর নিআমত' (সম্পদ পূর্ণ নরক) বলে। সেখানে এক রূপার দিনারে[১২৫] ২৫ রতল[১২৬] চাউল পাওয়া যায়। এই দিল্লিটি রতল ২০ পশ্চিম দেশীয় রতলের সমান। ৮ দিরহামে এক রূপার দিনার হয়। উহাদের এবং আমাদের দিহরহাম সমান। বলা হয় যে, এই বৎসর দূর্ভিক্ষ ছিল। মুহাম্মদ আলমাসউদী মাঘরিবি যিনি একজন আউলিয়া এবং দিল্লীতে আমার বাড়ীর নিকটে থাকিতেন, তিনি বলিতেন যে তাহার এক স্ত্রী এবং এক চাকর ছিল। তিনি তাহাদের তিনজনের এক বৎসরের খোরাক এককালে ৮ দিরহামে খরিদ করিয়া রাখিতেন। তিনি বলেন সেই সময়ে ৮ দিরহামে দিল্লীর ৮০ রতল পরিমান ধান্য পাওয়া যাইত। কুটিবার পর তাহা হইতে ৫০ রতল চাউল হইত। ইহা ১০ কিনতায় হইল। সেখানে দুধওয়ালা মহিষ তিনরূপার দিনারে পাওয়া যায়। সেই দেশে গাভী হয়না। ভাল মোটা মোরগী ১ দিরহামে ৮টি পাওয়া যায়। পায়রার বাচ্চা এক দিরহামে ১৫টি। মোটা ভেড়ার দাম ২ দিরহাম, চিনির রতল (দিল্লীর)৪ দিরহাম গোলাবের রতল ৮ দিরহাম, ঘির রতল ৪ দিরহাম, সরিষা তেলের রতল ২ দিরহাম, ৩০ গজ লম্বা তুলার কাপড়ের দাম ২ দিরহাম, এবং সুন্দরী বাঁদীর দাম ১ সোনার দিনার (যা পশ্চিম দেশের ২ দিনারের সমান) আমি এই মূল্যে 'আশুরাহ' নামে একটি বাদী কিনিয়াছিলাম। সে খুব সুন্দরী ছিল। আমার একজন সঙ্গী লুলু নামে একটি অল্প বয়সের গোলাম ২ দিনারে খরিদ করিয়াছিলেন।

২. সাদকাওয়ান

বাঙ্গালার প্রথমে যে শহরে আমি দাখিল হইলাম। তাহা সাদকাওয়ান। ইহা সমুদ্রের কিনারে একটি বড় শহর। এখানে গঙ্গ (গঙ্গা) ও জুন (যমুনা)[১২৭] নামে দুইটি নদী মিলিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। এই শহরের বন্দরে অনেক জাহাজ আছে, যাহার সাহায্যে ইহারা লখনৌতির (গৌড়ের) লোকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া থাকে।বাঙ্গালার বাদশাহ ফখর উদ্দিন। তিনি ফখরা নামে বেশী প্রসিদ্ধ। ইনি খুব বিদ্ধান। বিদেশী, ফকির ও সুফী দিগকে ইনি বড় ভালবাসেন।

আসলে এখানকার বাদশাহ সুলতান নাসিরুদ্দীন ছিলেন। যার পুত্র ম'ইযুদ্দীন দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধ ও সাক্ষাতের বিষয় আমি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামসুদ্দীন বাদশাহ হন। তাঁহার পর শাহাবুদ্দীন। শাহাবুদ্দীনকে জিয়াউদ্দিন ওরফে ভাওরা হারাইয়া দেন। শাহাবুদ্দীন সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুঘলকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। গিয়াস উদ্দীন তুলঘলক তাহাকে বন্দী করেন। কিন্তু তাহার পুত্র সুলতান মুহাম্মদ

---

১২৫. রূপার দিনার বর্তমান টাকার সমান ছিল।

১২৬. রতল দিল্লীর মন। ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে ইহার ওজন বর্তমানে ১২ সের। মালাবিকুল আবসারের গ্রন্থকারের মতে ১৫ সের।

১২৭. ৩. যমনু নদী। ইহা এলাহাবাদের যমুনা নাহে। হুগলির নিকটবর্তী ত্রিবেনীতে যে যমুনা নদী গঙ্গায় শাখা রূপে নির্গত হইয়াছে তাহাই। অন্যের মত গঙ্গা ও ব্রম্মপুত্রের সঙ্গমস্থল। Early Indiadependnent Sultans of Bangal P-146.

তুঘলক তাহাকে ছাড়িয়ে দেন। কিন্তু তিনি অঙ্গীকার মত আপন রাজত্বের অংশ বিভাগ করিতে অস্বীকার করায় বাদশাহ তাঁহাকে আক্রমন করেন। তাহাতে তিনি নিহত হন। সৈন্যগন তাঁহাকে হত্যা করে। এই সময়ে আলী শাহ লখনৌতিতে বাদশাহ হইয়া বসেন।

ফখর উদ্দিন যখন দেখিলেন যে তাহার প্রভূ নাসিরুদ্দীনের বংশ হইতে বাদশাহী চলিয়া যাইতেছে, তখন তিনি সাদকাওয়ানে বিদ্রোহী হইলেন। তখন তাঁহার সহিত আলী শাহের প্রবল যুদ্ধ বাধিল। গরমী ও কাঁদা পানির সময়ে ফখরুদ্দীন জাহাজের সাহায্যে লখনৌতি আক্রমন করিলেন। কেননা আলী শাহ অপেক্ষা তাহার নৌশক্তি অধিক ছিল। বর্ষা শেষ হইলে আলীশাহ ফখরুদ্দীনকে আক্রমন করিলেন। কেননা তাহার স্থল শক্তি বেশী ছিল। ফখরুদ্দীন ফকীর ও সুফীদিগকে এত ভালবাসিতেন যে, তিনি শয়দা নামে এক সুফীকে সাতগাঁওয়ে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং একা শত্রুর সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে থাকেন। তাহার অনুপস্থিতিতে শয়দা বিদ্রোহী হইলেন এবং পাকাপাকি বাদশাহ হইবার ইচ্ছে করিলেন। তিনি বাদশাহের এক মাত্র পুত্রকে হত্যা করলেন। ফখরুদ্দীন শীঘ্র রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। শয়দা এবং তাহার সঙ্গী সুনার কাওন (সোনার গাঁর) দিকে পালাইয়া গেলেন। এইটা একটি মজবুত জায়গা। বাদশাহ সেখানে সৈন্য পাঠাইলেন। সেখানকার বাসিন্দাগণ ভীত হইয়া সয়দাকে গ্রেফতার করিয়া বাদশাহী সৈন্যের নিকট পাঠাইয়া দিল। সেনাধ্যক্ষ বাদশাহকে লিখিলেন কি করা যায়? তিনি হুকুম করিলেন তাহার মাথা কাটিয়া পাঠানো হউক। এইরূপেই তাহার মস্তক পাঠানো হইল এবং তাহার সঙ্গী অনেক ফকীর নিহত হইল। আমি সাদকাওয়ানে পৌছিয়া সেখানকার বাদশাহর সহিত সাক্ষ্যাৎ করি নাই। কেননা তাহার সহিত দিল্লীর বাদশাহের যুদ্ধ হইয়াছিল। এইজন্য আমি ভাবিলাম সাক্ষাতের পারিণাম ভাল হইবেনা।

৩. কামরূপঃ

সাদকাওয়ান হইয়া আমি কামরুপের দিকে রওয়ানা হইলাম এই দেশ সাদকওয়ান হইতে এক মাসের পথ। ইহা বহু বিস্তৃত পাহাড়িয়া দেশ এবং ইহা চীন ও যে তিব্বে কস্তুরী হরিণ পাওয়া যায় তার সংলগ্ন। এই দেশের অধিবাসীরা আকৃতিতে তুর্কীদের ন্যায়। ইহাদের ন্যায় কর্মট কদাচিৎ অন্যস্থানে দেখা যায়। সেখানের একজন চাকর অন্যস্থানের কয়েকজন চাকরের সমান কাজ করেন। ইহারা বিখ্যাত জাদুগর।

আমার এই দেশে যাইবার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি বিখ্যাত আওলীয়া শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির সহিত সাক্ষাৎ করিব এই শায়খ নিজ সময়ের কুতুব (পীর শ্রেষ্ঠ) ছিলেন। ইহার আলৌকিক কার্য প্রসিদ্ধ। ইঁহার বয়স ও অনেক বেশি হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, তিনি খলিফা মুতাছিম বিল্লাহকে বাগদাদে দেখিয়াছিলেন এবং যে সময়ে খলিফা নিহত হলেন সে সময়ে তিনি সেখানে ছিলেন, তিনি ১৫০ পূর্ণ করিয়া মরেন। তিনি চল্লিশ বছর হইতে বরাবর রোজা রাখিতেছিলেন। দশদিন অন্তর তিনি একবার ইফতার করিতেন। তাহার শরীর রোগা পাতলা ছিল। তাঁহার আকৃতি লম্বা, গন্ডদ্বয় ক্ষীণ ছিল। তাহার হস্তে সেই দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।[১২৮]

---

১২৮. শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, (বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩২৯, ৫ম বর্ষ, ২ সং) পৃ ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৪. সোনার কাওন (সোনারগাঁও)

শায়খ জালাল উদ্দিনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি ইবলক শহরের দিকে গেলাম। ইহা একটি বড় শহর। ইহার মধ্য দিয়া নদী বহিতেছে। এই নদী কামরূপের পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে। ইহাকে নীল (আজরাক) নদী বলে। এই নদী দিয়া লোক বাঙ্গালা এবং লাখনৌতি গিয়া থাকে। এই নদীর উভয় পার্শ্বে ক্ষেত্র, বাগান সেখানকার বাসিন্দা কাফের। কিন্তু বাদশাহ রায়ত। তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক ভাগ রূপে লওয়া হয়। খাজনা ইহার অতিরিক্ত। আমি এই দেশে ১৫ দিন পর্যন্ত সফর করিয়াছিলাম। গ্রাম এবং বাগান এখানে এত বেশী যে, বোধ হইতেছিল যে, বাজার দিয়া যাইতেছি। অসংখ্য জাহাজ এই দেশে যাতায়াত করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাহাজে এক একটা ঢাক থাকে। দুই জাহাজে সাক্ষাৎ হইলে তাহারা ঢাক বাজায়। এই হইল তাহাদের সালাম। সুলতান ফখরুদ্দীনের হুকুম এই যে এই দেশে ফকীর দিগের নিকট হইতে কোন মাশুল আদায় করা হইবে না। ফকীর কোন শহরে উপস্থিত হইলে বাদশাহের তরফ হইতে তাহাকে আধ দীনার দেওয়া হয়। ১৫ দিন সফরের পর আমি সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হইলাম। এই শহরের অধিবাসীগণ শায়দাকে ধরিয়া বাদশাহের হাতে দিয়াছিল।[১২৯]

বাংলার আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাঃ ইবনে বতুতার বিবরণ

বাংলাদেশের চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহাসের অনেক উপাদানই ইবনে বতুতার ভ্রমন কাহিনী থেকে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, তিনি বাংলার আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে চাক্ষুষ বর্ণনা দেন। তার বিবরণ একদিকে যেমন নির্ভরশীল অপরদিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

<u>ভৌগলিক অবস্থানঃ</u>

ইবনে বতুতা সমুদ্র পথে বাংলাদেশে আগমন করে যে স্থানে পদার্পণ করেন তার নাম 'সাদকাওয়ান'। এই স্থানের সনাক্ত করণে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সাদকাওয়ান এবং হুগলি জেলার সাতগাঁও একই স্থান। আবার কেউ কেউ 'সাদকাওয়ান'কে চট্টগ্রামের সাথে সনাক্ত করেন। ইবনে বতুতার বিবরণীতে 'সাদওকাওয়ানের' যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, চট্টগ্রাম কেই তিনি 'সাদকওয়ান' নামে অভিহিত করেছেন। ইবনে বতুতা ১৩৪৫-৪৬ ঈসায়ী বাংলাদেশে আসেন এবং একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এসময় বাংলার স্বাধীন সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দীন মুবারকশাহ। ইবনে বতুতা বলেন যে, মুবারক সুফী দরবেশদের পৃষ্টপোষকতা করতেন এবং তার আমলে তিনি আদেশ জারি করেন যে, কোন সুফী সাধক, দরবেশ, ফকির ধর্ম প্রচারকের নিকট থেকে পক্ষকর বা নৌকা ভাড়া গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সুফীরা কোন শহরে পৌছলে সেখানকার জনসাধারণ তাদের থাকা খাওয়ার জন্য প্রতি সুফিকে অর্ধদিনার করে দিবেন।

---

১২৯. প্রাগুক্ত পৃ- ৪৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম প্রচারঃ

ইবনে বতুতার বিবরণী থেকে জানা যায়, চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজকীয় পৃষ্টপোষকতার ফলে মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, তুরান ও ভারত বর্ষ থেকে অসংখ্য ধর্ম প্রচারক সুফি সাধক এদেশে আগমন করেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইসলাম প্রচার হতে থাকে এবং স্থানীয় অমুসলমান সম্প্রদায় ইসলামে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। ড. আব্দুল করিম বলেন- পরিস্কার বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম, সিলেট সোনারগাও অঞ্চলে অধিক সংখ্যক সুফিরা যাতায়াত করতেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফির যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আরো বলেন প্রকৃত পক্ষে চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং মুসলমান শাসন বিস্তারের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাঃ

ইবনে বতুতার নির্ভরযোগ্য বিবরণী থেকে তৎকালীন বাংলার আর্থ সামাজিক অবস্তার কথা জানা যায়। তিনি বাংলার প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য দেখে হতবাক হন এবং খাদ্য সামগ্রীর বাজার দরের একটি তথ্যবহুল বিবরণ দেন। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বাংলার সর্বত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য বিশেষত চাল ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সস্তায় পাওয়া যেত। দ্রব্যমূল্যের মান ও সস্তা দামের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তিনি আর কোথাও এরূপ সস্তা দামের খাদ্য দ্রব্য দেখেননি। অবশ্য তিনি দিল্লীর রতলের হিসাবে জিনিষপত্রের ওজন এবং দিনারের মুল্য নির্ধারিন করেন। বর্তমান কালের টাকা হিসাবে মুল্যমান যাচাই করা দুস্কর। এতদসত্ত্বেও প্রফেসর নিরোদভূষণ ১৯৪৮ ঈসায়ী টাকার সম পরিমাণ মূল্যের হিসাবে ইবনে বতুতার বর্ণিত দ্রব্য সামগ্রীর মুল্য তালিকা নিরূপন করেন।

দ্রব্য মূল্যের তালিকাঃ নিচের প্রদত্ত তালিকা থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

দ্রব্য সামগ্রী	ওজন (আনুমানিক)	মূল্য
চাউল	৮$\frac{৩}{৪}$ পৌনে নয়মন	৭ টাকা
ধান	২৮ মন	৭ টাকা
ঘি	১৫ সের	৩.৫০ টাকা
তিল তেল	১৪ সের	১.৭৫ টাকা
চিনি	১৪ সের	৩.৫০ টাকা
তাজা মুরগী	৮টি	০.৯০ টাকা

তাজা ভেড়া	১টি	১.৭৫ টাকা
দুগ্ধবতী গাভী (মহিষ)	১টি	২১.০০ টাকা
পায়রা	১৫টি	.৯০ টাকা
গজ সুক্ষ সুতি কাপড়	১৫টি	১৪.০০ টাকা

* এই তালিকা ১৯৪৮ সনে প্রফেসর নিরোদ ভূষণ রায় প্রণয়ন করেছেন। J.N. Sarkar (ed) History of Bangla Voll. 11 pp- 101-102.

বাংলাদেশের স্বল্প মূল্যের দ্রব্যাদি সম্বন্ধে ইবনে বতুতা বলেন যে, মুহাম্মদ আল মাশহাদী নামীয় একজন মরক্কোবাসী, যিনি কিছু দিন সপরিবারে বাংলাদেশে বসবাস করেন, বলেন যে, তিন সদস্য বিশিষ্ট তার সংসারের জন্য ৭ টাকায় সারা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতেন। খাদ্য দ্রব্যের স্বল্প মূল্য থাকা সত্বেও বাংলার জনসাধারণ উচ্চ মুল্যের জন্য অভিযোগ করেন। এ থেকে প্রমাণিতহয় যে, সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না।

ক্রীতদাস প্রথাঃ

ইবনে বতুতার বিবরণী থেকে জানা যায় যে চতুদর্শ শতাব্দীতে বাংলায় ক্রীতদাস প্রথা চালু চিল। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, মরক্কোর বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক বাংলাদেশে দাস দাসী ক্রয়-বিক্রয় শুধু স্বচক্ষে দেখেননি বরং নিজেও একজন দাসী খরিদ করেন। তিনি বলেন যে, তার সামনে ৭ টাকার একটি সুন্দরী দাসী বিক্রি হয়। ইবনে বতুতা নিজে ১০ টাকার বিনিময়ে আশুরা নাম্মী এক সুন্দরী দাসী ক্রয় করেন। তার এক সঙ্গী ১৪ টাকায় একজন সুন্দর দাস বা লোক ক্রয় করেন। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, নারী অপেক্ষা পুরুষ দাসের মূল্য অধিক ছিল।

রণপৌত ও ব্যবসা বাণিজ্যঃ

ইবনে বতুতার বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে, তিনি চট্টগ্রামে অবতরন করে অসংখ্য জাহাজ দেখতে পান। তার মতে এগুলো ছিল সুলতান মুবারক শাহের রনতরী। অবশ্য যুদ্ধ জাহাজ ছাড়াও অনেক নৌকা নৌ ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, নদী পথে তরীগুলো এক সাথে দলবদ্ধ ভাবে যাতায়াত করত। প্রতি নৌকায় একটি করে ডঙ্কা থাকত এবং নৌকাগুলো যখন একে অপরকে অতিক্রম করত তখন ডঙ্কা ধ্বনি করা হতো। দলবদ্ধভাবে যাতায়াত এবং ডঙ্কা ধ্বনি থেকে অনুমান করা যায় যে, নদী পথ মোটেই নিরাপদ ছিল না। জলদস্যুদের আক্রমণের সম্ভাবনায় বাণিজ্য জাহাজগুলো আতঙ্কগ্রস্থ থাকত।[১৩০]

ইবনে বতুতার জন্মভূমি পৃথিবীর বৃহত্তর মরুভূমির পার্শ্বদেশ। বহুকাল তিনি উত্তর ভারতের শুষ্ক আবহাওয়া বসবাস করার পর বাংলাদেশে আসেন। সুতরাং নদীপথ প্রায় পঞ্চাশ দিন ব্যাপী সিলেট থেকে সোনারগাঁও যাত্রাকালে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক শোভা তাকে মুগ্ধ করেছিল।

---

১৩০. বাংলার ইতিহাস, পৃ- ১৮৩-১৮৫

দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, নদীপথের বাঁকে বাঁকে গ্রাম ও কিছু দুর পর হাট বাজার চারিদিকে সবুজের সমারোহ তাঁর মনে মিশরের নীল নদীর তীর ভূমির স্মৃতি জাগ্রত করেছিল। জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য ও স্বল্প মূল্য আর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ইবনে বতুতাকে আকৃষ্ট করলেও এই দেশের আবহাওয়া তাঁর পছন্দ হয়নি। শুষ্ক দেশের মানুষ ইবনে বতুতা বাংলাদেশের অতিবৃষ্টি ও তার সাথে আর্দ্রতা, বর্ষকালের কর্দমাক্ত পথ ঘাট এবং বন্যার প্লাবন পছন্দ করতে পারেননি। সেই কারণেই খোরাসানের লোক এই দেশকে 'দোযখপুর আজ নিয়ামত' (ধন সম্পদে পরিপূর্ণ নরক) বলে অবিহিত করেছেন বলে তিনি তার সফর নামায় উল্লেখ করেন।[১৩১]

---

১৩১. বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ- ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সিলেটে ইসলাম ও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর আগমন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিলেটের নাম তত্ত্ব, ভৌগলিক বিবরণ ও প্রসঙ্গকথা

নামতত্ত্বঃ

প্রত্যেক জায়গার নামের ইতিহাস সংগ্রহ করলে ঐ স্থানের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের ও প্রাচীনতত্ত্বের খবর পাওয়া যায়।

১। প্রখ্যাত চীনা পন্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৪০ সালে সমতট হতে জলপথে সিলেট আসেন। তিনি সিলেটকে 'শীলা চটোল' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ইহা সমুদ্র তীরবর্তী স্থান এবং কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার রাজ্যভুক্ত ছিল।[১]

২। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আলবেরুনী একাদশ শতকের প্রথম ভাগে ভারত পরিভ্রমন করেন। ভারতবর্ষের রীতিনীতি ও আচার আচরণ সম্বন্ধে তিনি একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখেন নাম দেন 'কিতাবুল হিন্দ'। গ্রন্থখানি লেখা হয় ১০৩০ ঈসাব্দে। উক্ত গ্রন্থে সিলেটের উল্লেখ আছে। তার মতে কামরূপ, তিলাওয়াত (ত্রিহুত) সিলাহাত[২] প্রভৃতি জনপদ ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এখানে 'সিলাহাত' দ্বারা সিলেট বুঝানো হয়েছে। মুসলিম আমলে এজেলা 'সিলহেট' কারো কারো মতে 'জালালাবাদ' নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকের কাগজ পত্রে Silhet বলে উল্লেখ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কাছাড় ইংরেজ অধিকারে আসার পর কাছাড় জেলার সদর ষ্টেশন Silchar থেকে পার্থক্য দেখবার জন্য এজেলাকে Sylhet বলে উল্লেখ করাহয়েছে।[৩]

৩। সম্রাট আকবরের সময় সিলেট সরকারের আটটি মহালের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিলেট নামকরণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি খুবই জনপ্রিয়। হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়া কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর কোন জনশ্রুতি অনুসারে সিলেট বিজয়ের প্রাক্কালে রাজা গৌড় গোবিন্দের ঐন্দ্রজালিক পাথর বা 'শিল' কে 'হট' বা হটে যা (পাথর সরে যাও) হযরত শাহজালালের এই আদেশে পাথরগুলো অপসারিত হল। কোন কোন জনশ্রুতি অনুসারে পাথর গুলো রাজা গৌড় গোবিন্দের বাহিনীর উপর পতিত হয়। তখন থেকেই শহরের নাম হয় সিলহট। বর্তমান সিলেট 'সিলহট' শব্দের মার্জিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ।[৪]

এভাবে সমগ্র সিলেট জেলায় হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রভাব পড়ে। দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কালক্রমে মুসলিম অধ্যুষিত একটি এলাকায় পরিণত হয়। হযরত শাহজালাল কর্তৃক সিলেট বিজয়ের সুস্পষ্ট কারণে ইহাকে জালালাবাদ নামে অভিহিত করা হয়।

---

১. সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, পৃ ৩৬।
২. প্রাগুক্ত পৃ- ৩৬।
৩. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ২৭৩-২৭৪।
৪. আল ইসলাহ শাহজালাল সংখ্যা, পৃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত শাহজালাল তো আরব দেশ থেকে এসেছিলেন তিনি 'সিল' এবং 'হট' ইত্যকার শব্দ কিভাবে ব্যবহার করলেন? জবাবে বলা যায় হযরত শাহজালাল উড়ে এসে জুড়ে বসেন নাই। ইতিহাস সাক্ষি তিনি ও তার সঙ্গী সাথীরা হাজার হাজার মাইল স্থল পথে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে স্থানে স্থানে ইসলাম প্রচার করতঃ বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। এক পর্যায়ে গৌড় গোবিন্দের অত্যাচারের কথা এবং এর বিরুদ্ধে সিকন্দর শাহের পরাজয়ের কথা জানতে পেরে দরবেশ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার ও সিকন্দর শাহের অনুরোধে সিলেট অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম প্রচার কালে নিশ্চয়ই তিনি স্থানীয় ভাষা সমূহ আয়ত্ব করেছিলেন। ফার্সী ভাষার কথাই উঠে না যেহেতু সে সময় রাষ্ট্র ভাষা ফার্সী ছিল। সুতরাং এ প্রশ্নটি অমুলক বলে প্রতিয়মান হয়। সিলেটের প্রাচীন নাম শ্রী ক্ষেত্র হইতে শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি।[৫]

৪। প্রাচীন গৌড়ের রাজধানীতে রাজা গুহক তাঁর প্রিয়তমা কন্যা শীলার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি হাটস্থাপন করেন ও নাম রাখেন 'শীলা হাট' বা শীলাহট্ট। এই শিলাহট্ট পরবর্তীতে সিলেট বা শ্রীহট্টে রুপান্তরিত হয়।

৫। প্রাচীন কালে পাবর্ত অঞ্চলে শিলা বা পাথরের প্রাচুর্য ছিল এবং শিলা বা পাথরে উপর হাট বা বাজার বসত। গৌড়র রাজধানীর প্রধান 'হাট' বা 'হট্ট' এর সহিত শিলা যুক্ত হয়ে 'শীলাহট্ট' বা 'সিলহট্ট' শব্দের উদ্ভব হয়েছ। শিলার অদ্যাংশ 'শি' বা 'শিল' যুক্ত অন্য নামের স্থান আছে। যেমন শিলচর, শিলঘাট, শিলগুড়ি, শিলং ইত্যাদি।

ইবনে বতুতা যখন হযরত শাহজালালের (রহ.) সহিত মোলাকাত করতে আসেন। তখন তিনি সিলেটকে কামরূপের বনভূমি বলে উল্লেখ করেছেন। মোট কথা সিলেট বা শ্রীহট্ট নাম খুব প্রাচীন বলে মনে হয়না পশ্চিম ভাগ (রাজনগর) তত্রলিপিতে 'শ্রীহট্টমন্ডল' কথার উল্লেখ আছে; ঐ তাম্র লিপি দশম শতকে উৎকীর্ণ হয়। তবে উক্ত শ্রীহট্ট মন্ডল গৌড়ের রাজধানী ছিল না। কিন্তু এতে প্রমাণ হয় যে, দশম শতকে 'শ্রীহট্ট' শব্দ পরিচিত ছিল।[৬]

'সিলেটের মাটি ও সিলেটের মানুষ' গ্রন্থে সিলেট নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এভাবে বলা হয়েছে হযরত শাহজালালের সিলেট (গৌড়) বিজয়ের সহিত ও 'শিলহট' নামের সম্পর্ক আছে বলে অনেকের ধারণা। রাজা গৌড় গোবিন্দ রাজধানীর প্রবেশ পথ 'পাথর' বা 'শিল' দিয়ে বন্ধ করে রাখেন। দরবেশ শাহজালাল (রহ.) তখন আদেশ দেন 'শিলহট' অর্থাৎ পাথর সরে যাও তাঁর নির্দেশে শিল-হটে যায়। তখন থেকে গৌড়ের নাম হয় 'শিলহট'।

ভৌগলিক বিবরণ ও প্রসঙ্গ কথাঃ

শায়খুল মাশাইখ 'আফতাবে বাঙ্গালা' হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.) সহ তিনশত ষাট আউলিয়ার অধিকাংশ আউলিয়ে কেরামের দেহ মোবারক ধারণ করেছে পুন্য ভূমি ঐতিহাসিক সিলেটের মাটি। এখানের মাটির স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের সাথে মুষ্টি প্রদত্ত আরবের মাটির মিল খুঁজে পেয়ে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন মহান দরবেশ হযরত শাহজালাল (রহ.) এ কারণে সিলেটকে বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়।

---

৫. জালালাবাদের কথা, পৃ ১০৩, ১০৪
৬. সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, পৃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত শাহ্ জালাল (রহ.) ছিলেন তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ওলীদের অন্যতম। তিনিই বাংলা ও আসাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আগত আউলিয়া বাহিনীর পথিকৃত বা পূর্বসুরী। এ কারণে হযরত শাহজালাল (রহ.) কে এদেশের আউলিয়াকুল শিরমনী ও সুলতানুল আউলিয়া ওলীকুল সম্রাট হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়। তারই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল একদল মর্দে মুমিন জিন্দা দিল মুজাহিদ বাহিনী। যারা জিন্দেগীভর অফুরন্ত ত্যাগ ও মেহনতের মাধ্যমে বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের শ্বাশত বাণী ও তৌহিদের সুমহান পয়গাম পৌছে দেয়ার ফলে বাংলাদেশ একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র। তাছাড়া দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবেও ইসলামী দুনিয়ায় রয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থান। এদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রয়েছে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীয় ওলী-দরবেশদের অশেষ অবদান।

সিলেটের ভৌগলিক পরিচিতিঃ

সিলেট জেলা (সিলেট বিভাগ) আয়তন ৩,৪৯০.৪০ বর্গ কি.মি. উত্তরে ভারতের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে- মৌলভী বাজার জেলা, পূর্ব ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা। বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.২° সে. সর্ব নিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৬° সে. বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত ৩৩৩৪ মিমি। সিলেটের প্রধান ও দীর্ঘতম নদী সুরমা (৩৫০ কিমি), অপর বৃহৎ নদী হল কুশিয়ারা। এ জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে মোট ৮২টি হাওর ও বিল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সিংগুয়া বিল (১২.৬৫ বর্গ কি.মি) চাতলা বিল (১১.৮৬কিমি) উল্লেখযোগ্য। সিলেটে সর্বমোট রিজার্ভ ফরেষ্ট ২৩৬.৪২ বর্গ কি.মি। জেলার উত্তরপূর্ব কোণে খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের অংশ বিশেষ বিদ্যমান। সিলেট বেশ কিছু ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা রয়েছে। যার মধ্যে জৈন্তিয়া টিলা (৫৪ মিটার) শারিটিলা (৯২ মিটার) লালাখাল টিলা (১৩৫ মিটার) ঢাকা দক্ষিণের টিলা (৭৭.৭ মিটার) উল্লেখযোগ্য।

জনসংখ্যাঃ ২৫,৬৯৭৮৩ পুরুষ ৫০.৭৫% মহিলা ৪৯.২৫% মুসলমান ৯১.৯৬%, হিন্দু ৭.৮০%, খ্রিষ্টান ০.০৯%, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ০.১৫%। খাসি (খাসিয়া) মনিপুরী ও পাত্র (পাথর) সম্প্রদায়ের উপজাতির বসবাস রয়েছে।[৭]

ভূতত্ত্ববিদ পন্ডিতগণের মতে বাংলাদেশকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁরা বলেন, সুবিশাল পদ্মা দক্ষিণবঙ্গকে উত্তর বঙ্গ থেকে বিভক্ত করেছে এবং দক্ষিণ বঙ্গের বন্যা কবলিত অঞ্চলকে উত্তর বঙ্গের শুষ্ক ভূমি থেকে পৃথক করেছে। উত্তরাঞ্চল ব্রম্মপুত্র ও মেঘনা দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সর্ব পশ্চিমে রয়েছে বরেন্দ্র মালভূমি, শক্ত ও লাল মাটি দ্বারা গঠিত। সত্য কথা বলতে গেলে একে গঙ্গার খাদের উপত্যকার এক বিস্তৃতি বলা যায়। দ্বিতীয় ভূখন্ড হচ্ছে উত্তর দিকে অবস্থিত ঢাকা ভূ-ভাগ। তার শক্ত অংশ মধুপুরের লাল মাটি দ্বারা গঠিত। একে বরেন্দ্র ভূমির এক বিস্তৃতি বলা যায়। তবে পশ্চিম ভূভাগ থেকেএ খন্ড ব্রম্মপুত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

---

৭. বাংলা পিডিয়া, ১০খ, পৃ ১৯৩-১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ স্থলে ব্রহ্মপুত্র যমুনা নামে অভিহিত। পূর্বাংশকে সুরমা উপত্যকা বলা যায়- উত্তর ও দক্ষিণ ভূ খন্ডের অন্তরবর্তী গম্বুজের মত পলিমাটির এক দেশ।

একে গম্বুজ বিশিষ্ট বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ ভূ খন্ডের পূর্ব দক্ষিণ অঞ্চল উচু টিলা দ্বারা গঠিত এবং উত্তর পশ্চিমাংশ নিম্নভূমি। সিলেট এ সুরমা উপত্যকায় অবস্থিত। তার উচ্চাংশে রয়েছে লাল মাটি ও টিলা, অপরদিকে নিম্নাংশে রয়েছে জলাশয় পূর্ণ ভাটি অঞ্চল।

জনশ্রুতি রয়েছে, বৃহত্তর সিলেটের পশ্চিমাংশে অর্থাৎ সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে এক জলাশয় ছিল, তার নাম ছিল কালীদাহ।

সিলেটের এ দুই অঞ্চলের মধ্যে মৃত্তিকার ও উচ্চতার ব্যবধান থাকায় তাদের মধ্যে জলবায়ুর ও পার্থক্য রয়েছে। উচ্চ ভূমি স্বাভাবিকভাবে শুষ্ক হয় বলে সিলেটের উচ্চভূমি নিম্ন ভূমির তুলনায় অধিকতর শুষ্ক। অপরদিকে ভাটি অঞ্চলের ভূমি কৃষ্ণ বর্ণ। বর্ষা সমাগমে এ অঞ্চল সাগরের আকার ধারণ করে। এজন্য বর্ষাকালে এ অঞ্চল অত্যন্ত স্যাতস্যাতে হয়ে যায়। বৃষ্টিপাতের পরিমান ও সিলেটের সকল অঞ্চলে সমান নয়। খাসিয়া পাহাড়ে অবস্থিত চেরাপুঞ্জিতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় বলে চেরা পুঞ্জির নিকটবর্তী সিলেটের সকল অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য সিলেট সদর ও সুনামগঞ্জ জেলার উত্তরাংশে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। এ অঞ্চল থেকে দুরবর্তী অঞ্চল সমূহে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তত প্রবল নয়। তবুও গড়পড়তা বৃষ্টি পাতের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, সিলেটে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান থেকে অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়। তেমনি বর্ষাকালে কোন কোন স্থান প্লাবিত হয় বলে তাতে পাতিয়া, বেত, হিজল, বরুন প্রভৃতি উৎপন্ন সম্ভব হয়।[৮]

সিলেট বিভাগ তিনদিক থেকে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে মেঘালয়, পূর্বে আসামের কাছাড় জিলা এবং দক্ষিণে ত্রিপুরা রাজ্য। ঐতিহাসিকদের ধারণা সিলেট বিভাগের নিম্নাঞ্চল ও সমতল ভূমি এক সময় সাগরের অংশ ছিল।

এখানকার সুবিশাল হাওর, বিল ঝিল এবং নৌ ঘাটির অস্তিত্ব এ সাক্ষ্য বহন করে। হাওরের উৎপত্তি সায়ার বা সাগর থেকে। সিলেট বিভাগের প্রশাসনিক ইতিহাসে দেখা যায়, সিলেট কখনো বাংলা আবার কখনো আসামের অন্তর্ভূক্ত ছিল। রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময় সিলেট বিভাগের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। ১৮৭৪ ঈসায়ী সিলেট একজন চীফ কমিশনারের অধিনে আসামের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট নূতন সৃষ্ট পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্রশাসনের অধিনে আসে। ১৯১১ ঈসায়ী নূতন প্রদশে বাতিল হলে সিলেট তার পুরাতন প্রসাশনিক অবস্থায় আসামে ফিরে যায়। ১৯৪৭ ঈসায়ী গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পূর্ব পাকিস্তানের আওতাধীন হয। ১৮৭২ ঈসায়ীর জরিপ অনুযায়ী সিলেটের আয়তন ছিল ৫,৩৮৭ বর্গমাইল।

---

৮. সিলেটে ইসলাম পৃ- ১, ২

১৯৪৭ এর গণ ভোটের পূর্বে বর্তমান সিলেট বিভাগের মূল সীমানা ছিল ৫,৪৪০ বর্গ মাইল, এখন আসামের অধীনে ন্যস্ত সাড়ে তিনটি থানা ব্যতিত সিলেটের বর্তমান সীমানা ৪,৯১২ বর্গমাইল।

খ্রিষ্টিয় দশম শতাব্দীতে বাংলায় চন্দ্র বংশের রাজত্ব কালে রাজা শ্রীচন্দ্রের অধিনে শ্রীহট্ট মন্ডল নামে একটি প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। যা সামন্ত রাজাদের দারা শাসিত হতো। এক কালে সিলেট লাউড়, গৌড় এবং জৈন্তা, ইটা, তরফ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ষষ্ট হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এখানে মানুষের বসবাস বাড়তে থাকলে এবং তখন থেকে একটি সভ্যতা গড়ে উঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৩০৩ ঈসায়ী হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রহ.)'র রূহানী নেতৃত্বে বিজয়ের পর সিলেট মুসলিম সুলতানদের অধিনে আসে। ১৬২২ ঈসায়ী পাঠান গোত্র প্রধান আফগান বীর খাজা ওসমান লোহানী সহ সিলেটের অন্যান্য ভুইয়াঁরা মুগল সেনাপতির নিকট পরাজিত হলে সিলেট মুগলদের শাসনাধীন আসে। এসময় সিলেটের প্রশাসন ছিল মুগল গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত ফৌজদারের অধীনে। ১৭৬৫ ঈসায়ী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর সিলেটের বিস্তারিত ইতিহাস জানা সম্ভব হয়। ইংরেজ শাসনামলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং বিদ্রোহের জন্য সিলেট বিখ্যাত ছিল। উপমহাদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয় সৈয়দ মোহাম্মদ হাদী ও সৈয়দ মাহদীর নেতৃত্বে ১৭৮২ ঈসায়ী জনসাধারণের মাঝে যাহা হাদা মিয়া ও মাদা মিয়া নামে পরিচিত। ১৭৮৩ ঈসায়ী খাসিয়া বিদ্রোহ, ফকির সন্যাসী আন্দোলন (১৭৬৩ - ১৮০০ ঈসায়ী) কুকি বিদ্রোহ ১৮২৬ ঈসায়ী উপমহাদেশের সিপাহী বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ ঈসায়ী এবং নানকার আন্দোলন ১৯২২-২৩ ঈসায়ী সংঘঠিত হয়।

সিলেট বিভাগের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষত তেল, গ্যাস, কাঠ, বাঁশ, তেজপাতা, চা, কমলালেবু, চুনাপাথর, মাছ (পানি সম্পদ) বিভিন্ন পশু পাখির জন্য ও সুপরিচিত। বাংলায় ইংরেজ কর্তৃত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ বিভাগের প্রশাসন ক্রমে ইংরেজ কোম্পানীর অধিনে চলে যায়। স্থানীয় বৈচিত্রের কারণে সিলেট বিভাগের ভূমি বন্দোবস্ত পদ্ধতি এমনকি চিরস্থায়ী জমিদারী পদ্ধতি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৭৯৩ ঈসায়ী এ বিভাগের প্রকৃত ভূমির উপর ৩,১৬,৯১১/- টাকা রাজস্ব ধার্য্য করা হয়। যার ফলে বাংলার অন্যান্য জেলা হতে সিলেট ছিল ব্যতিক্রম।

১৮৭৪ ঈসায়ী বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী হতে সিলেটের বিচ্ছিন্নতা সিলেটকে রাজনীতি, প্রশাসন এবং শিক্ষাগত দিক থেকে আসামের উপর আাদিপত্যকারী অবস্থানে এনে দেয়। তথাপি সিলেটের জনগন বাংলা ভাষার প্রতি তাদের প্রকৃত মনত্ব বোধের জন্য সরকারের বিরোধীতা করে। এ ছাড়া জনগন অনুন্নত এলাকার সাথে সিলেটের মতো উন্নত এলাকার সংযুক্তি পছন্দ ও করেনি। এ অবস্থায় গভর্নল জেনারেল নর্থ ব্রক সিলেটে আসেন এবং সিলেটের সংস্কৃতি ওঐতিহ্য রক্ষার করার ব্যাপারে আশ্বাস দেন। এমনকি এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সিলেটের শিক্ষা ও বিচার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা যথাক্রমে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্টের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কিন্তু ১৯৪৭ ঈসায়ী পূর্ববঙ্গে (পুর্ব পাকিস্তানের) সাথে সংযুক্তি পর্যন্ত জনমনে উত্তেজনা ও ক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

একটি শ্লোগানে এর প্রমাণ মিলেঃ

আসামে আর থাকবোনা গুলি খেয়ে মরবোনা
আসাম সরকার জুলুম করে নামাজেতে গুলি করে।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া ও আরো কয়েকটি কারণে স্মরণাতীত কাল থেকে সিলেট বিভাগ গুরুত্ব তাৎপর্যময়। সিলেট শহরে হযরত শাহজালালের (রহ.) দরগাহ শরীফ কেবল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অগনিত মুসলিম লোকজন দর্শন ও জিয়ারত করতে আসেনা বরং অন্যান্য দেশ ও ধর্মের লোকজন, এমনকি ইংরেজরাও দরগা শরীফ জিয়ারত করতে আসতেন।

খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইবনে বতুতার সিলেট আগমন এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ সিলেটের-ই ইতিহাসের অংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদের বাংলার বিজয়ের পূর্বে বাংলায় কিছু সংখ্যক সুফীর আগমন ও বসতি স্থাপন সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ থাকলেও বাংলার সকল অংশে ইসলামের প্রসার এবং মুসলিম সমাজ সংগঠন ও সম্প্রসারণে সুফিদের অবদান আদৌ উপেক্ষনীয় নয়। হযরত শাহজালাল (রহ.) এং তাঁর প্রিয় তিনশত ষাট জন সঙ্গী বাংলা ও আসামে ইসলাম বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দিন গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট বিজয় এক বহুল প্রচলিত ইতিহাস।

সিলেট বিভাগে রয়েছে দেশের অধিকাংশ চা-বাগান। চা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে (১৮৪৭ - ৫৪ ঈ.) প্রতিষ্ঠার কিছুকালের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ১৮৮০ দশক থেকে চা শিল্প স্থানীয় ও ব্রিটিশ আবাদ কারীদের পৃষ্টপোষকতায় বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের ১৫৬টি চা বাগানের মধ্যে ১৩৪টি সিলেট বিভাগে অবস্থিত। ত্রিশ হাজার শ্রমিক সহ প্রায় তিন লক্ষ লোক এই চা বাগানের উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু এ বিভাগটি দেশের মোট চা রপ্তানি ৯৬% যোগান দেয়।

সিলেট বিভাগের বাসিন্দাদের ইংল্যান্ড অভিবাসন শুরু হয় প্রায় দু'শ বছর আগে। প্রবাসী সিলেটীদের প্রেরিত অর্থে সিলেটের সমৃদ্ধি তথা বাংলাদশের জাতীয় আয়েও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ কোম্পানীর জাহাজে করে বহু লোক সিলেট থেকে বিদেশে যায়। জাহাজের অধিকাংশ নাবিকই ছিল সিলেটের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু সিলেটি ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে যোগ দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সিলেটিদের জন্য নূতন সুযোগ আসে। সংগত কারণেই ব্রিটিশ সরকার তার শিল্প কারখানা পুনর্গঠনের জন্য কমনওয়েলথ দেশ সমূহ থেকে শ্রমিক নিয়োগে উৎসাহিতদের ৯৮% ভাগ সিলেট বিভাগের অধিবাসী।[৯]

১৯৯৫ সালের ১লা আগষ্ট সিলেট দেশের ষষ্ট বিভাগ হিসাবে মর্যাদা পায় এবং মূলত বৃহত্তর সিলেট জেলার সীমানাই নূতন সিলেট বিভাগের আওতাভুক্ত করা হয়।[১০]

---

৯. মোস্তফা কামাল সৈয়দ, সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, (সিলেট, মেনেনা পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারী-২০০০, ১ সং, পৃ- ৬৯।
১০. বাংলা পিডিয়া, পৃ- ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিভিন্ন যুগে সিলেটের অবস্থা

প্রাচীন যুগ ঃ

প্রাচীন কালে সিলেট জেলায় অষ্ট্রিক জাতীয় লোক বাস করত। তারা হাড় ও পাথর দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণ করত। তারা তামা ও লোহার ব্যবহার জানত। কৃষি কার্যে তাদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। তারাই এদেশে ধানেরচাষ শুরু করে। তারা নারকেল, কলা, সুপারি, আদা, হলুদ, লাউ, প্রভৃতির চাষ করত। হয়ত তারা এদেশে তুলার চাষ ও প্রচলন করেছিল। তারা কড়ির সাহায্যে কেনাবেচা করত। আমরা এক গন্ডা, দুই গন্ডা, এক কুড়ি, দুই কুড়ি ইত্যাদি গননার নিয়ম এদের থেকে পেয়েছি। আজকাল অষ্ট্রিকদের ভেড্ডিড বলা হয়। অষ্ট্রিকদের পরে এদেশে মঙ্গোলীয় জাতির লোক বাস করে। এদের গোল বা মাঝারি মাথা, বাঁকাচোখ, দেখতে ছোট খাটো ও গায়ের রং ময়লা। মঙ্গোলীয়া প্যারোযাইন শাখার লোকই এদেশে বেশি দেখা যায়। এদের বড় জাতের লোক প্রধানত আসামের কাছাড় জিলা ও ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে। এরা সিলেট জেলার পার্বত্য অঞ্চলেও বাস করত। এর পরে পঞ্চম কি ষষ্ট শতাব্দিতে আসেন আর্যরা। এদের দেহের গঠন বলিষ্ট। এরা গৌর বর্ণ, দীর্ঘ আকৃতি এদের মধ্যে মাথা লম্বা, চোখ কটা, নাক লম্বা ও সরু।

মুসলমানরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হযরত শাহজালাল ও তার সঙ্গীরা এদেশে আগমন করে চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে যা ছিল এদেশে ইসলাম প্রচারের স্বর্ণযুগ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বিদ্রোহী পাঠানরা উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে মোগলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পূর্ববঙ্গের নানা দুর্গম স্থানে আশ্রয় নেয়। এদের অনেকে সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। ত্রয়োদশ পঞ্চদশ শতাব্দীর উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা রাঢ় থেকে পালিয়ে সিলেটে আসেন।

হিউয়েনসাঙ এর বিবরণীতে (৬২৯-৪৫ খ্রিঃ) আছে সমতট থেকে উত্তর পূর্ব দিকে সাগরের তীর ভূমি বরাবর এগিয়ে পাহাড় ও উপত্যকা ডিঙ্গিয়ে আমরা 'শিলি টেলেই' পৌঁছলাম। কেউ কেউ মনে করেন এই সিলটেলই সিলেট। কিন্তু আধুনিক পন্ডিতদের মতে শিলিচটল বঙ্গদেশের শ্রী ক্ষেত্র বা প্রাচীন প্রোম নগরী।[১১]

সিলেটে প্রাপ্ত তাম্রশাসনঃ

পঞ্চখন্ড পরগনার নিধনপুর গ্রামে ১৯২২ থেকে১৯২৫ সালের মধ্যে ছয়খানা তাম্র শাসন পাওয়া যায়। এগুলির দ্বারা কামরূপের সপ্তম শতাব্দীর মহারাজা ভাস্করবর্মা। তার প্রপিতামহ মহাভতি বর্মা কর্তৃক দান করা ভূমি পুণরায় দান করেন। ঐ দানকৃত ভূমি চন্দ্রপুরী বিষয়ের (জেলার) অন্তর্গত ছিল। পদ্মনাথ ভট্টচার্য, কনকলাল বড়ুয়া প্রভৃতি ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, দানকৃত ভূমি উত্তর বঙ্গে ছিল। কিন্তু নলীনা কান্ত ভট্রশালী, যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ পন্ডিতরা দানকৃত ভূমি সিলেটে ছিল বলে মনে করেন। ১৯৬১ সালে রাজনগর থানার পশ্চিম ভাগ গ্রামে বিক্রমপুরের মহারাজা শ্রীচন্দ্রের দশম শতাব্দীর একটি তাম্র শাসন পাওয়া যায়। ঐ তাম্র শাসন থেকে জানা যায় নিধনপুর চন্দ্রপুরী বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

---

১১. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ. ৭৭-৭৮, সূত্র Fiftienth Auniversary of publication of Burma Research Society, p- 262.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৩ সালে শ্রীমঙ্গল থানার কালীপুর গ্রামে আরেকখানি তাম্র শাসন পওয়া যায়। ঐ তাম্রশাসন দ্বারা সামন্ত নৃপতি মরুণ নাথ মৌলভীবাজার সাব ডিভিশনে কতেক ভুমি দান করেন। এই তাম্র শাসন সপ্তম শতাব্দীর এই দানপত্রের লিপি কুমিল্লায় প্রাপ্ত সামন্ত নৃপতি লোকনাথের তাম্রশাসনের লিপির অনুরূপ। লোকনাথ ও মরুন্তনাল উভয়েই শ্রীনাথের বংশীয় ছিলেন।

১৮৭২ সালে ভাটেরা পরগনায় দুই খানা তাম্র শাসন পাওয়া যায়। ঐ তাম্র শাসনে নবনীধান, গনগুন নারায়ন ও গোবিন্দ কেশব দেব নামক রাজাদের উল্লেখ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন এই তাম্রশাসনদ্বয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর। এই সকল তাম্র শাসন থেকে জানা যায় সপ্তম শতাব্দীতে সিলেট কামরুপের অধীন ছিল। অতঃপর সিলেট ত্রিপুরার শ্রীনাথের বংশধরদের অধীনে আসে। দশম শতাব্দীতে সিলেট বিক্রম পুরের চন্দ্র বংশীয় রাজাদের অধীন ছিল। একাদশ - দ্বাদশ শতাব্দীতে এই জেলা স্থানীয় সামন্ত নৃপতিদের অধিকারে ছিল। সিলেট জেলার চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের আটটি মুদ্রা পাওয়া যায়। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে সিলেট সমতট হারিকেল, পার্টি খেয়া ইত্যাদি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পাল বংশীয় রাজাদের এ জেলা অধিকার করতে কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১২]

তুর্কি আমলঃ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত আরব পর্যটক সোলায়মান ছয়রফী পারস্য সাগর হইতে বাহির হইয়া ভারত সাগরে গমন করিয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রমকালে বাংলার বিখ্যাত বন্দর চট্টগ্রাম ও সিলহেটের উল্লেখ বার বার করিয়াছেন। সিলেট যে তৎকালে বিখ্যাত বন্দর ছিল প্রাচীন আরবী ইতিহাস হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গেপসাগরে প্রবেশ করিলে তাহাদের অবস্থান কেন্দ্র হইতে সিলহেট আরবদের ভাষায়- সিলাহত।

সিলেট যে এক কালে বন্দর ছিল তার স্মৃতি স্বরূপ বন্দর বাজার ও চালিবন্দর আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যখন সিলেটের কালেক্টর রবার্ট লিনডসে ঢাকা থেকে নৌকা যোগে সিলেট আসেন তখন তাকে সিলেট জেলার পশ্চিমস্থ হাওরে সামুদ্রিক ক্যাম্পাসের সাহায্যে নৌকা চালনা করতে হয়েছিল। ১৩০৩ সালে হযরত শাহজালাল সিলেট জয় করেন।

সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল তাঁর সঙ্গী নুরুল হুদা আবুল কেরামত সাইদী হোসেনের উপর এ জেলার শাসন ভার অর্পন করেন। নুরুল হুদা সিলেটে হায়দর গাজী নামে পরিচিত। নুরুল হুদার অব্যবহিত পরবর্তী শাসনকর্তাদের নাম জানা যায় না। বাংলাদেশ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। কাজেই বাংলাদেশের এ সময়ের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে দিল্লী ও উত্তর ভারতের লিখিত ইতিহাসে কোন বিবরন পাওয়া যায় না। সিলেট মোগল শাসনে আসে ১৬২২ সালে। এর পূর্ববর্তী সময় সিলেটের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ।

---

১২. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৮০, সূত্র Numismatic charonicle Vo.. XX p229, (সিলেট প্রাপ্ত তাম্র শাসন সকলের বিস্তারিত বিবরণ কমলা কান্তগুপ্ত চৌধুরীর অধুনা প্রকাশিত Coppert platers of Sylhet নামক মূল্যবান গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হল)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত সারদা তিলক নামক সংযুক্ত এক খানা 'দাস বিক্রয়-পত্র' থেকে জানা যায় ১৪৪০ সালে বাংলার স্বাধীন সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ সাহেবের আমলে মুকাবিল খান সিলেটের উজীর ও সরে লস্কর ছিলেন। তিনি তখন সিলেটের শাসনকর্তা ছিলেন। তার কবর শাহজালাল (রহ.) এর দরগায় আছে।

সোনার গাঁওয়ে প্রাপ্ত ১৪৭৪ সালের এক শিলালিপি থেকে জানা যায় নবাব মোবারক-উদ-দৌলা মালিক উদ্দিন তখন ইকলিমে মুয়াজ্জামাবাদ ও লাউড়ের ওজীর ছিলেন। ইকলিম-ই-মুয়াজ্জামাবাদ পূর্বময়মনসিংহ পশ্চিম সিলেটের ভাটী অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল। কাজেই দেখা যায় মালিক উদ্দিন ঐ সময়ে সিলেট জেলার পশ্চিম অংশের শাসক ছিলেন। মৌলভী বাজার সাব ডিভিশনে (বর্তমান জেলা) গয়গড় গ্রামের মসজিদ লিপি থেকে জানা যায় যে, ১৪৭৬ সালে মজলিছে আলাম নামক মন্ত্রী ঐ মসজিদ নির্মাণ করেন। হয়ত তিনি তৎকালে সিলেটের শাসক ছিলেন।[১৩]

মুসলিম আমলঃ

১৩০৩ সালে বাংলার সুলতান শামস উদ্দীন ফিরুজ শাহের (১৩০১-১৩২২) সময়ে সিলেট জেলা মুসলমানদের অধিকারে আসে। এর পরে ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সুলতানেরা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়া কতৃক সিলেট বিজয়ের পর সিলেটের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সিকান্দর গাজী সিলেটের সর্ব প্রথম মুসলিম শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে সিকন্দর শাহের উল্লেখ আছে। ১৩৫৭ ঈসায়ী পর্যন্ত তাঁর যুগ বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। সিলেটের প্রথম মুসলিম শাসনকর্তা সিকান্দর শাহ-ই পরবর্তীকালে ১৩৫৭ ঈসায়ী বাঙলার সিংহাসন লাভ করে সমগ্র বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন কি? সিকান্দর সাহের পর নুরুল হুদা গাজী সিলেটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রুকন খানঃ

সিলেটের আলা উদ্দিনের পুত্র রুকন খান বাংলার বিখ্যাত সুলতান আলা উদ্দীন হোসাইন শাহের সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৫১১ সালে শাহজালাল (রহ.) এর দরগায় একটি মসজিদ নির্মান করান। হয়ত সামরিক কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি সিলেট বসবাস করেন।

দাউদ নগরের শাহ আহমদ উল্লার বাড়ী সংলগ্ন মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৫১৩ সালে ইকলিমে মুয়াজ্জমাবাদের স্ত্রী খোয়াস খান ঐ মসজিদ নির্মাণ করান। হোসেন শাহ খোয়াস খানকে ভাটি অঞ্চলের শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায় কোচ নৃপতি নারায়নের ভাই বিখ্যাত সেনাপতি চিলারায় ১৫৬৩ সালে সিলেট অধিকার করেন চিলের মত অতর্কিতে আক্রমণ করতেন বলে এই সেনাপতির নাম ছিল চিলা রায়। চিলারায় জনপ্রিয় নরপতি বিজয় মানিককে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন।[১৪]

---

১৩. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ ১০৩।
১৪. প্রাগুক্ত পৃ-৮২

অমর মানিক্যের অভিযানঃ

১৫৮১ সালে ত্রিপুরার নরপতি অমর মানিক্য (১৫৭৭-৮১ঈ.) তাঁর রাজধানীতে একটি বড় দীঘি খনন করান। তিনি অধীনস্ত সমস্ত নৃপতিদের মজুর পাঠাতে হুকুম করেন। তরফ বহুকাল ত্রিপুরার অধীনে ছিল। সৈয়দ মুসা এই সময়ে তরফের শাসক। মুসা মজুর পাঠাতে অস্বীকার করায় ত্রিপুরার যুবরাজ রাজধর মানিক্য বাইশ হাজার সৈন্য সহ তরফ আক্রমন করেন। চুনারুঘাটের নিকটবর্তী জিকুয়া গ্রামে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাঁধে। ত্রিপুরার বাহিনী বিজয় লাভ করে। সৈয়দ মুসা ও তার পুত্র বিরাম (ইব্রাহিম) ও সেনাপতি শুদ্ধরাম বন্দী হন। বিরামকে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি দেওয়া হয়। মুসা বন্দী অবস্থায় ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে নিহত হন।

এই যুদ্ধে সিলেটের পাঠান শাসনকর্তা ফতেহ খান তরফ পতির পক্ষ অবলম্বন করায় ত্রিপুরার সৈন্য দিনারপুরের পথে সিলেট আক্রমন করে। সিলেট শহরের দক্ষিনস্থ গোধরাইল গ্রামে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয। ঐরাবত বাহিনীর সাহায্যে ত্রিপুরার সৈন্যদল জয়ী হয়। ফতেহ খান বন্দী হয়ে দুলালী ও ইটা পরগনার মধ্যে দিয়ে ১৫৮২ সালে ১লা মাঘ ত্রিপুরার রাজধানী উদয় পুরে নীত হন। ফতেহ খানের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই বিজয়ের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ অমর মানিক্য ১৫০৩ (১৫৮১ ঈ.) এক মুদ্রা প্রচার করেন। সিলেটে প্রাপ্ত ও বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় মসনদ ফতেহ আলী খান ১৫৮৮ সালে সিলেটের শাসক ছিলেন। এতে মনে হয় ত্রিপুরা থেকে মুক্তি লাভ করে ফতেহ খান পুনরায় সিলেট সু প্রতিষ্টিত হন।

সম্রাট আকবরের সময়ে সিলেট বিদ্রোহী সামন্তদের অধীনে ছিল। আইনই আকবরীতে কিন্তু সিলেটের রাজস্ব উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদির উল্লেখ আছে। শের শাহের সময় বাংলাদেশের ভূমি পরিমাপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। অনুমান হয় আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত বিবরণ শের শাহের আমলের কাগজ পত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

আইনী আকবরীর মতে সিলেট আটটি মহালে বিভক্ত। এই মহাল গুলির নাম প্রতাপ গড়, বানিয়াচুঙ্গ, বাজায়া, জয়ন্তীয়া, হাবেলী সিলেট, সতর খন্ডন (সরাইল) লাউড় ও হরিনগর।

সিলেটের রাজস্ব ১৬৭,০৪০ টাকা নির্ধারিত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে লেখা আছে সিলেটে অনেক খোজা ও ক্রীতদাস পাওয়া যেত, সিলেটের কাঠ, কমলালেবু, তেজপাতার কথা ও শেরগঞ্জ ও বিহঙ্গরাজ নামক পাখীর বর্ণনা ঐ গ্রন্থে আছে। জয়ন্তীয়া তখন স্বাধীন ছিল। আইন-ই-আকবরীতে জয়ন্তীয়া রাজস্ব মাত্র ৬৮০ দাম নির্ধারিত হয়েছে। এতে মনে হয় জয়ন্তীয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ (উত্তর কাছ ও দক্ষিণ কাছ পরগনা) মোগল অধীকারে ছিল। সরাইল ব্রিটীশ আমলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সিলেট জেলার মধ্যে ছিল।[১৫]

---

১৫. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর সিলেটের পরবর্তী শাসনকর্তাদের নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। Statistical Account of Assam গ্রন্থে w.w. Hunter লিখেছেন- After the death of Shah Jalal the district as then constitued was included in the kingdom of Bengal. and Put in charge a Nowab. In the reign of Akbar it passed with the rest of Bengal into the Mughal Emperors and from that time was ruled byan amil (Locally Known as a Noyab) Subordinate of the Nowab of Dacca at one time there was in existence a full account of the proceding of the amils, collected from the Kanungo's records but the few copies have all been lost of destroyed and the only traces now remaining of any of the works of are the building as cribed to certion their number the names of about forty can still be gathered from their seais and they seen to have been constantly changed. (p-260) এরূপ বিবরন হতে ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নলিখিত আমিল বা ফৌজদারদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৪৪০ ঈসায়ী মুকাবিল খান
১৪৭৪ ঈসায়ী মালিক উদ্দীন
১৪৭৬ ঈসায়ী মজলিশ আলম
১৫১১ ঈসায়ী রুকন খান
১৫১৩ - খোয়াজ খান
১৫৮১- মসনদে আলা ফতেহ খান

উল্লেখ্য ১৫৮১ ঈসায়ী সিলেটের ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে। এই সময়ে ত্রিপুরার অমর মানিক্য (১৫৭৭-৮৬ খ্রিষ্টাব্দে)তরফ অভিযান করেন। ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে অমর মানিক্য তরফ জয়করেন এবং এই ঘটনাকে স্মরণ করিয়া রাখার জন্য বিজয় মুদ্রা (Victory coins) চালু করেন। সুতরাং এই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নাই। এই যুদ্ধের বিবরণ ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা ও সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায়।[১৬]

পাঠান আমল

খাজা উসমানঃ

মোগলদের কবল থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্র গন্য ছিলেন পাঠান বীর খাজা উসমান (১৫৭১-১৬১২)। তিনি উড়িষ্যার আফগান অধিপতি কতলুখাঁন লোহানীর ভ্রাতৃস্পুত্র ও উত্তরাধিকারী। মানসিংহ কর্তৃক উড়িষ্যা-

---

১৬. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, (শ্রাবন-আশ্বিন) ১৩৭২ বাং, পৃ-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি ময়মনসিংহের বোকাই নগরে আশ্রয় নেন। বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁর সেনাপতি শেখ কামাল উসমানকে ১৬১১ সালের অক্টোবর মাসে বোকাই নগর থেকে তাড়িয়ে দেন। উসমান তখন লাউড়ের পথে সিলেট জেলায় ঢুকে (পরগনায়) রাজনগরের রাজা সুবিধ নারায়ন কে পরাজিত করেন।

সুবিধ নারায়নের চারপুত্র মুসলমান হয়ে জামাল খান, কামাল খান, হাজী খান ও ঈশা খান নামে পরিচিত হন। তাঁদের বংশধরেরা সসম্মানে রাজনগর বাস করছেন। প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী দেওয়ান বাসিত এই বংশের। উসমান শ্রী সুর্য ও পতন উসার গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন ইতিপূর্বে যে সকল বিদ্রোহী পাঠান সিলেট জেলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের নেতা ছিলেন বায়জীদ কররানী। বায়জিদ সিলেট শহরে বসবাস করেন। উসমান ও বায়েজিদ মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন। বানিয়াচুঙ্গের আনোয়ার খার ও মতঙ্গের (শতং?) পহলোয়ানের সঙ্গেও উসমানের সৌহার্দ ছিল। উসমানের পুত্র মুমরীষ ও ভ্রাতা মলিহার উপর তরফ দুর্গের ভার ছিল।

ইসলাম খাঁ উসমানের বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী পাঠাতে স্তির করেন। অভিযান আরম্ভের পূর্বে উসমানকে বশ্যতা স্বীকার করতে অনুরোধ করে দুত মারফৎ চিঠি পাঠানো হয়। উসমান জবাব- দেন 'আমি আমার গর্ব ভুলে ভাগ্য বিপর্যয়ে এক কোনে আশ্রয় নিয়েছি। যদি তোমরা আমাকে এখানে শান্তিতে থাকতে দাও তবে ভাল। সারা দেশ তোমাদের দখল থাকা সত্বেও যদি তোমরা আমার অধিকৃত এই ক্ষুদ্র অঞ্চল কেড়ে নিতে চাও, তবে আমি যুদ্ধ করতে বাধ্য হব। আমার সামনে থাকবে দুটি পথ। যদি ভাগ্য তোমাদের সাহায্য করে তবে তোমরা জয়লাভ করবে। আর ভাগ্য যদি আমাকে ই সাহায্য করে তবে দেখব আমাকে কোথায় নিয়ে যায়।'

উসমানের এই তেজোদৃপ্ত উত্তর পেয়ে ইসলাম খান সুজাত খানের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। উসমানকে দমন করতে ইহতিমাম খান, মির্জা নাথান ও মুতাকিদ খান ইত্যাদি সেনাপতিরা ও এই বাহিনীতে ছিলেন। এই সেনাদলে ছিল সুবাদারের অশ্বারোহী সেনাদল থেকে বাছা বাছা পাঁচশ অশ্বারোহী। আর ছিল চার হাজার বন্দুকদারী সিপাই ও একশো রণকৌশলী হস্তী।

সুজাত খাঁ ঢাকা থেকে যাত্রা করে প্রথমে সরাইলে পৌছেন। নৌবাহিনী এখানে থেকে যায়। স্থল বাহিনী মেঘনা নদীর পার দিয়ে ৩৪ মাইল পথ পেরিয়ে তরফের দুর্গ দখল করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আঁকা রেনেলের মানচিত্রে তরফের দুর্গের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এটি ছিল পুটি জুরি থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে। তরফ থেকে রওয়ানা হয়ে মোগল বাহিনী পুটিজুরীর দুর্গ আক্রমন ও দখল করে। পুটিজুরী দুর্গের অধিনায়ক উসমানের ভাই ওয়ালী প্রতিরোধ না করে পালিয়ে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দেন। সেনাবাহিনী পুটিজুরী পৌছলে এক হাজার বন্দু কদারী অশ্বারোহী সৈন্য মোগল বাহিনীতে যোগ দেয়। এদের সঙ্গে রসদ ও আসে। পুটিজুরী ছেড়ে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে মোগল বাহিনী দৌলম্ভ পুরের নিকটস্থ জলা ভূমিতেই পৌঁছে। হাইল হাওরের উত্তর দিকের জলা ভূমিতে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। উসমানের রাজধানী উহার (বর্তমান পতন উষার) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তেরো মাইল পশ্চিমে ছিল।

উসমান রাজধানী থেকে যাত্রা করে মোগল বাহিনী থেকে দুই মাইল দুরে শিবির সন্নিবেশ করে দুই প্রতিদন্দি বাহিনীর মাঝে ছিল এক জলাভূমি তখন শীতকাল। জলাভূমিতে সামান্য জল ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ইটার পারিবারিক ইতিহাস বলে, ১৫৯৮ ঈসায়ী তরফ, রাজনগর ও শ্রীহট্টের উত্তরাংশ অধিকার করত খাজা উসমান পতন উষার গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১৩ বৎসর দক্ষিণ শ্রীহট্টে শাসন করার পর মোগল সেনাধ্যক্ষ ইসলাম খাঁর সঙ্গে ১৬১২ ঈসায়ী যুদ্ধ করত প্রাণ ত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা আছে মির্জা নাথান রচিত 'বাহারিস্থান গাইবী' নামক ইতিহাসে। মির্জা নাথান ওরফে সিতাব খান মোগলদের সেনাপতি ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি এই যুগান্তকারী যুদ্ধের খুটিনাটি বিষয় বর্ণনা দিয়েছেন। যদুনাথ সরকার Military History of India গ্রন্থে এই যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে This is many ways the most interesting Indian battle of the days before the English. সৈয়দ আব্দুস সাত্তার বঙ্গের শেষ বীর' নামে খাজা উসমানের জীবনী লিখেছেন। শত্রু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীর চক্ষুভেদ করে মস্তিষ্কে প্রবেশ করা সত্ত্বেও তাকে আহত দেখে সৈন্যগণ যাতে ভগ্নোৎসাহ না হয সেই নিমিত্তে নিজ হস্তে তীর বের করে উসমান যে অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ভাবলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বাঙ্গালী মুসলমান ইতিহাস চেতনাহীন। খাজা উসমান এই দেশে না জন্মে যদি ইউরোপ বা আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করতেন, তবে তার যশোগাথায় তার দেশ মুখরিত হত। মাওলানা মীর কাসিম ও মালিক মুবারক 'জঙ্গনামা' নামে দুই কাব্যে দৌলম্ভপুরের যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। এই যুদ্ধ খাজা উসমানের ৪র্থ যুদ্ধ। ইহার পূর্বে খাজা ওসমান ইটা রাজ্য দখল করলে ইটার রাজা সুবিদ নারায়ন আত্মহত্যা করেন।[১৭]

খাজা উসমানের ইটা অভিযানের প্রাক্কালে দীনার পুরের মজলিস কুতুব রাজাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন "রাজা আপনার শরীরে গরুর গন্ধ পাচ্ছি অর্থাৎ পুত্রগন ইসলাম গ্রহণ করবে। বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন।" একথা ইটার দেওয়ান আব্দুল বাছিত অনুসন্ধানে জানতে পেরেছেন বলে দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখিত কুতুব সাহেবের কেরামতির ঘটনাটিও বর্ণনা করেন।

দিনার পুরের মজলিশ খান, মজলিস বাহাদুর, মজলিস দৌলত ও মজলিস কুতুব নামে পরিচিত ছিলেন। নছব নামায়ও এরূপ প্রমাণ আছে। তার সম্বন্ধে ব্যাপক অসুন্ধানে আরও বহু মুল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সুবিদ নারায়ন আত্ম হত্যা করলে তার চার পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইন্দ্রনারায়ন, জামাল খা চন্দনারায়ন কামাল খা, শিবনারায়ন হাজী খাঁন, কৃষ্ণ নারায়ন ঈর্বা খা. নাম ধারণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে মোগল বাহিনী খাজা উসমানের বিরুদ্ধে-অগ্রসর হয়। এই যুদ্ধের চিত্তাকর্ষক বিবরণ মির্জা নাথানের বাহারীস্তানে গায়বী নামক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। ড. এম.আই. বুরাহ ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৯৩৬ ঈসায়ী সনে টীকা সহ ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের টীকায় সিলেটের পতন উষার রাজা উসমানের রাজধানী প্রতিষ্ঠা ও মোগল বাহিনীর হস্তে তার নিহত হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।[১৮] (পৃ-৭০৯)।

---

১৭. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস পৃ- ৮৬।
১৮. জালালাবাদের কথা, পৃ- ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী প্রভাবিত সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং আফগান সর্দারগণকে দমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ফতেপুর সিক্রির দরবেশ সলিম চিস্তির পৌত্র ইসলাম খান সিলেটের সুফীপ্রভাবিত অভিজাত বংশীয়দের পূর্বে বর্ণিত বিপর্যয়ের কথা ও ইতিমধ্যে জানতে পারেন। অতঃপর তিনি আফগান সর্দারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। 'বাহারীস্তান গাইবীতে' এই সব অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সিলেট ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে ও এই অভিযানের চিত্তাকর্ষক বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। ইহাতে দেখা যায় যে, ১৬১২ খাজা ওসমান পরাজিত হন। ইটার রাজবংশ নামক গ্রন্থে খাজা ওসমান ও সুবিদনারায়নের যুদ্ধের তারিখ ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই মহররম বলে উল্লেখিত হয়েছে। (পৃ-১৬) ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৬১২ পর্যন্ত নিম্নলিখিত শাসকদের কথা ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে।

১৫৮৮ ঈ. মসনদে আলা ফতেহ খান

১৬১১ ঈ. খাজা উসমান

১৬১২ ঈ. মুবারিজ খান

উল্লেখ্য যে, খাজা উসমান কখনও সমগ্র সিলেটে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি।

অতঃপর নিম্নলিখিত ফৌজদারদের সন্ধান পাওয়া যায়-

১৬১২-১৮ ঈ. মুবারিজ খান	১৬১৮ ঈ. মুকাররম খান
১৬২০ ঈ. মির্জা আহমদ বেগ	১৬২৪ ঈ. মির্জা সালেহ আরগুন
১৬২৭ - ৩৭ ঈ. মুহাম্মদ জামান	১৬৫৮ ঈ. ইসপিনদিয়ার খান
১৬৬০ ঈ. লুৎফুল্লাহ সিরাজী	১৬৬৫ ঈ. সৈয়দ ইব্রাহীম খান
১৬৭০ ঈ. মাহফতা খান	১৬৭০ ঈ. ফরহাদ খান
১৬৮৫ ঈ. আব্দুর রহিম খান	১৬৮৮ ঈ. সাদেক খান
১৬৯২ ঈ. ইনায়েত উল্লাহ খান	১৬৯৩ ঈ. রফি উল্লা খান
১৬৯৩ ঈ. আহমদ মজীদ	১৭০৩ ঈ. কারগুজার মজীদ
১৭০৩ ঈ. মতিউল্লাহ খান	১৭০৯ ঈ. রহমত খান, ককতলব খান বিজপুরী ও তৎপর ইউসুফ বেগ খান
১৭১৩-১৯ ঈ. তালিব আলী খান	১৯১৯-১৯ ঈ. শুখুর উল্লাহ
১৭২১ ঈ. হরেকৃষ্ণ দস্তিদার	১৭২৩ ঈ. সাদেকুল হর মানিক
১৭২৪ ঈ. শুকুর উল্লাহ	১৭২৮ - ৪৯ ঈ. সমসের আলী
১৭৪২ ঈ. জান মুহাম্মদ খা	১৭৪৪ ঈ. বাহরাম খা
১৭৪৮ ঈ. আলীকুলি বেগ	১৭৪৯ - ৫০ ঈ. নজীব আলী খান
১৭৫১ ঈ. হাজী হোসেন খা	১৭৫৩ - ৫৮ ঈ. মীর মুহাম্মদ হাদী

১৯. বাংলা একাডেমী পত্রিকা (শ্রাবন-আশ্বিন), ১৩৭২, পৃ- ৩৫

ব্রিটিশ আমলঃ

১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সিলেট জেলা ইংরাজের অধিকারে আসে। প্রথমে কোম্পানীর ঢাকাস্থ কাউন্সিলের উপরেই সিলেটের শাসন ভার ছিল। এতদুর থেকে সিলেটের শাসন ভাল ভাবে চলেনি। ১৭৭১ সালে কোম্পানী সিলেটে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করার প্রয়োজন উপলব্দি করেন। সিলেটে কোম্পানীর প্রথম প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, সামনার। তাঁর পদের নাম ছিল সুপার ভাইজার। রাজস্ব সংগ্রহই ছিল তাঁর দায়িত্ব। তখন পর্যন্ত ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা ছিল সুবাদারের হাতে। সামনার সিলেটে পৌছেন ১৭৭১ সালের জানুয়ারী মাসে।

সিলেটে কোম্পানীর থেকারে দ্বিতীয় প্রতিনিধি উইলিয়াম মেকপীস থেকারে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক থেকারের পিতামহ। থেকারে ১৭৭২ সালের মাঝামাঝি সিলেটে পৌছেন। ঐ বছরই কালেক্টর পদের সৃষ্টি হলে তিনি ২৭শে অক্টোবর সিলেটের কালেক্টর নিযুক্ত হন। ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। তাদের নজর ছিল লাভের দিকে। সেকালে সিলেটের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল ধান, পাট, চুনাপাথর ও হাতী। থেকারের বিশেষ দায়িত্ব ছিল চুন সরবরাহ ব্যবস্থা করা। প্রাচীন কাল থেকে সিলেটের চুনের নাম ডাক ছিল। ইতিপূর্বে নবাব মীর কাসিমের সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তিতে সিলেটি চুনের উল্লেখ রয়েছে। ১৯০২ -০৩ সালে ও সিলেট থেকে কুড়িলক্ষ মণ চুন কলিকাতায় চালান হত। তখন একশত মন চুনের দাম ছিল মাত্র পয়ত্রিশ টাকা।

থেকারে আমলে বছরে একলক্ষ কুড়ি হাজার মণ চুন কলিকাতায় রপ্তানী হত। একজন চুন সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ঠিকাদার চুন পরিবহনের জন্য প্রতি একশো মণে সাড়ে সাত টাকা মজুরী পেত। সেকালেও আজ কালের মত ইছাকলস ও লাউড় এই দুই পরগনায় চুন পাথর পুড়িয়ে চুন তৈরী হত। ঠিকাদারের প্রধান আড়ত ছিল আজমিরিগঞ্জ। তখন ও জমিদাররা কোম্পানীর শাসন গ্রাহ্য করতে অভ্যস্ত হননি। ঠিকাদার থেকারের কাছে নালিশ করল যে বানিয়াচুঙ্গ ও খলিয়াজুড়ী পরগনার জমিদাররা চুনা রপ্তানীতে বাধা দিচ্ছেন। থেকারকে জমিদারদের শাসনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। সিলেটের রাজস্ব ছিল একলক্ষ সত্তর হাজার টাকা। জমিদাররা কড়ি দিয়েই রাজস্ব আদায় করতেন। পাঁচ হাজার একশ কুড়ি কড়িতে এক টাকা হত। এক কড়ির পাহাড় নৌকা যোগে ঢাকা পাঠানো হত। সেখানে এই কড়ি নিলামে বিক্রি করে রৌপ্য মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হত।

থেকারে যখন সিলেটে আসেন তখন সিলেট শহরে কালেক্টরের বাসের উপযুক্ত কোন বাড়ী ছিল না। তিনি তাঁর বাসযোগ্য একখানা বাড়ী তৈরী করার অনুমতি চান। তিনি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে জানান যে, বর্ষাকালে অনেক চুন নষ্ট হয়ে যায়। চুনা পাথর ও ইটের দ্বারা তিনি অল্প খরচেই একখানা বাসগৃহ তৈরী করতে পারবেন। কর্তপক্ষ অনেক ইতস্ততের পর থেকারকে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দেন। বর্তমান ডেপুটি কমিশনারের বাংলার জায়গায়-ই থেকারের বাসগৃহ নির্মিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুরারি চাঁদ কলেজের অধ্যক্ষের আবাসিক টিলার উপরে থেকারের দ্বিতীয় বাসগৃহ নির্মিত হয়েছিল। এই টিলা আজও থেকারের টিলা নামে পরিচিত। উক্ত টিলা থেকে কুলুকুলু সুরমা নদী ও তার তীরের শ্যামল দৃশ্য মনোমুগ্ধ কর।

থেকারের শাসন কালের প্রধান ঘটনা জয়ন্তিয়া অভিযান। জয়ন্তিয়ার রাজা ছত্রসিংহ (১৭৭০-৭৪) সুরমা নদী দিয়ে কোম্পানীর মালামাল বহনে বাধা সৃষ্টি করে। রাজার লোকেরা কয়েকবার কোম্পানীর লোকদের মারপিট করে তাদের মালামাল লুট করে নেয়। থেকারে জয়ন্তিয়া আক্রমন করে রাজাকে শায়েস্তা করার প্রয়োজনীয়তার কথা কোম্পানীকে জানান। অনেক লেখালেখির পর কোম্পানী ক্যাপটেন এলারকারের নেতৃত্বে এক ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করেন্ এলারকারের সৈন্য বাহিনী জয়ন্তিয়ার রাজধানী নিজ পাট থেকে ছয় মাইল দুরবর্তী রাজাগঞ্জ বাজার ১৭৭৩ সালের ২৩শে মার্চ দখল করেন। পথিমধ্যে তাদের খরস্রোতা সাইর নদী অতিক্রম করতে হয়। রাজার সৈন্যরা নদী উত্তরনে বাঁধা দিতে ব্যর্থ হয়।

সাইর নদীর অপর পারে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ বাঁধে। দুই পক্ষই গোলাগুলি ছুড়ে। রাজার সৈন্যরা পৃষ্ট প্রদর্শনে বাধ্য হয়। এলারকার বিনা বাঁধায় রাজধানী নিজপাট দখল করেন। জয়ন্তীয়ার রাজা রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেন।

থেকারে জয়ন্তিয়া রাজ্য কোম্পানীর শাসনে আনার প্রস্তাব করেন। ঢাকার কাউন্সিল প্রস্তাব করেন এই অঞ্চল লাউড়ের জমিদার উমেদ রাজাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হোক। থেকারের এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। ইতিমধ্যে জয়ন্তিয়ার রাজার চৈতন্য উদয় হয়েছে। তিনি কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ ও সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজ্য ফিরে নেয়ার প্রস্তাবে রাজী হন। রাজাকে পনরো হাজার টাকা খেসারত দিতে হয়। তিনি সুরমা নদী দিয়ে কোম্পানীর নৌকা চলাচলে বাধা দিবেন না বলে অঙ্গীকার করেন। রাজার কথা যাতে খেলাপ না হয তার নিমিত্ত রাজার একজন ঘনিষ্ট আত্নীয়কে কালেক্টরের কাছে জামিন রাখা হয়। এই আপোষ প্রস্তাব চলার মধ্যে জয়ন্তিয়ার রাজা ছত্রসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁর ভাগিনেয়কে জয়ন্তীয়া রাজ্য ফেরত দেওয়া হয়।[২০]

১৭৫৭ ঈসায়ী পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য আস্তমিত হওয়ার পর ১৭৬৫ ঈসায়ী মোগল অধিকৃত সিলেট জেলা ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী ঢাকা প্রশাসন হতে স্বতন্ত্র হয়ে মহকুমা সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত জেলা সদর (H.Q) হতে শাসিত হতে থাকে। সিলেট ডিস্ট্রিক রেকর্ডে উল্লেখিত ২০/২২/১৭৯০ ঈসায়ীর এক সরকারী পরিপত্রে সিলেটকে ১০টি রাজস্ব জেলায় বিভক্তির সুপারিশ করা হয়। যথা নবীগঞ্জ, লস্করপুর, শংকর পাশা, তাজপুর ও পারকুল (সদর) হিংগাজিয়া, রাজনগর, নোয়াখালি, লাতু ও রসুল গঞ্জ।

ইংরেজ কালেক্টর উইলিসের সময়ে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। ১৬৪ টি পরগনা (কসবে সিলেট ব্যতিত) উক্ত ১০টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। লস্করপুর ঢাকা হতে ১৭৮৯-৯৩ ঈসায়ী সিলেট হস্তান্তরিত হয়।

---

২০. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ ১০৯, ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য মিঃ থেকারে সিলেটের প্রথম ইংরেজ কলেক্টর ছিলেন। তারপর যথাক্রমে সোমনার, হল্যান্ড, লিওসে এবং ইউলিস সিলেটের কালেক্টর নিযুক্ত হন। এইসকল বিবরণ ১৮৬৮ইংরেজীতে প্রকাশিত History and statistics of the Dacca Division নামক গ্রন্থ হতে সংগৃহিত হয়েছে। ১৭৭০ ঈসায়ী হতে ১৭৯১ ঈসায়ী পর্যন্ত ২১ বছর ইংরেজ শাসনের নির্ভরযোগ্য বিবরণ 'সিলেট ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস' নামক গ্রন্থে পত্রাকারে পাওয়া যায়। সিলেটের জনসাধারণ জমিদারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কারণ সিলেটের মুসলমান গন ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মেনে নিতে পারেনি। জমিদারদের নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রকার অসহযোগ বিদ্রোহের মাধ্যমে জনগন ইংরেজ শাসনের মোকাবেলা করে ইহার বিবরন সিলেট ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস নামক গ্রন্থে ও বিচ্ছিন্ন ভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফলে শাসনব্যবস্থায় তথাকথিত এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। একই সনে আধুনিক থানা ব্যবস্থার বুনিয়াদ ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এখানে প্রাচীন থানা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

পরগনার জমিদারগণ খাজনা আদায়ে সাহায্য করার জন্য থানাদার নিযুক্ত করতেন। এই সকল থানাদারদের অধিনে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য থাকত। এইসকল সৈন্যের অধিকাংশই থানাদারের বাড়ীর চারদিকে বাস করত বলে বস্তিটি নানা নামে অভিহিত হত। পল্লী বাংলার ইতিহাসে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার এরূপ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পল্লী পুলিশদের নিয়োগ করার ক্ষমতা ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকেও জমিদারদের হাতে থেকে যায়।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ও জমিদারদের উপর ন্যাস্ত ছিল। The Zamiders became bound to apprehand murderers, robbers, house breakers and generally all disturbers of peace.

In the Mohammadan regimes and in the earlier days of British Govt. the powers of the prolice were vested in and excercised by the zaminders 'পল্লী বাংলার ইতিহাসেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। পরগনার জমিদারদের এই সব ক্ষমতা পরবর্তী কালে পুলিশ আইনের মাধ্যমে রহিত করা হয। এইভাবে দেশের প্রশাসন হতে মুসলিম জমিদারগণকে ধীরে ধীরে উৎখাত করা হয়।'

আধুনিক থানা ব্যবস্থাঃ

আধুনিক থানা সমূহের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় কর্নওয়ালিসের সময়ে ১৭৯৩ ঈসায়ী ২২ই মে। ১০বর্গ ক্রোশ এলাকায় এক একটি থানা সংগঠনের দায়িত্ব ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর ন্যস্ত হয়।

উক্ত আইনের চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে- The magistrates are directed to endeavour to from the jurisdiction in such a manner as to bring the

Dhaka University Institutional Repository

principal Towns. Bazars and Gonjes in the center of them, So that the police establishment may secure for the protection of these principal places as well as circumjacent country.

২৬/১১/১৭৯০ ঈসায়ী বড় শহর বাজার ও গঞ্জকে থানায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়। ইহাতে তরফের হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জকিগঞ্জ, জগন্নাথপুর, বানিয়াচুঙ্গ, নবীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, হেতিমগঞ্জ, বাজে বেজুরা, শমসের গঞ্জ ও আজমিরি গঞ্জ সহ মোট ৩০টি থানার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই দেশের ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিপ্লব একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহার পর মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন নীতি সম্বন্ধে কতিপয় ঘোষণা প্রকাশ করেন। তিনি আশ্বাস দেন যে, স্থানীয় প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে সরকারী হামলা হবে না।

সিপাহী বিপ্লবের পরি প্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, The causes of Indian Revolt: নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে Mr. Allen octavion hume লিখেছেন। It was after reading Syed Ahmed Khan's Book on the causes of the Indian Mutiny that 1first felt the need for having a forum of public opinion of India and eventually the Indian National congress came in to existence.

এই বক্তব্য হতে দেশের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা যায়। এই সময় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও এতদ্দেশে দ্বিজাতি তত্ত্বের (Two nation theory) বুনিয়াদ সর্ব প্রথম ১৮৮২ ঈসায়ী স্যার সৈয়দ আহমদ ঘোষণা করেন। তিনি এক ভাষনে উল্লেখ করেন, Now suppose that all the English were to leave India then who would be rulers of India is it possible that under those circumstance's. That two nations the Mohammedans and Hindus could sit on the same throne seremain equal in power? Most certainly not.

দেশের এই যখন অবস্থা তখন ১৮৭৪ ঈসায়ী সিলেটকে বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগ হতে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই সম্বন্ধে Sylhet Garetteers (1974) বলা হয়; Sylhet was in Dacca Division of Bangal province till 1874. But transferred to chief commissioners ship of Assam in order to make the chief commissioner's province of Assam economically viable and secure the service of a number of educated and enlightened persons to admisnister it. There were, however, loud protests from sylhet against its inclusion in Assam as people of sylhet wanted to remain in Bengal with which it had linguistic and cultural links. It was necessary for the governor General loard North Brook to come down to Sylhet to pacify the people.

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটকে বাংলাদেশে হতে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সাথে জুড়ে দেয়ার পূর্বে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে হান্টারের Statistical Account of Assam নামক গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

তৎকালীন থানার নাম	মৌজার সংখ্যা	লোক সংখ্যা
পারকুল	৪৩৯	১,৪৭,৫৭০
তাজপুর	৬২১	৯৯,৪৩০
নবীগঞ্জ	৪২৯	১,১০,০০০
আবিদাবাদ	৩২৫	৮৮,৫৬৬
শংকরপাশা	৩০৫	৮,৮৬৪
লস্কর পুর	৫২৪	১,৭৭,৫৭৩
নোয়াখালী	১৮১	৭৪,৩৩৮
রাজনগর	২০১	১,০৯,৯৪৩
লাতু	৬৭৪	২,৬৮,৪৩৩

এই ১০টি থানা ইতিপূর্বে রাজস্ব জেলার মর্যাদা লাভ করে আসছিল। এতদ্বতীত নিম্নলিখিত থানাগুলির ও উল্লেখ পাওয়া যায়-

ধর্মপাশা	৩৭৫	৯৫,২৪০
সুনামগঞ্জ	২৩১	৬০,৫১৯
ছাতক	৬৮০	২,০৫,০৫৩
মুলাগোল	১১২	৪৭,৪৭৭
জৈন্তাপুর	১০৫	২৫,১০০
গোয়াইন	১১৬	৩২,৫২৮

১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট আসামভুক্ত হওয়ার পর ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সুনামগন্জ ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ এবং এবং ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে মৌলভী বাজার মহকুমা সৃষ্টি করা হয়। ইহার অনেক আগেই থানা সংগঠনকে মজবুদ করা হয়েছিল।

পরগনা কেন্দ্রিক প্রাচীন ব্যবস্থার স্থলে এই ব্যাপক রদবদলের ফলে পরগনা সমূহের গুরুত্ব বহুল পরিমানে হ্রাস পায়।

সিলেটে মহকুমা প্রতিষ্ঠার সুফল সাফল্য ও স্বার্থকতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ই.এ.গেট নিম্নরূপ-বর্ণনা করেছেন-

One of the first improvements brought about under the new regime was Introduction of the sub-division system into the sylhet district. Which had previously been Administred entiry from H.Q. Station. It was clearlg

Dhaka University Institutional Repository

impossile in this way, to deal as equately with the requlerements of a tract containing a population of millions and possessing a most difficult and complicated system of land tennures, and which the communications was so bed that many parts were almost inaccessible at certion seasons of the year. To remedy the state of affairs, four outlying subdivision were formed viz. Sunamgonj, Habigonj, Moulvibazar and Karimgongj and a seperaters office at heave quarters was told off to deal with Jointa porgana. It is now possible for the people in all parts of the district to obetain justice, paying their land revenue and transact other business with the officers of the Govt. with reasonable distanc of their own homes, and for the officers to obtain an adequate knowledge of the local customs prevailing in areas which they have to administer.

প্রাচীন পরগনা প্রথায় যেসব সুবিধা পরগনায় পাওয়ার সু ব্যবস্থা ছিল এখন সেই সবের জন্য থানা বা মহকুমা সদরে ধর্না দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। এতে তৎক্ষণাৎ জনগন কতটুকু উপকৃত হল বুঝা গেল না। প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ সরকারের সুবিধার জন্যই পরগনা ব্যবস্থার পরিবর্তে থানা ও মহকুমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

১৮৭৪ ঈসায়ী সিলেট জেলাকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে নবগঠিত আসাম প্রদেশের সহিত যখন জুড়ে দেয়া হয় তখন আসামকে সবেমাত্র ইংরেজরা এক সন্ধি বলে ব্রম্ম দেশের অধীন হতে নিজেদের অধীনে আনে। ব্রিটিশ শাসনে মুসলমানদের প্রতি যে, অবিচার হয়েছে তার বিবরণ The Indian Musalmans নামক গ্রন্থে পাওয়া যায। w.w. Hanter বলেন এদেশ আমাদের হাতে আসবার আগে মুসলমানেরা যে ধর্ম অনুসরণ করত, যা খেত ও যেভাবে জীবন যাপন করত আজও তা করছে। আজও তারা সময়ে সময়ে তাদের পুরাতন গভীর (মুসলিম) জাতীয়তাবোধ এবং যুদ্ধ বিষয়ে বাহাদুরী প্রদর্শন করে থাকে ঠিকই, কিন্তু অন্য সকল বিষয়েই তারা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আজ ধ্বংস প্রাপ্ত একটা জাতিমাত্র। সোজা কথায় মুসলমানের বিরাট গৌরব ময় অতীত ছিল কিন্তু হাল আমলে একেবারে জীবনোপায় শূন্য। তাদের অভিযোগ এই যে, কাল তারা যে দেশের বিজেতা ও শাসক ছিল তারা সেই দেশেই কোন জীবনোপায় খুজে পায় না। তাদের অবনতির কারণ সম্বন্ধে কোন উত্তর দিতে গেলে তাদের অভিযোগগুলির সত্যতা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ তাদের অবনতি আমাদেরই রাজনৈতিক অবজ্ঞতা অবহেলার বিষময় ফল গত ৭৫ বৎসরে বাংলার মুসলমান পরিবার গুলি হয় উৎখাত হয়ে গিয়েছে, না হয় আমাদের শাসনামলে নতুন সমাজের নিম্নস্তরে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তারা গঠিত ও উদ্ধত হতে পারে, কিন্তু তারাই শেষ আমির, বিজেতাদের বংশধর। আমরা মুসলমান ভদ্র শ্রেণীর জন্য সেনা বিভাগ বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমরা বুঝেছি যে, আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের সাবেক দেওয়ানী ব্যবস্থার পরিবর্তনকে তারা নিজ ওয়াদা খেলাফ বলে অভিহিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী মুসলমানদের ধন দৌলতের তৃতীয় উৎস ছিল বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ প্রভৃতি বেসামরিক চাকুরিতে একেচেটিয়া অধিকার।

এই দেশ আমাদের হুকুমতে আসার কিছুদিন পর পর্যন্তও মুসলমানেরা সব রকম কাযকর্ম নিজেদের হাতে রেখেছিল। কাজেই মুসলমান আইনজ্ঞরা দেওয়ানী আদালতে বিচার করতেন। এমনকি আমরা যখন সর্বপ্রথমে শিক্ষিত আহলে বিলাতি দিয়ে এই দেশের বিচার চালাবার চেষ্টা করলাম তখনও মুসলমান আইনজ্ঞরা আইনের পরামর্শ দাতা হিসেবে বসবার রীতিমত অধিকার পেতেন। ইসলামিক বিধি ব্যবস্থাই এই দেশের কানুন ছিল। সরকারী ছোট খাট আফিসগুলি মুসলমানদের সম্পত্তি ছিল। ভদ্রঘরের মুসলমানদের জন্য জাতিগত পেশা হিসাবে এখন খোলা আছে একমাত্র আইনব্যবসা। আইন ব্যবসায় সরকারী চাকুরীর মতো আরো কড়াকড়িভাবে মুসলমানদের চাকুরীর জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানেরা আজকাল এতদুর নীচে নেমে গিয়েছে যে তারা সরকারী চাকুরীর জন্য উপযুক্ত হলেও সরকারী ইস্তেহারে তাদেরকে বিশেষ ভাবে বাদ দেওয়া হয়।

উপরোক্ত পটভূমিতে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন আবার দানা বেঁধে উঠে। কালক্রমে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। ইহাই মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। ইহা প্রতিষ্ঠার ফলে Two nations theory মুসলমানদের নিকট জাতীয় ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের আমলে যখন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। তখন আসামের সঙ্গে সিলেটও এই দেশে আসে। ১৯১১ ঈসায়ী যখন এই প্রদেশ ভেঙ্গে ফেলা হয় তখন সিলেট জেলাকে আবার আসামের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ইহাতেও সিলেট বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সকল আপত্তি উপেক্ষা করে এই ব্যবস্থা মুসলমানদের উপর চেপে দেয়া হয়। মুসলমানেরা ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[২১]

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মীয় আন্দোলনঃ

মৌলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১৮০০-১৮৭৩) পূর্ববঙ্গে প্রায় চল্লিশ বৎসর ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। তিনি শির্ক ও বিদআতের বিরুদ্ধে প্রচারনা করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন। তিনি সিলেট জেলায় ও ধর্ম প্রচার করেন। সিলেটের নানা অঞ্চলে তার খলিফা ছিলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (১৭৮৬ - ১৮৩১) 'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া' আন্দোলন ও সিলেটে বিস্তার লাভ করেছিল। ১৮২১ সালে সিলেট জেলা থেকে কেউ কেউ কলিকাতা গিয়ে সৈয়দ আহমদের কাছে বয়াত গ্রহণ করেছিল। হায়দ্রাবাদের জয়নাল আবেদীন সিলেটে 'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া' প্রচার করেন। সিলেটের উর্দু কবি আশরাফ আলী মজুমদার (১৮২০-১৮৮৪) এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।[২২]

---

২১. জালালাবাদের কথা, পৃ- ১৪০-১৪৫।

২২. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ১৩৬, ১৩৭ ও জালালাবাদের কথা, পৃ- ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত আন্দোলনঃ

১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া সারা দেশে দেখা দেয়। এতদ্বতীত ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইতালী আরব অধ্যুষিত এবং তুর্কি সাম্রাজ্য ভূক্ত ত্রিপলী দখল করে নিলে ইংরেজ সরকার ইতালির সাম্রাজ্য বাদকে স্বীকৃতি দান করে। এতে এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজ মর্মাহত হয়। ফলে ১৯১৯ ঈসায়ী ৬ই ডিসেম্বর মুসলিম লীগের আহবানে ইতালি পন্য বর্জন এবং ত্রিপলীর দুর্গতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। তুরস্কের বিপর্যয় এই অঞ্চলের মর্মে আঘাত করল এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ বিরোধীতা ও দানাবেধে উঠল। এইভাবে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলন। সভা সমিতিতে মসজিদে খুৎবায়, সংবাদ পত্রে সাময়িকিতে প্রতিবাদ ও বিরুপ সমালোচনা শুরু হয়। এই জাতীয় আন্দোলনে মাওলানা মোহাম্মদ আলী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা শিবলী প্রমুখ নেতৃত্ব দান করেন।

১৯২০-২২ সালে সিলেট জেলা ব্যাপী খেলাফত ও নন কো অপারেশন আন্দোলন হয়। ১৯২২ সালের ২০শে মার্চ সুরমা ভেলীর কমিশনার জে.ই. রেষ্টার সাহেবের আদেশে কানাইঘাট মাদরাসায় বার্ষিক সভা উপলক্ষে আহুত জনতার উপর পুলিশ গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে ছয়জন লোক মারা যায় ও অনেক আহত হন। নিহত ব্যক্তিরা ছিলেন-

১। বায়মপুরে আবদুস সালাম
২। দুলর্ভপুরে মুসা মিয়া
৩। নিজ ভাউর ভাগের আব্দুল মজিদ
৪। উজানী পাড়ার হাজী আজিজুর রহমান
৫। সর্দারী পাড়ার জহুর আলী
৬। চটি গ্রামের ইয়াছিন মিয়া

এই ঘটনা উপলক্ষে কানাইঘাটে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ গারদ বসিয়ে পাইকারী জরিমানা আদায় করেও নিরপরাধ অনেক লোককে জেল দেওয়া হয়। এই ঘটনা জৈন্তার লোকদের কাছে কানাইঘাটের লড়াই নামে খ্যাত। বসন্ত কুমার দাস, ব্রজেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী, শিবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, মৌলভী আব্দুল হামিদ, মৌলভী আব্দুল মুছাব্বির, মৌলভী আব্দুল্লাহ বি.এল. মৌলভী আব্দুল মুছাব্বির মৌলভী সাখাওতুল আম্বিয়া ইত্যাদি অনেকে নন কো অপারেশন আন্দোলন অংশগ্রহণ করেন। এদের প্রায়ই কারা বরন করতে হয়। এই আন্দোলন উপলক্ষে গান্ধিজি, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, দেশ বন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাস, সরোজিণী নাইডু প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা সিলেটে পদার্পণ করেন।

মাইজভাগে ছিন্ন কোরানের মামলাঃ

১৯২২ সালে ৮ই এপ্রিল গোলাপগঞ্জ থানার ওসী আব্দুল হামিদ একদল পুলিশ সহ মাইজভাগ গ্রামের মগফুর মিয়ার বাড়ীতে যায়, থানা তল্লাশের সময় তার সম্পত্তির অনেক নথি করে ও

দুইখানা কোরআন শরীফ ছিড়ে ফেলে। মাগফুর মিয়া ছিন্ন কোরানদ্বয় সিলেট শহরের কুদরত উল্লাহ মসজিদে এনে অনেককে দেখান কোরআন গুলির ফটোও রাখা হয়। এই সম্পর্কে জনশক্তি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর রাজদ্রোহের অপরাধে দন্ডিত হন। কয়েক মাস পরে সিলেটের দায়রা জর্জ বি.এন. রাও হঠাৎ একদিন মাগফুর মিয়ার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে নিজে স্থানীয় তদন্ত করেন। তিনি আপীলে 'জনশক্তি' সম্পাদক ও মুদ্রাকরের দান্ডাদেশ নাকচ করেন এই মোকদ্দমা তখন খুব উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

আইন অমান্য আন্দোলনঃ

১৯৩০ - ৩২ সালে সিলেটে আইন আন্দোলন হয়। বসন্ত কুমার দাস, ব্রজেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী শিক্ষক ভদ্র বিশ্বাস প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা আইন অমান্য করে কারা বরন করেন। খুব অল্প সংখ্যক মুসলমান এই আন্দোলনে যোগ দেয়। সন্ত্রাস বাদীরা সিলেট বিশেষ সক্রিয় ছিল না।[২৩]

এই সময়কার অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনে সিলেটের বীর মুজাহিদের ও সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এই জন্য ব্রিটিশ সরকার তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। এই আন্দোলনে যোগদান কারী সিলেটের কতিপয় কৃতিসন্তানের নাম উল্লেখ করা গেল।

১। আব্দুল মতিন চৌধুরী (প্রাক্তন মন্ত্রী) (১৮১৫-১৮৪৮ঈ.)
২। মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া (১৮৯৪-১৯৬৯ ঈ.)
৩। ফজলুল হক সেলবরসী (১৮৮৩ - ১৯৬১ ঈ.)
৪। মকবুল হোসেন সুনামগঞ্জী (১৮৯৮-১৯৫৭ঈ.)
৫। মোঃ আব্দুল্লাহ বি.এল. (১৮৯৬-১৯৫৫ ঈ.)
৬। ডাঃ মর্তুজা চৌধুরী (১৮৯৬-১৯৭১ ঈ.)
৭। মাওলানা আব্দুল হক (মৃত্যু ১৯৪২ ঈ.)
৮। ডাঃ আলী আসগার নূরী (১৮৯৩-১৯৭২ ঈ.)।
৯। মাওলানা আবদুল মুছাব্বির (১৮৮০-১৯৪০ ঈ.)
১০। দেওয়ান আব্দুর রব চৌধুরী (১৯০৯-১৯৯৮৩ঈ.)
১১। দেওয়ান আব্দুল বাসিত (১৯১১-১৯৯৬ ঈ.)
১২। আব্দুল হামিদ বি.এল. (১৮৮৬-১৯৬০ ঈ.)
১৩। আব্দুল হামিদ চৌধুরী (সোনা মিয়া) (১৮৮৯-১৯৫৭ঈ.)
১৪। দেওয়ান আহবাব চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭১ ঈ.)
১৫। আসাফুর রাজা চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫০ ঈ.)
১৬। দেওয়ান মুজিবুর রহমান চৌধুরী (১৮৯৯ - ১৯৬৭ঈ.)

---

২৩. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ ১৪০-১৪১।

১৭। নুরুল হোসেন খান এডভোকেট (১৮৯২-১৯৭৩ ঈ.)

১৮। মৌলভী আব্দুল্লাহ (১৯০১- ১৯৭৩ ঈ.)

১৯। মাওলানা আব্দুল কাদির সিংকাপনী (১৮৯৭-১৯৮২ ঈ.)

২০। মাওলানা আব্দুর রহমান (সিংকাপনী) (১৮৭৮-১৯৬১ ঈ.)

২১। মাওলানা হরমুজ উল্লা সায়দা (১৯০৩-১৯৯০ ঈ.)

২২। মাওলানা রমিজ উদ্দিন সিদ্দিকী (১৮৭৯- ১৯৭৯ ঈ.)

২৩। মাওলানা ইব্রাহিম চতুলী (১৮৯৪-১৯৮৪ ঈ.)

২৪। দেওয়ান মুহাম্মদ আসফ (১৮৬২-১৯২৭ ঈ.)

২৫। মাওলানা সৈয়দ জামিলুল হক (১৮৯৯-১৯৬৪ ঈ.)।

২৬। মাওলানা আব্দুল মুকিত চৌধুরী (১৮৭৮-১৯২৭ ঈ.)

২৭। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বানিয়াচুঙ্গী (১৯০১-১৯৭৩ ঈ.)

২৮। ডাঃ আব্দুস শহীদ (১৮৮০-১৯৪৭ ঈ.)

২৯। মাওলানা রেদওয়ান উদ্দিন আহমদ (১৮৬০-১৯৩৮ঈ.)

৩০। মাওলানা মজিদ বকত চৌধুরী (১৮৯২-১৯৭৭ ঈ.)

৩১। মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী এডভোকেট (১৮৮৮- ১৯৮২ ঈ.)

৩২। আজমল আলী চৌধুরী (১৯১৪-১৯৭১ ঈ.)

৩৩। দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী (১৯১৬-১৯৯৫ ঈ.) প্রমুখ।

এছাড়াও অনেক অনেক নেতা কর্মী সিলেটের ঐতিহাসিক রেফারেন্ডামে জান মাল দিয়ে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকর করেছেন।[২৪]

পাকিস্তান আন্দোলন

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব পাকা হওয়ার পর পাকিস্তান আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে। পাকিস্তান আন্দোলন সম্বন্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। তন্মধ্যে হাবিবুল্লাহ বাহার রচিত 'পাকিস্তান' নামক গ্রন্থটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইহাতে পাকিস্তানের পটভূমি সহ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। আসামের ভূত-পূর্ব মন্ত্রী, ভারতের আইন পরিষদের প্রাক্তন ডেপুটি প্রেসিডেন্ট, মুসলিমলীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, সিলেটের কৃতিসন্তান ও পাকিস্তান আন্দোলনে সিলেটের বিশিষ্ট নেতা জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী উক্ত পাকিস্তান নামক গ্রন্থের পরিচিতি লিখিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ 'কেন পাকিস্তান চাই' নামক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন সিলেটের অপর কৃতি সন্তান মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া।

---

২৪. জালালাবাদের কথা, পৃ- ১৪৬- ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

এই আন্দোলনে জান ও মাল দিয়া সংগ্রাম করেন সিলেটের জনগণ। ইহাতে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিশেষত আসাম বাংলার নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের ভূমিকার কথাও সিলেটের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেশে বিদেশে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। ইহার বিবরণ তৎকালীন ভারতবর্ষের Eastern Command এর সর্বশেষ G.O.C Gen Sir Francis তদ্বীয় While Memory sernes নামক গ্রন্থে ও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের Why did we quit? প্রবন্ধে লিখিয়াছেন If I were asked to reply briefly to this question and would answer. Because the United States and Russia made impossible for us to day; There were multitude of other reasons. তিনি আরো বলেন By 1946 the Britis had reached the stage at while. Inpretty nearly every international discussion they were treading such this Ice as oppression of Indians in theeyes of the U.S.A and Russia. That their influece at conference was being most seriously impaired. Peridatetic Indians were prancing about English. Particulary the U.S.A shrilling the public place terrble oppression carried out by a most honest and pleasant persons to charges of floggings and wrongful imprisonments of Indian innocents at the hands of the British in India (p. 505). We were thus in a weak position Internationally. Americans thought we ought to give India liberty for ethical reasons. Russians made it impossible for us to remain longer by abusing us for being in India at all.

দেশ-বিদেশী জনমতের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা ঘোষণা করে। মুসলিমলীগ ও কংগ্রেস ইহা মানিয়া লয়। কিন্তু পরবর্তীতে কংগ্রেস নেতাদের ও সরকারের বিট্রায়েল এর ফলে তাহা বানচাল হইয়া যায়। ফলে মুসলিম লীগ সারা দেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direct Action day) পালান করে। সিলেট বিভাগে ও তাহা পালিত হয়। হবিগঞ্জ জিলায় এই দিবস পালনের ঐতিহাসিক দলীল পাওয়া গিয়াছে। তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।[২৫]

সিলেটে কায়েদে- আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৯৪৬ ঈসায়ীর ২রা মার্চ মুসলিম ভারতের প্রাণপ্রিয় নেতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ট্রেনযোগে সিলেট আসেন। লক্ষ লক্ষ আজাদী পাগল জনতা 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার' আওয়াজ তুলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। জননেতা আজমল আলী চৌধুরী জিন্নাহ সাহেবকে মাল্যভূষিত করেন। সফরসঙ্গী এম.এ এইচ. ইস্পাহানী। সিলেট শহরের বারুতখানা মহল্লার মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের 'সালারে আলা'

২৫. প্রাগুক্ত পৃ- ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুস সালামের নেতৃত্বে তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। সিলেট শহরের বিভিন্ন স্থানে তৈরী হয় অসংখ্য তোরণ। কায়েদে আযমের থাকার ব্যবস্থা করা আমজাদ আলী চৌধুরীর আমজাদ আলী রোডের বাড়ীতে। বিকাল পাঁচটায় শাহী ঈদগাহ ময়দানে বিশাল জনসভায় তিনি উর্দূতে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। কায়েদে আযম বলেনঃ মুসলমান ভাইয়েরা আপনারা এক হয়ে যান। আমরা পাকিস্তান বানাব। অবশ্যই বানাবো, ছাড়বো না। এই ঐতিহাসিক সভায় সভাপতিত্ব করেন জননেতা আব্দুল হামিদ, মিনিষ্টার, পাঠান টোলা, সিলেট।[২৬]

মাওলানা সহুল উসমানীর ঘোষণাঃ

পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য নেতৃবৃন্দ, জান-মাল ত্যাগ করে 'পাকিস্তান হাসিল জিন্দেগীর সাওয়াল গণ্য' করে রেফারেন্ডমের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ঐতিহাসিক গণভোটে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ হযরত মাওলানা সহুল উসমানী (রহ.) এর একটি ফতোয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক ফতোয়াটি নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত হলোঃ

মুসলমান ভাইদের প্রতি আবেদনঃ

হযরত মাওলানা সহুল উসমানী সাহেব গত ১২ই জুন ১৯৪৭ঈ. রোজ বৃহস্পতিবার হযরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) মাজারের দরগা শরীফ মসজিদ প্রাঙ্গনে ওয়াজের মাহফিলে কোরআন ও হাদিসের প্রমাণ দ্বারা সে বাণী প্রদান করেছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

মুহাদ্দিছ মাওলানা সহুল উসমানী সাহেবের ফতওয়াঃ

১। ভোটের দ্বারা শ্রীহট্ট জিলার মুসলমানগন কে পাকিস্তান কায়েম করা শরয়ী জেহাদ এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন।

মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রী যে কোন ব্যক্তি যদি হেলায় উক্ত জেহাদে যোগদান না করেন তবে তাহারা কোরআন ও হাদিসের রায়দ্বারা মহাপাপী হইবে।

২। যদি কোন মুসলমান উক্ত জেহাদে তাহার ধন বিলাইয়া দিতে বিরত হয়, তবে তাহার যাবতীয় ধন হরাম হইয়া যাইবে।

৩। যদি কোন মুসলমান উক্ত জেহাদের খবর পাওয়া মাত্র তাহার সমস্ত দুনিয়াদারী ছাড়িয়া উক্ত ভোট দান কার্যে সাহায্যের জন্য অবহেলা করে তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে জবাব দিতে হইবে।

৪। যদি কোন মুসলমানের নিজের স্ত্রীর ভোট থাকে এবং আপন স্ত্রীকে ভোট দিতে বিরত রাখেন তবে সেই স্বামী (শক্ত) গোনাহগার হইবে।

৫। যদি কোন মুসলমান তাহার জানামত নিঃসহায় (অন্ধ, আতুর রোগী ইত্যাদি) মুসলমান স্ত্রী পুরুষ ভোটারকে সাহায্য করিয়া ভোট কেন্দ্রে লইয়া না যান তবে কিয়মাতের দিন তাহাকে আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হইবে।

---

২৬. সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পৃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৬। জেহাদের সময় বিবি লোকের পর্দার কোন কড়াকড়ি নিয়ম নাই। বোরখা যদি থাকে তবে ভাল, নতুবা চাদর দ্বারা শরীর ঢাকিয় যাইতে হইবে। অবস্থা বিবেচনায় যে কোনমতেই ভোট দিতে হইবে।

৭। যদি শ্রীহট্ট জেলার মুসলমানরা নিজের ইচ্ছাকৃত গাফিলতির দরুন শ্রীহট্ট জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হইতে বিরত রাখেন তবে বর্তমান মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কেয়মতের ময়দানে দাড়াইয়া খোদার নিকট বলিবেন, ঐ আমাদের পুর্ব পুরুষ মুসলমানগন, আমাদিগকে দারুল ইসলামে যাইতে বাধা দিয়াছেন উহাদের উপযুক্ত শাস্তি হউক।

৮। শীহট্ট জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হইলে খাইতে পাইব না, কাপড় পাইবনা, দুঃখ কষ্ট ভোগ করিব। এই সকল শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সকল কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না । দেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে নতুবা হিজরত করিয়া এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

৯। এইবার ভোট দেয়া কোন ব্যক্তি বিশেষকে নয় কোন প্রতিষ্ঠানকে নয়, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাণের ও বড় প্রিয় জিনিস দারুল ইসলাম অর্থাৎ পাকিস্তান বানাইবার জন্য ভোট দিবেন।

উপরোক্ত উপদেশগুলো তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা তকরির করিয়া সকলকে বুঝাইয়াছেন। মোনাজাত করিবার সময় তিনি বিলাপের সুরে ক্রন্দন আরম্ভ করেন এবং বলেনঃ

হে পরওয়ার দেগার। এখন ও শ্রীহট্টের অনেক মুসলমান (কংগেস পন্থি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ) পাকিস্তানের বিরোধীতা করিতেছেন, তাহাদিগকে দারুল ইসলাম কায়েম করিবার জন্য একত্রিত করিয়া দাও। দোয়ার সময় প্রায় তিন হাজার মুসলমান বিলাপের সুরে ক্রন্দন আরম্ভ করেন। সেই করুন মর্ম বিদারক দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

খাদিমুল কওমঃ

ওয়াছিফ উল্লাহ, সম্পাদক শ্রীহট্ট জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, শাহ আবু তুরাব মসজিদ রোড, শ্রীহট্ট।

উল্লেখ্য মাওলানা ওয়াছিফ উল্লাহ ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলিম ও দীর্ঘদিন শাহ আবু তুরাব (রহ.) এর মসজিদের ইমাম। মরহুমের বাড়ী ছিল দক্ষিণ সুরমার লাউয়াই গ্রামে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কংগ্রেস পন্থি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর মোকাবিলায় তিনি মর্দে মুজাহিদের ভূমিকা পালন করেন।

মুসলমান ভাইগনের নিকট ছাত্রদের আবেদনঃ

মুসলমান ভাইগন, আগামী ৬/৭ জুলাই- ২১/ ২২ আষাঢ় ভোটের দ্বারা ঠিক করিতে হইবে আপনারা পাকিস্তান চান না হিন্দুস্তান চান? হিন্দুর গোলামী চান না মুসলমানী হুকুমত চান? বৃটিশ সরকারের ৩রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে ও আসাম প্রদেশ হিন্দুস্তানে পড়িয়াছে। আপনারা সিলেটবাসী মুসলমান ইচ্ছা করলে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়া পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থাৎপাকিস্তানে যুক্ত হইয়া জাতি হিসাবে স্বাধীন হইতে পারিবেন। মনে রাখিবেন যে, আসামর সাথে যুক্ত থাকিলে চিরকালের জন্য আপনারা হিন্দুর গোলাম হইয়া থাকিবেন। এই সেদিন হিন্দুদের বিশিষ্ট নেতা রামকিষন ডালমিয়া বলিয়াছে যে, হিন্দুস্তানে গরু কুরবানী বন্ধ করিয়া তাহাদের হিন্দু রাজ্যের শাসনের শুরু করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা রবিশংকর শুক্লা ও রাজেন্দ্র প্রাসাদ বলিয়াছে যে, হিন্দুস্তানে মুসলমান দিগকে নিজের ঘরে মুসাফিরের ন্যায় বাস করিতে হইবে ও তাহাদের সকল রকম অধিকার ছিনাইয়া নেওয়া হইবে অর্থাৎ মুসলমান গণকে হিন্দুস্তানে কুলি মজুরের মত বাস করিতে হইবে।

হিন্দু জমিদার মহাজনরা টাকা পয়সার লোভ দেখাইয়া মুসলমানের ঈমান ক্রয় করিয়া মুসলমান গণকে হিন্দুস্তানের পক্ষে ভোট দিবার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সাবধান ভাইগন। আপনারা এইসব কাফের মোনাফিকদের ধোকায় পড়িয়া নিজের গলায় নিজে ছুরি বসাইবেন না। সামান্য স্বার্থের লোভে মহা মূল্যবান ঈমান বেচিবেন না। ঈমানই মুসলমানদের একমাত্র মহাসম্বল। কুচক্রীদের ছলনাময় মিথ্যা প্ররোচনায় ও লোভের মোহে পথভ্রস্ট হইয়া নিজের ও জাতির মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবেন না।

সুতরাং ভাই মুসলামন গন! আপনারা এদশে মুসলমানদের ধর্ম, শিক্ষা, ঈমান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আল্লাহর পবিত্র শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদের নানা প্রকার অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, দুনিয়ায় মানুষ হিসাবে বাঁচিবার জন্য প্রত্যেকটি ভোট পাকিস্তানের পক্ষে দিন। ইহাই মুসলমানদের শেষ পরীক্ষা। ২৫/৬/৪৯ঈ. হবিগঞ্জ মুসলিম ছাত্র রেফারেন্ডম কমিটির পক্ষ হইতে আব্দুল গফফার মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সিরাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস কুমিল্লা।[২৭]

সিলেটে গণ ভোটঃ

১৯৪৬ সালের ২৩ শে মার্চ কায়েদে আজম সিলেট শহরে শুভ পদার্পন করেন। তাঁর আগমনে সিলেটে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও উত্তজনা হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য তিনি একটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করে দেশ বাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে ভারত বিভাগ পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় ও ছয় ও সাত জুলাই গনভোটের তারিখ নির্দষ্ট হয়। গনভোট গ্রহণ করার জন্য আসামের তৎকালীন লিগেল রিমেমব্রেসার H.A. Stork কে Referendum Commissioner নিযুক্ত করা হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস জনমত গঠনের জন্য প্রবল আন্দোলন করেন। সিলেট জেলার জমিয়তে উলামার একটি দল সিলেটের পাকিস্তান ভূক্তির বিরোধী ছিল। আসাম তখন কংগ্রেস শাসনের কবলে। বাংলাদেশ থেকে জনাব নুরুল আমিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দীন, তমিজ উদ্দীন খান, সৈয়দ মোগজেম উদ্দীন হোসেন ইত্যাদি নেতৃগন সিলেট আগমন করেন। বহু সংখ্যক ছাত্র ও মুসলিম লীগের ভলনটৈয়ার বাংলাদেশ থেকে সিলেটের গ্রামাঞ্চলে প্রচারণা করে জনমত গঠন সহায়তা করেন। মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী,

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী আব্দুল মতিন চৌধুরী, আব্দুল হামিদ, দেওয়ান বাসিত, মঈন উদ্দীন চৌদুরী, দেওয়ান আজরফ, মাহমুদ আলী প্রমুখ সিলেট ও আসামের নেতারা এই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। বসত কুমার দাশ দৈন্যনাথ মুঝার্কী, ব্রজেন্দ নারায়ন চৌধুরী প্রমুখ নেতারাও কংগ্রেসের পক্ষে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

সিলেটের ডিপুটি কমিশনার ডামব্রেক I.C.S এর তত্ত্বাবধানে গনভোট গ্রহণ করা হয়। অবশেষে ভোট গণনার ফলাফল জানা গেল ৫২,৭৮০ ভোটের আধিক্যে সিলেট পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছে।

দুঃখের বিষয় রেডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী করিমগঞ্জ সাব-ডিভিশনের পাথার কান্দি, রাতাবাড়ী, বদরপুর ও করিমগঞ্জ থানার অধিকাংশ পাকিস্তান থেকে বিচ্যুত হয়।

পাকিস্তান আন্দোলন সম্বন্ধে সিলেট গেজেটিয়ার (১৯৭৪) এ বলা হয়েছে- The demand for pakistan by Muslim League and inclusion of the district (sylhet) in Pakistan recaineed a momentum under the leadership of Mr.Abdul Mutin chowdhury and others. The vinit of Quide Azam to Sylhet on the 2nd March 1946 had quiven impetus to the pakistan Movement in the district. But local Muslim league leaders were extensively arrested by the congress Government in the province. The British Government on 3rd June 1947 announced the transfor of power to dominion of Pakistan and India. But it was provided that referendum should be held in Sylhet district to decide whether the district continence to from part of the indian provired of Assam or should be amulgamated in the new promince of Eastern Bengal in Pakistan. The Govt of India appointed Mr. stork I.C.S. Judicial secretary to the Govt. of Assam as the referendum commissioner. There was considerable enthuslam and escitement in the district at the time of referendum. [২৮]

গণভোটের ফলাফলঃ

মহকুমা	মুসলমান ভোট	পূর্ব বাংলার পক্ষে	শতকরা হার	সাধারণ ভোটার	আসামের পক্ষে	শতকরা হার
০১. সিলেট সদর	৯২,২৬৮	৬৮,৩৮১	৭৪.১১%	৪৮,৮৬৩	৩৮,৮৭১	৭৯.৫৫%
০২. করিমগঞ্জ	৫৪,০২২	৪১,২৬২	৭৬.৩৮%	৪৬,২২১	৪০,৫৩৬	৮৭.৭০%
০৩. হবিগঞ্জ	৭৫,২৭৪	৫৪,৫৪৩	৭২.৪৬%	৬০,২৫২	৩৬,৯৫২	৬১.৩৩%
০৪. দক্ষিণ সিলেট মৌলভী বাজার	৩৮,২৯৭	৩১,৭১৮	৮২.৩২%	৪১,৪২৭	৩৩,৭৪১	৮০.৭৯%
০৫. সুনামগঞ্জ	৫১,৮৪৬	৪৩,৭১৫	৮৪.৩১%	৩৯,০৪৫	৩৪,২১১	৮৭.৬২%
সমগ্র সিলেট জেলা	৩,১১,৭০৭	২,৩৯,৬১৯	৭৬.৮৭%	২,৩৫৮০৮	১,৮৪,০৪১	৭৮,০৫%

২৮. Sylhet District Gazetteer 1974, p-79-80.

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য সামগ্রিক ফলাফলে বুঝা যায়, চক্রান্তমূলক ভাবে যে নীতির ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিত হয়, তাতে আসামকে সিলেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিন থানা ও কাছাড়ের মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট মহকুমা হাইলাকান্দি অন্যায়ভাবে ভারতকে দেয়ায় তা সুস্পষ্টভাবে লংঘনকরা হয।

১৯৪৭ সালের গণভোট বৃহত্তর সিলেটের অনেক কৃতি সন্তান নেতৃত্ব প্রদান করে জান মাল ত্যাগ করে এই জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করেন। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কোন ইতিহাসেই তাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই যার ফলে আজাদী আন্দোলনের এই গৌরবময় অধ্যায়টি বিস্মৃতির মধ্যেই রয়ে গেল।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে গঠিত পূর্ব পাকিস্তানের জনগনই ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং নয় মাসের যুদ্ধে হানাদার পাক সেনাদের পরাভূতকরে দেশ মুক্ত করে। এতে নূতন জাতীয় পরিচয় আসে, নূতন পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত আসে, নূতন উদ্দীপনা ও চেতনা সঞ্চারিত হয় একথা সত্য। অনুরূপ ভাবে একথা ও সত্য যে, জনগন যা এবং যে রকম ছিল তা সেই রকমই থেকে যায়। ভৌগলিক সীমানা ও থেকে যায় আগের মতই। এ থেকে সাধারণ ভাবেই একথা বলা যায় যে, ১৯৪৭ এদেশ বিভাগ না হলে বাংলাদেশ হতো না।

সুতরাং এটাই বাস্তব সত্য যে ১৯৪৭ ঈসায়ী দেশ বিভাগই স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি রচনা করেছে। যারা এটা মানতে চায়না, তারা কেবল ইতিহাসের সিদ্ধান্তকেই অস্বীকার করে না, প্রকারান্তরে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও ভূগোলকেও অস্বীকার করে।

জনাব আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন পাকিস্তান দাবী শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী নয়, এটা গোটা ভারতের মাইনরিটির জাতীয় দাবী।[২৯] (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর)

আজ যারা '৪৭ এর নামে হিস্টিরিয়া রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে ইসলাম বিরোধীতা বুঝতে চান, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিপক্ষে রাজাকার, মৌলবাদী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রভৃতি শ্লোগান তুলে দেশে বিশৃংখলা, অশান্তি হানাহানির সৃষ্টি করে দেশকে দুর্বল করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের তাবেদারে পরিণত করতে চান, তাদের সম্পর্কে একটা কথাই যথেষ্ট। কথাটি হল বাংলার মাটিতে ধান পাটের পাশাপাশি যেমন বহু আগাছা জন্মায়, তেমনি সিরাজুদ্দৌলা, তিতুমীরের পাশপাশি মীরজাফর, কৃষ্ণচন্দ্র বা উর্মি চাদ, জগৎ শেটের জন্মও এদেশে কম হয়নি। যারা বাংলার পানি হাওয়ায় পুষ্ট হয়ে বিদেশি শক্তির দালালী করার জন্য সদা হাপিত্যেশ করে প্রহর গোনে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রাখতে হলে সকল 'মুক্তি' ব্যবসায়ী মীর জাফরদের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।[৩০]

---

২৯. সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি- পৃ-৭৪

৩০. সাময়িক প্রসঙ্গঃ আরিফুল হক: দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ১৬ জানুয়ারী ২০০০ ঈসায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটে ভাষা আন্দোলনঃ

বাংলা ভাষা আন্দোলনে সিলেটের জনগনের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই আন্দোলনে সিলেটের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় পত্র পত্রিকার ভূমিকা ও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত পক্ষে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবিতে সিলেটের রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবিগন এমনকি ঔপনিবেশিক আমলে ও সংগ্রাম করেছেন।

প্রাচীন কাল থেকেই সাধারণ মানুষের ভাষা হিসেবে সাধারণ মানুষের ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি বিভিন্ন ভাবে বিরোধীতার সম্মুখনি হয়েছে। সে যুগের হিন্দু ব্রাম্মনদের মতোই মধ্যযুগ বা আধুনিককালে মুসলিম ধর্মীয় নেতাগন বাংলা ভাষার প্রতি বৈরী মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। বাংলাকে তারা অমুসলিমদের ভাষা বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করেননি। শুরু থেকেই বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চায় অনেক বাঙালী মুসলমান কবির মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের অভাব ছিলনা। বাংলাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করে নেওয়ার সাহস ও এদের অনেকের ছিল না। তবে মধ্যযুগের শেষার্ধে কয়েকজন বাঙালী মুসলিম কবি বাংলাকে কাব্য রচনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ সুলতান। তাকে (১৬ থেকে ১৭ শতক) সিলেটের জনগন নিজেদের সন্তান এবং হবিগঞ্জের গৌরব বলে দাবী করে থাকেন। যখন অন্যান্য বাঙালী মুসলিম কবি ধর্মীয় সংস্কারের কারণে বাংলায় কাব্য চর্চা করতে সংশয় বোধ করতেন, তখন বাংলা ভাষার অন্যতম কবি সৈয়দ সুলতান সাহসিকতার সহিত লিখেন 'যারে সেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন/ সেই ভাব হয় তার অমূল্য রতন।'[৩১]

মাতৃভাষাকে অমূল্য রতন বলে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রতি সৈয়দ সুলতানের গভীর মমত্বের দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে। কেবল মধ্য যুগেই নয়, পরবর্তীকালে মাতৃভাষার প্রতি সিলেটের কবি সাহিত্যিকগণ গভীর নিষ্টার পরিচয় দিয়েছেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের অবদানের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ধর্মীয় উদার পরিবেশই বাংলা ভাষা চর্চা সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল।

সিলেটে বাংলা ভাষা চর্চার ব্যাপকতা এখানে ভাষা চর্চার অনুকুল পরিবেশ এবং সিলেটের জনগন বাঙালী হিসেবে সচেতনতার প্রমাণ বহন করে। এই সচেতনতা মাতৃভাষার প্রতি যে কোন ধরণের ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সরকারী দলের বৈরিতার মোকাবেলা করতে তাদেরকে সক্ষম করেছিল।

ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিম জাগরন আন্দোলন নেতৃত্ব দানকারী প্রায় সকলেই ছিলেন অবাঙ্গালী। এঁরা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে উর্দুর গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই ভাবে বাংলার কয়েকজন মুসলিম নেতা যারা বাঙালী মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য লড়াই করেন তাঁরাও উর্দু ভাষাকে সমর্থন করেন। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের সাথে সাথে উর্দুর প্রতি মনোভাব ক্রমেই পাল্টে যেতে থাকে। সূত্রপাত ঘটে ভাষা বিতর্কের।

---

৩১. সিলেটের গবেষকগন সৈয়দ সুলতানকে হবিগঞ্জ বাসী বলে অভিহিত করেছেন। আফজল মোহাম্মদ ড. ও মোস্তফা কামাল সৈয়দ, হবিগঞ্জ পরিক্রমা, (সিলেট ১৯৯৪, ১সং) পৃ ৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবি শ্রেণী দৃঢ়তার সঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলা তাদের মাতৃভাষা সিলেটের বুদ্ধিজীবিগন এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না, এদের কেউ কেউ বাঙালীদের স্বতন্ত্র জাতি সত্তা হিসেবে ঘোষণা দিতেও দ্বিধা করেন নি।

১৯০৯ সালে সিলেটের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মৌলভী হামিদ আলী সুষ্টভাবে বলেন, আমাদের পুর্ব পুরুষ আরব, পারস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতাদের অধিবাসী হউক, আর এদেশ বাসী হিন্দু হউক আমরা এক্ষনে বাঙালী আমাদের মাতৃভাষা বাঙালা।

১৯১১ সালে ধন বাড়ির জমিদার, আসাম ও বঙ্গীয় আইন সভার এক কালের সদস্য নওয়াব আলী চৌধুরী রংপুর প্রাদেশকি শিক্ষা সম্মেলনে উপমহাদেশের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং জাতীয় পর্যায়ে এর স্বীকৃতির জন্য আহবান জানান। ১৯২১ সালে রাষ্ট্র ভাষা প্রসঙ্গ আলোচিত হলে তিনি বাংলাকে এতদঞ্চলের রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী উত্থাপন করেন।

১৯২৭ সালে সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলার দাবী জোরালো ভাবে উচ্চারণ করেন সিলেটের রাজনীতিবিদগন।

ঐ বছর তৎকালীনআসাম প্রদেশের অন্তর্গত সিলেট জেলার এম.এল.এ গন সংসদে বাংলা ভাষায় কথাবলার অধিকার মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করেন। সে সময়ে একটি আপিল মামলা নিস্পত্তি বিষয়ক প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষা প্রশ্নটি নিয়ে আসাম প্রাদেশকি ব্যবস্থাপনা পরিষদে বিতর্ক হয়। উক্ত পরিষদে দোষী একজন পুলিশকর্মকর্তার বরখাস্তের দাবি সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব বাংলা ভাষায় পেশ করা হয়। সিলেট থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য গোলাপগঞ্জ রনকেলি গ্রামের আব্দুল হামিদ চৌধুরী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত জানতে চান কিন্তু যেহেতু বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়ার বিধান আইনে ছিল না, সেহেতু সরকার পক্ষ জবাব দানে বিরত থাকে। এ ঘটনা সিলেটের সদস্যদেরকে প্রতিবাদ মুখর করে তোলে। তারা প্রত্যেক সদস্যদের মাতৃভাষায় বক্তৃতা দানের অধিকার এবং সরকার পক্ষকে জবাব দানের বিধান তৈরী করার দাবীর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এ নিয়ে পরিষদ কক্ষে দেড় ঘন্টা ব্যাপী তর্ক বিতর্ক চলে এবং এবং পরে আব্দুল হামিদ চৌধুরী বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করার সুযোগ লাভ করেন। তখন থেকে আসাম ব্যবস্থাপনা পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা রাখার এবং প্রশ্ন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি পায়। পরিষদ সদস্য আব্দুল হামিদ চৌধুরী (সোনা মিয়া) গোপেন্দ্র লাল চৌধুরী ও রাজেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী প্রমুখ এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এ ঘটনার এক দশক পরে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আসাম বিধান সভায় পূনরায় বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৩৮ সালের ৫ ডিসেম্বর বিধান সভায় প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রামনাথ দাস একটি প্রশ্নের জবাব ইংরেজী ভাষায় দিলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এর প্রতিবাদ করেন। উল্লেখ্য

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানী ছিলেন বিধান সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দানকারী একমাত্র সদস্য তিনি ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, আমি বাংলায় উত্তর চাই মন্ত্রী বাংলা ভাষায় বলেন যে, আমি তো বাঙালী নই। সিলেট সদর (দক্ষিণ) থেকে নির্বাচিত সদস্য স্পীকার বসন্ত কুমার দাস বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব প্রদর্শনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। উত্তরে মাত্র অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভাসানী নিজ দাবীতে অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত স্পীকার মন্ত্রীকে ইংরেজীতে জবাব দিতে বলেন এবং তিনি তা বাংলায় অনুবাদ করে দেবেন বলে ভাসানীকে আশ্বাস দেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই সিলেটের বুদ্ধিজীবিগন স্থানীয় সংবাদ পত্রে বাংলা ভাষার পক্ষে লেখালেখি শুরু করেন। এক্ষেত্রে সিলেট থেকে প্রকাশিত নওবেলাল এবং আল ইসলাহ পত্রিকা দুটি বরাবরই বাংলা ভাষার পক্ষে সোচ্চার ছিল। ১৩৫৪ বাংলায় (১৪৭৭) ভাদ্র সংখ্যায় আল ইসলাহ পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়ে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। এখানে বলা হয় বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হবেনা।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে দেশীয় পত্রিকায় প্রকাশিত এটি সম্ভবত প্রথম সম্পাদকীয় যার লেখক ছিলেন মুসলিম চৌধুরী। একইভাবে মোহাম্মদ আলী এবং দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফের যৌথ প্রচেষ্টায় নওবেলাল পত্রিকাটি বরাবরই বাংলা ভাষার পক্ষের মুখ পাত্র হিসেবে ভূমিকা রাখে।

এসকল লেখা সিলেটের অধিবাসীদেরকে ভাষা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

১৯৪৭ সালের ৯ নভেম্বর সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে এক সভায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি উত্থাপিত এবং ব্যাপক ভাবে আলোচিত হয়। সিলেটের সুপরিচিত লেখক মতিন উদ্দীন আহমদ সভার সভাপতিত্ব করেন এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শীর্ষক প্রবন্ধ পাট করেন সিলেটের বিশিষ্ট লেখক মুহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান। তিনি বলেন, যেহেতু পাকিস্তানের মাতৃভাষা একাধিক, সেহেতু সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের মুখের ভষা বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এ ধরণের দুর্বল যুক্তিতে নয় বরং ভাষা হিসেবে বাংলার সমৃদ্ধির কারণেই এই দাবী জানচ্ছেন।

১৯৪৭সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্টিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দু ভাষাকে সর্ব সাধারণের ভাষায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাঙালী মন্ত্রীরাও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। বাঙালী মন্ত্রীদের এই বাংলা বিরোধী ভূমিকায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়। যার প্রকাশ ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। ১৯৪৮ সালের ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে। তবে এর বহু আগেই ৩০ নভেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সিলেট জেলা শহরের মাদরাসা হলে প্রকাশ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার

Dhaka University Institutional Repository

দাবির পক্ষে সম্ভবত প্রথম সভা। সাহিত্যিক মতিন উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু হওয়া উচিত। সভায় বক্তরা উর্দুর চাইতে বাংলার শ্রেষ্টত্বের কথা বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন।[৩২]

রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে ভাষার প্রশ্নে যে সময়ে সিলেট পৃথক দুটি শিবিরে বিভক্তি হয়ে পড়েছিল। যার প্রতিফলন মুসলিম লীগের সদস্যদের মধ্যে দেখা যায়। বাংলা ভাষার পক্ষে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি, ছাত্র সমাজ ও শিক্ষিত নারী সমাজ বিশেষ ভাবে সক্রিয় ছিল। মুসলিম লীগের একটি ক্ষুদ্র অংশ, মুসলিম ছাত্র লীগ, ছাত্র ফেডারেশন গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও তমদ্দুনমজলিস বাংলার পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন দেয়। অপর দিকে প্রগতিবিমুখ সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ছিলেন প্রবলভাবে বাংলা ভাষা বিরোধী। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের দলে টানতে তারা সদা তৎপর ছিল।

রাষ্টভাষা আন্দোলনের ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে উভয় পর্যায়েই শুধু পূর্ববঙ্গে রাজধানী ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ঢাকার বাইরে ও এ আন্দোলন ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলনে সিলেটের অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, সিলেটের পত্র পত্রিকায় ই প্রথম বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে এবং এখানেই ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে প্রথম উর্দুকে রাষ্ট ভাষা করার প্রতিবাদের সভা হয়। এছাড়া সিলেটে ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে সচেতন নারীসমাজ ভাষার প্রশ্নে ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। বিভিন্ন ফোরাম, সভা ও মিছিল করে তারা আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেন। সিলেট জেলা, মহকুমা, থানা ছাপিয়ে এ আন্দোলন প্রত্যন্ত গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের সূচনার আগে থেকেই সিলেট পাকিস্তানের রাষ্টভাষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয়ভাবে এ আন্দোলনে প্রসার হলে তাতেও সিলেট অন্যান্য জেলার চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৫২ সালের প্রথম দিকেই ভাষা আন্দোলনের চুড়ান্ত রূপ নেয়। মুসলিমন কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের জন্য খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা আসেন এবং ২৭ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য দেন। তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে। ৩১ জানুয়ারী গঠিত হয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রান পরিষদ। পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারী সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী নেয়। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা ভেঙে ঢাকায় ছাত্র জনতার মিছির বের হলে পুলিশ গুলি চালায়। শহীদ হন বরকত, জব্বার, সফিক এবং আহত হন অনেকে। গুলিবিদ্ধ সালাম ৭ এপ্রিল মারা যান। ঢাকা পুলিশের গুলিবর্ষনের খবর রাতের মধ্যেই সিলেটে ছড়িয়ে পড়ে।

---

৩২. সিলেট ইতিহাস ঐতিহ্য পৃ- ১৮৮-১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটে ইতি মধ্যেই পীর হাবিবুর রহমানকে আহবায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারী রাতেই রাষ্ট্রভাবা সংগ্রাম পরিষদ পরদিন হরতাল আহবান করে এবং হরতালের সমর্থনে রাতেই পোষ্টার ও প্রচারপত্র ছাপা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারী হরতালের পাশাপাশি হযরত শাহজালালের মাজারে শহীদদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয। এবং বিকেল ৪ টায় গোবিন্দ পার্কে (হাসান মার্কেট) এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণ মিছিলের পর এখানে সমবেত হয়। তার পর এ আন্দোলন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও ছড়িয়ে পড়ে।

উপসংহারে বলসিয়া ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে দুপর্বের ভাষা আন্দোলনের পক্ষে গনজোয়ার তৈরীতে সিলেটের পত্র-পত্রিকা আল ইসলাহ ও নওবেলালের ভূমিকা ছিল পুরোধা স্থানীয় প্রধানত এই পত্রিকা দুটোর কারণেই সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সিলেটের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মেরুকরণের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সালে মুসলিম লীগের যারা উর্দুর পক্ষে ছিল এমন অনেকেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে বাংলার পক্ষে যোগ দেন। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী দল, সরকারী পদে কর্মরত থেকেও অনেকে আন্দোলনের সৈনিকে পরিণত হন।

ভাষা আন্দোলনের কেহ কেহ বিরেধীতা করায় মুসলিম লীগগন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বৃহত্তর সিলেটে ৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টিতে জয়লাভ করে। পাকিস্তান সরকারের বাঙালীর প্রতি বৈষম্য ও অবিচার এবং ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে জন সমক্ষে প্রকাশিত হয়। ক্রমেই তা সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। ১৯৫৩ সালে নুরুল আমিন সিলেট এলে ছাত্র জনতা তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন করে এবং তার জনসভা পন্ড করে দেয়। হবিগঞ্জে নুরুল আমিনকে উদ্দেশ্য করে কালো পতাকা প্রদর্শন করা হয়। একই বছর প্রাদেশিক মন্ত্রী তফাজ্জল আলীকে বিয়ানীবাজারে প্রবেশমুখে জনতা কালো পতাকা প্রদর্শন করে এবং নুরুল আমিন সরকারের বিরুদ্ধে তারা শ্লোগান ও দেয়। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ভাষা আন্দোলনে গড়ে ওঠো নেতৃত্বই বাঙালীর স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।[৩৩]

সিলেটে মুক্তিযুদ্ধ ঃ ১৯৭১

বাংলাদেশ তথা দুনিয়ার ইতিহাসের এক হৃদয় বিদারক ইতিহস ২৫শে মার্চ ১৯৭১ঈ. থেকে ১৬ই ডিসেম্বর। ১৯৭১ সাল এই নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, এ ইতিহাস সভ্যযুগের বর্বর ইতিহাস। এই নয় মাসে জল্লাদ ইয়াহিয়ার বর্বর হানাদার বাহিনী বাঙালীর উপর যে নৃশংস অত্যাচার করেছে তা ভাষায় অবর্ণনীয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট আজকের বাংলাদেশ - পূর্ব পাকিস্তান নাম নিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। ভৌগলিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতি দিক বিবেচনা করে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে একাধিক সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কুচক্রীদের কুটকৌশলে উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট দুটি অঞ্চল নিয়েই একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয। যার নাম হয় পাকিস্তান।

---

৩৩. সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানী শাসক চক্র পূর্ব বাঙলার জনগনকে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে কোনঠাসা ধরে রাখতে থাকে। পাকিস্তান সৃস্টির পর পরই এক বৎসর যেতে না যেতেই তারা আঘাত আনল আমাদের মাতৃভাষার উপর।পূর্ব বাংলার জাগ্রত ছাত্র জনতা রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, স্লোগানে রুখে দাড়াল এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বুকের তাজা খুন ঢেলে দিল বরকত, জব্বার, রফিক, সালাম, মশিউর রহমান প্রমুখ। শহীদ ছাত্র নেতা। পাকিস্তানী শাসানের ২৩ বৎসরের শোষন বঞ্চনায় গড়ে উঠল দু অঞ্চলেল বৈষম্যের পাহাড়। পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবি তুলে নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ করলে তাদের আখ্যায়িত কার হতো দেশের দুশমন বলে। ওরা শেরে বংলাকে বিশ্বাসঘাতক, শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে রাষ্ট্রদ্রোহী, মাওলানা ভাষানীকে কর্মনিষ্ট, বাংলার বিপ্লবী কর্মী বঙ্গবন্ধুকে ভারতের চর আখ্যায়িত করে চালিয়ে ছিল শোষনের স্টীম রোলার। এইসব শোষন বঞ্চনার অবসান কল্পে ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু বাঙালীর বাঁচার দাবী ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচী জাতির সামনে ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর ধার্য হয় সাধারণ নির্বাচনের দিন। আওয়ামীলীগ ৬ দফা দাবী দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৬৭ টি এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশক পরিষদে ২৮৮টি আসন ভার করে আওয়ামলীগের এ বিজয় পশ্চিমা শাসক মহল আতঙ্কিত হয়ে বাঙালীর হাতে শাসন তার ছেড়ে না দিতে ষড়যন্ত্রে লিপ্তহয়। শুরু হয় ক্ষমতা গমৃদাসৃদরে টাল বাহানা।

১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ময়দানে বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষন দেন। ঐতিহাসিক ভাষনে তিনি জনগনকে উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন- "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তিনি আরো ঘোষণা করেন 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ' তিনি আরো বলেন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল আমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। শুরু হয় ইতিহাসের কুখ্যাত গনহত্যা। ২৫ মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে।

২৭শে মার্চ ১৯৭১ সালে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনাত ঘোষণা করেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ই.পি আর পুলিশ আনসার, মুজাহিদ সহ হাজার হাজার ছাত্র যুবক ও মুক্তিকামী মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় মুক্তি বাহিনী।[৩৪]

বৃহত্তর সিলেটের সকল এম.এন. এ এবং এম.পি এ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী এম.সি.এ।

---

৩৪. আফজাল মোহাম্মদ ডা. ও মোস্তফা কামাল সৈয়দ, (হবিগঞ্জ পত্রিকা, অক্টোবর- ১৯৯৪, ২সং) পৃ- ১৯৮, ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ এক ইংরেজী ভাষনে ওসমানী নিজেও নিজেকে Commander in Chief the Bangladesh Force (Mukti Bahini) বলে পরিচয় দিয়েছেন।

ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল নিয়োমিত বাহিনী বেসামরিক তরুনদের নিয়ে গঠিত গনবাহিনীর সমন্বয়ে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে ৩ ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত এই মুক্তিবাহিনী অবিরাম ঝড়বৃষ্টি ও অত্যন্ত কষ্টকর এবং প্রতিকুল পরিস্থিতিতে স্থল, সমুদ্র উপকূল ও আভ্যন্তরীন নৌপথ এবং পরবর্তী পর্যায়ে সীমিত সামর্থ নিয়ে আকাশ যুদ্ধে ও সাহসিকতার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন। ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফ্রন্ট থেকে ফ্রন্টে বয়সের ভার তার কর্মোদ্যামকে ব্যাহত করতে পারেনি।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে গড়া ওসমানী শুধু যে সমর বিদ্যার সুপন্ডিত ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমরকুশলীও । নানা রূপ আভ্যন্তরীন দুর্বলতা, প্রতিকুলতা ও যুদ্ধ সাজ-সরঞ্জামের অভাব সত্বেও তাঁর উদ্ভাবিত কৌশল মুক্তিযুদ্ধকে দ্রুত চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই।[৩৫] লেঃ কর্নেল আব্দুর রব এম.সি.এ মুক্তিযুদ্ধের চীপ অব ষ্টাপ ছিলেন। দেওয়ান ফরিদ গাজী এম.সি.এ ছিলেন মুজিব নগর প্রশাসনের নর্থ ইষ্ট জোনের চেয়ারম্যান। তিনি বৃহত্তর সিলেটে ৪ ও ৫ সেক্টরের রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং উত্তর পূর্ব জোন ১ এর প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। আব্দুস সামাদ আজাদ এম.সি.এ বাংলাদেশের পক্ষে ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি হিসেবে বুদাপেষ্ট শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। মানিক চৌধুরী, মোস্তফা আলী, আব্দুল মুনতাকিম চৌধুরী, মোঃ ইলিয়াছ, আব্দুল হক, আব্দুর রহীম ও দেওয়ান ওবায়দুর রেজা চৌধুরী এম.এ. গণি এবং তৈমুছ আলী, আব্দুল জহুর, আব্দুর রইস, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, লুৎফুর রহমান, এডভোকেট মাসউদ চৌধুরী, আব্দুল হেকিম চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, আজিজুর রহমান, তোয়াবুর রহীম, আব্দুল আজিজ, মোস্তফা শহীদ, গোপাল কৃষ্ণ মহারত্ন মাওলানা আসাদ আলী, সামসু মিয়া চৌধুরী ডা. আব্দুলমালিক, আব্দুল লতিফ, আলী সরওয়ার খান, আলতাফুর রহমান, কাজী সিরাজ এম.পি এ গন।

এ. এইচ. সাদত খানকে আহবায়ক করে এবং ডা. এম.এ. মালিককে কোষাধ্যক্ষ করে ৯ সদস্যের বৃহত্তর সিলেট জেলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডা. নুরুল হোসেন চঞ্চল, সিরাজ উদ্দীন আহমদ, এডভোকেট শাহ মোদাব্বির আলী, আব্দুল মুনিম, এডভোকেট মুজিবুর রহমান চৌধুরী, ইসহাক মিয়া ও জমির উদ্দিন আহমদ।

(ক) হবিগঞ্জে অনুরূপ ভাবে নিম্নোক্ত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এডভোকেট মোস্তফা আলী এম.এন.এ আহবায়ক, ডাক্তার শামসুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক, সদস্য কর্মান্ডেন্ট মানিক চৌধুরী এম.এন.এ তৎকালীন লেঃ কর্নেল (অব.) এম.এ. রব এম.এন. এ, মোঃ এনামুল-

---

৩৫. সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৃ- ৬৭৭

Dhaka University Institutional Repository

হক (মোস্তফা শহীদ) এম.পি, এ. আব্দুল আজিজ চৌধুরী এম.পি, এ. সৈয়দ আফরোজ বখত, এডভোকেট কৃপেন্দ্র বর্মণ ও মোঃ ইয়াকুত আলী কোষাধ্যক্ষ।

(খ) সুনামগঞ্জ সংগ্রাম পরিষদ; দেওয়ান ওবায়দুর রাজা চৌধুরী সভাপতি, আলফাত উদ্দিন আহমদ সম্পাদক, সদস্য আব্দুস ছামাদ আজাদ, আব্দুল হক, আব্দুল হেকিম চৌধুরী, এম.এ রইছ এডভোকেট, আব্দুল জহুর, সামাদ মিয়া চৌধুরী ও সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, হোসেন বক্ত, আলী ইউনুস এডভোকেট ও আব্দুল কুদ্দুছ।

(গ) মুক্তিযুদ্ধের কৌশল হিসেবে সমগ্র দেশকে ১১ ভাগে বিভক্ত করা হয় তন্মধ্যে ৪নং সেক্টরকে নিম্নোক্ত কমান্ডার দের অধিনে ৬টি সাব সেক্টর এ বিভক্ত করা হয়।

১। সাব সেক্টর-১ ফ্রিজম ফাইটার মাহবুবুর রব সাকী চৌধুরী।

২। সাব সেক্টর- ২ কমান্ডর মেজর রব লেঃ নিরঞ্জন তার অধীনে কাজ করেন।

৩। সাব সেক্টর- ৩ কমান্ডর লেঃ জহির

৪। সাব সেক্টর- ৪ কমান্ডার ফ্লাইট লেঃ কাদের, মেজর শরিফুল পরে এই সেক্টরে যোগদানকরেন।

৫। সাব সেক্টর- ৫ কমান্ডার লেঃ ওয়াকিউজ্জামান।

৬। সাব সেক্টর- ৬ কমান্ডার মেজর এনাম।

(ঘ) সুনামগঞ্জ জেলা ৫নং সেক্টরের যা নিম্নোক্ত কমান্ডারদের অধিনে চারটি সাব সেক্টরে বিভক্ত ছিল।

১। ভোলাগঞ্জ সাব সেক্টর - কায়েস চৌধুরী পরে মোঃ তাহির উদ্দীন আখঞ্জী যোগদান করেন।

২। সেলা সাব সেক্টর, ক্যাপ্টেন এ.এস. হেলাল উদ্দীন

৩। বালাট সাব সেক্টর, সালা উদ্দীন পরে মেজর এম.এ. মুত্তালিব নেতৃত্ব দান করেন।

৪। টেকের ঘাট, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এম.পি. পরে মেজর (অব.) মুসলিম উদ্দীন যোগদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ কনে এ. এইচ. সাদত খান, আকন্দাছ সিরাজুল ইসলাম, মরহুম ডা. নুরুল হোসেন চঞ্চল, বরুন রায়, ইকবাল চৌধুরী, জয়নাল আবেদীন, জাকির খান চৌধুরী, ইসমত চৌধুরী, পীর হাবিবুর রহমান, মরহুম আকতার আহমদ, বাবরুল হোসেন বাবুল, শাহ আজিজুর রাহমান, এনামুল হক চৌধুরী, রফিক আহমদ,সদর উদ্দীন, আব্দুল মুক্তাদির, সুলেমান (শহীদ), আশরাফ আলী, মকসুদ ইবনে আজিজ লামা, মোয়েব আহমদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান মুজিব, মাহবুবুর রব সাদী, নিজাম উদ্দীন লস্কর, এ.টি.এম. মাসুদ টিপুসহ আরো অনেক।

এ আর চৌধুরী সি.আর. দত্ত আবুল ফাত্তাহ চৌদুরী ছাড়াও সামরিক বিভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন মঈনুল হোসেন চৌধুরী, এম.এম.কে জেড, জালালাবাদী, নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, জনাব আখঞ্জী, এ মোতালিব, আব্দুল আজিজ, মুহাম্মদ্ আব্দুর রব প্রমুখ। সিলেটের ই.পি. আর এবং পুলিশ বাহিনীর বহু সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন পর্যায়ে সিলেটের সংগ্রামী নেতারা জেল জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সত্য কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মত এতো রক্ত দিতে হয়নি বা এতো মানুষ নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতে হয়নি। রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন অনেকে তন্মধ্যে ডাক্তার সামসুদ্দীন আহমদ, মুনাওর আলী, তাছির মিয়া, মাহমুদ হোসেন, নীলমনি সরকার, কনষ্টেবল তৌহিদ মুজাহিদ সিপাই রমিজ উদ্দীন, রফিক উদ্দীন, নুর উদ্দিন আহমদ, নায়েক রাশেদ আলী, নায়েক আব্দুল মালিক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসীদের মধ্যেও অনেকে মুক্তিযদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে এস.এ.এম.এস কিবরিয়া ও আব্দুল মুহিত, ছাড়াও আব্দুল মান্নান, তৈয়বুর রহমান ও আয়ুব আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আব্দুল হান্নান চৌধুরী প্রবাসী সরকারের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্টিত ছিলেন, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী নয়া দিল্লীতেবাংলাদেশ সরকারের কুটনৈতিক প্রতিনিধির দায়িত্ব কৃতিত্বের সাথে সম্পাদন করেন।

ভাষা আন্দোলনের পর এ পথ অতিক্রম করে সিলেটবাসী স্বাধীকার আন্দোলন এবং অবশেষে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখে যারা স্মরণীয় বরণীয় হয়ে রয়েছেন তারা জাতির কাছে চির স্মরণীয়ও হয়ে থাকবেন নিম্নে বিভিন্ন পদক প্রাপ্তদের বিবরণ দেয়া হলঃ

বীর উত্তম পদকপ্রাপ্তঃ

১। মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুর রব, মুক্তি বাহিনীর চীপ অব স্টাপ রূপে সর্বাধিনায়কের সহকারী, বাড়ী হবিগঞ্জের খাগাউড়ায়।

২। মেজর জেনালের চিত্তরঞ্জন দাস, ৪ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক, বাড়ী হবিগঞ্জের মীরাসীতে।

৩। ক্যাপ্টেন (বর্তমান বিগ্রেডিয়ার) হারুন আহমদ চৌধুরী, বিয়ানীবাজার থানার চারখাই আদিনাবাদ নিবাসী।

৪। ক্যাপ্টেন (বর্তমানে ব্রিগ্রেডিয়ার) মুহাম্মদ আজিজুর রহমান ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বাড়ী গোলাপগঞ্জ থানার রানাপিং অঞ্চলে।

৫। সুবেদর (পরবর্তীতে সুবেদার মেজর এবং অনারারী ক্যাপ্টেন) আপ্তাব আলী বীর প্রতিক গোলাপগঞ্জ থানার দক্ষিণ ভাদেশ্বরের অধিবাসী।

৬। শহীদ নায়েক শাকির উদ্দীন চৌধুরী প্রাক্তন ইউ.পি.আর গোলাপগঞ্জ থানার রনকেলী গ্রামের অধিবাসী।

বীর বিক্রম পদকপ্রাপ্তঃ

১। ল্যাফটেন্যান্ট (পরবর্তীকালে মেজর) শমসের মুবিন চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ থানার ভাদেশ্বর গ্রামে জন্ম।

২। মেজর (বর্তমানে মেজর জেনালেল) মঈনুল হোসেন চৌধুরী বালাগঞ্জ থানার সিওরখালে জন্ম।

৩। ডক্টর তৌফিক এলাহি চৌধুরী (প্রাক্তন সি.এস.পি) বাড়ি বিয়ানীবাজার থানার নাটেশ্বর।

৪। ক্যাপ্টেন (পরবর্তীতে লেঃ কর্নেল) বদরুন্নুর চৌধুরী, দক্ষিণ সুরমার লাউয়াই নিবাসী।

৫। সুবেদার মেজর ফখর উদ্দিন চৌধুরী প্রাক্তন ই.পি.আর গোলাপগঞ্জ থানার রনকেলীতে জন্ম।

৬। শহীদ হাবিলদার জুম্মা মিয়া (জন্ম গোলাগঞ্জ থানার হেতিমগঞ্জ)

Dhaka University Institutional Repository

৭। শহীদ মাহমুদ হোসেন, জন্ম কানইঘাট থানায়।

৮। নীলমনি সরকার, কোতয়ালী থানার পালপুরে জন্ম।

৯। জনাব ইয়ামিন চৌধুরী জন্ম, গোলাপগঞ্জ থানার রনকেলীতে।

১০। জগৎ জ্যোতি দাস (জন্ম আজমিরিগঞ্জ থানার জাবুড়ায়)

১১। শহীদ কনষ্টেবল তৌহিদ,জন্ম গোলাপগঞ্জ থানার চৌধুরী বাজারের সন্নিকটে মুকিত লায়।

১২। শহীদ মুজাহিদ সিপাই রমিজ উদ্দীন, জন্ম শায়েস্তাগঞ্জের নিকট বিরামচরে।

বীর প্রতীকপ্রাপ্তঃ

১। ক্যাপ্টেন (বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার) মুহাম্মদ আব্দুল মতিন।

২। শহীদ রফিক উদ্দিন, জন্ম কানাইঘাট থানার দর্পনগরে।

৩। জনাব মাহবুবুর রব চৌধুরী সাদী, জন্ম নবীগঞ্জ থানার দিনারপুর (বনগাঁও)

৪। শহীদ নুর উদ্দিন আহমদ জন্ম নবীগঞ্জ থানার দিনারপুরের সাতাই হাল গ্রামে।

৫। জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস ছাতক থানার ভরহাল গ্রামে।

৬। জানব এনামুল হক চৌধুরী, জন্ম বালাগঞ্জ থানার সুলতাপুরে।

৭। জনাব এম. আব্দুল হালিম জন্ম সুনামগঞ্জের টেংরা ঘাটে।

৮। জনাব ফখর উদ্দীন চৌধুরী জন্ম গোলাপগঞ্জ থানার ফুলবাড়ীতে

৯। মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, জন্ম সুনাগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজারের আজবপুরে।

১০। জনাব সিরাজুল ইসলাম, জন্ম সুনামগঞ্জ জেলায়।

১১। শহীদ সিরাজুল ইসলাম, জন্ম ফেঞ্চুগঞ্জ থানার মাইজগাঁওএ।

১২। শহীদ নায়েক আব্দুল মালিক জন্ম গোলাপগঞ্জ থানার নাগরগ্রামে।

১৩। জনাব এ.কে.এম. আতিকুল ইসলাম, বিয়ানীবাজার থানায় জন্ম।

১৪। জনাব মোঃ মইজুল ইসলাম, মৌলভী বাজার জেলার রাজনগর থানায় জন্ম।

১৫। মকবুল আলী

পদকপ্রাপ্ত না হইলেও বৈশিষ্ট অর্জনকারী

১। শহীদ সুলেমান (জন্ম বিশ্বনাথ থানাধীন সুলেমান নগরে) ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে মিত্র বাহিনীর সহিত সিলেট বিমান ছত্র সাহায্যে অবতরণের পর শহীদ হন।

২। লেঃ কর্ণেল আজিজুর রেজা চৌধুরী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) শাহপরানের দরগার নিকট 'গ্রীন হিলস' এর বাসিন্দা।

৩। মেজর আবুল ফাত্তাহ চৌধুরী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) জন্ম বিয়ানী বাজার থানার দাহালে।

৪। ডাক্তার আব্দুল আলী (১৯৮১ সনের ডিসেম্বর মাসে মটর কোচ এর আঘাতে নিহত হন) ৩ ও ৪ নম্বর সেক্টর অঞ্চলে ডাক্তার হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন।

০৫। ক্যাপ্টেন (বর্তমানে কর্ণেল) এজাজ আহমদ চৌধুরী ৩ সেক্টরে যুদ্ধরত ছিলেন, জন্ম গোলাপগঞ্জ থানার ফুলবাড়ী (পরবর্তীতে তিনি মেজর জেনারেল হয়েছেন)। [৩৬]

---

৩৬. জালালাবাদের কথা, পৃ- ১৭৯- ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিলেটের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহাজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের প্রাক্কালে তথা প্রাচীন যুগে সিলেট ছিল কামরুপের অংশ বিশেষ। ইবনে বতুতার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ দ্বারা ইহা প্রমানিত। কামরু (কামরুপের) বিখ্যাত পীর শায়খ জালাল উদ্দিন (শাহজালাল (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করাই ছিল তার বাংলা সফরের উদ্দেশ্য বলে তিনি বলেছেন। যখন যে রাজন্য সিলেট শাসন করেছিলেন সেই রাজন্য বর্গের অনুসৃত ধর্মনীতি ভাষা ও সাহত্যি সিলেটকে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া সিলেটের শিক্ষা ও ভাষা সাহিত্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র বোধ পরিলক্ষিত হয়।

চতুদর্শ শতাব্দীতে সোনারগাঁয়ে প্রতির্ষ্ঠিত মাদ্‌রাসা বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়ার কারো কারো ভূমিকা অবশ্যই ছিল। বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসার মডেলে এখানে শিক্ষা দেয়া হতো। সুলতানী বাংলায় আব্বাসিয় খলিফাদের আমলে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম চালু ছিল। স্বয়ং শাহজালাল (রহ.) নিজামিয়া শিক্ষা লাভ করেন।

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষা প্রদানের কাজেও ৩৬০ আউলিয়ার কেউ কেউ সম্পৃক্ত আছেন বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে শাহ বদর বা আল্লামা বদর উদ্দিনের নাম বিশেষ ভাবে বিবেচিত হতে পারে। এই শিক্ষাঙ্গন থেকেই তরফের সৈয়দ ইব্রাহিম ও সৈয়দ ইস্রাইল মালিকুল উলামা-

খেতাব লাভ করেন। সংশ্লিষ্ট সুলতান এসব খেতাব স্বয়ং বিতরণ করেন। উনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে সিলেটের অনেকে দেওবন্দ, রামপুর, সাহারান পুর ও কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় যেমন অধ্যয়ন করেন তেমনি চতুর্দশ শতাব্দীতে এবং পরবর্তীকালে ও সিলেটের অনেকে সোনারগাঁ মাদরাসায় অধ্যয়ন করতেন বলে ধারণা করা হয়।

চতুর্দশ শাতব্দীতে সিলেট শহরের দরগাহ প্রাঙ্গনে স্থাপিত ''দারুল ইহসান' ছিল তৎকালীন সময়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও গবেষণার প্রধান কেন্দ্র। হযরত শাহজালালের নির্দেশে (স্বপ্নে) ১৫০৫ ঈসায়ী এখানে ইমারত নির্মিত হয়। হোসেন শাহী শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমারত না হলে ও দারুল ইহসানের অস্তিত্ব ইসলামী যুগের শুরুতে ছিল। শিলালিপি ও সনদ সূত্রে জানা যায় যে, মৌলভী বাজারের মোস্তফাপুরে ইমাম বাড়ীও লংলায় বড় একটি মাদরাসা ছিল। এজন্য বহু ভূমি ও অর্থের সংস্থান সনদের মাধ্যমে করাহয়।

সৈয়দ নজিব আলী খান মোস্তফা পুরের বরকত উল্লাহ (নজর) ইমাম বাড়ী সনদ দান করেন। (১৭৪৮ ঈ.) মুসলমান ছেলে মেয়েরা মক্তবে শিক্ষা শুরু করত। এসব মৃক্তবের অধিকাংশ ছিল মসজিদ ভিত্তিক প্রত্যেক শহরে বহুমসজিদ ছিল। এমনকি ক্ষুদ্র গ্রামে সেখানে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ছিল সেখানে ও অন্ততঃ একটি মসজিদ পাওয়া যেত। প্রতিটি মসজিদেই মক্তব

Dhaka University Institutional Repository

থাকত। মক্তব ছাড়া সিয়া মুসলমানদের ইমাম বাড়াগুলোতে মক্তব চালু থাকত। খানকা ও মসজিদ ছিল মুসলমানদের প্রধান শিক্ষাঙ্গন।[৩৭]

ইংরেজ রাজত্বকালে বাংলায় ৮০,০০৮ মাদরাসা ছিল। আস্তে আস্তে এসব অনেক মাদরাসা উঠে যায়। এর কারণহলো ইংরেজ শাসনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাদি। প্রথম হামলাটি শুরু হয় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সুর্যাস্ত আইন চালুর মাধ্যমে। ১৮২০ সালে ফৌজদারের পদ উঠিয়ে দেয়া হয়। ফলে এরা আর সনদের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্টপোষকতায় আইনি অধিকার ও হারিয়ে ফেলেন। মুসলিম এলিটরা মৌখিক ওয়াকফের মাধ্যমে ও মসজিদ মাদরাসায় ভূমিদান করতেন। লাখেরাজ সম্পত্তি দান করতেন এবং এর মাধ্য সেই পরিচালিত হত মসজিদ মাদরাসা গুলো। কিন্তু ১৮২৮ সালের এক আইন (রিজাম্পশন ল') বলে এসব সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেয়। পরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষাকে চাপিয়ে দিলে (১৮৮৩) মুসলমানদের সর্বনাশ সাধিত হয়।

১৮৬৯ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ২৮০ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করতেন। এ সময়ে সিলেটি শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ৫ জন। দিল্লির ১ জন ত্রিপুরা/ কুমিল্লার ১ জন, ময়মনসিংহের ১ জন পাবনায় ২ জন/ ঢাকা, কলকাতা ও চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীর সংখ্যা অবশ্য তুলনামুলক বেশি ছিল। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত দি এডুকেশন অব দি মুহাম্মাদ কমিউনিটি ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া নামক দুস্প্রাপ্য গ্রন্থে এক তথ্য নিম্নরূপ পাওয়া যায় যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সিলেটের জনৈক ইসমাইলের জবানীতে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায। একটি তদন্ত কমিশনকে তিনি বলেন, আমি হাইকোর্টের একজন উকিল। এখন প্রাকটিস করিনা। কারণ আমি ইংরেজী জানিনা আমি সিলেটের অধিবাসী। আমিহুগলি মাদরাসায় লেখাপড়া করেছি। আমি আরবী যা শিখেছিলাম তা ভুলে গেছি প্রায়। আমার একটি প্রেস (ছাপাখানা) আছে। আমি আইন ও বিধির অনুবাদ প্রকাশ করে থাকি। তবে উর্দু ভাষায় বেশী ছাপাই এবং এগলো বিহারে বিক্রি হয়। বাংলাভাষী মুসলমানগন ও এসব কিনেন। আমার একপুত্র এই মাদরাসার ছাত্র ইঙ্গ ফার্সী বিভাগে অধ্যয়ন করে। অন্য দুটি ছেলেকে বয়স হলে পাঠাব। এ বিভাগে যা পড়ানো হয় তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। আমি মনে করি মুসলমানদের এখন ইংরেজী ও ফার্সী পড়া উচিত। গ্রহণযোগ্য বাঙ্গালী মুসলমানদের ভালভাবে বাংলা জানা উচিত। বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় পর্যাপ্ত চাকুরী পাচ্ছে না। একারণে আমি মনে করি মুসলমানদেরকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়া অত্যাবশ্যকীয় অত্যাবশ্যক।

ইংরেজী জানা থাকলে আমি আর ভাল করতে পারতাম। আরবী বিভাগের ছাত্রদেরকেও ইংরেজী শেখানো উচিত। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বেশ কিছু ছাত্র এ প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসে। কারণ বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার আরবী শিক্ষার মর্যাদা উপলব্ধি করে থাকেন। কিন্তু সেখানে আবরী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। আগে মাদ্রাসার সুনাম আরও অনেক বেশি ছিল। শিক্ষা আগে অনেক ভাল হতো। বর্তমান দুর্দশার কারণ এই যে, শিক্ষা গ্রহণের পর আর চাকুরী পাওয়া যায় না। একারণে আরবী পড়ার দিকেও এখন আর নজর নেই। মুসলমানগন এখন দারিদ্রের চরম

---

৩৭. ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (এপ্রিল-জুন, ২০০৩) পৃ- ১৩১ ও ১৩৪

সীমানায় উপনীত। একারণে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বেতনের প্রশ্নটিও সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন। শরাফত নামার জন্য আমার অনুমোদন রয়েছে। মৌলভী ইসমাইলের সাক্ষ্য হতে হুগলি ও কলকাতা মাদরাসায় সিলেটের অনেকেই যে লেখাপড়া করেছেন তাও জানা যায়। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত মোহাম্মদ আহমদ প্রণীত শ্রীহট্ট দর্পণ গ্রন্থে বলা হয়েছে; এ জেলায় এন্টাস স্কুল ৩টি, ইংরেজী মাধ্যম শ্রেণী ১৬, বাংলা মাধ্যম শ্রেনী ১৪, নিম্ন শ্রেণী ৩০, পাঠশালা ৪২৬ এবং ৩টি মাদরাসা আছে। এই সকল স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ১৬,৬০১। জালাবাদের কথায় (১৯৯৭) বলা হয়েছে। সিলেট জেলার মোট ২৬টি ছেলেদের স্কুল ছিল। তন্মধ্যে ৩টি সিলেট শহরে বাকী ২৩টি লস্করপুর, হবিগঞ্জ, বুরুঙ্গা, ইলাশপুর, জালালপুর ইছাকলস, ছাতক, ভাটিপাড়া (২টি) জলডুপ, ঘিলাছড়া, আখালিয়া, কেশবপুর, বিথঙ্গল, ভাটেরা, বরমচাল প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্টিত ছিল। তখন সিলেট শহরে একটি এবং ছাতকে ১টি মোট দুটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। মেট্রিক পর্যন্ত কেবল সিলেট শহরের শেখঘাটের মিশন স্কুলেই ছিল। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে ছিল। কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে স্থাপিত হয়েছিল। সিলেট মোট ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। অন্যান্যগুলো ছিল নিম্নমানের স্কুল। সরকার মিশন ও জনগন বা জমিদারের দ্বারাই এসব স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এসব তথ্য হিষ্টরী অব ঢাকা ডিভিশন গ্রন্থসূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

১৮৩৬ সালে সিলেটে প্রথম ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। এটি সরকারী পাইলট স্কুল হিসেবে অবিহিত হয়। সিলেট ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠায় সিলেট সৈয়দ বখত মজুমদারের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ১৮৫৯ সালে সিলেট স্কুলে ৪৫ জন ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে ২জন খ্রিষ্টান এবং বাকীরা ছিল হিন্দু। ১৮৫৯ সালে সিলেট জেলার ৭টি ইঙ্গ বঙ্গ স্কুল ছিল। ১৮৬৭ সালে নাগাদ স্থানীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ছিল ৮টি। এগুলো ছিল ছাতক, দিলবরগঞ্জ, জালালপুর, কোরাব, লস্করপুর, ভাটিপাড়া, রাসবিহারী ও কেশবপুরে। ১৮৭২ সালে সিলেট মোট ৩৫টি স্কুল ছিল। ১৮৭৩ সালে এ সংখ্যা ২২৯ এ উন্নীত হয়। ১৮৭২ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৭০০ এবং ১৮৭৩ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ৬৬,৪৫০ এ। এসময়ে মক্তব ছিল ৩৫ টি, ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৩৪ জন।

সমকালীন শিক্ষাচিত্র

শিক্ষার্থী	স্কুল সংখ্যা	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র
১৮৫৭-৬০	০২	৪৮	১৯
১৮৬০-৬১	০৫	২৯৬	৭৬
১৮৭০-৭১	১৫	৮০৫	৭০

১৮৭৩ সালে শিক্ষার্থীদের সমাজ চিত্রঃ

বাংলাভাষী ৪৪৮৪ জন তন্মধ্যে হিন্দু ৩৫২৫ (ব্রাহ্মন ৬১৭জন) মুসলমান ৯৫৬ জন খ্রিষ্টান ৩ জন, অন্যান্য ৩ জন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ও অন্যান্য ভাষাভাষী ছিল আসামীয়া ৬ জন, ইউরোপীয়ান ২ জন, খাসিয়া ৮ জন, মনিপুরী ৪৮জন (ক্ষত্রিয়) এবং ত্রিপুরীয়া ২ জন। এসব ছাত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক বিভাজন ছিল নিম্নরূপ।

শিক্ষার্থীর সামাজিক স্টেটাস	হিন্দু	মুসলমান	খ্রিষ্টান	অন্যান্য	মোট
উচ্চ শ্রেণী	৪	৪			৮
মধ্যবিত্তে	১৫৫১	৩২০	৪	১৮৭৫	৩৭৫০
নিম্নবৃত্ত	২০২৫	৫৩৬	১	১০	২৬৭২
মোট	৩৫৮০	৮৬০	৫	১৮৮৫	৬৪৩০১

১৮৭৪ হতে ১৯০১ সাল পর্যন্ত স্কুলের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

সন	মাধ্যমিক স্কুল	প্রাইমারী স্কুল
১৮৭৪-৭৫	২৭	১৯৫
১৮৮০-৮১	৩১	২৮৫
১৮৯০-৯১	৪৪	৬৯৫
১৯০০-১৯০১	৬৮	১০১৭

১৯০০-১৯০১ সালে সিলেটে কলেজ ছিল ১টি, হাইস্কুল ৭টি, এম.ই. স্কুল ৪৬ টি, মধ্যবঙ্গ স্কুল ১৫টি। বি.সি. এলেনের জেলা গেজেটিয়ার (১৯০৫) সিলেট জেলার মাধ্যমিক স্কুল সমূহের একটি তালিকা দেয়া আছে। এ সময়ে উত্তর সিলেটে ১৩টি সুনামগঞ্জ ৯টি দক্ষিণ সিলেটে ৯টি করিমগঞ্জে ১০টি এবং হবিগঞ্জে ১৮টি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। তন্মধ্যে ইমামগঞ্জ বাজার স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দিনার পুর সদর ঘাটের দেওয়ান আব্দুল আলী (জন্ম ১৮৪১ ঈ.)

১৯০৫ সালের সিলেট জেলার মাধ্যমিক স্কুল সমুহের তালিকাঃ

উত্তর সিলেট মহকুমা	সুনামগঞ্জ মহকুমা
১. আখালিয়া	১. ব্রাহ্মন ঝুলিয়া
২. বালাগঞ্জ	২. ছাতক
৩. বেগমপুর	৩. দুহালিয়া
৪. বুরুঙ্গা	৪. জাতুয়া
৫. দেওরাইল	৫. কুবাজপুর
৬. জৈন্তা	৬. মধ্যনগর
৭. কানাইঘাট	৭. পাগলা
৮. মঙ্গলচন্ডি	৮. রাজানগর
৯. মোগলা বাজার	৯. সুনামগঞ্জ।
১০. নইখাই	
১১. রনকেলী	
১২. সিলেট শহরের গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল	
১৩. সিলেট শহরের বালিকা বিদ্যালয়	

Dhaka University Institutional Repository

হবিগঞ্জ মহকুমা	দক্ষিণ সিলেট বা মৌলভী বাজার মহকুমা
১.আগনা	১.ভাটেরা এম.ই
২.আজমিরিগঞ্জ	২.ভূনবীর এম.ই
৩.বামই	৩.কমলগঞ্জ এম.ই
৪.বানিয়াচুঙ্গ	৪.মৌলভী বাজার এম.ভি
৫.বেজুড়া	৫.মুন্সীবাজার (কেসি.এম.ই)
৬.গোবিন্দপুর	৬.পাঁচগাঁও (কেসি.এম.ই)
৭.গোপায়া	৭.পৃথিম পাশা আলী আমজদ এম.ই
৮.হবিগঞ্জ	৮.শ্রীমঙ্গল এম.ই.
৯.ইমামগঞ্জ (সদরঘাট) দেওয়ান আব্দুল আলি প্রতিষ্ঠিত	৯.টুংরা পোর্টিয়ার্স এম.ই
১০. জলসুকা	**করিমগঞ্জ মহকুমা**
১১. মাচুলিয়া	১.আগিয়ারাম এম.ই
১২. মিরাসী	২. ভাঙ্গা
১৩. মীরপুর	৩. বিয়ানীবাজার পঞ্চখন্ড
১৪. নবীগঞ্জ	৪.বিরশ্রী
১৫. পুটিজুরী	৫. ঢাকা উত্তর এম.ভি
১৬. রাজার বাজার	৬. করিমগঞ্জ
১৭. বরিশাল	৭. লাতু এম.ই.
১৮। সাইন্তাগঞ্জ	৮. নিলামবাজার
	৯. পাথারিয়া

সিলেট বিভাগের শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান হাল হকিকত

বিশ্ববিদ্যালয় ৩টি,

- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- সিলেট লিডিং বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
- সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি,বাগবাড়ী, সিলেট।

মেডিকেল কলেজ ৩টিঃ

- সিলেট এম.এ.জি মেডিকেল কলেজ (সরকারী)

Dhaka University Institutional Repository

✪ জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (বেসরকারী)

✪ নর্থ ইষ্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (বেসরকারী)

আইন কলেজ - ১টি

কলেজ ৮০ টি

স্কুল ৬৭৩ টি

মাদরাসা (আলিয়া) ২২৬ টি

সিলেট বিভাগের কলেজ সমূহ (পুরুষ/ কো এডুকেশন) :

ইংরেজী শাসনামলঃ

১। এম.সি কলেজ, সিলেট। (১৮৯২)

২। সরকারী আলিয়া মাদরাসা সিলেট (১৯১৩)

৩। সিলেট সরকারী মহিলা কলেজ (১৯৩৯)

৪। মদন মোহন কলেজ, সিলেট। (১৯৪০)

৫। সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ (১৯৪৪)

৬। বৃন্দাবন সরকারী কলেজ হবিগঞ্জ (১৯৩১)

পাকিস্তান আমলঃ

১। সিলেট সরকারী কলেজ, টিলাগড়, সিলেট (১৯৬৪)

২। বিয়ানী বাজার সরকারী কলেজ বিয়ানীবাজার (১৯৬৮)

৩। ঢাকা দক্ষিণ ডিগ্রী কলেজ, গোলাপগঞ্জ (১৯৬৯)

৪। ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, মাইজগাও, ফেঞ্চুগঞ্জ (১৯৭০)

৫। মৌলভী বাজার সরকারী কলেজ (১৯৫৬)

৬। কুলাউড়া ডিগ্রী কলেজ, কুলাড়া (১৯৬৯)।

৭। শ্রীমঙ্গল সরকারী কলেজ, শ্রীমঙ্গল (১৯৬৯)

বাংলাদেশ আমলঃ

মোট ৮০টি কলেজের মধ্যে ৭টি ইংরেজী শাসনামলে এবং ৭টি কলেজ পাকিস্তান আমলে স্থাপিত হয়েছে। ৮০ টি কলেজের মধ্যে বিভিণ্ন সময়ে মহিলাদের জন্যে মাত্র ৮টি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, স্বাধীন বাংলাদেশে বাকী সব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এটাও স্বাধীনতার সুফল। অন্যান্য আরও কোন কোন স্থানে কলেজ স্থাপিত হওয়ার দরকার।[৩৮]

---

৩৮. নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, সিলেট বিভাগের ইতিহাস (ঢাকা, ২৪ জুলাই ২০০৬ ১ সং) পৃ ১৪৯-১৫২

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য সরকারী কলেজ ১১টিঃ

১. এম.সি কলেজ, সিলেট
২. সিলেট সরকারী কলেজ
৩. সিলেট সরকারী মহিলা কলেজ
৪. সরকারী বাণিজ্যিক কলেজ
৫. সরকারী ভেটেনারী কলেজ
৬. সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউ
৭. সিলেট ক্যাডেট কলেজ
৮. ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট
৯. সরকারী তিব্বিয়া কলেজ
১০. বিয়ানী বাজার সরকারী কলেজ
১১. জকিগঞ্জ সরকারী কলেজ

বেসরকারী কলেজ ২৮টিঃ

হাই স্কুল সরকারী ৬টি ও বেসরকারী ১৮৭টি, মাদরাসা সরকারী ১টি, মাদরাসা, বেসরকারী ৬৮টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০০৬৫টি ও বেসরকারী ২৩৯টি।

মৌলভী বাজার জেলাঃ

মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১২৪৩ টি

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০০৬টি, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৮৬টি, মাদরাসা ৩৬টি, কলেজ ১৫টি, সরকারী কলেজ ২টি: (১) মৌলভী বাজার সরকারী কলেজ (২) শ্রীমঙ্গল সরকারী কলেজ।

সুনামগঞ্জ জেলাঃ

মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৪৮৯ টি

সরকারী কলেজ ১টি, সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ

বেসরকারী কলেজ ১০টি

হাইস্কুল ১০টি, সরকারী ৫টি ও বেসরকারী ৯৫টি। মাদ্রাসা ৪৬টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২৯টি। সরকারী ৮৫৭ টি ও বেসরকারী ৪৪১টি।

হবিগঞ্জ জেলাঃ

মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১০৯৬টি

সরকারী কলেজ ২টি

১. হবিগঞ্জ সরকারী বৃন্দাবন কলেজ

২. চুনারুঘাট সরকারী কলেজ

বেসরকারী কলেজ ১০টি

হাই স্কুল ৮৬টি, সরকারী ৬টি, বেসরকারী ৮০টি, মাদরাসা ৪৩ টি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৫৫টি সরকারী ৭৩৩টি বেসরকারী ২২২টি।[৩৯]

---

৩৯. সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পৃ- ৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটের শিক্ষাঙ্গন ও সাহিত্য

সিলেটের শিক্ষাঙ্গন ও সাহিত্যকে উনবিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।
(ক) প্রাচীন যুগ (খ) বৈষ্ণব সাহিত্য্য (গ) আধুনিক সাহিত্য (ঘ) সিলেট নাগরী (ঙ) ইসলামী ও মাদরাসা শিক্ষা (চ) ইংরেজী শিক্ষা (উনবিংশ শতক)

(ক) প্রাচীন যুগঃ

সংস্কৃতি ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার একটি হিসেবে স্বীকৃত। এই ভাষার ধারক ও বাহক ছিলেন আর্যগণ। প্রাচীন যুগে আর্যগন কামরূপে একটি উপনিবেশন স্থাপন করেন। সে সময়ে এ অঞ্চলে আর্যদের ভাষা সংস্কৃতির আগমন। সিলেট তখন কামরূপের অংশ বিশেষ। ঐ যুগে শিক্ষা ছিল ধর্মভিত্তিক বাগযত্র সম্পাদনের প্রয়োজনে। শিক্ষায় সার্বজনীন কোন রূপ ছিল না। বিদ্যা শিক্ষা সীমাবন্ধ ছিল ব্রাম্মণদের মধ্যে। বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র ছিল গৃহ। ব্রাম্মণদের জনগোষ্টির ধর্মগ্রস্থ অধ্যয়ন নিবিদ্ধ ছিল। রাজন্যগন পন্ডিত পোষতেন। শাস্ত্র বিচার বিধি প্রদান ও শিলালিপি লেখার প্রয়োজনে। নিধন পুর তাম্রলিপির ভাষা সংস্কৃত। কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মা সপ্তম শতকে নিধন পুরের তাম্রলিপির মাধ্যমে তার প্রপিতামহ ভূর্তিবর্মণ কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি পুণরায় ব্রাম্মনগণকে দান করেন। এতে প্রমাণ মিলে যে, সপ্তম শতকে সিলেট অঞ্চলে সংস্কৃত ও ব্রাম্মন গণের বসবাস ছিল।

সাম্প্রদায়িক বিপ্রঃ ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা আদি ধর্শপাশা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কান্যকুজ ও মিথিলা থেকে পাঁচ জন শাস্ত্রও ব্রাম্মন নিয়ে আসেন। যজ্ঞপেতে রাজার অনুরোধে এই পঞ্চ ব্রাম্মণ সিলেটে থেকে যান। এরাই সিলেটে বৈদিক শিক্ষার প্রসার ঘটান। নিধিপতি বৃহস্পতি, রঘুনাথ প্রমুখ। পন্ডিতগণ উপরোক্ত পঞ্চবিপ্রের অধঃস্তন পুরুষ। তাদের মাধ্যমেই পরবর্তী যুগে সিলেটে আর্যভাষা, বৈদিক শিক্ষা, বেদ বৈদান্তের চর্চা ভালভাবে শুরু হতে থাকে।

পাল রাজাদরে যুগঃ ৭৫০ থেকে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০০ বছর বঙ্গে পাল রাজাদের যুগ। এরা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও বিদ্যুৎসাহী। তারা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ ও বৌদ্ধপন্ডিতের পৃষ্টপোষকতা করতেন। এ সময়ে সিলেটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লিখিত চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলে স্বীকৃত। চর্যাপদের ভাষা ও সিলেটের গ্রাম্য ভাষায় যথেষ্ট মিল রয়েছে। সিলেটের প্রাচীন গ্রাম্যভাষা আনেকটা বৌদ্ধ পালিভাষা মিশ্রিত ছিল।
উহা আজও বৌদ্ধ প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। সঙ্গত কারণেই বলতে হয় যে, চর্যাপদের কোন কোন কবি সিলেটবাসী ছিলেন।

পশ্চিম ভাগ তাম্রশাসনঃ দশম শতকে উৎকীর্ণ রাজনগর পশ্চিমভাগ তাম্র শাসন থেকে জানা যায় শ্রীহট্ট মন্ডলে (মনুকুল প্রদেশ) বিশ্ব বিদ্যালয়ের নমুনায় একটি বিদ্যাপীট ছিল। এর পরিচালনার জন্য এক সহস্র ব্রাম্মনের প্রত্যেককে এক পটক এবং বিভিন্ন কর্মচারীদের জন্য ১২০ পটকা জমি নিস্কর বরাদ্দ ছিল। এক পটকা সমান ৫০ একর ভূমি। তাম্র শাসন থেকে পাওয়া যায় যে, দশম শতকে সিলেট অঞ্চলে বিদ্যাপীঠ বর্তমান ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

রাঘবী পাওয়ার গ্রন্থঃ

একাদশ শতকে জৈন্তার রাজা কদমদের রাজত্ব ছিল। পন্ডিত ও কবি কবিরাজ মালব দেশ থেকে জৈন্তার রাজ সভায় আগমন করেন। রাজা কাম দেবের উৎসাহে কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় "রাঘব পাওরী" গ্রন্থ রচনা করেন। সে যুগে সিলেট সংস্কৃত চর্চার ইহা ও একটি নজির।

সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যঃ একাদশ শতকের শেষের দিকে এবং পরবর্তীকালে সিলেট সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও প্রসার ঘটেছিল যুগের তাগিদে। সেই সময়ে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন বিভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে। তাদের মধ্যে রঘুনাথ, শিরোমনি, মহেশ্বর ন্যায় লস্কর, রঘুদেব ভট্টাচার্য, রাজকুমার নন্দী, শরচচন্দ্র চৌধুরী, নারায়ন দেব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

খ. বৈষ্ণব সাহিত্য

পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্যদেব ও তার ভাব বিপ্লবকে কেন্দ্র কের গোটা বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্য হয়ে উটে। শ্রী চৈতন্যের পিতা মাতা ও তাঁর পার্যদগণের অধিকাংশই সিলেটবাসী। শ্রী চৈতন্য নিজে কোন বই পুস্তক লিখেনি। তাকে কেন্দ্র করে সিলেটে যে বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠে তা বিশাল ও বৈচিত্রপূর্ণ।

বৈষ্ণব সাহিত্যের সকল রচিয়তাদের নাম এখানে উল্লেখ করতে না পারলে ও সিলেট বৈষ্ণব সাহিত্য ও এর রচয়িতাদের কতক পরিচিতি উল্লেক করার প্রয়াস পাব।

✪ **বৃন্দাবন দাশঃ** তিনি সিলেটের সন্তান। তিনিবাংলা সাহিত্যের আদি পদকর্তা ও শ্রী চৈতন্যের জীবনী লেখক।

✪ **অদ্বৈত চার্য্য ঃ** লাউয়ের গ্রাম নিবাসী অদ্বৈতচার্য্য প্রথম 'দৌড়পদ' রচনা করেন। তার পিতা কুবের পন্ডিত লাউড় রাজ দিব্য সিংহের মন্ত্রী ছিলেন।

✪ **ঈশান নাগরঃ** লাউড়ের অধিবাসী ঈশান অদ্বৈত প্রকাশ নামক গ্রন্থের রচয়িতা অদ্বৈত আচার্যের জীবনী গ্রন্থ তিনি রচনা করেন ১৫৬৮ ঈসায়ী।

✪ **ব্রজমেহান দত্তঃ** সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার ঢাকা দক্ষিণ নামক স্থানে তার জন্ম তিনি রচনা করেন গৌরাঙ্গ গীতি।

✪ রাধা মাধব দত্ত- তিনি সুনাম গঞ্জের জগন্নাথপুর থানার কেশবপুরের অধিবাসী। রাধারমন দত্তের পিতা তার রচিত গীতিকাব্য কৃষ্ণলীলা সিলেটের এইসব বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত গ্রন্থ রাজি বাংলার সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মুল্যবান ঐতিহাসিক তত্ব ও তথ্য এসব গ্রন্থে নিহিত আছে।[৪০]

---

৪০. সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, পৃ- ১৩৯-১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

(গ) আধুনিক সাহিত্য

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে সিলেটের শিক্ষাঙ্গন ও সাহিত্য জগতে বিভিন্ন শাখায় সমৃদ্ধ ছিল। অনুরূপ আধুনিক সাহিত্যে সিলেটের এখানে বিভিন্ন সাহিত্যের পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্যকে বুঝাবেন। সিলেটের সাহিত্যাঙ্গন অন্যান্য আধুনিক সাহিত্য ব্যতিত ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন এবং ইসলামী সাহিত্য রচনা করে সিলেটের সাহিত্য ভান্ডারকে পুষ্ট ও অলংকৃত করেছেন।

নিম্নে আধুনিক সাহিত্যে অবদান রেখেছেন এমন কয়েজন সাহিত্যিকের রচনাবলী, রচনার সময়কাল এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিত তুলে ধরা হল-

- অচ্যুতচরণ চৌধুরী (১৮৫৭-১৯৫৩) তিনি জকর গড় পরগনার মৈনা গ্রামের অধিবাসী তার শ্রীহট্টের 'ইতিবৃত্ত' ১৯১০ সালে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়।
- আর্জুমন্দ আলী (১৮৭০-১৯১৪) সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার ভাদেশ্বর গ্রামে তার জন্ম ১৮৯১ সালে তার উপন্যাস 'প্রেম দর্পন' প্রকাশিত হয। খুব সম্ভব ইহাই মুসলমান লিখিত প্রথম সামাজিক ইতিহাস তারকাব্য সংগ্রহ 'হৃদয় সংগীত'।
- আব্দুল মালিক চৌধুরী (১৮৯১-১৯৬৭) ভাদেশ্বরের অধিবাসী। তার গ্রন্থ 'নূতন ইমাম' 'স্বপ্নের ঘোর' ও 'হযরত শাহজালাল'।
- কাজী মোহাম্মদ আহমদ - মৌলভী বাজার দুলর্ভপুরে অধিবাসী। তিনি ১৮৮৫ সালে 'শ্রীহট্ট দর্পণ' নামে সিলেটের ইতিহাস লিখেন। বাংলা ভাষায় ইহাই সিলেটের প্রথম ইতিহাস।
- সৈয়দ আব্দুল গফফার- হবিগঞ্জের তরফ লস্করপুরের অধিবাসী। ১৮৮৫ সালে তিনি তরফের ইতিহাস লিখেন। তার অপর গ্রন্থ 'ইসলাম দর্পণ'।
- সৈয়দ আব্দুল মুতাকাব্বির- তিনি বিচারপতি সৈয়দ মাহমদু হোসেনের পিতা। তার উপন্যাস 'কল্প তরু' ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। তার অন্যান্য গ্রন্থ 'তত্ত্ব দর্পন'ও 'মুসলিম সমাজ'।
- আব্দুস সাত্তার- হবিগঞ্জ নরপতির অধিবাসী তার গ্রন্থ 'বসরার গোলাব' 'বঙ্গের শেষবীর' ও 'মেসো পোটেমিয়া ভ্রমণ'।
- আবু মুজাফর খাঁ - তিনি ইটার হাজী খার পুত্র। তার সাহিত্য কর্ম 'ইটারাজ বংশের কবিতা' ১৭ শতকে রচিত হয়। সুচিত নারায়ন ও খাজা উসমানের যুদ্ধের বিবরণ এই গ্রন্থে রচিত হয়েছে।
- শম্ভু চরন চৌধুরী- তিনি রসুলগঞ্জের মুন্সী ছিলেন। ১৮৭৫ সালে তিনি ইংরেজীতে History of Sylhet গ্রন্থ রচনা করেন।
- তারানাথ চৌধুরী- ১৮৯৩ সালে তিনি জগন্নাথপুরের ইতিহাস রচনা করেন।

- আবু জাকারিয়া ইব্রাহিম আলী সিলেটের গোটাটিকরে তার জন্ম। তাঁর গ্রন্থ শ্রীহট্ট "বিজয়কাব্য" ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়।
- রাধা রামনদত্ত সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থানার কেশবপুর নামক গ্রামে তার জন্ম। তিনি একজন সাধক কবি। তার গ্রন্থ 'রাধারাম সঙ্গীত'।
- দেওয়ান একলিমুর রাজা (১৮৮৯-১৯৬৪) দেওয়ান হাসন রাজার পুত্র।তার পুস্তক 'স্বপ্ন পথে' 'গীতি মেখলা' 'অভিজ্ঞতার ফল' প্রভৃতি।
- মুফতি আজহার উদ্দিন, শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি (১৯৩৮) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (১৮৮৩-১৯৫০) শাহজালাল এন্ড হিজ খাদিম (১৯১৪)
- আব্দুল আজিজ মাস্টার (১৮৯৫-১৯৬০) জৈন্তা সারিঘাটের অধিবাসী। জৈন্তার ইতিহাস হযরত শাহজালাল প্রভৃতি তার পুস্তক।
- আব্দুল গফফার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬) কবি আব্দুল গফফারের জন্ম করিম গঞ্জের বিরশ্রী গ্রামে। সাময়িক পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখতেন। তার প্রকাশিত পুস্তক 'হেলাল'।
- মতিন উদ্দিন আহমদ সাহিত্য রসিক মতিন উদ্দিন আহমদ দেওরাইলের অধিবাসী তার পুস্তক 'চালাক হাওয়ার পয়লা কিতাব' 'চোরাগ' ও 'বুদ্বুব' প্রভৃতি।
- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, জাতীয় অধ্যাপক প্রখ্যাত দার্শনিক সুনামগঞ্জের দুহালিয়া জমিদার পরিবারের সন্তান তিনি অনেক আধুনিক পুস্তকের প্রণেতা- তার কয়েকটি বই যেমন- 'আবুজর গিফারী' 'মুক্তির ডাক' 'নতুন সূর্য' 'দর্শনের নানা প্রসঙ্গ 'তমদ্দুনের বিকাশ' ইত্যাদি।
- শাহেদ আলী- ইসলামী চিন্তাবিদ মাহমুদ পুরের অধিবাসী। তার প্রকাশিত জিব্রাইলের ডানা, মক্কার পথ একই সসতনে 'হৃদয় নদী' প্রভৃতি। (মোহাম্মদপুর, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ ১৯২৫-)
- কবি দেলওয়ার (১৯৩৭) সিলেটের ভার্থখলায় জন্ম। উদীয়মান কবি ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমী পুরুস্কার পান। তার গ্রন্থের কয়েকটি 'জিজ্ঞাসা' 'পুবাল হাওয়া' 'ঐক্যতান' 'উল্লাস' 'স্বনিষ্ঠ সিলেট' প্রভৃতি।

ঘ- সিলেট নাগরী

চতুদর্শ শতকে সিলেট মুসলমান গন কর্তৃক বিজিত হয়। সে সময়ে স্থানয়ি অধিবাসীদের ভাষা ছিল বাংলা ও সংস্কৃত। কিন্তু বিজেতাদের ভাষা ছিল আরবী ও ফারসী। রাষ্ট্র বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বিপ্লব ঘটা ও স্বাভাবিক। ফলত; সেই যুগে সিলেটে নাগরী ভাষা নামে একটি উপভাষার জন্ম নেয়। তবে ঠিক কখন কিভাবে সিলেটে নাগরীর জন্ম নেয় সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। অনুমান করা হয় চতুর্দশ শতকের শেষে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে নাগরী লিপির জন্ম। এর ব্যবহার সিলেট কাছাড়ের মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সিলেট নাগরী সাহিত্যে মুখ্য অংশই ইসলাম ধর্মের বিধি- বিধান কাহিনী বর্ণনায় ব্যয়িত। মাঝে মাঝে

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক বিষয়ে মরমী প্রেম ও রোমান্টিক কাহিনীর সন্ধান ও মিলে। এ লিপিতে দু'একটি চিঠিপত্র ও কিছু দলিল দস্তাবেজের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও সরকারী কার্যকলাপে বা শিলা লিপিতে এর ব্যবহারের প্রমাণ নেই।

নাগরী লিপি

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ভাষা যুক্তাক্ষর বর্জিত। সিলেট নগরীতে যুক্তাক্ষর নেই। অক্ষর সংখ্যা ৩২। স্বরচিহ্ন৫টি। সিলেট নাগরী প্রবর্তনে বাংলা, সেমিটিক, আরবী, ফারসী ও সিলেটি উপভাষাজাত উচ্চারণ ভঙ্গীর স্পষ্ট অবদান রয়েছে। বাংলা দু'ভাষী পুতি সাহিত্যের ভাষা একেবারে সিলেটী গ্রাম্য উপভাষা। এই ভাষা সহজে আয়ত্ব করা যায়। সিলেটী নাগরী শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয়ে যাওয়ার দরকার হয় না। গ্রামীন মহিলাগন অতি সহজে এই ভাষা আয়ত্ব করে নাগরী পুথি পড়তে পারেন। সিলেটী নাগরী লিপিমালাকে 'সিলেট নাগরী হরফ' বলা হয়। হিন্দু পন্ডিতগণ এলিপিকে 'মুসলমানী নাগরী' বলে অভিহিত করেন। সিলেট এম.সি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক বাংলা ভাষার সুর্য সন্তান প্রফেসর আসদ্দর আলী সাহেব তার 'সিলেট দর্পণ' গ্রন্থের সিলেটী নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন Syloli nagri script is one thing but a shimlified from of Bangali script bascet on phonology. আর সে জন্যই 'সিলেটী নাগরী হরফ' কে বাংলা বিকল্প লিপি বা দ্বিতীয় লিপি হিসেবে গণ্য করা হয়। সিলেটী নাগরী লিপির প্রেস।

উনবিংশ শতকের পূর্বে নাগরী শুধু হাতে লিখা হত/ টাইপ না থাকার দরুন সিলেটী নাগরীতে বই ছাপানো সম্ভব ছিলনা। সিলেটের কৃতি সন্তান মরহুম মুন্সী আব্দুল করিম সর্ব প্রথম নাগরী অক্ষরে টাইপ কাটান ও পুস্তক ছাপানোর কাজে হাত দেন।

সিলেটে ইসলামিয়া প্রেস ও সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কসপ কলকাতার আপার চিৎপুর রোডের রত্ন সরকার লেনে জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে অনেক নাগরী পুস্তক ছাপানো হয়।

নাগরী সাহিত্য

সিলেটে নাগরী সাহিত্য প্রায় দু'শ বছর যাবত সিলেটের গ্রামীন সাহিত্য রসিক জনগনের সাহিত্য পিপাসা নিবৃত্ত করেছে সিলেটী নাগরী সাহিত্যের সাধক গন ও তাদের সাহিত্য কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- **কবি গোলাম হুসন** তাঁর গ্রন্থ 'তালিব হুসন' তিনি মৌলভি বাজার লংলার অধিবাসী। তার গ্রন্থের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় তার জন্ম ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে ৮১ বছর বয়সে তিনি 'তালিব হুসন' লিখতে শুরু করেন এবং তা সমাপ্ত করতে পাঁচ বছর সময় লাগে।
- সৈয়দ শাহ হুসন- তার গ্রন্থ 'ভেসদার' তিনি জগন্নাথপুর উপজেলার পিরের গাঁও অধিবাসী। তিনি ষোড়শ শতকের বিশিষ্ট সাধক। তিনি ছিলেন মহাকবি সৈয়দ সুলতানের মুর্শিদ।

Dhaka University Institutional Repository

- সৈয়দ শাহনুর -তার গ্রন্থ 'নূর নসিহত' মৌলভী বাজার ঘরগাঁও এ তার জন্ম। তার জগন্নাথপুরের সৈয়দপুর গ্রামের ও হবিগঞ্জের জালাল সাপ গ্রামে ও তাঁর বসত বাড়ী ছিল। তিনি কোন এক স্থানে বেশি দিন থাকতেন না। তিনি উচুদরের সাধক ছিলেন। জালাল সাপে তাকে সমাহিত করা হয়।
- সাধক কবি শেখ চান্দ (১১৬৬-১৭২৫) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'রাসুল বিজয়' 'কিয়ামত' ও 'তালিব নামা' প্রভৃতি। তিনি মৌলভী বাজারের ভানুগাছের লোক। সৈয়দ শাহনুর তার গরু ছিলেন।
- দীন ভবানন্দ- 'রাগ হরি বংশ' তার গ্রন্থ। কুলাউড়ার অন্তর্গত বরমচালে নর্তন গ্রামে একব্রাম্মন পরিবারে তার জন্ম। ভবানন্দ ঠাকুর পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের নাম দীন ভবানন্দ আগর তলার কাসিম নগর পরগনায় তার সমাধি।
- ভেলা শাহ-'খবর নিশান' গ্রন্থ প্রণেতা ভেলা সাহেবের আসল নাম জানা যায়নি। তার বাড়ী ছিল বালাগঞ্জ উপজেলায়। ইসলামীয় প্রেস থেকে 'খবর নিশান' ছাপা হয়।
- কবি খলির - তার পুস্তক 'চন্দ্র মুখী' ও গোল সোনাওর এগুলো রোমান্টিক কাব্য। তার বাড়ী সিলেট সদর উপজেলায়। অষ্টাদশ দশকের শেষ পাদে তার জন্ম।
- শাহ ওয়াজেদ আলী তার রচিত 'বড়জঙ্গ নামা' পূতি সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তিনি সুনামগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী বোলঘর নিবাসী ছিলেন।
- শাহ আছদ আলী- শাহর রচিত এবাদতের মগজ প্রভৃতি তার গ্রন্থ। তার আবাস ছিল সুনামগঞ্জের বোল ঘরে।
- শেখ ভানু হবিগঞ্জের বামই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উনবিংশ শতকের লোক। তিনি উচ্চমানের আধ্যাত্মিক গান রচনা করেন।
- মুন্সী সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬২) 'হালতুন্নবী' 'রদ্দেকুফুর' 'হাশর মিছিল' 'মহব্বতনামা' প্রভৃতি তার গ্রন্থ। 'হালতুন্নবী' তার অমর সৃষ্টি ও সাড়া জাগানো পূতি। উনবিংশ শতকের শেষাংশে ও বিংশ শতকের প্রথম পাদে 'হালতুন্নবী' ঘরে ঘরে পঠিত। কুলাউড়ার দৌলতপুর গ্রামে তার জন্ম এক হিন্দু পরিবারে তার পূর্ব নাম ছিল গৌর কিশোর সেন। তিনি হিঙ্গাজিয়া আদালতের মুন্সীফ ছিলেন।
- সুফি শিতালং (১৮০০-১৮১৮) তার গ্রন্থ 'রাগশিতালঙী' আধ্যাতিক বাউল গানের সমষ্টি। করিমগঞ্জের বাউল ঠাকুরী গ্রামে তার জন্ম। তিনি সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার ফুলবাড়ী আজিরিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। যে মাদরাসায় আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) ও আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী (রহ.) দ্বয়ের মুর্শিদ আল্লামা শাহ ইয়াকুব বদর (রহ.) অধ্যয়ন করেছিলেন। সুফী শিতালং শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তিনি উচুধরের একজন সাধক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

- মুন্সি ইরফান আলী (১৮৫৬-১৯২৬) 'ছয়ফুল বেদার্ত' 'মুফিদুল মুমিনীন' 'রাহাতনামা' প্রভৃতি তার গ্রন্থ। তিনি করিম গঞ্জের পঞ্চম খন্ড কসবা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।
- হাজী মোহাম্মদ ইয়াছিন- 'মাগিবাতুন নবী' 'প্রেম আজ' 'মায়ারিশ' 'রমনী দর্পন' 'আশিকে খোদা' ও 'হুক্কে রাসুল' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। হাজী মোহাম্মদ ইয়াসীনের পৈত্রিক নিবাস ছিল করিম গঞ্জে তিনি আগরতলা রজ্যের ধর্মনগরে বসবাস করতেন।
- 'দুই খুরাশাহ' দুই খুরারাগ তার পুথির নাম। তার আসল নাম মুন্সি মনির উদ্দিন। করিম গঞ্জের বাহাদুরপুরে তার সমাধি।
- শাহ আব্দুল ওহাব (১৮০০-১৮৮৮) তার গ্রন্থে 'উম্মিতরান' 'হাশার তরান' 'ভবতরানি' ও 'ভেদ কারা'। ভেদকারা ১৮৯৫ সালে কলকাতা থেকে ছাপা হয়। তার জন্ম ভরায়া পরগনার ফুলবাড়ীতে। অতি উচু দরের আলিমও সাধক ছিলেন তিনি ছিলেন শিতালং শাহ ও ইব্রাহিম তশনার আধ্যাত্মিক গুরু।
- কবি নছিম আলী (১৮১৩-১৯২০) 'হরফুল খাসলত' রচয়িতা কবি নসিম আলী সিলেটের অদুরে কৌড়িয়া পরগনায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দৌলত মোহাম্মদ পাঠান বংশোদ্ভুত। নছিম ১৮৭৫ সালে তার গ্রন্থ লিখেন ও ১০৭ বছর বয়সে ওফাত প্রাপ্ত হন।
- মৌলভী আব্দুল করিম 'কড়িনামা' 'সদমি মসলা' 'সোনা ভানের পুতি' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা আব্দুল করিমসাহেব সিলেট শহরের অধিবাসী ছিলেন তিনি প্রথম সিলেট নারগী টাইপ কাটান ও নাগরী পুঁথি প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করেন।
- 'সৈয়দ রাগীব আলী' 'মা'রিফুল ওয়াহদত গ্রন্থ রচয়িতা সৈয়দ রাগীব আলীর বাড়ি ছিল সুনামগঞ্জের সৈয়দের গায়ে। অবশ্য তিনি পরে ছাতকে বসতি স্থাপন করেন।
- শাহ হরমুজ আলী 'দিলনসিহত' 'হরমুজ নসিহত' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। শাহ হরমুজ ছিলেন সিলেট শহরের প্রসিদ্ধ সাদক কবি।
- মুন্সি চেরাগ আলী 'হালাতুননূর' 'ইবরত নামা' 'রাগনামা' প্রভৃতি গ্রন্থের লিখক। চেরাগ আলীর আসল নাম বুহরান উল্লাহ। তিনি সিলেটের আখালিয়ার অধিবাসি। উনবিংশ শতকের দিকে তিনি পুস্তক লিখেন।
- সৈয়দ জহুরুল হোসেন তার গ্রন্থ 'নুর নাজাত' 'মারিফাতের জাওয়াহির' তার নিবাস ছিল হবিগঞ্জের তরফে।
- মুন্সী আহমদ আলী- 'ভবতরান' 'পুথির কবি আহমদ আলী জৈন্তা চতুল পরগনার দুর্গাপুরে অধিবাসী।
- মুন্সী আব্দুল করিম- তাঁর রচিত পুথি 'ওয়াজিবুল আমল' ওজু নামাযের কবিতা, ১৩০ ফরজ ও বাউল করিমি তিনি জৈন্তা চতুল হারাতৈল গ্রামের অধিবাসী। তিনি বিখ্যাত খেলাফত নেতা ইব্রাহিম চতুলীর পিতা।

Dhaka University Institutional Repository

- আব্দুল আজিজ মাষ্টার (১৮৯৫-১৯৬০) তাঁর পুস্তক 'ওয়াজিবুল ইসলাম' 'মুফিদুল আওয়াম'ও 'রাগ বাউলা দিল দিওয়ানা' কানাইঘাট থানার ছোট দেশ গ্রামে তার জন্ম। তিনি বাংলা ভাষায় 'জৈন্তার ইতিহাস' 'হযরত শাহজালাল' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'সিলেটী নাগরী হরফে সিলেট নাগরী সাহিত্যে যে সব কবি, সাহিত্যিক, লেখক বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের নাম দিয়ে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ের উপর, মরমী কবিতা, পুথি, বাউল গান, আধ্যাত্মিক গান, ইলমে মারিফতের তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর সিলেটের উপভাষায় স্বার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে সিলেটের নাগরী সাহিত্যকে জীবন্ত রাখার চেষ্টা করলে ও এখন এ সিলেটী নাগরীর অন্তিম দশা। বর্তমান প্রজন্মের কেহ এ লিপির সম্বন্ধে অবগত বলে মনে হয়না। তবে এতটুকু সত্য বলে জানা যায় যে, চৌধুরী গোলাম আকবর ও অধ্যাপক আছদ্দর আলী প্রমুখ গবেষনা করে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

আমাদের প্রত্যাশা যে, তাদের সাধনার ফসল শীঘ্রই একদিন প্রকাশিত হবে। এতটুকু আনন্দের ও সুখের বার্তা এইযে, কিছুকাল আগে ধর্মপাশা উপজেলার অধিবাসী ড. গোলাম কাদির সিলেট নগরীর উপর গবেষণা করে একটি থিসিস লিখেন এবং ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে একটি থিসিস লিখেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এমনিভাবে এ লিপি টি ধরে রাখতে আরো অনেকে এগিয়ে আসবেন বলে আমার বিশ্বাস।[৪১]

(ঙ) ইসলামী ও মাদরাসা শিক্ষাঃ

চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গী সাথীগন সিলেটে আগমন করেন। ক্রমে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে এবং ধর্মের অঙ্গ হিসেবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.) নিজে ও হবিগঞ্জের 'তরফ' নামক স্থানে সিপাহসালার নাসের উদ্দিন এবং বৃহত্তর সিলেটের অন্যান্য স্থানে ৩৬০ জন সাথী অবস্থান করেন।

ফলে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠে। মূলতঃ সিলেট ও হবিগঞ্জের তরফে এ দুটোস্থানেই প্রথম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠে। অন্যান্য আউলিয়াগন যেখানে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন তারাও সেসব স্থানে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন।

তৎকালীন সময়ে ইসলামী শিক্ষা বাহন ছিল আরবী ও ফারসী সুতরাং মাদরাসা মক্তবে আরবী ফার্সীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হতো। সুলতানী আমল ফারসী রাজভাষায় আসন গ্রহণ করে। ফলে অফিস আদালতে সরকারী কাজকর্মে ফারসী প্রচলিত হয়। ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত রাজ কর্মচারীগণকে ফারসী ভাষা লিখতে হতো। মুসলমানী আমলে যত শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে তার অধিকাংশ ফারসী ও কিছু কিছু আরবী ভাষায়।

৪১. নহীদুল ইসলাম, নিজামী, মো. মাওলানা মুহাম্মদ মুশাহীদঃ জীবন, কর্ম ও চিন্তা (এম.ফিল অভিসন্দর্ভ অপ্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬খ্রী.) পৃ- ৬৪- ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর অনুচর বর্গের আগমনের পর বৃহত্তর সিলেটের গ্রামে গঞ্জের সর্বত্রই ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম না হলেও কতিপয় স্থানে চতুর্দশ শতকের শেষ হতে মক্তব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হতে শুরুকরে বলে কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

তরফ (লস্করপুর) মাদরাসাঃ

প্রবাদ ছিলো "স্থানের নাম তরফ ঘরে ঘরে হরফ"। চতুদর্শ শতকের শেষার্ধে তরফ লস্কর পুরে অনেক গুলো মক্তব ও মাদ্রাসা গড়ে উঠে। আরবী ফার্সী এবং পবিত্র কোরআন হাদিছ এখানে শিক্ষা দেয়া হত। তরফের শিক্ষিত আলিমগণ দিল্লীর বাদশাহ ও গৌড়ের সুলতান গণের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হতেন।

শামছুল উলামা, মুলুকুল উলামা, কুতবুল আউলিয়া প্রভৃতি খেতাবধারী আলিম ও সুফীদের কর্মস্থল এই তরফ। সুদীর্ঘ চারশত বছর যাবত তরফ লস্করপুর ছিল ইসলামী জ্ঞান চর্চার তীর্থ কেন্দ্র। তরফের মহাকবি সৈয়দ সুলতান নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে এইভাবে লিখেছেন-

"লস্করে পুরখানি আলিম বসতি
মুই মুর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি।"

মুফতি মাদরাসাঃ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে সিলেটের মুফতি পরিবারের মৌলভী জিয়া উদ্দিন এই মাদরাসা স্থাপনকরেন। সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর এ মাদরাসা ফারসী ভাষার শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। সে সময় রাষ্ট্রভাষা ফারসী থাকায় উহার স্বতন্ত্র মুল্যায়ন ছিল। মাদরাসার ব্যয় নির্বাহাতে সরকারী ভাবে দিল্লির সম্রাটগন ৫৪২ হাল ভূমি লাখেরাজ দান করেন। এই মাদরাসায় হিন্দু মুসলমান সকলেই ফারসী ভাষা শিক্ষা করতেন। ১৮৩৭ সালে ফারসীর স্থলে রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজী হওয়ার ফলে মাদরাসাটি উঠে যায়। মাদরাসার জমি ও বৃটিশ বেনিয়া সরকার দখল করে নেয়। এই ভাবেসমগ্র দিল্লির সালতানাতের হাজারো হাজারো দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার সম্পত্তি বৃটিশ তথা ইংরেজ সরকার তাদের আওতায় নিয়ে যায়। এবং সুপরিকল্পিত ভাবে উহা ধ্বংস করে ফেলে। দ্বীনের ধারক বাহক প্রকৃত নায়িবে নবী ওলামায়ে কেরাম ইংরেজদের হাতে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েও সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করে আজ পর্যন্ত মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা ও খানকা নির্মাণে মুসলমানদের সার্বিক সহযোগিতায় টিকে আছে।

ফুলবাড়ী আজিরিয়া মাদরাসাঃ

সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানায় ফুলবাড়ীর মিরহাজরা বংশীয়গন ফুলবাড়ীতে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। এ মাদরাসা বহু বছর যাবত পূর্ব উত্তর সিলেটে দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীকালে মৌলভী আজির উদ্দিনের নামে ইহার নাম করণ করা হয় আজিরিয়া আলিয়া মাদরাসা। উনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রথম সিলেটের বড় বড় আলিম গন এই মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। সুফী শিতালং ইব্রাহিম ও মাওলানা শাহ ইয়াকুব বদরপুরী

Dhaka University Institutional Repository

যিনি আল্লামা ফুলতলী সাহেব কিবলা ও আল্লামা মুশাহিদ (রহ.) দ্বয়ের পীর ও মুর্শিদ ছিলেন প্রমুখ আল্লামাগন ফুলবাড়ী মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন।

সৈয়দপুর শামছিয়া মাদরাসাঃ

৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম সৈয়দ শাহ শাম্সুদ্দীন বোগদাদী (রহ.) এর স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম সৈয়দপুর সুনামগঞ্জের জগন্নাতপুর থানায়অবস্থিত। সৈয়দপুরের শামছিয়া মাদ্রাসাটি প্রায়শতাধিক বছরের পুরনো। এই মাদরাসা অনেক জ্ঞানী গুণী আলিম উলামার জন্ম দিয়েছে। মাদরাসাটি বর্তমানে ফাজিল শ্রেণতি উন্নীত। এছাড়া আল্লামা হোসাইন আহমদ মদনী (রহ.) এর আগমনে সেখানে আর একটি কওমী (টাইটেল) মাদরাসা প্রতিষ্ঠিতহয়। এ দুটি মাদরাসায় সুশিক্ষার ফলে আজো বৃহত্তর সুনামগঞ্জের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় সৈয়দপুরের গ্রামে শিক্ষিতের হার অপরাপর সকল থানা ওউপজেলার মধ্যে শীর্ষে।

সৈয়দিয়া মাদরাসা, সিলেটঃ

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে হাজি সৈয়দ বখতে মজুমদার মজুমদারীতে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। ইহা সৈয়দিয়া মাদরাসা নামে খ্যাত। এই মাদরাসার প্রধান শিক্ষকছিলেন সোয়াতের অধিবাসী শামসুল উলামা আব্দুল ওহাব (১৮৫০-১৯২২) দুর্লভপুরে কাজী মোহাম্মদ আহমদ সাহেব ও এ মাদরাসায় কিছু কাল শিক্ষকতা করেন। মজুমদারী ওয়াকফ স্টেট থেকে এ মাদরাসার ব্যয় ভার বহন করা হতো। পরবর্তীকালে এ মাদরাসাটি উঠে যায়।

ইমদাদুল উলুম মাদরাসা, উমরগঞ্জঃ

প্রসিদ্ধ সুফী সাধক খেলাফত কর্মী ইব্রাহিম তশনা নয় বছর হিন্দুস্থান ও (উত্তর প্রদেশ) এবং দিল্লিতে অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে এসে তার জন্মস্থান কানাইঘাটে বাটাই আইলে ১৩১৭ হিজরীতে (১৮৯৮ সালে) একটি উচ্চ শিক্ষার মাদরাসা স্থাপন করেন নাম দেন ইমদাদুল উলুম মাদরাসা উমরগঞ্জ। তিনি নিজেও কিছুদিন এই মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। এই মাদরাসায় মিশরী লাহজায় কিরাত প্রশিক্ষণ দেয়া হত। মাদরাসাটি জন সাধারণের সাহায্য সহায়তার উপর নির্ভরশীল। প্রায় শতাব্দীকাল যাবত প্রতিষ্ঠানটি টিকে আছে।

ঝিঙ্গাবাড়ী আলিয়া মাদরাসাঃ

১৮৩৫ সালে জৈন্তা বৃটিশ শাসনের আওতায় আসে এবং সিলেট জেলার সাথে সংযুক্ত হয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে জৈন্তার ঝিঙ্গাবাড়ীতে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠে। ফুলবাড়ী মাদরাসার পরেই স্থান করে নেয় ঝিঙ্গাবাড়ী মাদরাসা। মাওলানা হাবিবুল্লাহ এই মাদরাসাকে আলিয়া মাদরাসায় উন্নীত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় মাওলানা আব্দুল বারী ও মাওলানা ইব্রাহিম সাহেবের প্রচেষ্টায় এই মাদরাসার সুনাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে হাফিজ মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা নিসার আলী, বাহরুল উলূম মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন, মাওলানা বশির উদ্দিন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

জামেউল উলুম আলিয়া মাদরাসা গাছবাড়ীঃ

১৯০১ ইংরেজীতে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে মাওলানা আবু ইউসুফ ইয়াকুব সাহেব দিল্লী থেকে অধ্যয়ন কোবে গাছবাড়ী ফিরে আসেন ও মাদরাসাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আপ্রান চেষ্টায় জামাতে উলা খোলা হয়। পরবর্তীকালে আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরীর মাধ্যমে হাদীসের অধ্যাপনা শুরু হয়। এ মাদরাসা থেকে সিলেট ও সিলেটের বাইরে জেলা সমূহের অসংখ্য আলিম শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

গভর্ণমেন্ট আলিয়া মাদরাসা, সিলেট ঃ

শতাব্দীর ঐতিহ্যে লালিত উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা। এদেশে সরকারী ভিত্তিতে কোন আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এটিই প্রাচীন। অপর একমাত্র সরকারী আলিয়া মাদরাসা, মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, প্রথমতঃ ১৭৮০ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। অথচ এর ৩৪ বছর পূর্বেই সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা পায়।

এই মাদরাসা ১৯১৩ সালে, সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থল চৌহাট্টায় ৭.১৭ একর জমি সংগ্রহ করে ইবতেদায়ী ক্লাশ ও জুনিয়র সেকশনসহ সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা। প্রতিষ্ঠালগ্নে অধ্যক্ষের পদ ছিল না। প্রতিষ্ঠাতা সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মাওলানা সাদ উদ্দিন আবুল লেইছ। ১৯১৯ সালে কোলকাতা আলিয়া মাদরাসার অনুকরণে সিনিওর সেকশন চালুর মাধ্যমে অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হয়। এবং জনাব আবু সাঈদ আবদুল্লাহ মাদরাসার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

সে সময়ের আসাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জননেতা সৈয়দ আব্দুল মজিদ কাপ্তান মিয়ার উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় এ মাদরাসাটি স্থাপিত হয়। ১৯৩৫ সালে আসামের শিক্ষা মন্ত্রী শামসুল উলামা আবু নছর মুহাম্মদ ওহীদ মাদরাসার কামিল শ্রেণী অনুমোদন করেন এবং দুই বছর দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতি আল্লামা ছহুল উসমানীকে মুহাদ্দিছ নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৪ সালে বাহরুল উলুম আল্লামা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে সিলেট আলিয়া মাদরাসায় প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হয়ে আসেন। ১৯৪৭ সালে পূর্বে আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী পরপর তিনবার উক্ত মাদরাসায় শায়খুল হাদীসের পদে দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম দুইবার আল্লামা সহুল উসমানীর স্থলাভিবিক্ত এবং পরবর্তীবার আল্লামা শেরুজ্জামানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে শায়খুল হাদিসের দায়িত্ব পালনকরেন। ইসলামী শিক্ষার প্রসারে এ মদ্রাসাটির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া অনেক সরকারী কর্মকর্তা সচিব, মন্ত্রী সহ বহু জ্ঞানী গুনীজন এ মাদরাসা যুগ যুগ ধরে উপহার দিয়ে আসছে।

তাছাড়া সিলেটের শীর্ষস্থানীয় মাদরাসা সমূহের মধ্যে রয়েছে- বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, সৎপুর কামিল মাদরাসা, মৌলভী বাজার টাউন সিনিয়র কামিল মাদরাসা।

প্রায় বড়বড় কওমী মাদরাসার প্রাক্তন বড় বড় আলিম দেখা যায় যারা সরকারী আলিয়া মাদরাসা সিলেট থেকে পড়াশুনা কর পরবর্তীতে স্ব-স্ব উদ্যোগে কওমী মাদরাসা স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। এমনিভাবে যুগ যুগ ধরে আলিয়া মাদরাসা দেশ ও জাতিকে সৎ নাগরিক প্রকৃত দেশ প্রেমিক, সমাজ সেবী খ্যাতনামা কৃতিপুরুষ আন্তর্জাতিক পর্যায়েস্বীকৃত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও উপহার দিয়েছে। সিলেটের অন্যান্য প্রাচীন মাদরাসার মধ্যে জালালপুর সিনিয়র মাদরাসা হোসাইনিয়া আরাবিয়া কওমী মাদরাসা গরহপুর, পাথারিয়া, দেওরাইল, ছাতক, গঙ্গাজল,বাঘা, বিশ্বনাথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

✪ সিলেটের মাটি ও মানুষ প্রাগুক্ত, হিমাদ্রী শিখর রায়, সিলেট বিডি ইনফো ডট কম, (ঢাকা- ফকিরেরপুল ২০০২ই., ১সং) পৃ- ৩৫।

(চ) ইংরেজী শিক্ষা (উনবিংশ শতক)

১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সিলেটের শাসনভার গ্রহণ করে। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭০ বছর দেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ফার্সিবহাল থাকে। এই সময়ে টোল এবং মক্তব মাদরাসাই ছিল স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ছিল ধর্মভিত্তিক এর সার্বজনীন কোন রূপ ছিল না; টোলে এবং গুরু গৃহে হিন্দু শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃত পঠন পাঠন চালাত। সরকারী কাজে নিযুক্ত হিন্দুগনকে ফার্সি ভাষা শিখতে হতো, তাদের টাইটেল ছিল মুন্সী। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা মক্তব মাদরাসা কেন্দ্রীক ছিল। শিক্ষার পরিধি ও পরিসরে নিয়ন্তা ছিলেন ইসলাম ধর্মীয় গুরু উলামাগণ।

১৮৩৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শিক্ষানীতিতে প্রথম হস্তক্ষেপ করে। তাদের শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন।

১৮৩৭ সালে আইন করে ফার্সি ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে বন্ধ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মুসলীম সমাজে প্রতিবাদের ঝঁড় উটে। পূর্বে ফার্সিই ছিল অফিস আদালতের ভাষা। রাজকার্যে নিয়োজিত হিন্দু মুসলমান সকলেই ফার্সি শিখতে হতো। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি বাগ্মী বিপিন চন্দ্রপাল তার আত্ম জীবনীতে লিখেছিলেন যে, তার শিক্ষা আরম্ভ হয় শেখ সাদীর পান্দ নামার মাধ্যমে নিজ পিতার নিকট। তার পিতা রাম চন্দ্র পাল ছিলেন ফার্সী নবীশ। সে কালের হিন্দুগন ইংরেজী শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে চাকুরীর খাতিরে। তাদের পক্ষে মনিব বদলের সাথে ভাষা বদল ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল ভিন্ন। তারা দ্বীনি শিক্ষা বিবর্জিত ইংরেজী ভাষার প্রতি ছিল বিমুখ। নাসারা (খৃষ্টানদের) ভাষা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ফলে উনবিংশ শতকের শেষাধে হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতে অফিস আদালত ব্যবসা বাণিজ্য দখল করে নেয়। রাজানুগ্রহ লাভের নেশায় উচ্চ হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে যায়। উল্লেখ্য মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা না করার প্রেক্ষাপট ছিল রাজনৈতিক ভাবে তাদেরকে এ দেশে থেকে বিতাড়ন করা, এতে ঢালাও ভাবে আলিম ওলামাগন দায়ী করা মোটেই সমিচিন নয় বলে আমি বিশ্বাস করি। তাদের উপর এক কঠিন বিপদের সময় অতিবাহিত হয়েছে।

মোটামোটি একথা বলা যায় এ সময় ভারত বর্ষের সকল প্রদেশ, বিভাগ ও জেলা সমূহে ইংরেজী শিক্ষার একটি প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে হিন্দু প্রধান সিলেট জেলায় ও এর প্রভাব পড়ে। তবে মুসলমানগণ বিজাতীয় ভাষা ইংরেজকে সহজে বরণ করতে পারেনি। যার ফলে এ শতাব্দীতে সিলেট সহ সারা ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার হার অতি নগন্য বলে ইতিহাস প্রমাণ দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট গর্ভর্মেন্ট হাইস্কুল (প্রথম পর্যায়)

মিশনারী মিঃ এডামের রিপোর্ট অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বাংলাদেশের প্রতি জেলায় একটি করে হাইস্কুল স্থাপন করা হবে। সিলেট সে সময়ে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত ১৮৪০-৪১ সালে সিলেটে সরকারী হাইস্কুল স্থাপিত হয়। ইংরেজী ভাষার প্রতি জনসাধারণের অনিহা তাই ছাত্র স্বল্পতা হেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বছর ১৮৫৭ সালে এ স্কুল উঠে যায়।

মিশনারী হাইস্কুলঃ

সরকারী স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে রেভারেও প্রাইজের প্রচেষ্টা ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনে মিশনারী স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ সালে এই স্কুল থেকে সর্বপ্রথম (চারজন) ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নেয়। কেবলমাত্র নবকিশোর সেন উত্তীর্ণ হন। পরের বছর ঐ স্কুল থেকে জয় গোবিন্দ ঘোষ ও তার বড় ভাই সনাতন ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। এই সময় পাদ্রী প্রাইজ সিলেট ত্যাগ করেন। রেভারেণ্ড জোনস মিশন হাই স্কুল পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাইজ মধ্য ইংরেজী স্কুলঃ

শিক্ষনীয় স্কুল স্থাপনের পর পরই পাদ্রী প্রাইজ শেখঘাট ও নয়াসড়কে দুটি মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। শেখ ঘাট স্কুলে নবকিশোর সেন ওনয়াসড়ক স্কুলে গোবিন্দচরন দাস প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে প্রাইজ সাহেব শিলচর চলে যান। পরিচালনার অভাবে স্কুল দুটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। অধিকন্তু পাদ্রী প্রাইজ শিলচরে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন ও নবকিশোর সেনকে সেইস্কুল নিয়ে যান।

রাস বিহারী মধ্য ইংরেজীস্কুল

১৮৬৭ সালে সিলেট শহরের চৌহাট্টা মহল্লায় বাবুর বিহারী মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। তৎকালীন সময়ের সিলেটের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মৌলভী আব্দুল করিম ও প্রখ্যাত সমাজকর্মী ডা. সুন্দরী মোহন দাস এই স্কুলের ছাত্র। ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রি পাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে ইহা হাইস্কুলে পরিনত হয়। কিন্তু সরকারী হাই স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। প্রায় দশ বছর পর ১৮৭৭ সালে স্কুলটি উঠে যায়।

সিলেট সরকারী হাইস্কুল (দ্বিতীয় পর্যায়)ঃ

১৮৬৯ সালে মিশন স্কুলের ভগ্নাবশেষ নিয়ে ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর বাব নবকিশোর সেনের প্রচেষ্টায় সিলেটের মনোয়ারের টিলার ওপর গভর্ণমেন্ট হাইস্কুল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষক হন বাবু দুর্গা কুমার বসু। তিনি ৩৪ বছর এই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন সে সময়ে মনোয়ারের টিলা শহরের বাহিরে ছিল তাই, ছাত্রগন এতদুর যেতে ইচ্ছুক ছিলনা। ফলে স্কুলটি নবাব তালাবের সিলেটের তালদিঘীর পশ্চিম তীরে নিয়ে আসেন। ১৮৭৯ সালেল ভূমিকম্পে স্কুলটি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংশ হয়ে যায়। পরে এটা পুনঃ নির্মিত হয় এবং বর্তমানে এ স্কুলটি টিকে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক ট্রেনিং স্কুলঃ

১৮৭৩ সালে সিলেটে একটি শিক্ষা ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। কয়েক বছর পর স্কুলটি উটে যায় ও শিলচ নর্মাল স্কুল বা গুরু ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়।

মুফতি স্কুলঃ

১৮৭৬ সালের পহেলা জানুয়ারী মুফতি জালাল উদ্দিনে ও মুফতি নুর উদ্দীন দরগা মহল্লায় মুফতি স্কুল স্থাপন করেন। পরের বছর লর্ড বিশ্বপ বাহাদুর সিলেট সফর কালে এই স্কুল পরিদর্শন করেন। স্কুলের উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট হন। ইহাই সিলেটের সর্বপ্রথম প্রাইভেট হাইস্কুল। মুফতি স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন প্রকাশ বাবু। ১৮৭৭ সালে খান বাহাদুর সিকন্দর আলী এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। বাসবিহারী স্কুলের মত এই স্কুলটি ও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। মুফতি স্কুল পরবর্তী জাতীয় স্কুলে রূপান্তরিত হয়।

জাতীয় বিদ্যালয়ঃ

১৮৮০ সালে ৫ই জানুয়ারী মুফতি স্কুলের ভগ্নাবশেষ নিয়ে কলিকাতার শ্রীহট্ট সম্মিলনীর বিপিন চন্দ্রপাল, রাজচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ যুবকগন বড়যত্র বা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে বাবু বিপিন চন্দ্র পাল পরে বাবু রাধানাথ চৌধুরী এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বাবু দীননাথ দাস মুন্সী এ বিদ্যালয়ের ফার্সি ভাষায় শিক্ষক ছিলেন।

স্কুলটির অবস্থান ছিল বর্তমান সিলেট শহরের ডি.সি অফিসের সামনে। ১৮৯২ সালে রাধানাথের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর স্কুলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৮৯৬ সালে রাজা গিরিশচন্দ্র এই স্কুলের স্বত্ব ক্রয় করেন ও ইহাকে মুরারী চাঁদ হাই স্কুলের অঙ্গীভুত করেন।

মুরারী চাঁদ হাইস্কুলঃ

১৮৯৬ সালে ১৭ই জুন গিরিশচন্দ্র আপন মাতামহের স্মৃতি রক্ষার্থ মুরারী চাঁদ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯২ সালে মুরারী চাঁদ কলেজ স্থাপিত হলে উক্ত হাইস্কুলের নাম হয় মুরারী চাদ কলেজিয়েট স্কুল। ১৮৯৬ সালে রাজা গিরিশচন্দ্র নৈশ স্কুল ক্রয় করে মুরারীচাঁদ কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে একিভূত করেন। এর নূতননাম হয় গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল বা সংক্ষেপে রাজার স্কুল। ১৯৮৬ সালে স্কুলটির শত বার্ষিকী উদযাপন করে।

নবাব তালাব বঙ্গ বিদ্যালয়ঃ

জিন্দা বাজারের বাবু কৃষ্ণচরণ দাস এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৬ সালে গিরিশ চন্দ্র রায় এই স্কুলের স্বত্ব ক্রয় করেন। পরে স্কুলটি তাঁতীপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়ে গিরিশচন্দ্র স্কুলে পরিণত হয়। পরবর্তীতে স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং এর নাম হয় এইডেড হাই স্কুল।

মফস্বলের অন্যান্য স্কুল

আসাম ডিস্ট্রিক গ্যাজিটিয়ারে উল্লেখ করা হয় ১৮৬৭ সালে সিলেট জেলার স্কুলের সংখ্যা চিল ২৮ ও ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১২৭ জন। ছাত্রদের অর্ধেকের বেশী ছিল সিলেট শহরের অধিবাসী।

Dhaka University Institutional Repository

মফস্বলে তখনও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়নি বললেই চলে। ২৮টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ৩টি স্কুল ছিল ইংরেজী। মিশনারী ২টি ও রাস বিহারীস্কুল। অবশিষ্ট সবকটি ছিল বঙ্গ বিদ্যালয়।

দুর্লভ পুর মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ঃ

দুর্লভপুরে কাজী মোহাম্মদ আহমদ নিজগ্রাম দুর্লভপুরে ১৮৭০ সালে একটি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন ইহা আহমদ স্কুল নামে পরিচিত ছিল। এই স্কুল সরকারী সাহায্য লাভ করেছিল। খান বাহাদুর সিকন্দর আলী ও মৌলভী বাজারের প্রথম গ্রাজুয়েট মৌলভী হাবিবুল্লাহ (১৮৮৯) এ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু কালী কুমার গুপ্ত। মৌলভী জমির উদ্দীন উর্দ্দু ও ফারসী শিক্ষক ছিলেন।

বৃহত্তর সিলেটের অন্যান্য স্কুলঃ

উনবিংশ শতকে সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত স্কুল সমূহের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো।

১৮৭৬ সালে পোর্টিয়াস মধ্য ইংরেজী স্কুল, মৌলভী বাজারের রাজ নগরে।

১৮৮৩ সালে হবিগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।

১৮৮৬ সালে শরৎ সুন্দরী মধ্য ইংরেজী স্কুল,বেগমপুর

১৮৮৭ সালে মীরাসী মধ্য ইংরেজী স্কুল হবিগঞ্জ

১৮৯১ সালে মৌলভীবাজার হাই স্কুল

১৮৯৫ সালে মুন্সী বাজার মধ্য ইংরেজী স্কুল

১৮৯৬ সালে দশরথ মধ্য ইংরেজী স্কুল, গুমটার, শ্রীমঙ্গল।

১৮৭৩ সালে প্রকাশিত 'History of Dacca Division' গ্রন্থে সিলেটের শিক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিলেট জেলায় মোট ২৬টি ছেলেদের স্কুল ছিল। তন্মধ্যে ৩টি সিলেট শহরে। বাকী ২৩টি লস্করপুর, হবিগঞ্জ, বুরুঙ্গা, ইলাশপুর, জালালপুর, ইছাকলস, ছাতক, জলডুপ, বানিয়াচং, ঘিলাছড়া, আখালিয়া, কেশবপুর, বিথঙ্গল, ভাটেরা, বরমচাল, ভাটপাড়া, পাগলা, উচাইল প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত ছিল।

কেবল মাত্র শেখঘাট মিশন স্কুলে মেট্রিক পর্যন্ত পড়ানো হত। অন্যান্যগুলো ছিল নিম্নমানের স্কুল। সরকার মিশন বা জমিদারগণ কর্তৃক এসব স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৪৩ সালে লস্করপুর মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে তৎকালীন মহকুমা সদর বর্তমান জেলা হবিগঞ্জে স্থানান্তরের সময় স্কুলটিও হবিগঞ্জে চলে যায়। ১৮৮১ সালে দেওয়ান হাসান রাজা সুনামগঞ্জে হাসান মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৮৭ সালে জুবিলি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে এ স্কুলটি উঠে যায়। ছাতকের স্কুলটি স্থাপন করেন মিষ্টার হ্যারি ইনগিলিস।

১৯০০ সালে সিলেট জেলায় ১টি কলেজ, ৭টি হাইস্কুল, ৪৬টি মধ্য ইংরেজী স্কুল, ১৫ মধ্যবঙ্গ স্কুল, ৪৭টি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল ও ৮৩৩ টি নিম্ন প্রাইমারী স্কুল ছিল বলে ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮৬ সালের ৩০ এপ্রিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক সংলগ্ন স্থানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হযরত শাহজালালের নামানুসারে এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়। ১৯৮৯ সালের ১ জুন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী এ বিশ্ববিদ্যায়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৩ জন শিক্ষক ও ২০৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে তিনটি বিভাগ (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও অর্থনীতি) দিয়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। পরে এগুলোর ছয়টি ফ্যাকাল্টিতে বর্ধিত করা হয়। সেগুলো হচ্ছে- School of Physical Sciences, School of Social Science, School of Applied Science and Technology, School of Agriculture and Mineral Sciences, School of Management and Business Administration. এই স্কুলগুলোর অধীনে বর্তমানে ১৫টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। **School of Physical Science:** Physics, Chemistry, Mathematics and Statistics. **School of Social Science:** Economics, Sociology, Social Work, Anthropology and Political Studies and public Administration. **School of Applied Science and Technology:** Electronics and Computer Science, Chemical Technology and Polymet Scienc, Environmental Engineering and Pollution Control, Industrial and Production Engineering. **School of Agriculture and Mineral Science:** Forestry, **School of Management and Business administration:** Business Administration । বর্তমানে এখানে ২০০ জন শিক্ষক ও ৬,০০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। ৩২০ একর জায়গায় গড়ে ওঠা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে একটি মাষ্টার প্ল্যান করা হয়েছে। যাতে রয়েছে সাতটি স্কুলের অধীনে ৩৬টি ডিপার্টমেন্ট এবং ছাত্রছাত্রী হবে স্নাতক পর্যায়ে ৮,২০০ এবং রিচার্স স্টুডেন্ট হবে ১,৮০০ জন। সিলেট বিডি ইনফো ডট কম, প্রাগুক্ত পৃ-৩০-৩১

মুরারী চাঁদ কলেজ যা এমসি কলেজ নামে খ্যাত

রাজা গিরিশ চন্দ্র রায় ১৮৯২ সালে তার মাতামহের নামে স্থাপন করেন মুরারীচাঁদ কলেজ। এটি আসাম প্রদেশের বর্তমান সিলেট জেলার প্রথম কলেজ। প্রথম বছরে ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ জন। রায় বাহাদুর দুলাল চন্দ্র দেব কলেজের সেক্রেটারী ও প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। প্রথমে কলেজের ক্লাস মুরারীচাঁদ স্কুল বিল্ডিং এ শুরু হয়। কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন মি. শতীশ চন্দ্র রায়। ১৯০৮ সালে গিরিশ রাজার মৃত্যু হলে কলেজ সংকটের সুম্মুখীন হয়, তখন থেকে আসাম সরকার কলেজকে এইড দিতে আরম্ভ করে। ১৮৯২ সালে কলেজটি সম্পূর্ণ সরকারী বলে রূপান্তরিত হয়। ১৮৯২ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর দুলাল চন্দ্র দেব কলেজের সেক্রটারীর গুরু দারিত্ব পালন করেন। ১৯১৬ সালে কলেজে বি.এ ক্লাস খোলা হয় ও কলেজটি

Dhaka University Institutional Repository

ফাস্ট গ্রেড কলেজে উন্নীত হয়। খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ কাপ্তান মিয়া ও অন্যান্য তাদের প্রচেষ্টায় ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে থ্যাকারের টিলায় (বর্তমান সাইট) কলেজ ভবন নির্মিত হয়। ১৯২৫ সালে কলেজটি নূতন বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত হয়। কলেজটি উদ্বোধন করেন আসামের গভর্ণনর স্যার ইউলিয়াম।

(ছ) বিংশ শতকে সিলেটে ইংরেজী শিক্ষাঃ

বিংশ শতকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশ রাজ কায়েম ছিল। এই ৪৭ বছরের মধ্যে চারটি বিশেষ ঘটনা ঘটে যার প্রভাব অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেটের শিক্ষাঙ্গনে প্রতিফলিত হয়।

(এক) পূর্ববঙ্গ ও আসামে সিলেট, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ঘটনের ফলে এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটে। অনেক স্কুল কলেজ স্থাপিত হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আব্দুল লতিফ, মৌলভী আব্দুল করিম প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলমানগন ইংরেজী শিক্ষার দিকে আগ্রহান্বিত হয়। এরপূর্বে হিন্দু সমাজের একচেটিয়া ইংরেজী শিক্ষার ময়দান দখলে ছিল। মুসলমানগণের মধ্যে কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যতিত বিজাতীয় ভাষা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ ছিল না।

যে সময় ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের ফলে লাভ হত সরকারী চাকুরী ও সম্মানের জীবন। পূর্বে গোড়া হিন্দুদের পক্ষে সমুদ্র পাড়ি দিলে সমাজচ্যুত হতে হত। মুসলমান গন তুলনামূলক ভাবে ইংরেজী শিক্ষায় এগিয়ে যেতে শুরু করলে হিন্দু সমাজের আচার বিচার অনেকটা হ্রাস পায় অনেক হিন্দু ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়।

(দুই) প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)

এ সময়ে আসাম সরকার সাম্রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারের ভূমিকা ছিল প্রায় শুন্য। তাই যে সিলেট জেলা আসামের অধিনে ছিল সেই বৃহত্তর সিলেটে এসময় কালে তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। তবে ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেক স্কুল কলেজ মাদরাসা স্থাপিত হয়। এসময়ে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ প্রথম গ্রেড কলেজে উন্নীত হয়।

(তিন) খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৫)

এ সময়টা ছিল ইংরেজী শিক্ষার একটি ক্লাইমেক্সের যুগ। ইংরেজী শিক্ষা বর্জন ও ইংরেজী চাকুরী ত্যাগ ছিল এই আন্দোলনের ঘোষিত নীতি। দলে দলে লোক স্কুল কলেজ ত্যাগ করে। আন্দোলনটি ছিল সর্বদলীয়। যে হিন্দু সমাজ ইংরেজী শিক্ষাকে নিজেদের জীবন প্রবাহের মুল নিয়ামত মনে করেছিল। সেই হিন্দু সামজের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এর নেতৃবৃন্দ ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনেমুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। যেখানে আন্দোলন তীব্র তর সেখানে ঐ সময়ের জন্য ইংরেজী শিক্ষা তেমন বড় হয়ে দেখা যায়নি। ভারতের জাতীয় দল কংগ্রেস, খেলাফত পন্থী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, উলামায়ে ইসলাম, মুসলীম লীগ সকলেই সম্মিলিত

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে একই মঞ্চে এক যেগে আন্দোলন গড়ে তোলে। হিন্দু মুসলিম ঐ সময়ে একই সুতায় আবদ্ধ হয়।

(চার) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

এই যুদ্ধের পরেই বৃটিশ সরকারকে পাততাড়ি গুটাতে হয়। এই সময় মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব, ভারতীয় কংগ্রেসের কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, আসামে জাপানী আক্রমন প্রভৃতি ঘটনার দরুন বৃটিশ সরকার শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি।

সিলেটের অন্যান্য কলেজ

সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজ ছাড়াও ১৯৩২ সালে হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ, ১৯৩৯ সালে সিলেট মহিলা কলেজ, ১৯৪০ সালে সিলেট মদন মোহন কলেজ এবং ১৯৪৪ সালে সুনামগঞ্জ কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ এর পরে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে স্থাপিত হয়। বর্তমানে শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য সিলেটে প্রযুক্তি গত শিক্ষার ও প্রসার ঘটেছে।[৪২]

সিলেটের শিক্ষাঙ্গন ও সাহিত্য একটি বিরাট বিষয়। সম্পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরতে হলে একটি পৃষ্ঠা পূর্ণাঙ্গ পুস্তকের প্রয়োজন। সিলেটে গুরুত্ব ও টোল, মক্তব ও মাদ্রাসা স্কুল ও কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাঙ্গন রূপে পরিগনিত হয়েছে। এখানে সংস্কৃত, বাংলায় সিলেটী নাগরী, আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষার সাহিত্য চর্চা হয়েছে।

বর্তমান কালে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠা এতদঞ্চলের শিক্ষাঙ্গনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৮৬ সালের ৩০ জুন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং ১৯৮৭ সালে এতদসংক্রান্ত বিল জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণ তথা সিলেট বাসীগণের অনেক প্রত্যাশা।

সিলেটে তৎকালীন মেডিকেল স্কুল ১৯৪৭ সালে চালু হয় ১৯৬২ সালে মেডিকেল কলেজে উন্নীত হয়। ১৯৮৬ সালে এটির নূতন নাম হয় ওসমানী মেডিকেল কলেজ। এছাড়া সিলেটে ইউনানী চিকিৎসা প্রসারের লক্ষ্যে তিব্বিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল্ ১৯৪৫ সালে। শ্রীহট্ট সংসকৃত কলেজে সম্প্রতি আয়ুর্বেদ শাখা চালূ করা হয়েছে। হোমিও পথিক চিকিৎসার জন্য হোমিও প্যাথিক কলেজ ও চালু করা হয়েছে এই অঞ্চলে কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে দি স্কুল অব হান্ডক্রাপট নামে। ১৯২৯ সালে এটি সুরমা ভ্যালী টেকনিকেল ইন্সটিটিউট নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে এটি একটি পলিটেকনিকেল ইনস্টিটিউট রূপান্তরিত হয়েছে। সিলেট আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। এছাড়া এই অঞ্চলের চারটি জেলায় রয়েছে একটি করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণে ইন্সিটিউট এগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে।

---

৪২. প্রাগুক্ত পৃ- ১৫০ -১৬৬।

১৯৬১ সালে সিলেটের খাদিম নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দি ন্যাশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এরপর বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে তা বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সিলেটে পর্যটক বৃন্দের আগমন

হিউয়েন সাঙ ঃ

প্রাচীন কাল থেকেই সিলেট শিল্প সাহিত্যে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগামী ছিল। তন্মধ্যে চীন দেশীয় বৌদ্ধ পন্ডিত 'হিউয়েন সাঙ' প্রাচীনতম। যার সূত্র ধরে সিলেট ভূমিতে সিলেট বহু কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। পর্যটক হিউয়েন সাঙ ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট আসেন। কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে হিউয়েন সাঙ কামরূপ ও সিলেট সফর করেন। ঐ সময় সিলেটের নাম ছিল 'শিলা চটৌল' এবং তা কামরূপ রাজ্যের অংশ ছিল। তিনি সমতট হতে জলপথে সিলেট আসেন। তখন সিলেট ছিল সমুদ্র তীরবর্তী একটি বন্দর। সিলেটের চতুর্দিকে ছিল পাহাড়ও বনভূমি এবং অধিবাসীরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। হিউয়েন সাঙ সে সময়ে সিলেট তথা কামরূপ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য তখন ছিলেন পাটলি পুত্রের রাজা।[৪৩]

ইবনে বতুতাঃ

শায়খ শরফ উদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭ খ্রিঃ) ছিলেন মরক্কোর তানজিয়ার অধিবাসী। তিনি সিলেট সফর করেন ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে। সিলেটে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য ছিল হযরত শাহ জালাল (রহ.) এর দোয়া ও দিদার লাভ। ইবনে বতুতা সিলেট অঞ্চলকে কামরূপের অন্তর্গত অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নাহরে আজরাকে অর্থাৎ- সুরমা নদী দিয়ে হাবাঙ্ক শহর হয়ে জল পথে সিলেট আসেন। তাঁর বর্ণনায় সিলেটের বাসিন্দাদের গড়ন ছিল তুর্কীদের মত চেপ্টা নাক। অধিবাসীরা ছিল দুঃসাহসী ও যাদু বিদ্যায় পরদর্শী। সিলেটকে তিনি একটি গহীন বনভূমি বলে উল্লেখ করেছেন। পরের বছর তিনি মোহাম্মদ বিন তুঘলকের দুত রূপে চীনের পিকিং ভ্রমন করেন। সেখানেই তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর বন্ধু শায়খ বুরহান উদ্দীন সাগরজীর কাছে হযরত শাহ জালাল (রহ.) এর ও ফাতের সংবাদ জানতে পারেন।

মির্জা ফিরুজ শাহঃ

১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নাতি মির্জা ফিরুজ শাহ সিলেট সফর করেন। তাঁর ভ্রমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগা জিয়ারত। ফিরুজ শাহ বাহাদুর শাহের পুত্র। মির্জা ফিরুজ শাহ ঢাকা থেকে নৌকা যোগে সিলেট আসেন। সিলেট সফরকালে তিনি মজুমদারীতে হাজী সৈয়দ বখত মজমুদারের মেহমান ছিলেন।

---

৪৩. প্রাগুক্ত পৃ- ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড নর্থব্রুকঃ

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ১৮৭৪ সালে আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। তখন ভারতের বড় লাট লর্ড নর্থ ব্রুক। সে সময়ে সিলেটে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সিলেটবাসীগণ বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সিলেটবাসীকে প্রবোদ ও শান্তনা দিতে স্বয়ং বড়লাট সিলেটের মত শহরে আগমন করেন। এই উপলক্ষ্যে সিলেটে একটি দরবার অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে বা পারে আর কোন বড় লাট সিলেটে আসেননি। বড়লাটকে অভ্যর্থনা করার জন্য চান্নিঘাটের সুরম্য সোপানাবলী নির্মিত হয়। এই ঘাটে উপরেই পৃথ্বিম পাশার বিখ্যাত জমিদার আলী আমজদ খাঁ একটি ঘড়িঘর ও ঘড়ি স্থাপন করেন। বহুদিন যাবত চান্নি ঘাট (চাঁদনীঘাট) ও আলী আমজদের ঘড়ি সিলেটে নবাগতদের জন্য দর্শনীয় বস্তু ছিল।[৪৪]

শ্রী নিবাস শাস্ত্রীঃ

বিখ্যাত মারাটা পন্ডিত শ্রী নিবাস শাস্ত্রী ও তার বোন পন্ডিতা রুকবাই ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট ভ্রমন করেন। ঐ সময়ে ভাটেরার তাম্র ফলক আবিস্কৃত হয়। তাম্রফলকের ভাষা ছিল প্রাচীন সংস্কৃত। সিলেটের তৎকালীন ডিপুটি কালেক্টর মিঃ লটমন জনসন তাম্র ফলকের পাঠোদ্ধারের জন্য শ্রী নিবাস শাস্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

শাস্ত্রী মহাশয়, ফলকদ্বয়ের পাটোদ্ধার করেন। তাম্র ফলকদ্বয়ে চন্দ্র বংশীয় পাঁচজন রাজার নাম ও তাদের কীর্তি কাহিনীর উল্লেখ আছে। রাজাগন হচ্ছেন নব গিটান তার পুত্র গোকলদেব, তৎপুত নারায়ন দেব, তদীয় পুত্র কেশব দেব ও ইহার পুত্র ঈশান দেব। প্রত্যেক রাজাই ছিলেন ধর্মপরায়ন দানশীল ও যোদ্ধা। তাদের সুসজ্জিত নৌবহর ও ছিল। তারা পাশ্ববর্তী রাজ্য সমূহ জয় করেন। ঐ সময় সিলেট সমুদ্র তীরবর্তী ছিল বলে উল্লেখ করেন।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীঃ

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে বালাগঞ্জ থানার আওরঙপুরে সিলেটে উলামা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হয়ে আসেন বিখ্যাত অনলবর্ষী বক্তা মাওলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। উদ্দ্যোক্তা ছিলেন সৈয়দ আফরোজ বখত চৌধুরী ও সৈয়দ ইয়াওর বখত চৌধুরী দুই ভাই। সভাপতিত্ব করেন সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ হরত মাওলানা সহুল ওসমানী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট আসেন। সিলেট-শিলিং রাস্তা তখনো নির্মিত হয়নি। শিলং এর চেরাপুঞ্জি থেকে নারিঘাট পর্যন্ত আট মাইল পথ পায়ে হেটে অথবা খাসিয়াদের পিটে 'থাবয়' চড়ে চলতে হত। রবীন্দ্রনাথ মানুষের পিঠে চড়তে রাজী হননি্ কাজেই তাঁকে মটর যোগে শিলং গৌহাটি এবং গৌহাটি থেকে রেলপথে লামডিং, বদরপুর

---

৪৪. প্রাগুক্ত পৃ ১৩০।

কুলাউড়া হয়ে সিলেট আসতে হয়। সিলেট তাঁকে রাজোচিত সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। রেলস্টেশনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও আসাম প্রাদেশকি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জননেতা সৈয়দ আব্দুল মজিদ, সিঃ আই.ই. কাপ্তান মিয়া (১৮৭২-১৯২২খ্রিঃ)মৌলভী আব্দুল করিম, সুখময় চৌধুরী, প্রমোদ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। কবিকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয় লোকনাথ রতন মনিটাউন হলে (সারদা হলে)। তিনি সিলেটকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে লিখেন-

মমতাবিহীন কালোস্রোতে
বাংলার রাষ্ট্র সীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রী ভুমি

দেশ বন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাসঃ

১৯২১ সালের ৭ই মার্চ মৌলভী বাজার শহরের নিকটবর্তী যোগী ভহরে আসাম প্রাদেশিক খেলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। খেলাফত কমিটির আমন্ত্রণে দেশবন্ধু মি. আর দাশ সিলেটে আসেন ও কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। সময়টি ছিল হিন্দু মুসলিম মিলনের স্বর্ণযুগ। এ সভায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গান্ধীজি, শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলীঃ

১৯২১ সালের ২৯শে আগষ্ট সিলেটের শাহী ঈদগাহে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা করেন মহাত্মাগান্ধী, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মোহাম্মদ আলী। আলী ভ্রাতৃদ্বয় পাঠানটোলায় জননেতা আব্দুল হামিদ মিনিষ্টারের মেহমান হন।

শ্রীমতি সরোজিনী নাইডুঃ

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে সুনামগঞ্জ শহরে 'সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু। তিনি একজন কবিও ছিলেন। সিলেট অবস্থান কালে তিনি এম.সি কলেজ পরিদর্শন করেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেনঃ "Every student of this college should be a peot".

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সিলেটে দু'বার এসে ছিলেন। প্রথমে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে পরে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম বার এসেছিলেন 'শ্রীহট্ট যুব সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন দ্বিতীয় বার আসেন" মুসলিম ছাত্র সম্মিলনী উদ্বোধন করতে।

জওহরলাল নেহেরুঃ

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস সভাপতি ও সর্বভারতীয় নেতা পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু সিলেট আসেন। বৈদনাথ মুখার্জি, বসন্ত কুমার দাস, বওয়ারী লাল দাস প্রমুখ জননেতাগন তাঁকে সংবর্ধনা জানান ও মাল্যভূষিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৯৪৬ সালের ২রা মার্চ সিলেটের ইতিহাসে বিশেষ স্বরণীয় দিন। ঐ দিন মুসলিম ভারতের অবিসম্বাদিত নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সিলেট সফরে আসেন।

বিকাল পাচটায় শাহী ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণকালের বিশাল জনসভা। সিলেটে ইতিপূর্বে এত বড় জনসভা কেউ দেখেনি। সভায় তার সংক্ষিপ্ত ভাষন ছিল। মুসলমান এক হয়ে যাও। আমরা পাকিস্তান বানাব অবশ্যই বানাব, ছাড়বনা। কথাগুলো তিনি উর্দুতে বলেছিলেন। জনসভায় গগন বিদারী আওয়াজ উঠে "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"। ৩রা মার্চ সকালে তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগা শরীফে জিয়ারত শেষে দুঃখ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন;

তোমরা এত বড় দরবেশের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থানকে ভিক্ষুকের আস্তানায় পরিণত করেছ।

সিলেট সফর কালে তার সফর সঙ্গী ছিলেন জননেতা আব্দুল মতিন চৌধুরী। কায়েদে আজম আজমল আলী চৌধুরীর বাসভবনে আমজাদ আলী রোডে অবস্থান করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে কায়েদে আজমের বোন ফাতেমা জিন্নাহ সিলেট সফরে এলে তিনি ও আজমল আলী চৌধুরীর বাসভবনে অবস্থান করেছিলেন।

সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কায়েদে আজমের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন ইচ্ছে হয় তোমাদের এই সবুজ সুন্দর পরিবেশে আমিও একটি বাড়ী নির্মাণ করি। তিনি সিলেটের বেতের কারুকাজ দেখে মুগ্ধ হন ও আজম আলী চৌধুরীকে দিল্লিতে তাঁর ব্যবহারের জন্য ঝুড়ি পাঠাতে অনুরোধ করেন।

কাবা শরীফের ইমামঃ

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারী পবিত্র খানা-ই কাবা মসজিদুল হারাম এর সম্মানিত ইমাম মুহতরাম শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন সুবায়েল সিলেট তাশরীফ আনেন। সিলেট পৌরসভা শাহী ঈদগাহে বাদ জোহার এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। সভায় লক্ষাধিক জন সমাবেশ হয়। সম্মানিত ইমাম তার ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন-

বর্তমান বিশ্বে এমন সব মানবতা ধ্বংসকারী ফিৎনার উদ্ভব ঘটেছে যা নবুওতের আকিদাবিশ্বাসকে মিটিয়ে দিতে সদা তৎপর। নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, জাতীয়তা বাদ রূপী জাহিলিয়াতের ফিতনা বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী রাহমাতুললিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিষ্ঠিত জীবনাদর্শকে চোখ রাঙাচ্ছে। খতমে নবুওতের আকিদা আজ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বাতিল মতবাদের মোকাবেলায় আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার এবং বাতিল ফিতনার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা সবাইকে শামিল হতে হবে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন আমার উম্মতের বিপর্যয় কালে যারা আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে, তাঁদের জন্য রয়েছে একশ শহীদের সওয়াব।[৪৫]

---

৪৫. সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ ৪৮- ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সিলেটে মুসলিম আগমন ও বসতি

সিলেট জেলার মুসলিম আগমন ও বসতি বিস্তারের প্রাথমিক ধারা অম্বেষন করা খুব সহজ নয়। অপর্যাপ্ত তথ্য এক্ষেত্রে গবেষনার পথে প্রধান অন্তরায়। পেশাজীবি ইতিহাসবিদদের দক্ষতা ও শৃঙ্খলাবোধের অভাব জনিত সংকটে সত্য অনুসন্ধানের বদলে অনুমান নির্ভর উপখ্যান গুরুত্ব পেয়েছে।

হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক ১৩০৩ ঈসায়ী সিলেটের গৌড়রাজ্য জয় করার পরে সিলেটে ব্যাপক ভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় এবং গৌড় রাজ্যের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন খন্ড রাজ্য ও পরবর্তীতে বিজিত হয়। এজন্য তার বিজয়কে ইসলামের বিজয় বলে আখ্যায়িত করা যায়। তিনি তিনশত বাট আউলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বলে এদেশে এখনও প্রবাদ রয়েছে। উল্লেখ্য হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তৎকালীন সময়ের ইসলামের বিজয় সম্পর্কিত প্রামানিক প্রমাণ সূত্র ছড়া ও উপাখ্যান এবং প্রবাদের উপর অনেক কিছু নির্ভরশীল যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর বাস্তবতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে তাঁর বিজয়ের পূর্বে ও সিলেটের তিনটি অঞ্চলে মুসলিমদের বাস ছিল, তার প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৬]

প্রাথমিক সূত্রের সাক্ষে সিলেটে ইসলামের সূচনা বা মুসলিম সমাজের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের সময়কার ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে 'আরসা শ্রীহট্ট' নামটি প্রথম পাওয়া যায়।

তিন অংশে লেখা লিপির মাঝের অংশে উৎকীর্ণকাল ৭০৩ হিজরী অর্থাৎ ১৩০৩ ঈসায়ী বর্ণিত হয়েছে। শিলালিপির উপরে ক্ষুদ্রাকৃত লিপিতে 'শায়খ জালাল মুজাররদ' নামউৎকীর্ণ থাকায় ধারণা করা হয় যে, লিপিটি সিলেটে হযরত শাহজালালের দরগাহর গায়ে এক সময় স্থাপিত ছিল। এই ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করেছে অঞ্চল হিসেবে আরসা শ্রীহট্ট নাম অন্তর্ভুক্ত করার শিলালিপির প্রথম অংশে সুস্পষ্ট ভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আধুনিক সিলেট অঞ্চলই 'আরসা শ্রীহট্ট' নামের রূপান্তর এ ধারণা করা অসঙ্গত হবেনা। কারণ শিলালিপির প্রথম অংশের পুরো বাক্য বিন্যাস লক্ষ্য করলে এর স্বপক্ষে প্রমাণ মেলে। এখানে লেখা হয়েছে-

সুলতান ফিরুজ শাহ এর সময় সিকন্দর খান গাজী কর্তৃক আরসা শ্রীহট্ট প্রথম মুসলিম বিজয় সাধিত হয়েছিল।

সিলেটে ইসলাম প্রচারে প্রথমপুরুষ হযরত শাহজালাল। তাঁর নেতৃত্বে সিলেটে ইসলাম বিস্তার তথা মুসলিম সমাজ বিকাশের যাত্রা শুরু চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে সিলেটে মুসলিম বসতি বা মুসলিম সমাজের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা তা উপাদানের অভাবে নিশ্চিত রূপে বলা যাচ্ছে না।

---

৪৬. সিলেটে ইসলাম, পৃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য সিলেটে লাউড়, গৌড় ও জৈন্তা নামে তিনটি রাজ্য ছিল। সিলেট বিজয় কালে যে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে আগত শতাধিক দরবেশ ছিলেন এবং গৌড়ের সুলতান ফিরুজ শাহের সেনাপতি সিকান্দর শাহ এবং নব নিযুক্ত সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দীন ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এত আরও একটা বিষয়ে সকলেই একমত, শায়খ বুরহান উদ্দীনের সঙ্গে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাক্ষাৎ গৌড় গোবিন্দের রাজ্য জয়ের অনেক পূর্বেই হয়েছিল। তা দিল্লীতে হতে পারে।

হযরত শাহজালাল (রহ.) বোরহান উদ্দিনের বাচনিক শুনতে পেলেন, বোরহান উদ্দিনের নিবাস সিলেটের টুলটিকর মহল্লায়। গৌড় বিজয় সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সিলেট শহরের সন্নিকটে যেমন একদল মুসলিম বাস করতেন, তেমনি বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার তরফে ও হযরত শাহজালাল (রহ.) আগমনের পূর্বে মুসলিমদের বসতি ছিল। বর্তমান কালের আজমিরিগঞ্জ থানা কোন এক সময় আজমুরদান নামে পরিচিত ছিল এবং বাংলার তৎকালীন সুলতান কর্তৃক শাহজালাল পূর্বযুগে তা বিজিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাববার বিষয় হচ্ছে এই ১২০৪ (পক্ষান্তরে ১২০১) সালে বিখ্যাত তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হওয়ার পূর্বে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে সুফী দরবেশগন এদেশে আগমন করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন হযরত মাহমুদ ও হযরত মুহাইমিন (রা.) বলে দু'জন অতি উচ্চশ্রেণীর সুফি দরবেশ।

তাঁরা বা তাঁদের দলের অপর কোন দরবেশের সিলেট আগমনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে গৌড়ের সুলতানদের কোন কোন শাসক প্রথম দিকে গৌড়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজ্যগুলি জয় করার জন্য আগ্রহী হলে ও পরবর্তী কালে গৌড় রাজ্যের সন্নিহিত কামরূপ প্রভৃতি রাজ্য জয় করার বাসনায় তাঁদের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ফৌজ কামরূপ অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ সম্বন্ধে ইতিহাসবিদ পন্ডিতগন বলেন ইখতিয়ার উদ্দীনের পরবর্তী সুলতানদের মধ্যে মালিক ইয়াজউদ্দীন তুঘরল খান (১২৩৬-৪৫ঈ.) বাঙলার পরিবর্তে পশ্চিমাঞ্চলের দিকে তার অভিযান পরিচালনা করেন। মালিক তাসের খানই কোরান (১২৪৫-৪৭ঈ.) মালিক জালাল উদ্দীন মাহমুদ গজনী (১২৪৭-৫১) মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারনে অতি দুর্বল ছিলেন। মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ার উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত রাঢ় রাজ্য বিজয়ের পরে মালিক মুগিজ উদ্দীন উজবেক তুঘরল পূর্ব সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ঐতিহাসিক মার্সম্যান লিখেছেন- "গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করার পরে তিনি সিলেট আক্রমন করে অনেক লুন্ঠিত দ্রব্য লাভ করেন। পরের বৎসর তিনি (১২৪৪ ঈসায়ী) আজ মুরদান রাজ্যের রাজ্য আক্রমন পূর্বক সমস্ত ধন দৌলত হাতী সহ রাজধানী দখল করেন। স্টুয়ার্ট মনে করেন আজমুরদান রাজ্য বর্তমান আজমিরিগঞ্জের নিকটে এবং আজমিরিগঞ্জ পুরাতন আজমুরদানের নূতন নাম আজ মুরদানের রাজার পরাজয়ের দশ বৎসর পরে মালিক উজবেক তুঘরল সিলেটের বানিয়া চঙ্গ রাজ্য অভিযান করে সেখানকার রাজাকে পরাজিত করেন। এবং প্রাপ্ত হাতীসহ প্রত্যাবর্তন করেন। ক্যাপ্টেন ফিশার লিখেছেন বানিয়াচঙ্গ রাজার পূর্ব পুরুষ সম্ভবত বাংলার গভর্নর মালিক উজবেক কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

১২৫৪ ঈসায়ী আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ আসামে মৃত্যুবরণ করেন। সিলেটের কতক অংশ দখল করার পর মালিক উজবেক তুঘবল কামরূপকেও তার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বিত সুলতান কামরূপ অভিযানে লক্ষনাবতীর সুদক্ষ বাহিনী হারান এবং সংগে সংগে তার অমূল্য জীবনও যায়। ক্যাপটেন ফিশারের অভিমত এই যে, মুসলিম সৈন্যরা সিলেটের ভিতর দিয়েই কামরূপ গমন করেছিলেন। এসব ঘটনা থেকে স্বাভাবিক ভাবে মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সিলেটের অংশ বিশেষ বাংলার সুলতানদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল। তবে তা সত্ত্বেও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের (১৩০৩ ঈসায়ী) পূর্বে সিলেটের কোন বৃহৎ ভূখন্ড বাংলার সুলতানদের দ্বারা বিজিত হয়নি বলে, এসকল বিজয়ের ফলে সিলেটের সীমারেখার কোন পরিবর্তন হয়নি। ব্যতিক্রম লাউড় রাজ্য হযরত শাহজালালের বিজয়ের পরেও তার শাসন ক্ষমতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। বর্তমান মৌলভী বাজার জেলার অন্তর্গত চোয়াল্লিশের রাজা চন্দ্র মোহনের রাজত্ব, কানিহাটির রাজা আসলাম রায়ের রাজত্ব দিনারপুরের বাগচী রাজার রাজত্ব হযরত শাহজালালের বিজয়ের পরে মুসলিম শাসিত হয়েছে। কাজেই হযরত শাহজালাল (র.) এর গৌড় রাজ্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বৃহত্তর সিলেটের সীমানা চূড়ান্ত ভাবে নির্দিষ্ট হয়নি।[৪৭]

সিলেটের বুকে মুসলিমরা কখন ও কিভাবে এসেছিলেন? হযরত শাহজালাল (রহ.) এর এদেশে অভিযান করার কারণ হিসেবে তৎকালীন রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্তৃক টুলটিকরের মুসলিম বাসিন্দা বোরহান উদ্দিনের উপর অমানুষিক নির্যাতন, তরফের রাজার আচাক নারায়ন কর্তৃক কাজী নুর উদ্দীনের উপর ভীষণ অত্যাচারকে কারণ স্বরূপ বলা হয়।

আজমুরদানে মুসলিমদের বাস তুর্কী সেনাপতি কর্তৃক সে অঞ্চলকে জয় করার ফলে হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে টুলটিকরে অথবা তরফে এসকল মুসলিম কোন সূত্রে বা কোন পথে আগমন করেন? আধুনিক গবেষণার ফলে দেখা যায়, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের উপকূলে আরব দেশীয় বনিক ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। এরা একদিকে যেমন তাদের ব্যবসায়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতে তাদের জাহাজের নোঙ্গর করতেন, তেমনি এদেশীয় সমাজের লোকদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম ও প্রচার করতেন। সেকালে ভারতের পশ্চিম উপকুলেও একদল শিয়া মতাবলম্বী প্রচারক ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বঙ্গদেশে যে ইতিপূর্বেও একদল সূফী দরবেশ ইসলাম প্রচার করেছেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বোরহান উদ্দীন বাস্তহারা ছিলেন না। তাঁর সমাজের লোকেরা পূর্বাপর টুলটিকরেই বাস করেছেন। এখনও তাদের বংশধরগণ টুলিটিকরেই বাস করেছেন। খুব সম্ভব তাঁরা রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজ্যলাভের বহু পূর্বেই সে স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তার পূর্ব পুরুষগণ আরবদেশীয় বনিকদেরই বংশধর বলে ধারণা করা হয়। কারণ সিলেটের লোকেরা যে এক কালে সওদাগরী বা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিলেট শহরের ব্যবসা

৪৭. প্রাগুক্ত পৃ ৩১- ৩২

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যের সর্ব প্রধান কেন্দ্রকে এখনও বলা হয় বন্দর বাজার। অপর এক মহল্লাকে বলা হয় চালিবন্দর। সিলেটে এখনও প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে, এ বন্দর ছিল সাগর তীরে অবস্থিত এবং এ বন্দরে বড়বড়জাহাজ নোঙ্গর করতো। খুব সম্ভব এসব বড় বড় জাহাজে আগত আরব দেশীয় ব্যবসায়ীগণ চট্টগ্রামের আরব ব্যাবসয়ী গনের মত আগমন করেছেন্ তাদের মধ্যে কোনকোন ব্যক্তি সিলেটের টুলটিকরে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন। তা না হলে অন্য কোন প্রমানের অভাবে টুলটিকরে মুসলিমদের উপস্থিতি একটা আচমকা ব্যাপার বলেই মনে হয়।

তেমনি আচাক নারায়ন কর্তৃক নির্যাতিত কাজী নুর উদ্দীন ও কোন দরবেশের বা তাঁদের দ্বারা বায়আত প্রাপ্ত কোন লোকের বংশধর হবেন। তাঁর সঙ্গে তরফে আরও মুসলিম ছিলেন। তবে এতদঞ্চলে তখনও অমুসলিমদের হাতেই রাজশক্তি ছিল বলে এবং সংখ্যায় তারা গরিষ্ট ছিলেন বলে মুসলিমেরা তাদের ধর্মের বিধি বিধান যথাথভাবে পালন করতে সমর্থ ছিলেন না। যখনই তাদের কোন আচার-আচারণ প্রতিবেশী সমাজের লোকদের কাছে তাদের ধর্ম বিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে তখনই তারা মুসলিমদের সংগে সংঘর্ষে বা নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এদেশ থেকে মুসলিম তথা ইসলামকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে। এদের এ মনোভাব যে কেবল সিলেট ও তরফে দেখা দিয়েছিল তা নয়। পুর্ববর্তী সামন্ত রাজাদের ব্যবহারেও প্রকাশিত হয়েছে। কারণ তখনকার দিনে মানুষের মনে ধর্মের ক্রিয়াশীলতাই ছিল সর্ব প্রধান। ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন আবর্তিত ও বিবর্তিত হত। কাজেই যেখানেই দুই ধর্ম প্রত্যয়শীল দুই ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে ধর্মীয় প্রত্যয় বা আচার ব্যবহার নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে সেখানেই তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি দেখা দিয়েছে।

সিলেটে ইসলাম প্রচারের প্রথম পুরুষ হযরত শাহজালাল (রহ.)। তাঁর নেতৃত্বে সিলেটে ইসলাম বিস্তার তথা মুসলিম সমাজ বিকাশের যাত্রা শুরু চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই। চতুদর্শ শতাব্দীর আগে সিলেটে মুসলিম বসতি বা মুসলিম সমাজের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা তা উপাদনের অভাবে নিশ্চিত রূপে বলা যাচ্ছেনা, অথচ এ যাবত প্রকাশিত বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধে কিংবদন্তীর আশ্রয়ে গড়ে উঠা কাহিনীতে উল্লেখিত সময়কালে মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।[৪৮]

প্রকাশ থাকে যে, বাংলার তিনটি ধারায় ইসলামের বিস্তার ও মুসলিম সমাজের পতন হয়েছি। প্রথম ধারা ছিল খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। এসব বনিক আরব মুসলমানদের আগমন ঘটে উপকুলীয় অঞ্চলে। মুসলিম সমাজ গঠনের এই পর্বটি ছিল সীমিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। পরে একাদশ শতাব্দীতে আগমন ঘটে সুফী সাধকদের। তারা বিচ্ছিন্ন ভাবে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন বাংলার অভ্যন্তরে। চূড়ান্ত পর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকেই ইসলাম প্রচারিত হয় ব্যাপকভাবে। এই পর্বে বাংলার রাজক্ষমতা মুসলমানদের করায়ত্ত হয়। সুলতানদের পৃষ্টপোষকতায় সুফী সাধকদের প্রচার কার্য আরও গতি লাভ করে। ইসলাম প্রচার ও মুসলিম

৪৮.সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ বিকাশের এই ধারাক্রম অনুসন্ধান করে খুজতে হবে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে সিলেটে মুসলিম সমাজের স্বরূপ।

বাংলায় ইসলাম বিকাশের সাথে ভারতে ইসলাম প্রবেশ ও বিকাশের সম্পর্ক রয়েছে। খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরব বনিকেরা ভারত বর্বের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আরব বনিকদের মাধ্যমে পশ্চিম ভারতের সমুদ্র উপকূলীয় সিন্ধু, কাথিওয়ার, গুজরাট অঞ্চল সমূহে ইসলাম প্রবেশ করতে থাকে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে বানিজ্য সূত্রে আরবদের বসতি ধীরে ধীরে বাংলা ও মায়ানমার উপকূলীয় অঞ্চলে ও সম্প্রসারিত হয। ফলে স্থানীয় অধিবাসী ও আরব বনিকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহাবস্থান গড়ে উঠে। প্রথম দিকে ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মত কোন সামরিক শক্তি আরবদের ছিলনা। এসময় তারা শান্তিপূর্ন বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। দক্ষিন ভারতে আরব বসতি স্থাপন কারীদের সাথে স্থানীয় জনসাধারণ ও শাসকদের ছিল বন্ধুত্বপূর্ণসম্পর্ক। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে উত্তর ভারতে মুসলমানদের সামরিক অভিযান চলতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় দিল্লি সালতানাত। বাংলায় বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার সুচনা এই বিজয় অভিযানেরই ধারাবাহিকতার প্রতিফলন।

রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বহু পূর্বেই বাংলার সাথে মুসলমানদের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। অষ্টম শতাব্দীতে আরব বনিকগণ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু এই আরব বনিকেরা ইসলাম প্রচারে তেমনকোন ভূমিকা রেখেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনপ্রমাণ নেই। বর্তমান আলোচনায় তাই প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন একজন্য যে কোন গবেষক অনেক আগ থেকেই সিলেট এলাকায় আরব বনিকদের বংশধরগন বসবাস করেছিলেন বলে অনুমান নির্ভর মন্তব্য করেন। অধুনা প্রকাশিত 'সিলেটে ইসলাম' গ্রন্থে এর সরাসরি প্রকাশ লক্ষ করা যায। ইতিহাস গবেষণায় একটি বিজ্ঞান মনস্ক দিক রয়েছে। ইতিহাসের জন্য চাই প্রামানিক সূত্র। অনুমান যদি করতে হয় তবে তা করতে হবে সূত্রের অবলম্বনে। উল্লেখিত গ্রন্থে 'টুলটিকরের' মুসলিম বাসিন্দা বোরহান উদ্দীন অথবা 'তরফের' সম্ভ্রান্ত মুসলিম কাজী নুরুদ্দীনের কথা বলা হয়েছে। গবেষকগন এদের আরব বনিকের বংশধর বলতে চেয়েছেন।

বোরহান উদ্দিন বা নুরুদ্দীনের অস্তিত্ব রয়েছে প্রধানত প্রচলিত লোক কাহিনীতে লোক কাহিনী বা কিংবদন্তী একবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ পুরোকালের ইতিহাস অনেকাংশ লোক কাহিনীর উপর নির্ভরশীল। উহাকে বাদ দিয়ে ইতিহাসের এক বিরাট অংশ বাদ পড়ে যায়।

তারপরও এ যাবত ইতিহাস যে তথ্য জানিয়েছে তাতে অন্তত আরব বনিকদের সিলেট অঞ্চলে প্রবেশ করার কোন প্রমাণ নেই। এ যুক্তির পেছনে কি প্রমাণ রয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

১। রাজ শক্তি হিসেবে প্রবেশের অনেক পূর্ব থেকেই মুসলমানদের এদেশে আগমন ঘটেছিল আধুনিক গবেষণায় তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।[৪৯]

---

৪৯. আব্দুল করিম, বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, পৃ- ১৩০, ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

২। তুর্কি ও আরবী ঘোড়সওয়ার উত্তর পশ্চিম বাংলায় আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার পূর্বেই এদের পূর্ব পুরুষগণ ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন।

৩। সুফী দরবেশদের আগমন ঘটেছে স্থল ও নৌ উভয় পথেই। ধরণা করা হয় অধিকাংশের আগমন ঘটেছে সমুদ্র পথে।

৪। খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে ইরাকি প্রাধান্য রাজ শক্তিকে গ্রাস করে। কিন্তু স্বাধীনতা ও অভিযান প্রিয় খাঁটি আরবগন ইরানী প্রাধান্য মেনেনিতে না পেরে নূতন দিগন্তের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন এবং বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত মহাসাগর পাড়ি দেন। এদের অনেকেই চট্টগ্রামে বাণিজ্য উপলক্ষে এসেছিল। এর স্বপক্ষে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চাটগাঁ বাসীদের কথ্য ভাষায় বিকৃত অবিকৃত বহু আরবী শব্দের উপস্থিতি ও উচ্চারণে আরবীটান। মোট কথা আরব বনিকেরা সাধারণতঃ চট্টগ্রাম বন্দর হয়েই বঙ্গ কামরুপের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করতেন। এ অনুমান অসঙ্গত নয়।[৫০]

৫। ভাষা তত্ত্ববিদ সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন আহমদ হাসান দানী। সুনীত কুমার দেখিয়েছেন যে, সিলেটী নাগরীর ব্যবহার স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটি উত্তর ভারত থেকে আগত ধর্মপ্রচার মুসলমানদের প্রভাবেরই ফল। কিন্তু সমুদয় বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক দানী সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সিলেটী নাগরী আফগান অধিকারের পর আফগান শাসকদের তত্ত্বাবধানে বিশেষ রূপ লাভ করেছিল তাই এর উৎপত্তি হয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে।

৬। মধ্যযুগের প্রথম সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' সময়কাল ১৩৫০-১৩৮০ বলে অনুমান করা হয়। আরব বনিক গণের আগমনের বহু শতাব্দী পর রচিত এই গ্রন্থেমাত্র ৭-৮ টি আরবী শব্দ পাওয়া যায়। প্রচুর আরবী শব্দ পাওয়া গেছে শাহ মোহাম্মদ ছগীর রচিত 'ইউসুফ জোলায়খা' কাব্যে। এর রচনাকাল ১৩৯০ থেকে ১৪১০ এর মধ্যে।

গ্রন্থটিতে বিশেষ করে গৌড়েশ্বর নাম উল্লেখিত থাকায় গৌড়ের সাথে লেখকের সম্পৃক্ততার কথা বিবেচনা করা হয়। গৌড়ে মুসলিম শাসক ও সুফী সাধকদের আগমন ব্যাপক ঘটেছিল। ফলে আরবী ফার্সী ভাষার ব্যবহার স্বাভাবিক কারণেই সেখানে বেশী দেখা যায়। উল্লেখ্য, আরব বনিকেরা সধারণত চট্টগ্রাম বন্দর হয়েই বঙ্গ কামরূপের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করতেন। ব্রিটিশ শাসন যুগ পর্যন্ত আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল সিলেট। মহা ভারতের যুগে আসামের পরিচিতি ছিল প্রাগ জৈতিষ নামে। আর পূরানে প্রথম বলা হয়েছে কামরূপ। কামরূপ মূলত আসামেরই পরিপুরক নাম। সুতরাং দক্ষিণ দক্ষিণপুর্ব আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চল সিলেট কামরূপের পরিপূরক অভ্যন্তরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন তার কোন প্রমাণসাক্ষ্য নেই। এ কথাটি আহমদ শরীফ ই প্রথমে বলেছেন। পরিপূরক হতে পারে না। চট্টগ্রাম থেকে আরব বনিকগন

তিনি হয়ত ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে প্রভাবিত হতে পারেন। ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযাী তিনি হয়ত হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাথে দেখা করতে চট্টগ্রাম থেকে কামরূ অর্থাৎ কামরূপে গিয়েছিলেন। ধারণা করা যায় সিলেট বা শ্রীহট্ট নামটি ইবনে বতুতার নিকট পরিচিত ছিল না। তাই সুপরিচিত কামরূপের অংশ বলে তিনি সিলেটকে কামরু বলেছেন। নৌ পথে আরব বণিকদের সিলেট যাওয়ার কোন প্রমাণ নেই।

---

৫০. আহমদ হাসান দানী, শ্রীহট্ট নাগরী লিপির উৎকর্ষ ও বিকাশ; (বাংলা ভাষা ২খ, হুমায়ুন আজাদ, সম্পা. ঢাকা বাংলা একাডেমী) পৃ- ৭০৯

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক সূত্র ধারণা দিচ্ছে নদী বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অন্তত চতুর্দশ শতাব্দীর পর। ইবনে বতুতার বিবরণের ভিত্তিতেই এ জাতীয় মন্তব্য করা হয়েছে। একজন ইতিহাস বিদের অন্তর্দৃষ্টি ছিল এ মহান পরিব্রাজকের। তাই লিপিবদ্ধ বিবরণীতে ইবনে বতুতা নিজের দেখা জগতের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের খুটিনাটি বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি নৌ পথে সোনার গাও বন্দরে এসেছিলেন। সোনার গাঁও পৌছার পূর্বে একমাত্র 'হবঙ্ক' শহরের বর্ণনা ছাড়া অন্য কোন শহর বা বন্দরের কথা তিনি বলেননি। 'হবঙ্ক' শহরের অবস্থান নিশ্চিত করা যায়নি। এটি সম্ভবত বর্তমান হবিগঞ্জের অন্তর্গত কোনস্থান হয়ে থাকবে। সোনারগাঁও বন্দরের বিস্তাতির বিবরণ ও তার বর্ণনায় পাওয়া যায়।

মুসলিম বিজয়ের মধ্য দিয়ে সিলেট বাংলার মুসলিম শাসন কাঠামোর সাথে যুক্ত হয়। আন্তঃদেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সিলেটের তখন সৃষ্টি হয়। সিলেটে বিভিন্ন বন্দর গড়ে উঠার প্রেক্ষাপট এভাবে সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর আগেই কামরূপ অর্থাৎ আসামে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। সেই সূত্রে আসাম থেকে মুসলমানদের সিলেটে প্রবেশ করা ও বসতি স্থাপন করা স্বাভাবিক ছিল কি না এ প্রশ্নটি ও উথাপন করা যেতে পারে।

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজি দিনাজপুরে দেবকোট থেকে কামরূপের পথ ধরে তিব্বত অভিযানে বেরিয়েছিলেন। কামরূপের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ইয়াজ খলজি (১২১৩-১২২৭) মুগীস উদ্দীন ইউজবেক ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কামরূপে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। অবশ্য কোন কোন গবেষক কামরূপে এই মুসলিম অভিযান সিলেটের উপর দিয়ে সাধিত হয়েছিল বলে অনুমান করেছেন।

কেউ কেউ এ ধরণের অনুমান করার সুযোগ প্রত্যাখান করেন। তাঁদের মতে লখনৌতির শাসকদের কামরূপ অভিযানের পথ হিসেবে সিলেটকে ব্যবহার করা হলে পূর্ব বঙ্গের উপর তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। গোয়ালপাড়া দিয়ে কামরূপ যাওয়ার সহজ পথ রেখে দুর্গম অঞ্চল বেঁচে নেয়ার পর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় চর্তুশ শতাব্দীর শুরুতে সুলতান শমস উদ্দীন ফিরুজ শাহের সময়ে (১৩০১খ্রিঃ) প্রথম পূর্ববঙ্গ অধিকৃত হয়েছিল। এ কারণেই ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট অভিযান হয়েছিল সহজ। এভাবে কামরূপে মুসলিম সংশ্লিষ্টতার পরিবেশ সৃষ্টি হলেও সাধারণ মুসলিম পরিবারের পক্ষে দুর্গম পথ পরিক্রমন করে কামরূপ থেকে সিলেট আগমন অস্বাভাবিক ছিল বলে তিনি মনে করেন। উল্লেখিত বক্তব্যের স্বপক্ষে বলা হয়েছে শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত A Historical atlas of south Asia এদিক থেকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এখানে ৯৭৫ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের আসাম কে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কামরূপ নগরের অবস্থান ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে। ইরফান হাবিব তার মানচিত্রে ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে কামরূপকে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে দেখিয়েছেন। আবার ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মানচিত্রে কামরূপকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি প্রশাসনিক জেলা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানেও কামরূপের অবস্থান ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে।[৫১]

---

৫১. A Historical Atlas of South Asia (ed) E. Joseph Scholarly lleers. Chicago University Press- 1978.

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র গুলি সমকালীন ভৌগলিক অবস্থানের যে চিত্র দেয় তাতে কামরূপ থেকে কাউকে সিলেট আসতে হলে রীতিমত দুঃসাহসিক অভিযানে বেরুতে হতো।

প্রথমতঃ মানুষ গনমনাগমনের অনুকূলে কোন পথ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ প্রমাত্তা ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিতে হতো। তৃতীয় দুর্গম শিলং পাহাড় অতিক্রম করতে হতো। অতঃপর কাছাড় দিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ ছিল সিলেটে। তাই বরাবরই গৌড় থেকে কামরূপে যাওয়ার পথ ছিল উত্তর, উত্তরপূর্ব ব্রহ্মপুত্রকে দক্ষিণে রেখে। একটি মানচিত্রে চীনা পরিব্রাজবের ভারত আগমনের পথ প্রদর্শিত হয়েছে। দেখা হিউয়েং সাঙ তাম্রলিপ্ত দিয়ে প্রবেশ করে কজঙ্গল হয়ে ব্রম্মপুত্রের পশ্চিম পাড় ধরে উত্তরে প্রাগ জ্যোতিষ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আরব বনিকদের কামরূপের সাথে বাণিজ্যের যে কথা বলেছেন প্রফেসর আহমদ শরীফ, উপরে আলোচিত প্রমাণ থেকে মনে হয় এই বাণিজ্য ব্রহ্মপুত্রের পথ ধরে বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আরব ঐতিহাসিক ইবনে খুরদাদ বিহ (মৃ. ৯১২হি.) বঙ্গোপসাগরের বন্দরের কথাই বলতে চেয়েছেন। সেখানে কামরূপ ও অন্যান্য স্থান থেকে ১৫ বা ২০ দিনের নদী পথে ঘৃত কুমারী কাঠ আমদানি করা হতো।

সিলেটে ইসলাম গ্রন্থে আরব বনিকদের বংশধরগন সিলেটে এসেছিলেন বলে তাদের প্রভাবে সিলেট বাসীরা সওদাগরী ব্যবসায় লিপ্ত ছিল বলা হয়েছে। বন্দর বাজার 'চালি বন্দর' এসব নাম এই স্মৃতি বহন করছে। বন্দর নামের সাথে সমুদ্র বন্দর বা নদী বন্দরের স্মৃতি জড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক। সিলেটে সমুদ্রবন্দর ছিলনা তাতো ভুগোল জ্ঞানই নিশ্চিত করছে। তাই সিলেটে প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী এখানে সাগর তীর, সমুদ্র বন্দর এবং বড় বড় জাহাজ নোঙ্গর প্রভৃতি বক্তব্য গ্রহণ না করা গেলেও নদী বন্দর যে ছিল তা মেনে নেয়া স্বাভাবিক। যা অধুনা ও দেখা যাচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠা তাও অসম্ভব নয়। নদী পথে ব্যবসা বাণিজ্য করাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। শুধুমাত্র কিছু অনুমান করার ভিত্তি রয়েছে যে, একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে মুসরমান পরিবারের অভিভাসন হতে পারে বৃহত্তর সিলেটের কোন অংশে। এ প্রাচীন কালের ইতিহাসের সঠিক তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। একতো বন জঙ্গল বিনষ্ট নর্বত অঞ্চল দ্বিতীয়তঃ ঘন বসতি ছিল খুবই কম। যতটুকু জানা যায় বাংলায় আগমন কারী প্রথম সুফি শাহ সুলতান রুমীল (১০৫৩ ঈ.) সম্পর্কে জানা যায় প্রাচীন ফার্সি সূত্রে। নেত্রকোনা জেলায় মদনপুরে তার সমাধি রয়েছে।[৫২] এই সুফি প্রতিঅনুরক্ত হয়ে কোচ রাজা তাকে জমি দান করেছিলেন। শাহ সুলতান রুমী নেত্রকোন এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। নেত্রকোনার প্রতিবেশি অঞ্চল বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ সুতরাং কোন মুসলিম পরিবার নেত্রকোনা থেকে এসব অঞ্চলে বসতি গড়তে পারেন। তবে কোন রকম স্থান গুরুত্ব না থাকায় কোন মুসলমান দের জন্য সে যোগ বর্তমান সিলেট সদরের নিকট এতোটা পথ মাড়িয়ে বসতি গড়া যুক্তি গ্রাহ্য নয়। আর প্রামান্য সূত্র -

৫২. A History of Sufism in Bengal, p-209-10

Dhaka University Institutional Repository

না পাওয়া পর্যন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছার অবকাশ নেই। তবে ইসলাম প্রচারক সুফি দরবেশদের পক্ষে এসব অঞ্চলে জীবনের হুমকি নিয়ে হলেও আগমন সম্পূর্ন অসম্ভব ও নয়। কারণ তারা আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা বলে অসম্ভবকে সম্ভব পর করতে পারেন। যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যর্থ সেখানে এসব ওলী আউলিয়া দরবেশ দের ক্ষমতা কার্যকর আর তা-ই হচ্ছে কারামত। তাঁরা বিয়ে সাদীর মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয। প্রামান্য সূত্র দ্বারা এসব বিষয় সাব্যস্থ করার জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি তবে কিংবদন্তী তথা যুগ যুগ ধরে চলে আসা কাহিনীর বাস্তবতা অস্বীকার করলে এসব অঞ্চলের মুসলিম বসতি এবং সুফি দরবেশ মুবাল্লিগদের ইসলাম প্রচার এবং তাদের কারামত অস্বীকারের নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণ ভূগোল দ্বারা প্রমাণ করতে চাইলে অনেকটা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। যেমন সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ বসতি গড়ার অন্য রকম সমস্যা রয়েছে। সুনামগঞ্জের অধিকাংশ অঞ্চল এবং হবিগঞ্জের কিছু অংশের অবস্থান সমুদ্র পৃষ্ট থেকে মাত্র ১০ ফুট উচ্চে। বাংলাদেশের এ ধরণের উচ্চতা বিশিষ্ট অঞ্চলে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে মানব বসতির তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। বলা যায় বসতি স্থাপনের উপযুক্ত ছিল না এই অঞ্চলগুলি।[৫৩]

সার্বিক আলোচনায় চতুদর্শ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম শক্তি ও হযরত শাহজালালের নেতৃত্বে সিলেট অধিকারের পূর্বে মুসলিম বসতি স্থাপনের কোন সুযোগ বা সাক্ষ্য ইতিহাসের সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সামন্ত রাজা আচাক নারায়ন কর্তৃক অত্যাচারিত কাজী নুর উদ্দিন এবং টুলটিকরের বুরহান্ উদ্দিনকে ঐতিহাসিক প্রামান্য সূত্র দিয়ে প্রমান করতে না পারলেও যুগ যুগে ধরে চলে আসা কিংবদন্তী কেও পরিত্যাগ করা যাবে না। তবুও ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে শেষ সিদ্ধান্ত নিতে হলে প্রমাণের অপেক্ষা করতে হবে।

---

৫৩. সিলেটঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ- ৭৮-৭৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সিলেটে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা

ভূমিকাঃ

সিলেটে মুসলিম শাসন শুরু হয় ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে ৭০৩ হিজরী সনে এবং এর ব্যপ্তিকাল ছিল ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। উপাদানের স্বল্পতার কারণে আলোচ্য বিষয়ের উপর পূর্নাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সহজ নয়। তথাপি প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে সিলেটে মুসলিম শাসক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো।

শিলালিপি হতে প্রাপ্ত সূত্রঃ

সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগাহে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় যে লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে (১৩০১-১৩২২ খ্রিঃ) ৭০৩ হিজরীতে (১৩০৩ খ্রিঃ) সিলেট মুসলিম অধিকারে আসে।[৫৪] সিলেট বিজয়ের সাথে প্রখ্যাত সুফী দরবেশ শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (রহ.) ও সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দীনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুরহান উদ্দিন কর্তৃক গরু জবেহ (আক্বীকা) কে কেন্দ্র করে সিলেট বিজয়ের সূত্রপাত হয়েছে বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র ও যুগ যুগ ধরে পরস্পরায় চলে আসা কিংবদন্তী তথা জনশ্রুতি থেকে জানা যায়। এটাই হচ্ছে সিলেট বিজয়ের কারণ। এছাড়া বাংলাদেশে মুসলিমদের রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে,মুসলিম রাজ্য বিস্তার নীতির বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাই ছিল সিলেট বিজয়ের পেছনে মূল প্রেরণা।[৫৫]

সিলেট বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী আচক নারায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য তরফ (দক্ষিণ- সিলেট) অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সংবাদ পেয়ে আচক নারায়ন তাঁর পরিবার পরিজন সহ তরফ ছেড়ে পালিয়ে যান। ইত্যবসরে মুসলিম বাহিনী খোয়াই নদীর তীরবর্তী মুড়ারবন্দ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী আর গৌড়গোবিন্দ কিংবা আচক নারায়নের পিছু ধাওয়া করেননি মুসলিম বাহিনী জৈন্তিয়া এবং লাউড় অঞ্চল দখল করার জন্য কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালায়নি। ফলে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে জৈন্তিয়া ও লাউড় বাদে গৌড় ও তরফে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লাউড়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলেও মুসলিম বাহিনী কর্তৃক গৌড় ও তরফ বিজড়িত হওয়ার পর লাউড়ের স্বাধীন চরিত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। লাউড়েরপরের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কোন কিছু জানা যায় না। শুধু জানা যায় যে, লাউড়ের অন্তর্গত জগন্নাথপুরের হিন্দু প্রধান দরবার সিংহ এবং বানিয়ার চঙ্গের গোবিন্দসিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে লাউড়ে মুসলিম শাসকের সূত্রপাত হয় এবং সে সময় থেকে এ অঞ্চল মুগল কর্তৃক অধিকৃত না হওয়া পযৃন্ত সেখানে মুসলিম শাসন চলতে থাকে।[৫৬]

---

৫৪. Jurnal of the Asitatic Society of Bangla. (JASB) New Series XVIII, 1922, P- 413, 414.

৫৫. সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ- ২০৯

৫৬. District Gazetteer Sylhet,Chapter 1970, p- 5-6

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটের ইতিহাসে সুলতান সামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর সময়ে সিলেটে দ্রুত ইসলাম প্রসার লাভ করে। তিনি ১৩২২ ঈসায়ী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর লখনৌতির সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনকালে দিল্লির সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুঘলক লখনৌতি আক্রমন করেন। যুদ্ধে গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ পরাজিত হন। ফলে লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের উপর পুণরায় দিল্লির শাসন প্রবর্তিত হয় (১৩২৪ঈ.)। এ সময় সিলেটও দিল্লির শাসনাধীন চলে যায় এবং সেখানে শুরু হয তুঘলক শাসন। গিয়াস উদ্দীন তুঘলক বাংলা ত্যাগ করার পূর্বে বাংলাকে লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এ তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন।[৫৭] সিলেট সোনারগাঁও প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভূত ছিল।

১৩৫২ ঈসায়ী লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও দখল করেন। ফলে সিলেটের উপর ও তার শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে সিলেটে আদি ইলিয়াস শাহী শাসন সিলেটে স্থায়িত্ব লাভ করেছিলেন। ১৪১২ ঈ. পর্যন্ত। আদি ইলিয়াসশাহী শাসন কালে চারজন সুলতান-

১। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৫২-১৩৫৮ খ্রিঃ)

২। সিকান্দর শাহ (১৩৫৮- ১৩৯৩ খ্রিঃ)

৩। গিয়াস উদ্দিন আজম মাহ (১৩৯৩ - ১৪১০ খ্রি:)

৪। সাইফুদ্দীন হামজা শাহ (১৪১০-১৪১২খ্রিঃ)

সিলেট সহ সমগ্র বাংলাদেশে শাসন করেন।[৫৮]

আদি ইলিয়াস শাহী শাসনের পর সিলেটে শিহাবুদ্দীন বায়েজিদ ও তার পুত্রের শাসন শুরু হয়। শিহাবুদ্দীন বায়োজিদ শাহ ১৪১২ থেক ১৪১৫ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্টিত ছিলেন। এরপর তারপুত্র আলা উদ্দিন ফিরুজ শাহ মাত্র কয়েকমাস রাজত্ব করেন (১৪১৫ খ্রিঃ) ১৪১৫ থেকে ১৪৩৬ ঈসায়ী পর্যন্ত সিলেট জেলার উপর রাজাগণেশ ও তাঁর বংশধরদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৫৯] প্রথম নাসির উদ্দীন মাহমুদের মাধ্যমে বাংলায় পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে সিলেট জেলার উপর পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসন পুণরায় শুরু হয়। ১৪৩৬ থেকে ১৪৮৭ পর্যন্ত পাঁচজন সুলতান এ জেলার উপর তাদের শাসন বজায় রেখেছিলেন। এরা হলেন-

১। নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১৪৩৬ - ১৪৬০ খ্রিঃ)

২। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৬০- ১৪৭৪খ্রিঃ)

৩। শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১খ্রিঃ)

৪। সিকন্দর শাহ (তিন দিনের জন্য) ১৪৮১ খ্রিঃ

৫। জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭খ্রিঃ)

---

৫৭. Diya-Al-Din Barani. Tarikh E. Firuz Shahi, Bibliotheca India 1862, P- 454-416.

৫৮. বাংলাদেশের ইতিহাস পৃ, ২২৪, ২৪৬।

৫৯. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ- ২৭০-৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে সিলেটের শাসন ভার যাদের উপর অর্পিত ছিল তাঁদের মধ্যে উজীর মকুবল খান। মুয়াজ্জাম খুরশীদ খান, মহালিয়ান নওবত আলী, দস্তর মজলিসে আলম এবং মুকারব উদ দৌল্লাহ মালিক উদ্দিন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬০] ঐ পরবর্তী ইলিয়াস শাহীশাসনের পর ১৪৮৭ হতে ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে সিলেটে বাবরক শাহজাদা (১৪৮৭-১৪৮৮ঈ.) ৬মাসের জন্য সাইফুদ্দিন ফিরুজ শাহ (১৪৮৮ -১৪৯০ ঈ.)

মাহমদু শাহ (১৪৯০-১৪৯১ ঈ.) ও মুজাফফর শহ (১৪৯১- ১৪৯৩ খ্রি) এ চারজন হাবশী সুলতানের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৬১]

হাবশি শাসনের অবসান ঘটিয়ে উজির সৈয়দ হোসাইন সুলতান আলা উদ্দিন শাহ উপাধি ধারণ করে বাংলায় নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে সিলেট ও তাঁর শাসন প্রবর্তিত হয। তার শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূত্রপাত করে। তাঁর সময়ে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। এ সময়ে কুখ্যাত কোন বিদ্রোহ ঘটেনি। তিনি ১৪৯৩ হতে ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নূসরত শাহ ক্ষমতায় অধিষ্টিত হন। তাঁর রাজত্বকাল (১৫১৯-১৫৩১ ঈ.) বাংলার ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়।

এ বংশের শেষ দুজন সুলতান হলেন

(১) আলা উদ্দিন ফিরূজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩) ও

(২) গিয়াস্ দ্দিন মাহমদু শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রিঃ)

বাংলার ইতিহাসে মাহমুদের রাজত্বকাল পরিবর্তনের যুগ। শের খানের নেতৃত্বে আফগান শক্তির পুনরুত্থানের চাপে সিলেট তথা বাংলায় হুসাইন শাহী শাসনের এবং দীর্ঘ দুশত বছর ব্যাপী বাংলায় স্বাধীন যুগের অবসান ঘটে।

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শের খান বাংলা অধিকার করলে সিলেট ও তাঁর শাসনাধীন চলে আসে। ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুনকে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত করার পর শেরশাহ পুনরায় বাংলা অধিকার করেন এবং নওযাজিস খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। (অক্টোবর ১৫৩৯ খ্রিঃ) নওয়াজিস খান বাংলার অধিাকংশ এলাকায় শুর বংশের শাসন পূণঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বাংলা দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তহয়ে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এসময় সিলেট ও শের শাহের অধিকারে ছিল।[৬২]

শের শাহের মুদ্রা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শের শাহের রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময় থেকে সিলেট শের শাহের অধীনে ছিল না। কেননা মুদ্রা সাক্ষ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ১৫৪২-৪৩ ঈসায়ী বার বার শাহ নামধারী একজন সুলতান সিলেট ও ময়মন সিংহ অঞ্চলে রাজত্ব করেন। এ ছাড়া দেখা যায় যে, শের শাহের টাকশালগুলো উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে অবস্থিত ছিল। উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় তার টাকশাল না থাকায় মনে করা যেতে পারে যে, এ এলাকা গুলো তার অধীনে ছিল না। শের শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইসলাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন (১৫৪৫ঈ.)। তিনি মুহাম্মদ খাঁন শুরকে বাংলার শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন।

---

৬০. District Gazetteer Sylhet p. 58
৬১. বাংলার ইতিহাস, পৃ- ৩৩৭   ৬২. District Gazetteer, Sylhet p- 59

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায় এ সময়ে সুলাইমন খান নামে একজন আফগান বাংলায় আসেন এবং পূর্ব বাংলার অংশ বিশেষ (ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার হাওর অঞ্চল) অধিকার করে সেখানে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসন নিয়ে আফগানদের মধ্যে ভীষণ গৃহযুদ্ধ শুরু হলে বাংলার আফগান শাসনকর্তা মুহাম্মদ খান শুর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর শাসনামলে সিলেট তাঁর অধীনে ছিল। বাংলায় শুব বংশের শাসন চলছিল ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। অতঃপর সেখানে কররানী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৩]

কররানী বংশের শাসনের শুরুতে সিলেটের উপর করবানী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তা সঠিক করে বলা যায় না। তবে জানা যায় যে, তাজ খান কররানীর শাসনামলে ঈসা খান ভাটি অঞ্চলের জমিধারী লাভ করেন।[৬৪] সিলেটের পশ্চিমাঞ্চল তাঁর জমিধারীর অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৬৫]

এ সময়ে তরফের (সিলেট জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল) জমিদার হিসেবে ফতেহ খানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আরো দেখা যায় যে, এসময় সিলেটের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় বায়েজীদ কররানীর শাসনাধীন ছিল।

১৫৭৬ ঈসায়ী রাজ মহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানী পরাজিত হলে উত্তর ও পশ্চিম বাংলা মুগল সাম্রাজ্য ভুক্তহয়। এ সময়ে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে (সিলেট সহ) মুগল বিরোধী জমিদারগণ (বার ভুঁইয়া) শাসন কার্য পরিচালনা করছিলেন। এসকল জমিদারদের মধ্যে ঈসাখান, খাজা উসমান, ফতেহ খান, দ্বিতীয় বায়েজীদ কররানী প্রমুখ জমিদার দের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা বিশেষ করে ঈসা খান মুগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুগল শক্তির বিরুদ্ধে অব্যাহত ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। ঈসা খানের মৃত্যুর পর (১৫৯৯ খ্রিঃ) তার পুত্র মুসা খান ভাটি অঞ্চলের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৬]

মুসা খানের সময়ে তাঁর কয়েকজ সহযোগী বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে তাঁর কাছ থেকে সিলেট অঞ্চলের ভুমি লাভ করে ছিলেন। এদের মধ্যে বানিয়াচংয়ের (হবিগঞ্জ) আনোয়ার খান ও হুসাইনখান, দক্ষিণ সিলেটের উসমান খান, মধ্য ও উত্তর সিলেটের বায়েজিদ কররানী, মাতং এর (হবিগঞ্জ এলাকায়) পাহলওয়ান, মৌলভী বাজার অঞ্চলের মালছি খান প্রমুখ জমিদার উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

---

৬৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত) বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ, পৃ- ১১৩। এম.এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ২য় খন্ড (বাংলা অনুবাদ) ঢাকা ১৯৮২।

৬৪. ঈসা খানের পিতা সুলাইমান খান হুসাইন শাহী বংশের অবসানের পর ভাটি অঞ্চলে জমিদারী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম শাহ শুরের সেনাপতি তাজ খান কররাণী তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং ঈসা খান কে বন্দি করেন। পরবর্তী সময়ে তাজ খান কররানী যখন বাংলায় রাজ্য স্থাপন করেন তখন তিনি ঈসা খানকে ভাটি অঞ্চলের জমিদারী প্রত্যার্পন করেন। এ জন্য ঈসা খান কররানী বংশের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত ছিলেন এবং কররানী বংশের প্রভাব প্রতিপত্তি যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্যও তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন্ তাঁর এ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ দাউদখান কররানী তাকে মাসনাদ-ই-আলা উপাধিতে ভূষিত করেন। (Sec social and cultural History of Bengal Vo. I,P- 198).

৬৫. আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্বভাগ এবং বর্তমান কুমিল্লা ও সিলেট জেলার পশ্চিমাংশই ভাটি অঞ্চল নামে পরিচিত। দেখুন আব্দুল করিম পাক ভারত মুসলিম শাসন ঢাকা ১৯৬৯, পৃ- ৪৯৪। ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩, পৃ- ৬৪।

৬৬. বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

এঁরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় প্রায় স্বাধীন ভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সুবাদার ইসলাম খান সমগ্র বাংলাকে মোগল সম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। এ সময়ে সিলেট ও মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। (১৬১১ ঈ.) মুগল আমলে সিলেট সহ সমগ্র বাংলা ২২ জন সুবাদর শাসন কার্য পরিচালনা করেন্ অতঃপর সেখানে শুরু হয় নবাবী আমল (১৭২৭ ঈ.)

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ দৌলাহ্ পরাজিত হলে বাংলায় ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভকরে। কিন্তু তাঁরা তখন নিয়োজিত নবাবদের মাধ্যমে বাংলা শাসন করেন। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে দিওয়ানী সনদ লাভকরার পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রকৃত অর্থে বাংলা শাসন করতে শুরু করে। ফলে সিলেট ও কোম্পানীর শাসনাধীন চলে আসে। এভাবে সিলেট মুসলিম শাসনের অবসান হয়।

প্রাক মুগল যোগঃ এ সময়ের সিলেটের প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায়না। তবে মুদ্রা সাক্ষ্যে মনে হয় যে, সিলেট বিজিত হওয়ার পর সুলতান সামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ নিজেই সেখানকার শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে তাঁর রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের (সিলেট সহ) শাসনভার পুত্র গিয়াস উদ্দিন বাহাদুরের উপর ন্যাস্ত করেছিলেন। ১৩০৩ থেকে ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সিলেটে নিয়োজিত দুজন প্রশাসকের নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন সিকান্দর খান গাজী ও শেখ নুরুল হুদা আবুল কেরামত সাঈদী হোসাইনী। সিকান্দর খান গাজী ছিলেন সিলেটের প্রথম মুসলিম প্রশাসক।[৬৭]

তুঘলক শাসনামলে সিলেট বাংলা প্রদেশের সোনার গাও প্রশানিক বিভাগের অন্তর্গত ছিল। তুঘলক শাসনামলের প্রাথমিক পার্যায়ে সোনার গাঁও এর শাসনকর্তা ছিলেন বাহরাম খান। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর এবং বাহরাম খান যৌথভাবে সোনার গাঁও অঞ্চল শাসন করতেন।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত শিলালিপি ও মুদ্রা সাক্ষ্যে প্রতিয়মান হয় যে, সিলেট ইকলিমই-মুয়াজ্জামাবাদের (সোনারগাঁও) অন্তর্গত ছিল। ৮৮৯ হিজরীর এক শিলালিপিতে সিলেটকে ইকলিম ই মুয়াজ্জামাবাদের অন্তর্গ একটি থানা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৮]

পরবর্তী কালে সিলেটকে পৃথক একটি আরসা (প্রশানিক বিভাগ) মর্যাদা দেওয়া হয়।[৬৯]

আরসাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপাধি ছিল উজির সার্ ই লস্কর, জামাদার ই গায়রী মহলী। তারা কখনো কখানো লস্কার বলেও অভিহিত হতেন। আরসার বিভাগীয় প্রধানগন তাঁর এলাকার প্রশাসন ও সেনাবাহিনীল প্রধান ছিলেন। শিলালিপি থেকে প্রাক মুগল যুগের সিলেটের কয়েকজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন-

---

৬৭. District Gazetteer Sylhet Chapter II, p- 58

৬৮. A.H. Dhani- Bibliography of the muslim inscriptions of Bangla (J.A.S.P Dhaka 1957) p. 59

৬৯. A.H. Dani Muslim inscriptions of Bangal, p- 59

Dhaka University Institutional Repository

(১) উজীর মকবুল খান (১৪৪০ খ্রিঃ)

(২) খান মুয়াজ্জম খুরশিদ খান মাহালীয়ন নওবত আলী (১৪৬৩খ্রিঃ)

(৩) দপ্তর মজলিস আলম (১৪৭২-১৪৭৬খ্রিঃ)

(৪) উজির রুকন খান (১৫১২ খ্রি) ও

(৫) খান আজম ওয়াল মুয়াজ্জম আল খাওয়াস খান (১৫১৩খ্রিঃ)।

বিচার কার্যের জন্য একজন কাজী নিযুক্ত ছিলেন।

শিলালিপিতে একজন কমর্কতার নাম প্রাওয়া যায়। ইনি হলেন মুকাররব উদ-দৌলাহ মালিক উদ্দীন (১৪৮৪ খ্রিঃ)। থানার প্রধান কর্মকর্তা তাঁর এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকতেন। বর্তমান কালে দারোগা বা পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের অধীনে থানার কর্মচারীগণ যে সব কর্তব্য পালন করে থাকে সেকালেও থানার কর্মচারীদের অনুরূপ কর্তব্য ছিল। কিন্তু প্রাক মুগল আমলে থানার প্রধান কর্মকর্তার অধিনে একটি সামরিক বাহিনী থাকতো তার এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।

শিলালিপি বিশ্লেষনে আরো মনে হয় যে, আরসাহ সিলেটের অধীনে শহর (ব্যবসা ভিত্তিক নগর) কসবা (অস্থায়ী সামরিক ছাউনি) এবং খিত্তার (স্থানীয় সাময়িক নগর) অস্তিত্ব ছিল। শহর, কসবা এবং খিত্তা উজির ও সাব-ই লস্কর উপাধি ধারী কর্মকর্তার অধীনে ছিল।[৭০] শহরের প্রশাসনকার্য পরিচালনার জন্য কিছু সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত হতো। পুলিশ প্রধান কতোয়াল ও বিচার বিভাগীয় মুন্সেফ শহর প্রশাসনের অন্যতম কর্মচারী ছিলেন। সিলেটে আফগান শাসন শুরু হয় ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে বিল গ্রামের যুদ্ধে মুগল সম্রাট হুমায়ুন পরাজিত হলে বাংলা (সিলেট সহ) দিল্লী

সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। শের শাহ সম্ভবত বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। সিলেট ছিল ১৯টি সরকারের মধ্যে একটি।

মুঘল যুগঃ

প্রাক মুঘল যুগের তুলনায় মুঘল আমলে সিলেটের তথা বাংলার শাসন ব্যবস্থা ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। মুঘল যুগে বাংলা দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশ ছিল। দিল্লি সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুবায় যে শাসন পদ্ধতি চালু ছিল বাংলা সুবায় ও অনুরূপ শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। বাংলা সুবার সুবাদার ও দিওয়ানের অধিনে সিলেট সরকারে যথাক্রমে একজন ফৌজদার ও একজন আমিন ছিল। ফৌজদারের দায়িত্ব ছিল তার এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। অপর পক্ষে আমিন রাজস্ব বিষয়ক আইন কানুন ও বিধি ব্যবস্থা কার্যকর করতেন এবং পরগনার খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করতেন এবং পরগনার আদায়কৃত রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন।[৭১]

---

৭০. বাংলার ইতিহাস পৃ- ৫১৪

৭১. সিলেট ইতিহাস ঐতিহ্য, পৃ- ২১৪

১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলার সুবাদার ইসলাম খান মুবারিজ খানকে সিলেটের ফৌজদার নিযুক্ত করেন।

মুবারিজ খান ১৬১৮খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিলেটের ফৌজদার ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুকাররম খানকে সিলেট ও তরফের ফৌজদার নিয়োগ করা হয় (১৬১৮খ্রিঃ)। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পদচ্যুত হন এবং তদস্থলে মিরাক বাহাদুর জালাইরকে নিয়োগ করা হয়। এ সময়ে তরফ ও উহার (শমসের নগরের নিকটে) এর দাযিত্ব ভার অর্পনকরা হয় শেখ সুলাইমানের উপর।

১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ সুলাইমান মৃত্যুবরণ করলে সিলেটের কৌজদার নিযুক্ত হন। মির্জা আহমদ বেগ তাঁর সময়ে শায়খ সুলাইমানের পত্র নায়েব ই ফৌজদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিদ্রোহী শাহজাদা শাহজাহান ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা দখল করে মির্জা সালিহকে সিলেটের ফৌদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা পুণরুদ্ধার করার পর মির্জা সালিহ কে পদচ্যুত ও শাস্তি প্রদান করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালের শেষের দিকে আকা মুহাম্মদ জামান তেহরানী সিলেটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন।সম্রাট শাহজাহানের সিহাসন প্রাপ্তির পর তিনি সিলেটের ফৌজদার পদে বহাল হন। এ পদে তিনি ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিষ্টিত ছিলেন। এর পরবর্তী সময় সিলেটের ফৌজদার ছিলেন যথাক্রমে মুইজ উদ্দীন মুহাম্মদ রিজভী, সোহরাব খান ও সুলতান নজর এঁদের কার্যকালের সঠিক তথ্য জানা যায় না।

১৬৫৬ থেকে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ সিলেটের ফৌজদার পদে অদিষ্টিত ছিলেন। এঁদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

কিশওয়ার খান (১৬৫৬) ইসফিন দিয়ার বেগ লুৎফুল্লাহ সিরাজি, সৈয়দ ইব্রাহিম খান, জান মুহাম্মদ খান, মাহাফাতা খান, ফরহাদ খান (১৬৭০-১৬৪৮ ঈ.) নওয়াব আবদুর রহিম খান (১৬৮৫-?) সাদেক খান, এনায়েত উল্লাহ খান, করতলব খান বিজাপুরী, আহমদ মজীদ, আব্দুল্লাহ সিরাজী, কারগুজের খান, শুজা উদ্দীন মুহাম্মদ খান (১৭১৯) সুকুরুল্লাহ, মনসুরুল মুলুক হরকৃষ্ণ দাস (১৭২১-১৭২৩ঈ.) নওয়াব সাদেক উল্লাহ খান, দিওয়ান মানিক চান্দ রায় ও হরদয়াল এরা দুজন যৌথ ভাবে এক বছরের জন্য (১৭২৩-১৭২৪ খ্রিঃ নিযুক্ত হন। সুকুরুল্লাহ দ্বিতীয় বার (১৭২৪-১৭২৮ঈ.) (১৭২৮- ?) শমসের খান, বাহরাম খান আলী কুলীবেগ, নাজিব আলী খান (১৭৪৮- ১৭৫০ ঈ.) হাজী হুসাইন খান (১৭৫১-১৭৫৭ঈ.) মীর মুহাম্মদ হাদী (১৭৫৭-১৭৫৮ঈ.), নওয়াজিস মুহাম্মদ (১৭৫৯-১৭৬২ ঈ.) নাসির উল মুলুক মীর আলী ইয়ার খান (১৭৬২- ১৭৬৩ ঈ.) মুহাম্মদ আলী খান কাইমজুং (১৭৬৩-১৭৬৫ঈ.)

১৭৬৫খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মুগল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে দিওয়ানী লাভ করে। এভাবে সিলেটে মুগল শাসনের অবসান ঘটে।

মুঘল শাসনামলে ফৌজদারের অধীনে কখনও কখনও নায়েব-ই- ফৌজদার উপাধিধারী কর্মকর্তাগন ও নিয়োজিত ছিলেন। যেমন ফৌজদার ফরহাদ খানের অধীনে নওয়াব সৈয়দ, মুহাম্মদ আলী কাইমজুং (১৬৮০খ্রিঃ) ও নওয়াব নাসরুল্লাহ (১৬৮৬খ্রিঃ) এবং ফৌজদার শমশের খানের অধীনে শুজা উদ্দীন খান (১৭২৯ খ্রিঃ) বশরাত খান (১৭৩০খ্রি) গালিব ইয়ার

Dhaka University Institutional Repository

খান (১৭৩২ঈ.) আবু তালিব (১৭৩২ঈ.) সৈয়দ রফিউল্লাহ হাসানী (১৭৩৩ঈ.) ও হুসাইন (১৭৩৩-১৭৩৭ ঈ.) নায়িব-ই-ফৌজদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সরকারে আরো কয়েকজন কর্মচারী ছিলেন। তাঁরা সরকার শাসনে ফৌজদার ও আমিলকে সাহায্য করতেন।

সিলেট সরকার ৮টি পরগনায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক পরগনায় একজন শিকদার আমিন, কানুনগো ও খাজাঞ্চি নিয়োজিত ছিলেন। শিকদার ছিলেন পরগনার প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি পরগনার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। ষোল শতকের বাংলা সাহিত্যে ও শিকদারের প্রশাসনিক ক্ষমতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাশের চৈতন্য ভগবত থেকে জানা যায় যে, শিকদারের উপর বিচার দায়িত্ব ও অর্পিত ছিল।

আমিন প্রজাদের রাজস্ব নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি মুন্সিফ নামে ও অভিহিত হতেন। তিনি সরেজমিনে প্রজাদের জমির অবস্থান, গুনাগুন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতেন এবং এসবরে উপর ভিত্তি করে খাজনা নির্ধারন করতেন। কার কুন ছিলেন পরগনার রেজিষ্ট্রার বা লেখক। তিনি রাজস্ব সংক্রন্ত আইন কানুন, বিধিব্যবস্থা, প্রভৃতির কাগজ পত্র এবং রাজস্বের হিসাব নিকাশের জন্য দায়ী ছিলেন। পরগনার খাজাঞ্চী প্রজাদের এবং জমিদারের নিকট হতে খাজনা গ্রহণ করতেন এবং এর হিসাব ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। কানুন গো ছিলেন দলিল রক্ষক। তিনি স্থানীয় রাজস্ব প্রথা ও রীতিনীতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। পরগনায় ছিলেন কয়েকজন চৌধুরী। চৌধুরী আধা সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তিনি প্রজাদের অভাব অভিযোগ ও সুযোগ সুবিধার বিষয়ে সরকারের নিকট তাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন।[৭২]

মুঘল শাসকরা গ্রামের জীবনধারায় কোন রূপ হস্তক্ষেপ করতেন না। গ্রামের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রামের মাতবরদের উপর ন্যাস্ত ছিল। গ্রামে পঞ্চায়িত ছিল এবং এ গ্রাম্য পঞ্চায়িত ধর্মীয় অন্যান্য সকল ব্যাপারে গ্রামে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করত। মুগল শাসকরা গ্রামে কোন অফিসার নিযুক্ত করতেন না। মুকদিম উপাধি ধারী গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা রাজস্ব আদায় করতেন। মুকাদ্দম ও পাঠ ওয়ারী আদায়কৃত রাজস্ব পরগনার আমিনের নিকট জমা দিতেন। তাঁদের দায়িত্বের জন্য তাঁরা রাজস্বের কিছু অংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ পেতেন।[৭৩]

নবাব মুর্শিদ কুলি খান বাংলা সুবার শাসন ও রাজস্ব বিভাগ গুলোর পুনর্গঠন করেন। তিনি একে ১৩টি চাকলায় ভাগ করেন। এ ১৩টির মধ্যে সিলেট একটি চাকলার মর্যাদা লাভ করেছিল। সিলেট চাকলায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শাসন কার্যের জন্য নবাবের নিকট দায়ী থাকতেন এবং চাকলার শান্তি রক্ষা, নবাবের আদেশ নির্দেশ ও আইন কানুন কার্যকরী করতেন। সিলেট চাকলার নাবিব নাজিম উপাধিধারী একজনকর্মকর্তা ও ছিলেন। ফৌজদার তাঁর তত্ত্বাবধানে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন।

---

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫, ৪০৬।
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৬।

Dhaka University Institutional Repository

কোন অবাধ্য জমিদারের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করতে হলে ফৌজদার রাজস্ব কর্মচারীদেরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। মুর্শিদ কুলী খান পূর্বের পরগনা গুলোকে পূণর্গঠিত করে সিলেট চাকলাকে কতকগুলো মহালে বিভক্ত করেন। মহাল প্রধানত রাজস্ব বিভাগ ছিল। আমিল ছিলেন মহালের প্রধান কর্মচারী। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত আইন কানুন কার্যকরী করতেন এবং রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্ব নবাবের রাজকোষে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। রাজস্ব নির্ধারনে আমিলকে সাহায্য করার জন্য একজন আমিন নিয়োজিত ছিলেন। আমিন মুন্সীফ এবং মুশরিফ নামেও পরিচিত ছিলেন। এছাড়া মহালে কারকুন, খাজাঞ্চি, কানুনগো, চৌধুরী প্রভৃতি কর্মচারী ছিল। রাজস্ব বিষয়ক কাগজপত্র ও হিসাব রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন কারকুন। খাজাঞ্চি রাজস্ব গ্রহণ ও রাজকোষের দাযিত্ব বহন করতেন। স্থানীয় রাজস্ব প্রথা ও আইন কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্থানীয় প্রধানদের মধ্য থেকে একজন কানুনগো নিয়োগ করা হতো। প্রতি মহালে কয়েকজন চৌধুরী ও নিয়োজিত ছিল। এঁরা তাঁর এলাকার প্রজা ও রাজস্ব ব্যবস্থার বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কানুনগো ও চৌধুরী আধা সরকারী কর্মচারী ছিলেন, তাঁরা প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার ও প্রজা উভয় পক্ষের স্বার্থের দিকে নজর রাখতেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট বিজয় এবং পরবর্তীতে শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিস্তৃতির মাধ্যমে মুসলিমদের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় রাজ্য বিস্তার নীতি পূর্ণতা লাভ করে। ফলে সিলেট অচিরেই একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রাক মুগল যুগে ও মুগল যুগে সিলেটের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ দিল্লি সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্টাবলী আরসা সিলেট ও সরকার সিলেটের শাসন ব্যবস্থায় দেখা যায়। তৃতয়িতঃ সিলেট মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সিলেটের অধিবাসীদের সাথে বহিরাগত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মেলামেশার সুযোগ হয়। এ কারণে তাঁদের চিন্তা চেতনায় মধ্যে এক সংমিশ্রন ঘটে। এর ফলে সিলেটের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও কিছুটা ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ট পরিচ্ছেদ

সিলেট বিজয়ের পটভূমি ও সমকালীন পরিস্থিতি

জনমনে দৃঢ়মূল বিশ্বাস যে, গৌড় গোবিন্দ কতৃক মুসলিম প্রজা নিপীড়ন হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের প্রধান কারণ। মুলতঃ ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজী থেকে শুরু করে মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারণের যে ধারা চলছিল, সিলেট বিজয় তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়।

অসম সাহসী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক গৌড় নগরী বিজিত হওয়ার ঠিক একশ বছর পর হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক সিলেট বিজিত হয়। গুটি কয়েক সৈন্য নিয়ে বখতিয়র খলজি অকস্মাৎ উলকাসম আক্রমনে নবদ্বীপ করতলগত করেন। তিনি তাঁর সিহাব শরীফ দুর্গ থেকে অতি দ্রুত বাঙলার দিকে অগ্রসর হন। কথিত আছে যে, মাত্র ১৭ জন আশ্বারোহী তাঁর অনুগামী হতে সমর্থ হয়েছিল। সৈন্যদলের অবশিষ্টাংশ পশ্চাতে অগ্রসর হচ্ছিল। নগর পান্তে এসে উপস্থিত হওয়ার সময় তিনি কাউকে উৎপীড়ণ করেননি, বরং ধীর এবং শান্ত পদক্ষেপে নগরে প্রবেশ করেন। দ্বার রক্ষক সহ অপর কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে আগন্তুক মুহাম্মদ বখতিয়ার। তবে অনেকেই ধারণা করছিল বখতয়িার সহ নতুন আগন্তুকরা উচ্চাকৃতির দামী অশ্ব বিক্রেতা। রাজা রায় লক্ষণ সেন রাজ প্রসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে তিনি তার তীক্ষ অসি নিষ্কোসিত করেন এবং নির্বিচারে অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে থাকেন। রাজা লক্ষণ সেন তখন মধ্যাহ্ন ভোজে ব্যস্ত ছিলেন। রাজ প্রসাদের দ্বার প্রান্ত থেকে এবং রাজধানীর মধ্যস্থল থেকে করুণ বিলাপ এবং আর্তনাদ উঠছিল। যখন রাজা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তখন বখতিয়ার প্রাসাদের অভ্যন্তরে তিনি ইতিমধ্যেই প্রসাদের বহু লোককে হত্যা করে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। ফলে রাজা লক্ষন সেন নগ্ন পদে পেছন দরজা দিয়ে পলায়ন করেন।

নবদ্বীপ বিজয়ের পর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী তার বিজয় অব্যাহত রাখেন। লাখনৌর (বীর ভূম জেলা) এবং রাঢ় অঞ্চল জয় করার পর তিনি গৌড় এবং দেবকোট জয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। ১২০৩ সালের জানুয়ারীর মধ্যেই এ দু'টি নগরী ও বখতিয়ার খলযির পদানত হয়।

বখতিরয়ার দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করেই তিব্বত বিজয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি লক্ষনাবতীর পূর্বদিকে অবস্থিত তুর্কীস্থান এবং তিব্বতের বিষয় খবর পেলেন। তখন থেকেই তিনি তিব্বত এবং তুর্কীস্তান বিজয়ের মৌলিক কল্পনা মনে মনে পোষণ করতে থাকেন। বখতিয়ারের তিব্বত অভিযান ছিল আত্মঘাতি। দশ সহস্র সুনিপুন অশ্বারোহীর বিপুল বাহিনী নিয়ে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। সেই দুর্যোগ পূর্ণ অভিযান থেকে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ভিনি যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে মাত্র দু'শ অশ্বারোহী ও ছিলনা। বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ফলে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব বৃহৎ সেনাদল ধ্বংস হয়ে যায়। দেবকোর্ট শুধু বিধবা এবং পিতৃমাতৃহীনের বিলাপ তিব্বত অভিযানের স্মৃতির প্রতি অভিশাপ

Dhaka University Institutional Repository

দিচ্ছিল। বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের শোকবহ পরিণতি প্রায় অর্ধ শাতব্দীর জন্য পূর্বভারতের মুসলিমশাসন সম্প্রসারণ স্তিমিত করে দিয়েছিল।

বখতিয়ারের মৃত্যুর পর খলজি আমীর ওমরাহ দের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। তাতে পূর্ব ভারতে মুসলিম শাসন সম্প্রসারণে গতি স্তিমিত হলেও একেবারে স্তব্দ হয়ে যায়নি। বখতিয়ারের পুত্র মুহাম্মদ খলজি কামরূপে এক অভিযান (১২০৫-১২০৬) পরিচালনা করেন। মুহাম্মদ খলজি কোন পথে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তা, জানা যায়নি। তবে খুব সম্ভব সিলেট জেলার কত কাংশের উপর দিয়ে খাসিয়া এবং জৈন্তিয়ার পর্বত দুপাশে রেখে আগ্রসর হয়ে তিনি কামরূপ প্রবেশ করেছিলেন।[৭৪]

সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ (১৩০১-১৩২২ ঈ.)

শাহের রাজত্বকালে মুসলিমদের দ্বারা সিলেট বিজয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জে.এন.সরকর বলেন সম্ভবত সুলতান ফিরোজ দেহলভীররাজত্বকালের সর্বাপেক্ষ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ময়মনসিংহ জেলার ব্রম্মপুত্র নদীর অপর তীর আসামের সিলেট জেলার মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি। তখন রাজ্য শাসনের কেন্দ্র স্থল সোনারগাঁয়ে স্থাপিত হয়। মুসলিমদের নয়া অভিযানের রাজনৈতিক কেন্দ্র ভূমি সোনারগাঁ হতে পূর্ব দিকে অভিযান পরিচালিত হবে তা নিতান্ত স্বাভাবিক। বস্তুত সিলেট বিজয় ভিন্ন সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের দ্বিয়ারে বাঙলা বিজয়ের স্বপ্ন সফল হতে পারত না। রাজ্য জয়ের গতি ধারা অনুসারে এবং নিতান্ত স্বাভাবিক পরিণতহিসেবে সিলেট জয় করা শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের জন্য অপরিহার্য ছিল।

মুসলিমদের সিলেট বিজয় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের ন্যায় পরাক্রম শালী সুলতানের পক্ষে এক পার্বত্য অঞ্চলীয় রাজার নিকট তাঁর সেনাপতি সিকন্দর খান গাজীর পরাজয় বরদাস্ত করে নেয়া অসম্ভব ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ফকির শাহজালাল (রহ.) এর সাহায্য এবং দয়া না থাকলেও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অপরিহার্য পরিণখি হিসেবে শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের আমলে সিলেট বিজয় সম্পন্ন হত। রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্তৃক বুরহান উদ্দিনের হস্তচ্ছেদন সিকান্দর গাজীর সিলেট আক্রমণের উপলক্ষ মাত্র, মূল কারণ নয়। ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর আক্রমন থেকে যে ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ শুরু হয়েছিল, তারই পরিনতি হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক সিলেট বিজয়।

হযরত শাহজালঅল (রহ.) এর সর্ব শ্রেষ্ঠ অবদান সামরিক বিজয় নয়, আধ্যাত্মিক বিজয়। সিলেট জেলা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.) এবং তাঁর শাগরিদ গনের প্রচেষ্টার ফলে ধর্মীয় ঐতিহ্যশালী ক্ষেত্রে রোপিত হয় ইসলামের প্রান ছায়নী আধ্যাত্মিক তরু। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিজয়ের ফলেই মুসলিমদের রাজনৈতিক বিজয় স্থায়িত্ব লাভ করে। আধ্যাত্মিক বিজয় সম্পন্ন হয়নি বলেই বার বার বিজিত হওয়া সত্ত্বেও কামরূপে মুসলিম রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।[৭৫]

---

৭৪. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল: ভ-১৮ ১৮৭৩, পৃ ৮৩৮-৮৪০
৭৫. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.), পৃ ৫৪-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটের প্রাচীন ইতিহাস তেমন জানা যায় না- Sylhet in copper plates এ নিম্ন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়ঃ

In the pre-historic days the southern part of the sadar subdivision northern part of Moulavi bazar and Habigonj Sub division and realy the entire sunamgonj subdivision were a part of the bধy of Bengle or a large lake along with the Landsof near by districts of comilla. Mymensingh. Dacca and Noakhali. There are many proofs of this. The chinese traveller Heuen tsang in the 7th century A.D. has described the sylhet areas as the silichatal country on the sea shore. The famous saint Hazrat Shahjalal (Muzarrad -e Yamoni) arrived in sylhet or Gour in fourteenth century A.D. It is said that nearly all the lands from Sadar ghat or Dinarpur of the present Habiganj sub division to the Monarys till a in Sylhet. (Where the district judge and the Execlltive Engineer reside) town was under water.[৭৬]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে সিলেটে লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তিয়া নামে তিনটি প্রধান রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায। এতদ্ব্যতীত তুঙ্গনাথ, ইটা প্রভৃতি কয়েকটি সামান্ত রাজ্য ও ছিল। প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তিয়া রাজ্যের নিম্নরূপ বিবরণ প্রদান করেছেন।

লাউড় রাজ্যঃ

কুরসা, জনতরী, পাইকুড়া, সতর সতী, সুনাইতা, জলসুকা, বিথঙ্গল, মুড়াকৈড়, বানিয়াচুঙ্গ, জোয়ানশাহী (বর্তমান ময়মনসিংহ জিলায়) শিক সুনাইতা (বর্তমান বেশীর ভাগ সদর মহকুমার) সুনামগঞ্জের সমুদয় পরগনা (কেবল মাত্র ইসাকলস ব্যতিত) ব্যাপী লাউড় রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

গৌড় রাজ্যঃ

সুনামগঞ্জ ও সিলেট সদরের অন্তর্গত ইসাকলস পরগনাহতে বিয়ানী বাজার থানার অন্তর্গত পঞ্চখন্ড পর্যন্ত উত্তরে খাসিয়া পাহাড়, দক্ষিণে কুশিয়ারা নদী পর্যন্ত।

জৈন্তা রাজ্যঃ

কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাট তহসীলের সবগুলো পরগনা ও বর্তমানে খাসিয়া পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত লুসাই মহকুমার অন্তর্গত সমুদয় ভূমি।

---

৭৬. মি. কে. গুপ্ত এম.এস সি এল.এল.বি The citizen (published by the district council Sylhet. Sept. 1963, Vol No. 2) p-19

Dhaka University Institutional Repository

গৌড়গোবিন্দ প্রসঙ্গ

যে হিন্দু নরপতিকে পরাজিত করে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটের পবিত্র ভূমিতে ইসলামের অর্ধ চন্দ্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন তাঁর নাম রাজা গৌড়গোবিন্দ। গৌড় গোবিন্দ সিলেটের শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি। যদিও গৌড় গোবিন্দ চতুর্দশ শতাব্দীর লোক, তথাপি তাঁর জীবন কাহিনীনিয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস কখনো লেখা হয়নি। তাই লোক মুখে কথিত গৌড় গোবিন্দের জীবন কাহিনী ইতিহাসের উপাদান না হয়ে হয়েছে ঠোক কথার উপকরণ।

রাজা গৌড় গোবিন্দ সম্পর্কেসামান্য তথ্য বিশেষ পাওয়া যায়না তবে সিলেটে প্রচলিত বিভিন্ন লোকগীতি থেকে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে সিলেটে প্রচলিত বিভিন্ন ঠোকগীতি থেকে তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যায়। এগুলি হচ্ছে পাগল ঠাকুরের ছড়া, হাস্যনাথের পাঁচালী,শান্তি রাণীর বারমাসী এবং গোপী নাথ দত্ত রচিত দত্ত বাংশাবলী। এই লোকগীতিগুলি পরীক্ষা করে আধুনিক পন্ডিতেরা মনে করেন যে, গৌড় গোবিন্দ সম্ভবত গারো জাতীয় লোক ছিলেন বা কোন ত্রিপুরা রাজার নির্বাসিতা রাণীর সন্তান ছিলেন। তিনি সিলেটের সিংহ বংশীয় কোন একজন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে সিলেট শহর দখল করেন। পরে তিনি খাসিয়া রাজাকে পরাজিত করেন এবং লাউড় ও জৈন্তিয়া রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজা গৌড় গোবিন্দের চিকিৎসক ছিলেন কবিরাজ চক্র পানি দত্ত, এই কবিরাজের দুই ছেলেকে রাজা সিলেটে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। এরা সার্তগাও-এর দত্তদের পূর্ব পুরুষ।[৭৭] এস্থানটি সিলেটস্থ সাতগাঁও, এখানে চা বাগান ও রেল স্টেশন আছে।

এই দত্ত পরিবারের একজন গোপী নাথ দত্ত বংশাবলী রচনা করেন্ মুসলমানদের সঙ্গে পরাজিত হয়ে রাজা গৌড় গোবিন্দ পরিবার পরিজন ফেলে আত্ম গোপন করেন। রাজার বিশ্বস্থ ভৃতৎ ঝাভুরাম (বা ঘাটুরাম) রাজমাতা অর্পনা এবং রাণী শান্তি রানীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। পরে ঝাভুরাম মুসলমানদের হাতে নিহত হয় এবং রাজমাতা ও রানী অনেক দুঃখ কষ্ঠে কালাতিপাত করেন। শান্তি রাণীর শেষ জীবনের দুঃখের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় শান্তি রাণীর বারমাসী। অতএব, এই লোক গীতিগুলোর সত্যতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। এইগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাজা গৌড় গোবিন্দ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।[৭৮]

গৌড় রাজ বংশর ইতিহাসের প্রথম সূত্র হট্টনাথের পাঁচালী। হট্টনাথ গৌড় রাজ বংশের কুলদেবতা। হট্টনাথের পাঁচালী মূলতঃ দবেতা হট্টনাথের স্তুতি গাঁথা। তাছাড়া এতে রয়েছে রাজ বংশের ইতিহাস, রাজ্যের সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক এবং ভৌগলিক বিবরণ খ্যাতনামা বৃহস্পতি ছিলেন রাজ দরবারের সভাপন্ডিত। তিনি রাজা গোবিন্দের দরবারে

---

৭৭. সিলেট গেজেটিয়ার, পৃ- ১০

৭৮. হযরত শাহাজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ১২, ১৩

গৌড় রাজ বংশের ইতিহাস, বর্ণনা করেন। এই ইতিহাস মুখে মুখে বহু পন্ডিতের স্মৃতি বয়ে ভট্টাচার্যদের পূর্ব পুরুষ পন্ডিত রঘুনন্দন পর্যন্ত নেমে আসে। গনেশ রাম শিরোমনি বা গনেশ্বর ছিলেন রঘুননান্দের প্রপৌত্র। তিনি হট্টনাথের স্মৃতি গাঁথা রাজবংশের এবং রাজ্যের ইতিহস হট্টনাথের পাঁচালী নামে পুস্তকাকারে সংকলন করেন।

ভাটপাড়ায় জাহ্নবি ধর ভট্টাচার্য আখালিয়ার কুল নাথ চক্রবর্তীর বাড়ীতে হট্টনাথের পাঁচালীর ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্তহন। তিনি পাচালীর যে অংশ পাওয়া গিয়েছিল তা যত্ন সহকারে রক্ষা করেন। সিলেটের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কেউ কেউ ধারণা করেন যে, হট্টনাথের পাঁচালী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর রচিত।[৭৯] পাঁচালী সাতখন্ডে ভিবক্ত। এর মধ্যে রয়েছে ৩৬ হাজার শ্লোক।

হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক সিলেট বিজয় কালে বর্তমান সিলেট জেলা কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলো মধে গৌড় জয়ন্তিয়া, লাউড়, আপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল।

ছোট রাজ্যগুলোর মধ্যে ইটা, তরফ, প্রাতপগড়, মগদ, ত্রৈয়পুর, রাজ্যাংশ প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সকল রাজ্যের মধ্যে গৌড়-ই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। বর্তমান সিলেট টাইন এবং সদর মহকুমায় গৌড় রাজ্যের বিস্তার ছিল।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী বলেন- রাজা গৌড় গোবিন্দ সম্বন্ধে কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টে প্রচলিত পাগল ঠাকুরের ছড়া, হাস্যনাথের পাঁচালী, শান্তি কন্যার বারমাসী ও সাত গাঁওয়ের গোপী নাথ তদন্ত রচিত দত্ত বংশাবলী আলোচনা করলে মনে হয় তিনি শ্রীহট্টের সিংহ বংশীয় কোন ও রাজা কে পুণিবিলের জল যুদ্ধে নিহত করে শ্রীহট্ট শহর দখল করেন। গোবিন্দ সম্ভবত গোয়ার বা গারো জাতীয় ছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি কোন নির্বাসিতা ত্রিপুরা রাজ্যের মহিষির সন্তান ছিলেন। তিনিখাসিয়া রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করেন। তৎপরে লাউড় ও জৈন্তার রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এর পরে গোবিন্দের পেটে ব্রুণ হয়। তার চিকিৎসার জন্য সুবিখ্যাত কবিরাজ চক্রপানি দত্ত শ্রীহট্টে আসেন ও চিকিৎসা করে তঁকে নিরাময় করেন। গোবিন্দের অনুরোধে চক্রপানি দত্তের মহীপতি ও মুকুন্দ নামক দুই পুত্র শ্রীহট্টে বসতি করেন। এরাই সাতগাঁয়ের দত্ত দেব পূর্ব পুরুষ। গোবিন্দ চব্বিশ বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করেন। তৎপর সিকন্দর গাজীর সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। দত্ত বংশাবলী গ্রন্থে আছে, গৌড়ের গোবিন্দনামে তাহার নৃপতি, শব্দভেদী বানে যার আছিল শক্তি।

শাহজালালের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজরে পর গোবিন্দ পেচাগড়ে আত্মগোপন করেন। তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য ঝাড়ুঃ রাম গোবিন্দের মাতা অর্পনা ও স্ত্রী শান্তিরাণীকে নিয়ে গড়গাঁওয়ে পালিয়ে যায়। সেখানে রাজমাতা ও রাজ মহিষি দুঃখে জীবন যাপন করেন। ঝাড়ুরাম মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। শান্তিরানীর শেষজীবনের কাহিনী 'শান্তিরানর বারমাসী নামক ছড়ায় বর্ণিত আছে। গোবিন্দের দুর্গপ্রাসাদ, গড়দুয়ারে ছিল। মনারায়ের টিলা নামক সুচ্চটিলার উপরে দুর্গে তাঁর প্রধান সেনাপতি বাস করতেন। এই উচ্চ টিলার উপর থেকে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করা সহজ ও সুবিধাজনক ছিল। মনারায়ের পতনের পরে গোবিন্দের মনোবল নষ্ট হয় ও তিনি পেঁচাগড়ে পলায়ন করেন। পেঁচাগড় সম্ভবত গোবিন্দের দ্বিতীয় দুর্গ ছিল। পেঁচাগড়ের কাছে নাকি নানাবিধ দালান মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল।[৮০]

---

৭৯. চৌধুরী কমল কান্ত গুপ্ত, শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস, (সিলেট, সাধনা প্রেস ১৩৪৭ বাংলা) পৃ- ৫১।
৮০. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ১৫-১৬।

রাজা গোবিন্দের প্রাচীনতম জ্ঞাতী উত্তর পুরুষ ছিলেন কামরূপ রাজ কামসিন্ধু। কামসিন্ধুর মৃত্যুর পর প্রাগ জ্যোতিস্পুর রাজ কামরূপ আক্রমন করেন। সেখানে তিনি নিজ রাজ্যের পশ্চিম অংশে এবং জয়ন্তিয়ার নারী রাজ্যের কিংদাংশ অধিকার করে একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করেন।[৮১]

গৌড় গোবিন্দের রাজধানী ছিল বর্তমান সিলেট শহরে। গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর বলে তিনি গৌড়গোবিন্দ নামে অবিহিত হতেন। হিন্দুরা তাঁকে গোবিন্দ দেব বলে ডাকত। তিনি প্রতিমা পূজক ছিলেন এবং যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলে কিংবদন্তী সূত্রে জানা যায়।[৮২]

তাছাড়া রন চাতুর্যে রাজা গোবিন্দের সবিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি সমকালীন প্রতিবেশী বহু রাজাকে পরাজিত করে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় ছিল সকন্দর শাহের বিরুদ্ধে। রাজা গোবিন্দের তীরন্দাজ বাহিনী সমকালীন রাজাদের ঈর্ষার বস্তু ছিল। রাজা স্বয়ং তীর বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি শব্দ শুনে লক্ষ্যবস্তু বিদীর্ণ করতে পারতেন।[৮৩]

দত্ত বংশাবলীতে আছেঃ জানিহ শ্রীহট্ট নামে আছে পূর্ব দেশ
ব্রম্ম পুত্রের পূর্বস্থান আছে সবিশেষ
গৌড় গোবিন্দ নাম তাহার নৃপতি;
শব্দ ভেদি বান যার আছে অধীতি।

শরীর চর্চার বিভিন্ন দিকে রাজা গোবিন্দের খুবই উৎসাহ ছিল। সনাতন লগ্নকর শারিরীক ব্যায়ামের পরিবর্তে তিনি রাজকীয় ব্যায়ামাগারে কতকগুলো নতুন নতুন।

ব্যায়াম কৌশলেল প্রবর্তন করেন।[৮৪] রাজা গোবিন্দ কতকগুলো অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন যেগুলোর জন্য শত্রু মিত্র সকলেই মনে করত রাজা অলৌকিক যাদু বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। প্রজা সাধারণের কাছে গোবিন্দ নাম ত্রাসস্বরূপ ছিল। পাগল ঠাকুরের ভাষায়
বাঘে গরুয়ে একই ঘাটে পানি খাইত ভরে।

রাজা গোবিন্দ শিক্ষা সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতা করতেন। সু-প্রসিদ্ধ কবি কানুলাল কাব্বী তার সভা কবি ছিলেন। শিল্পী- সাহিত্যিক ও জ্ঞান যোগীদের পোষকতার জন্য কবি কানুলাল কাব্বী রাজা গোবিন্দকে বিক্রমাদিত্য ও লক্ষণ সেনের পর্যায় ভুক্ত করেছিলেন। কবি কালিদাস এবং জয়দেব যথাক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য ও লক্ষণ সেনের সৌরভ বৃদ্ধি করেন। তাঁর ভাষায়-

যেন মতে কাশি দাস বিক্রমের সভায়/ যেন মতে জয়দেব সেনের আশ্রয়
তেন মতে কানাই গোবিন্দের গৌড় বসি / হট্টনাথের মঙ্গল কথা কহিল প্রকাশি।

কবি কানুলালের বর্ণনামতে দেখা যায় যে, রাজা গোবিন্দ শিবের ভক্ত ছিরেন। শিবভক্ত হয়ে তিনি অন্যান্য দেবদেবীর পূজা অর্চনায় উৎসাহ সহকারে অংশ গ্রহণ করতেন। পন্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়ালাঙ্কার রাজা গোবিন্দের সভাপন্ডিত ছিলেন। রাজা গোবিন্দ জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্টপোষকতা করতেন। জ্ঞান চর্চায় রাজা গোবিন্দের খুবই উৎসাহ ছিল কবি ও পন্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা তিনি পর আগ্রহ সহকারে শুনতেন।

---

৮১. শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস, পৃ- ৫১।
৮২. হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ- ১১৬-১১৭।
৮৩. চৌধুরী অচ্যুতচরন, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (কলকাতা, বিজয় প্রেস ১৩১৭ বাং, ২ খ, ১ সং) পৃ- ৪
৮৪. শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস, পৃ- ৯

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট অভিযান ও বিজয়ের সময়

"হিন্দু আছে লাখে লাখে নাইরে মুসলমান সিলেটের মোকামে আসি কে দিল আযান।" এ দু'টি লাইন, সিলেটে প্রচলিত লোকগীতির অংশ বিশেষ। লাইন দু'টি সিলেটে ইসলামের আবির্ভাবের কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) এর স্মৃতির প্রতি নিবেদিত। মুসলমানদের সিলেট বিজয়ের সঙ্গে শাহজালাল ও তাঁর শিষ্য সঙ্গীদের নাম জড়িত। অর্থাৎ সিলেট বিজয়ে তাদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কিন্তু মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। তা ছিল নিছক ব্যবসায়িক সম্পর্ক যার ফলে বাংলাদেশ বা সিলেট কামরূপ আসামে সে সময়ে ওলী আউলিয়াদের আগমন তথা ইসলাম প্রচারের তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৮৫]

রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজত্বকালে গৌড় নগর (বর্তমান সিলেট শহর) টুলটিকর মহল্লায় শায়খ বুরহান উদ্দীন নামে এক ধার্মিক মুসলমান বাস করতেন। এ মহল্লায় জনৈক ব্রাহ্মন চালিত একটি টুল ছিল। সম্ভবত সে জন্যই মহল্লাবাসীর নাম টুলটিকর। শায়খ বুরহান উদ্দীন সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কিছুই জানা যায় না। ঐতিহাসিক বিল সাহেব তাঁর প্রাচ্যের জীবনীমূলক অভিধানে সতাজন বুরহান এবং আটজন বুরহান উদ্দীন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই পনের জন বুরহান ও বুরহান উদ্দীনের মধ্যে একজনের সঙ্গে ও হযরত শাহাজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয় ঘটনার সাথে জড়িত শায়খ বুরহান উদ্দীনের কোন মিল নেই।

শায়খ বুরহান উদ্দিন কখন কিভাবে সিলেট এসে বসতি স্থাপন করেন, এ সম্বন্ধে কোন হাদিস পাওয়া যায় না। ওয়াইজ এ সম্পর্কে লিখেন 'কিভাবে একজন মুসলিম গৌড় আগমন করেন, কেনই বা সে তার স্বধর্মীয়দের কাছ থেকে এত দূরে বসতি স্থাপন করেন? এই প্রশ্নটি মহী উদ্দিনকে (রিসালার লেখক) হতবুদ্ধি করেছিল। তিনি (মহি উদ্দিন) মনে করতেন, এই সঙ্গী বিহীন মুসলমানটি খুব সম্ভব হিন্দু বংশ জাত ছিলেন অথবা তিনি তেমন খাটি মুসলমান ছিলেন না। তবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ভারত বিজয় বা বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের বহু বছর পূর্বেই আরব বাণিজ্য পোতগুলো বাংলার উপকুলে যাতায়াত করত। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙলার উপকুল আরবদের কাছে সুপরিচিত ছিল। উত্তর বঙ্গে মহাস্থানগড়ের নিকট অষ্টম শতব্দীর আব্বাসীয় মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। এমনও হতে পারে আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা এদেশে বসতি স্থাপন করেন, শায়খ বুরহান উদ্দীন তাঁদের কারো বংশধর। এটাও হতে পারে যে, বুরহান উদ্দিন প্রাথমিক যুগের নওমুসলিমদের বংশধর ছিলেন। কোন কোন লেখক লিখেছেন যে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী দাস রাজ বংশের তৎকালীন

---

৮৫. অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর আরব ভৌগলিকদের বিবরণে কামরূপের পার্বত্য এলাকা থেকে নদী পথে সুগন্ধ আগর ইত্যাদি সমুদ্র পথে নেওয়ার উল্লেখ আছে। Bangladesh district Gazetteer, Sylhet, Dhaka 1974, p 212.

Dhaka University Institutional Repository

কোন এক সুলতানের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁরা ভীত সাত্রস্ত হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য দিল্লী থেকে পলায়ন করেন। সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁরা অজানা পথ দিয়ে সুলতানাতের পূর্ব সীমার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কথিত আছে যে, তাঁরা সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহন করেন। এমনও হতে পারে যে, শায়খ বুরহান উদ্দিন ঐ সমস্ত পলাতক আশ্রয় প্রার্থীদের কোন একজনের বংশধর ছিলেন।[৮৬]

মুফতি আজহার উদ্দীন মনে করেন যে, শায়খ বুরহান উদ্দিন হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অনুসারী ছিলেন এবং তিনি সিলেট শহরের অনতিদূরে জালালপুরে বাস করতেন। তাঁর মতে বুরহান উদ্দিনের গরু কুরবানীর ঘটনাটি ঘটেছিল শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের পর, যখন শাহজালালাল (রহ.) সিলেটের নিকটস্থ কোন স্থানের বসবাস করছিলেন।

শায়খ বুরহান উদ্দীনের কোন পুত্র সন্তান ছিলেন না। অনেক বছর ধরে তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেছিলেন। কথিত আছে যে, একবার বুহরান উদ্দিন মান্নত করেন যে, যদি তাঁর একটি পুত্র সন্তান লাভ হয় তবে তিনি একটি গরু কুরবানী (আকিকা) দেবেন। বহু বছরের একাগ্রে প্রার্থনার পর বুরহান উদ্দিনের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তাঁর একটি পুত্র সন্তান লাভ হয়। কৃতজ্ঞ এবংআনন্দিত বুরহান হাত তুলে আল্লাহর কাছে শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন। তাঁর আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়।[৮৭]

বুরহান উদ্দিন তার নিয়ত প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে একটি গরু কুরবানী করেন। বুরহান উদ্দিন গরুর গোশত জনকয়েক মুসলিম তখন সিলেট বাস করছিল তাদের মধ্যে বিতরণকরেন। তবে একটি গরুর গোশত ভোজন করার মতো মুসলিম সংখ্যা তখন সিলেট শহরে ছিল না। গুটি কয়েক মুসলিম তখন সিলেট শহরে হিন্দুয়ানী পীর মহল্লায় বসবাস করছিল।

প্রতিবেশীদের মধ্যে গরুর গোশত বিতরনের পর অবশিষ্টাংশ খুব সম্ভব কাক, চিল প্রভৃতির জন্য ছুঁড়ে দেয়া হয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে এক টুকরা গোশত একটি চিলের দ্বারা শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজ প্রাসাদের আঙ্গিনায় নিক্ষিপ্ত হয়।

কিংবদন্তী সূত্রে গৌড় গোবিন্দের রাজত্বকালে সিলেটে কয়েকঘর ধর্মপ্রাণ মুসলিম বসবাস করতেন। সিলেট শহরের অদুরবর্তী টুলটিকর মহল্লায় জনৈক ধর্মপ্রাণ মুসলমান বুরহান উদ্দীন স্বীয় পুত্রের আকিকা উলক্ষে একটি গরু যবাই করেন। দুর্ভাগ্যবশত একটি চিল একখন্ড গোশত জনৈক ব্রাহ্মনের বাড়িতে (মতান্তরে রাজবাড়ীতে) ফেলে দেয়। বিষয়টি গৌড় গোবিন্দের গোচরীভুত করে উহার প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়। স্রষ্টা ও মানব জীবন সম্পর্কে সেখানে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। আর কেবল এতটুকু নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে একের পুণ্য অপরে কাছে মহাপাপ বলিয়া গণ্য হয়। এই ক্ষেত্রেও তাই হল।[৮৮]

---

৮৬. আব্দুর রহিম শ্রী মুহাম্মদ, শ্রীহট্ট নূর বা শাহজালাল মজররদে সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত (কলকাতা এন্টিকলি প্রেস, শ্রী কার্তিক চন্দ্র দাস প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১৯০৫ইং) পৃ- ১২

৮৭. ওবাইদুল হকঃ মাওলানা তাজকিরাত ই আউলিয়া, বাংলা (ফেনী, হামিদিয়া লাইব্রেরী ১৯৬৯) পৃ-১৩

৮৮. আল ইসলাহ বৈশাখ-আশ্বিন, (শাহজালাল সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৩৬৪ বাং) পৃ- ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ধর্মে নবজাত শিশুর আকিকা একটি ধর্মীয় কর্তব্য ও সুন্নত। ইহা মুসলমানদের নিকট বহু পুণ্যের কাজ। অপর পক্ষে হিন্দুধর্মে গো-হত্যা মহাপাপ। কারন গরু তাদের নিকট দেবতুল্য। সুতরাং গৌড় গোবিন্দের রাজ্যে গো-হত্যার দুঃসাহস গোবিন্দের সহ্য হওয়ার কথা নয়। ফলে রাজার আদেশে বুরহান উদ্দিনকে নবজাত শিশু সহ খুজে বের করে গ্রেফতার করত রাজদরবারে হাজির করা হয়। জালিম গোবিন্দ বুরহান উদ্দিনের হাত কেটে ফেলে ও নবজাত শিশুটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। রাজার নির্দেশ পালিত হয়। এমন পাশবিক অত্যাচার কোন মানুষই সহ্য করিতে পারেনা। সুহেল-ই-ইয়ামনের বর্ণনায় প্রথমে তাঁর দু-হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দিল। তারপর শিশু সন্তানকে তারই সামনে জবাই করে টুকরো টুকরো করে শহীদ করে দিল। সিলেট ভূমি এই দুই নিস্পাপ ব্যক্তির হোলি খেলায় রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। গ্রন্থকারের আরবী কবিতার অনুবাদ নিম্নরূপ-

"তুমি শক্তিশালী হলে কখনো অত্যাচার করনা, কেননা অত্যাচার তোমার কাছে শেষ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে আসবে লজ্জা ও অনুশোচনা।" এমন পাশবিক নির্যাতন কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না। বুরহান উদ্দিনের মনে প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। তার বিচারের কোন স্থান ছিল না। কর্তিত হাত ও নিস্পাপ সন্তানের হত্যার বিচার পাওয়ার কোন আশ্রয়স্থল ছিল না। কেবল ধৈর্য্যই ছিল তার সহায়। একবার নিজের কর্তিত হাতের দিকে চাইতেন, আবার নিজ প্রাণপ্রিয় পুত্রের দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন।

এমনিভাবে ব্যথিত চিত্তে বুরহান উদ্দিন তৎকালীন লখনৌতির সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের (১৩০১ - ১৩২২ঈ.) নিকট এই অমানুষিক জুলুমের ইনসাফ চেয়ে সাহায্য কামনা করেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সুলতানের ন্যায় পরায়নতার সুখ্যাতি রয়েছে। ন্যায়, সুবিচার ও আদর্শের ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হয়। তাই সুলতান আপন ভাগিনের সিকান্দর খান গাজীকে গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এদিকে সিকন্দর খান সসৈন্যে গৌড় অভিযানে অগ্রসর হন। সিলেটের একটি ছড়ায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ

গাজী সাহেবের নাম শেখ সিকান্দর / চৌদ্দ বছর যুদ্ধ করল কুড়ুলীর ভিতর
অগ্নিবান খাইয়া বেটা গেল পালাইয়া / কুবাই তনে শাহজালালরে লইয়া আইল গিয়া। [৮৯]

ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, শায়খ সিকন্দর প্রথমে দীর্ঘকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করত সদরঘাটের 'কুড়ুলী টিলা নামক স্থান পর্যন্ত দখল করেন। এই এলাকায় লাউড়ের রাজধানী থাকার কিংবদন্তী রয়েছে। স্থানীয় ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে ও এখানে কোন রাজ্যের (লাউড়ের) রাজধানী ছিল বলে ধারণা করা হয়। সুতরাং এই স্থান পর্যন্ত শায়খ সিকন্দর দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে মুসলিম অধিকারে আনয়ন করে লাউড়ের রাজধানী লাউড়ের পাহাড় সম্পূর্ণ রূপে স্থানান্তরিত করে তৎকালিন লাউড় রাজ লাউড়ের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহন করেন। তাহার নাম জানা যায় না। সদর ঘাটের নিকটই বরাক নদী অবস্থিত। ইহা লাউড় ও গৌড়ের সীমান্ত এলাকা ছিল। সিকন্দর খান এই নদী অতিক্রম করিতে গেলেই গোবিন্দ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে সিকন্দর খান গৌড় গোবিন্দের মোকাবিলা করতে পারেন নাই। কারণ জনশ্রুতি অনুসারে কোন মতেই গোবিন্দ শায়খ সিকন্দরের অভিযানকে ব্যর্থ করতে না পেরে অবশেষে যাদু বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং মুসলিম বাহিনীর উপর অগ্নিবান নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। যুদ্ধের এই নতুন পদ্ধতি বা টেকনিক মুকাবিলা করার জন্য শায়খ সিকন্দর পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন ইহাকে মুকাবিলা করতে হলে কামিল ওলী-দরবেশের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য্য। তাই তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে বাংলার তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁ অভিমুখে প্রত্যাগমন করেন। এই সুযোগে লাউড় রাজ সম্ভবত আবার তাঁর সম্পূর্ণ রাজ্য (ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত) অধিকার করে নেন।

---

৮৯. আল ইসলাহ, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৬৪ বাংলা, পৃ ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ফলে গৌড় গোবিন্দ তখনকার মত রক্ষা পান। শায়খ সিকান্দরের সিলেট অভিযান ব্যর্থ হয়। ইহা জানতে পেরে তৎখালীন সুলতান শামস উদ্দীন ফিরুজ শাহ্ সৈয়দ নাসির উদ্দিন কে সিপাহসালার বা সেনপতি নিযুক্ত করে তার নেতৃত্বে একদল সৈন্য সিকন্দর খানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এই সময় শাহজালাল সোনার গাঁও অবস্থান করছিলেন। জানা যায় যে সিকন্দর খান এবং নাসির উদ্দীন সিপাহসালার একত্র হয়ে হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.)'র খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর দোয়া এবং সাহায্য কামনা করেন। হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.) দোয়া করেন এবং ৩৬০জন শিষ্য সহ জিহাদে শরীক হন। শায়খ সিকন্দরের প্রত্যাগমনের সুযোগে লাউড় রাজ আবার নিজ রাজ্য পুন:দখল করে নিয়াছিল। কিন্তু গৌড় গোবিন্দের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল। অনুচরদের মাধ্যমে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়া সহ শায়খ সিকান্দরের পূণবাভিযানের খবর পেয়ে লাউড় রাজা গোবিন্দের পরামর্শ মতে ব্রম্মপুত্র নদীর নৌকা ইত্যাদি পরাপারের যাবতীয় ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এতে কোন ফল হয় নাই। মুসলিম বাহিনী সহ শাহজালাল (রহ.) হরিনচর্য নির্মিত জায়নামাজে করে নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সৈয়দ মুর্তাজা আলী বলেন, সিকান্দর খান গাজী সোনারগাঁও থেকে পূর্ব দিকে রওয়ানা হয়ে সসৈন্যে ব্রক্ষপুত্র নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। এই স্থলে গৌড়গোবিন্দ তাঁকে আক্রমণ করলেন। কথিত আছে গৌড় গোবিন্দ অগ্নিবান (হাওই কিংবা মশাল লাগান তীর) বর্ষণ করায় সিকান্দর গাজী পরাভূত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর সিকান্দর গাজী দ্বিতীয় বার সৈন্য পরিচালনা করেও গৌড় গোবিন্দের আক্রমণে ব্রক্ষপুত্র নদী অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলেন। তখন বর্ষাকাল। ভাটি অঞ্চলে প্রবল বর্ষার সঙ্গে আরবও তুর্কী সৈন্যের ইতিপূর্বে পরিচয় ঘটেনি। বর্ষার প্রকোপে সৈন্য শিবিরে নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ মনে করল হয়ত ভোজ ভাজির রাজা গৌড় গোবিন্দের যাদুর প্রভাবেই এই ভীষণ বর্ষা নেমেছে। অনেকে ভীত ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। আক্রমণকারী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হল। সে সময় মুসলমানেরা কুসংস্কার বশতঃ জ্যোতিবশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তী যুগে লিখিত 'বাহারিস্তানে ঘাইবিতে' দেখা যায় ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্য বাহিনীর অধিনায়করা যুদ্ধে যাত্রার পূর্বে শুভদিন গণনা করে রওয়ানা হতেন। যাহা হউক সিকান্দর গাজী বার বার বিফল মনোরথ হওয়ায় সুলতান সামস উদ্দীন জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হলেন। জ্যোতিষীগণ বলল যে, কোন দরবেশের অধিনায়কত্ব ব্যতিত গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করার সম্ভাবনা নেই এবং উক্ত দরবেশের যে বর্ণনা তারা দিল তা সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালারের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।

সিকান্দর গাজী তখন শাহজালাল ও তাঁর সঙ্গীদের আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে পুণরায় শ্রীহট্টের দিকে অভিযান করলেন এবং দরবেশ সৈয়দ নাসির উদ্দীনকে এই সৈন্য বাহিনীর সিপাহসালার (সেনাপতি) করা হল।

ইতিমধ্যে শাহজালালের সঙ্গে তিনশত এগারজন দরবেশ সঙ্গী সাথী হিসেবে যোগদান করেছেন। দরবেশ ও আউলিয়ার শক্তিতে বলিয়ান এই বাহিনী বিনা বাধায় ব্রক্ষপুত্র নদী অতিক্রম করে কুমিল্লায় আসেন। কুমিল্লায় যে স্থানে হযরত অবস্থান করেন সেখানে একটি দরগা আছে। তৎপর শাহজালাল

Dhaka University Institutional Repository

গৌড় গোবিন্দের রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্থিত নবীগঞ্জের নিকটস্থ চৌকি পরগনায় উপস্থিত হন। এখান থেকে হযরত শাহজালাল ও তাঁর সঙ্গীয় দরবেশ সহ সৈন্য বাহিনী বাহাদুরপুরের নিকট বরাক নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হলেন। এর পূর্বরাত্রে হযরত সরসতি পরগনার অন্তর্গত ফতেপুর গ্রামে ছিলেন। তদবধি ফতেপুরে এক মোকাম আছে। গৌড় গোবিন্দ এই স্থানে নৌকা চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রবাদ এই যে, হযরত তাঁর মৃগচর্মের জায়নামাযে বসে সঙ্গী সাথী আউলিয়া বাহিনী সহ নদী অতিক্রম করলেন। অতঃপর তারা পূর্বদিকে যাত্রা করে শেখ ঘাটের দক্ষিণ দিকে বর্তমান সিলেট রেল ষ্টেশনের অদূরে সুরমা নদীর তীরে খেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হযরত পুণরায় তাঁর জায়নামাজে বসে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে নদী পার হলেন।

ওলী-আউলিয়া বা আল্লাহর প্রকৃত মুমিন বান্দা দ্বারা সাধারণ অভ্যাসরে বিপরীত কোন কিছু প্রকাশ পাওয়া হচ্ছে কারামত। ইহাকে সত্য জেনে বিশ্বাস করতে হয়, ইহাই আকাইদ শাস্ত্রের মূলনীতি।

কোন কোন পন্ডিত মনে করেন ও তাদের অভিমত নিম্নরূপ ব্যক্ত করেন: "বাংলাদেশে বাঁশ ও কলা গাছের দুর্ভিক্ষ কোনদিন ছিল না। কাজেই নৌকা চলাচল বন্ধ করিলেও পর্যাপ্ত সংখ্যক বাঁশ ঝাড় কেটে ভেলা বানাইয়া অভিযান কারীরা ভেলাতে করিয়া নদী অতিক্রমে সক্ষম হন। আরামের জন্য ভেলার উপর হযরত শাহজালাল (রহ.) এর হরিনচর্ম জায়নামাজ বিছাইয়া রাখা হইয়াছিল।" তাদের এই অভিমতটুকু ইসলামী আকীদা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ ভেলা দ্বারা নদী অত্রিক্রম করা কারামত হতে পারে না বা কারামতের আওতায় তাদের ব্যাখ্যা অন্ত র্ভুক্ত নয়। আকাঈদে নাসাফী প্রণেতার ভাষ্য মতে আউলিয়ায়ে কেরামদের পক্ষ থেকে সংঘটিত অলৌকিক কর্মকান্ড সত্য। ওলীর জন্য অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পাওয়া হচ্ছে করামত। সুদীর্ঘ দূরত্ব স্বল্প সময়ে অতিক্রম করা, পানাহার সামগ্রী, পোশাক পরিচ্ছদ প্রকাশ পাওয়া, পানি এবং বাতাসের উপর দিয়ে পরিভ্রমণ করা জড় বস্তু এবং জীব জন্তু সাথে কথা বলা অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে এ সমস্ত প্রকাশ পেয়েছে বলে বর্ণিত আছে। কলা গাছ বা বাঁশ ঝাড় দ্বারা ভেলা বানিয়ে নদী অতিক্রম করা ওলীর কারামতের সংজ্ঞাই পড়ে না। শাহজালাল (রহ.) সিলেট বিজয়ের প্রায় সকল কর্মকান্ডেই আধ্যাত্মিকতা ও কারামত এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর বিপরীত ধারণা পোষণ করা আউলিয়া কেরামের কারামত অস্বীকার করার নামান্তর।[৯০]

শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (রহ.) অনেক উচু স্তরের ওলী ছিলেন। আধ্যাত্মিক শক্তি বলে গৌড় গোবিন্দের মত জালিম শাহীকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন দিল্লীর সালতানাত ও বাংলার সুলতান ও সেনাপতি তথা রাষ্ট্রীয় সমর শক্তির মাধ্যমে চেষ্টা করে ও পরপর দুবার শারখ সিকন্দর পরাজয় বরণ করেছিলেন। এহেন একজন মহান ওলীর পক্ষে জায়নামাজ বিছিয়ে নদী পারাপার এমন কোন কঠিনকাজ ছিল না এ ধরণের কারামত (অলৌকিকতা) আউলিয়াদের জীবনী পাঠে জানা যায়।

---

৯০. আকাইদ আন নাসাফী উর্দু শরাহ আবদুল কাওয়াইদ আলা শারহিল আকাইদ, পৃ- ১৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

কবি দিলওয়ার (শাহজালাল (রহ.)-কে লক্ষ করে বলেনঃ

জায়নামায বিছাইয়া তুমি দিলায় নদী পাড়ি
শুই না রাজা গৌড় গোবিন্দের দিশা গেল উড়ি।

জায়নামাজের উপর বসে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর নদী অক্রিমের খবরে রাজা গোবিন্দ নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করলেন। তিনি শাহজালাল (রহ.) এর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ফকীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি বিজয়ের কোন সম্ভাবনাই দেখলেনা তাই রাজা গৌড় গোবিন্দ কুটকৌশল অবলম্বন করলেন।[৯১]

মুসলিম বাহিনী কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র নদী এভাবেই অতিক্রমের সংবাদ পেয়ে লাউড় রাজ ভাবলেন এবার আর রক্ষা নই। পূর্বে তিনি শায়খ সিকন্দরের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীর শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তিনি অনর্থক লোকক্ষয় করতে আর প্রস্তত হলেন না। পূর্বের মত তিনি লাউড়ের অন্যতম রাজধানী সদরঘাট পরিত্যাগ করতে লাউড়ের পাহাড়ে আবার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মুসলিম বাহিনীর সহিত কোন চুক্তির কালও এইরূপ হয়ে থাকতে পারে। এ জন্যই সিলেট বিজয়ের পরেও লাউড় রাজ নির্বিবাধে তার রাজত্ব পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। ইতিহাসের ধারায় ইহা সহজেই প্রতিয়মান হয় যে, মুসলিম বাহিনীর প্রথমত দিনারপুর পর্যন্ত মুসলমানের অধিকারে এনেছিল এবং সম্ভবত এই স্থানকে কেন্দ্র করে-ই দ্বিতীয় পর্যায়ে গৌড় অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

শাহজালাল (রহ.) যে নদী সৈন্য সামন্ত নিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, তা ব্রম্মপুত্র বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ব্রম্মপুত্র দক্ষিণ হবিগঞ্জে উপর দিয়ে কখনও প্রবাহিত হয়নি। পূববর্তী দুটি অভিযানে মুসলিমরা ময়মনসিংহের উপর দিয়ে পরিচালিত করেন। তখন মুসলিম সৈন্যদলকে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করতে হয়েছিল। সে জন্যেই কোন কোন লেখক তৃতীয়বার ও সিকান্দার বাহিনী ব্রহ্মপুত্রে অতিক্রম করেছে বলে মনে করেছেন। ১৭৭২ ঈসায়ী মেজর জেমস রেনেলের ক্যাপে দক্ষিণ হবিগঞ্জ কাহিয়া এবং বুশিয়া নামক দুটি গুরুত্ব পূর্ণ নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব হযরত শাহজালাল (রহ.) এ দুটির একটি নদী অতিক্রম করেছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করার প্রশ্নই উঠতে পারে ন।

পূর্ববর্তী অভিযানে সিকন্দর বাহিনী ব্রহ্মপুত্র তীরে আক্রান্ত হয়েছিল বলে যে কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় তা ও অসম্ভব বলে মনে হয়। ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন শাখা কিশোরগঞ্জ মহকুমার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হতো। কিন্তু কিশোরগঞ্জ মহকুমা কখনও গোবিন্দের রাজ্যভুক্ত ছিল না।

মুসলিম বাহিনী হযরত শাহজালাল (রহ.) নেতৃত্বে অবলীলাক্রমে নদী অতিক্রম করে বর্তমান নবীগঞ্জের নিকর্ট দিনার পুর পরগনার চৌকি নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। চৌকি ছিল রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে।

---

৯১. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.) পৃ- ১১২

Dhaka University Institutional Repository

চারদিকে খবর প্রচারিত হয়ে গেল যে, মুসলিম বাহিনী ফকীরের জায়নামাযে বসে নদী অতিক্রম করেছে। প্রায় সকলেই এ ঘটনা বিশ্বাস করল। যাদু বিদ্যা বিশারদ রাজা গৌড় গোবিন্দ হতবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন এ কি করে সম্ভব? তবে কি ফকীর শাহজালাল তাঁর থেকে বড় যাদু বিশারদ। তাঁর মনে হতাশার সৃষ্টি হল। তিনি মুসলিম অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য কৃত সংকল্প হলেন।

বন-জঙ্গল থেকে নিরাপদ দুরত্ব রেখে ফকীরের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি রাজা গোবিন্দের অতর্কিত আক্রমণের আশংকা তিরোহিত করে দিয়েছিল। মুসলিম সেনাদলের প্রতিটি অবস্থান স্থানই মশাল বাহী তীরের পাল্লায় বাইরে ছিল।

দিনারপুর পরগনার চৌকিনামক স্থানেই (বর্তমান নবীগঞ্জের নিকট) মুসলিম বাহিনীকে আক্রমন করা গোবিন্দ সুবিধা জনক মনে করলেন। ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে চৌকিতে মুসলিম এবং গৌড় গোবিন্দের বাহিনীর মধ্যে প্রথম সম্মুখ সমর অনুষ্ঠিত হয়।

মুসলিমদের মশালধারী তীর বাহিনী এ যুদ্ধে সর্বাধিক সহায়ক ছিল। নিজস্ব অগ্নি তীরন্দাজ বাহিনীর আড়াল থেকে গোবিন্দের পদাতিক বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মুসলিম সেনাদলের নিক্ষিপ্ত মশাল তীর তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যাহত করে দেয়।

মুসলিমদের সে তীরন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের জন্য গোবিন্দ মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। যুদ্ধাস্ত্র বিদ্যার এ দিক টিকে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাদের আত্ম প্রত্যয় ছিল। মুসলিমগন যে এ যুদ্ধে তীরন্দাজ বাহিনী নিয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে গোবিন্দ সেনাদল অবগত ছিল না। গোবিন্দ বাহিনী পূর্বেই শাহজালাল (রহ.) এর অলৌকিক শক্তির বিষয় অবগত ছিল। যখন ঝাঁকে ঝাঁকে মুসলিম নিক্ষিপ্ত অগ্নিতীর গোবিন্দের সেনাদলের উপর পড়তে লাগল, তারা মনে করল যে, তাদেরই নিক্ষিপ্ত তীর শাহজালাল (রহ.) এর অলৌকিক শক্তির প্রভাব তাদের দিকে ফিরে আসছে।[৯২]

অল্প সময়ের মধ্যে গোবিন্দের সমগ্র সেনাদল এ অলৌকিক কান্ডের খবর প্রচারিত হয়ে গেল। এ অপ্রত্যাশিত বিপদে রাজা গোবিন্দের সেনাদল কিং কর্তব্য বিমুঢ় হয়ে গেল। অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ফকীর চালিত সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করা অনেকেরই মতে নিরর্থক মনে হল। গোবিন্দ সেনাদল যখন এরূপ হতাশা এবং অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করছিল, মুসলিম আশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী তখন তীব্র বেগে আক্রমন চালান। রাজা গোবিন্দের সেনাদলের শৃঙ্খলা এবং আত্ম বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে গেল।

মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক সুসজ্জিত ছিল। পূর্ব পরাজয়ের গ্লানি দুর করার সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় সতর্কতা সিকন্দর শাহ করেছিলেন। শাহজালাল (রহ.) এর ন্যায় পরম ধর্মপরায়ন সংসার ত্যাগী ফকীরের উপস্থিতি তাদেরকে দিয়েছিল অপূর্ব আত্মবিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস ছিল শাহজালাল (রহ.) এর - উপস্থিতি রাজা গোবিন্দের কোনরূপ যাদুবিদ্যা কার্যকরী হতে পারবে না।[৯৩]

---

৯২. হিস্ট্রী অব শাহজালাল এন্ড হিজ খাদিমস, পৃ- ১০৮-১০৯
৯৩. ইকরাম, এস.এম. আবে কাওছার (লাহোর, ফিরোজ সন্স, ১৯৫৯) পৃ- ৩৬১।

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধের পর মুসলিমদের যুদ্ধ বিদ্যার নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হল। ইতিপূর্বে তারা সেনাদলে তীরন্দাজ ধনুর্ধর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী অনুভব করেননি। পরবর্তী সময়ে ইলিয়াছ শাহ দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তোঘলকের বিরুদ্ধে তীরন্দাজ বাহিনী নিয়োগ করছিলেন।[৯৪]

বিজয়ী মুসলিম বাহিনী দিবাবসানে বাহাদুরপুর বা সতরসতি পরগনার অন্তর্গত সতরসতী নামক স্থানে রাত্রি যাপন করেন। শাহজালাল (রহ.) এর দোয়া এবং পরিচালনায় বিজয়ী হয়ে মুসলিম বাহিনী তাঁরই দৃষ্টিতে সে রজনী শুকরিয়া ইবাদত ও প্রার্থনায় কাটান। শাহজালাল (রহ.) যেস্থানে রাত্রি যাপন করেন সে স্থানটি চিহ্নিত আছে। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে লোকজন সতরসতিতে শাহজালাল (রহ.) এর মোকাম নামে কথিত বিশ্রাম স্থান পরিদর্শন করে থাকে।
সিলেট জেলার প্রায় সমস্ত লোকই বিশ্বাস করে যে, রাজা গোবিন্দের সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীর ই হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে প্রত্যাবর্তিত হয়ে গোবিন্দের সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দেয়। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী লেখকের প্রত্যেকেই প্রায় অলৌকিক কাহিনীর বিবরণ চিত্তাকর্ষক ভাবে দিয়েছেন।
সতরসতি থেকে যাত্রা করে দরবেশ শাহজালাল (রহ.) এবং সৈন্য বাহিনী বালাগঞ্জ থানার বরাক নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। বরাক নদীর ফেরী ও গোবিন্দ বন্ধ করে দেন এবং নদী থেকে সমস্ত নৌকা অপসারণ করেন। গোবিন্দ মুসলিম বাহিনীর যাত্রাপথের মধ্যবর্তী অন্যান্য নদীতে নৌ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন।এ পর্যন্ত শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে লিখিত প্রায় সকল পুস্তকেই আছে শাহজালাল (রহ.), জায়নামাজে বসে নদী অতিক্রম করেছিলেন। এটাও বিশ্বাস করা হয় যে, শাহজালাল (রহ.) শাগিরদ এবং সৈন্য বাহিনী ও জায়নামাযে আরোহন করে নদী অতিক্রম করেছিলেন।

উল্লেখ্য সিলেট বিজয়ের পূর্বে বাংলার সুলতানের নিয়মিত তীরন্দাজ বাহিনী ছিলেন। রাজা গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান কালে মুসলিমগণ তীরন্দাজ বাহিনরি প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি অনুধাবন করে ছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দীন বারানী সুলতান শামস উদ্দীন শাহের তীরন্দাজ বাহিনীর উল্লেখ করেছেন। মুসলিমদের মশালধারী তীর বাহিনী এই যুদ্ধে সর্বাধিক সহায়ক ছিল। নিজস্ব অগ্নিতীর বাহিনীর আড়াল হতে গোবিন্দের পদাতিক বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মুসলিম সেনাদলের নিক্ষিপ্ত মশাল তীর তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যাহত করেছিল। গোবিন্দবাহিনী পূর্বেই শায়খ জালালের আলোকিত শক্তির বিষয় অবগত ছিল। যখন ঝাঁকে মুসলিম নিক্ষিপ্ত তীর গোবিন্দের সেনাদলের উপর পড়তে লাগল তারা মনে করল যে, তাদেরই নিক্ষিপ্ত তীর শায়খ জালাল (রহ.) অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তাদের দিকে ফিরে আসছে। অল্প সময়ের মধ্যে গোবিন্দের সেনাদলে এই অলৌকিক কান্ডের খবর প্রচার হয়ে গিয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত বিপদে রাজা গোবিন্দের সেনাদল কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে গিয়েছিল।

---

৯৪. বারানী জিয়া উদ্দিন, তারিখে ফিরোজ শাহী (তারড, বিবলিথিকা ১৮৯২) পৃ- ৫৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ফকির চালিত সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করা অনেকের মতে নিরর্থক মনে হয়েছিল। গোবিন্দ সেনাদলে যখন এইরূপ হতাশা এবং অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করেছিল, মুসলিম পদাতিক বাহিনী, আশ্বারোহী বাহিনী তখন তীব্রবেগে আক্রমন চালিয়ে যেতে ছিল। রাজা গোবিন্দের সেনাদলের শৃঙ্খলা এবং আত্ম বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী এই যুদ্ধে অধিক সুসজ্জিত ছিল। পূর্ব পরাজয়ের গ্লানি দুরীভূত করার জন্য সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় সতর্কতা সিকন্দর শাহ করেছিলেন। সেনাদলে শায়খ জালাল (রহ.) এর ন্যায় পরম ধর্মপরায়নসংসার ত্যাগী ফকিরের উপস্থিতি তাহাদেরকে দিয়েছিল অপূর্ব আত্মবিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস ছিল শায়খ জালালের উপস্থিতিতে রাজা গোবিন্দের কোন যাদু বিদ্যা কার্যকরী হতে পারবে না সিলেট জেলার প্রায় সমস্ত লোকই বিশ্বাস করেন যে, রাজা গৌড় গোবিন্দের সেনাবাহিনী নিক্ষিপ্ত তীরই হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে প্রত্যাবর্তিত হয়ে গোবিন্দের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেয় দিয়েছিল। হযরত শায়খ জালাল (রহ.) এর জীবনী লেখক প্রায় প্রত্যেকেই এই অলৌকিক কাহিনীর বিবরণ চিত্তাকর্ষক ভাবে দিয়াছেন। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেন। উল্লেখিত যুদ্ধে গৌড় গোবিন্দের পরাস্ত হওয়ার বিবরণ চৌধুরী গোলাম আকবর প্রণীত হযরত শাহজালাল নামক পুস্তকে নিম্নরূপ বর্নিত হয়েছে।

ইহা পরে শ্রীহট্টের চৌকি দিনারপুর
উপনীত হলে পরে গোবিন্দ চত্বর
অলক্ষ্যেতে তাহাদের করি অবস্থান
শুন্য ব্যোহ নিক্ষেপিত বহু অগ্নিবান
কিন্তু তাহা বিধাতার মহিমার গুণেতে
স্বীয় সৈন্যদলে গিয়া লাগিল পড়িতে
দেখিয়া গোবিন্দ এই কান্ড চমৎকার
বিস্মিত ত্রাসতি হইয়া সেই স্থান ছাড়িয়া করিলেন
পলায়ন রনে ভঙ্গ দিয়।[৯৫]

ডাক্তার কুদরত উল্লাহের ভাষায়ঃ

এগিয়ে চলে রন কাফেলা
না আছে সংশয়
আল্লাহ যাদের সাথে আছে
কিসের তাদের ভয়।

পূর্বের মত তারা ক্রমে সুরমা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন, তখন গোবিন্দ বেশ বুঝতে পারেন যে, আর রক্ষা নাই। তবুও তিনি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তার আস্ত্রাগারে অতি প্রাচীন একটি লৌহ ধনুক ছিল্ এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, যে ব্যক্তি এই ধনুকে গুণ যোজনা করতে পারবে কেবল মাত্র সে গৌড় রাজ্য জয়ে সমর্থ হবে। গৌড় গোবিন্দের

৯৫. হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ. ১২১-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস ছিল যে, কেহই ইহাতে গুণ যোজনা করতে পারবেন না। তাই তিনি হযরতের কাছে উহা পাঠিয়ে জানালেন যে, তার সাথীদের মধ্যেই কেহ যদি উহাতে গুণ আরোপ করতে পারেন তবে তিনি বিনা যুদ্ধেই রাজ্য ছেড়ে যাইবেন। শাহজালাল (রহ.) এর নিকট তাহা নীত হইলে তিনি সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া বললেন, যে ব্যক্তি কোন দিন আসরের বা ফজরের নামাজ কাযা করেন নাই। তিনিই এই কার্য সাধনে সক্ষম হবেন। সকলের মধ্যে কেবলমাত্র সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দিনএই কার্যের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়াতে হযরত তাঁকেই ধনুতে গুন যোজনা করতে বললেন। আশরাফ হোসেন সাহিত্য রত্ন সাহেব কবিতার ভাষায় ইহার আকর্ষনীয় বর্ণনা দিয়েছেন। তাহা নিম্নরূপঃ

উঠহে সৈয়দ জাদা হিম্মত করিয়া

খেমটাতে চড়াও চিল্লা বিসমিল্লাহ বলিয়া

আল্লাহ পাকের হুকুমে নাসির উদ্দীন সহজেই কৃতকার্য হলেন।

এ কথা জানতে পেরে গোবিন্দ পলায়নের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। পলায়নের পূর্বে শাহজালাল (রহ.) কে দেখবার আশায় গোবিন্দ এক সাপুড়িয়ার ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে শাহজালাল (রহ.) সামনে হাযির হলেন। গোবিন্দ সাপুড়িয়াকে বলে দিয়াছিল যেই ঝুড়িতে সাপ থাকবে শুধু সেই ঝুড়িটি খুলতে এবং অপর জুড়িটি (যেখানে গোবিন্দ থাকিবে) না খুলতে। সাপের খেলা দেখার আগ্রহ শাহজালাল (রহ.) এর ছিল না। কিন্তু চাতুরী খেলার বিষয় দিব্যচক্ষে অনুধাবন করতে পারে তিনি কোন ভূমিকা না করেই বললেন, গোবিন্দ বাহির হয়ে আস। গোবিন্দ দেখলেন এই বার আর রক্ষা নেই। তাহার চক্রান্ত শাহজালাল (রহ.) ধরে ফেলেছেন। উপায়ান্তর না দেখে গোবিন্দ বাহির হয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর নিকট আত্ম সমর্পণ করলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) বললেন "গোবিন্দ তোমার ইতিহাসতালাশ করে দেখ, উহা কলংকের কালিমায় পরিপূর্ণ। তুমি ছিলে দেশের রাজা আপামর জনসাধারণে সর্ব প্রধান নায়ক। তোমার কর্তব্য ছিল ন্যায় নীতি ও ন্যায় বিচার করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সেই পথ অবলম্বন না করে তুমি প্রজাদলন নীত অবলম্বন করেছিলে। তোমার অত্যাচারে দেশ বাসী ক্ষুব্ধ। মুসলমানদের প্রতি তুমি যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছ তার নযীর ইতিহাসের কোথাও নাই। তোমার শাস্তি হওয়া উচিত।

গোবিন্দ এবার নিজকৃত সকল অপরাধের কথা স্বীকার করলেন এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে জীবন ভিক্ষা চাইলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাকে ক্ষমা করিলেন। ক্ষমা করাই যে আল্লাহ প্রেমিকের ধর্ম। ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে রাজ্যের মোহত্যাগ করে গোবিন্দ অতঃপর সিলেট শহর হতে পলায়ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবির ভাষায় ঃ

রাজ্য ছাড়ি গেল রাজা পর্বত ভিতর

এর পর কি হইল আর না জানি খবর।[৯৬]

এইভাবে অত্যাচারী রাজার রাজত্ব খতম হল। গোবিন্দের পতনের বিষয়টি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের আলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। একাদশ শতাব্দীতে নিজামূল মূলক (হিঃ ১০১৭-১০৯২) রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় তদীয় 'সিয়াসত নামায়' লিখেছেন "ধর্মহীন রাজ্য চলিতে পারে, কিন্তু অত্যাচারীর রাজ্য চলিতে পারে না। আত তিবরুল মসবুক গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী (রহ.) ও এই রূপ বক্তব্য রেখেছেন। তিনি লিখেছেন, নবী (সা.) এরশাদ করেছেনঃ কাফিরদের রাজত্ব স্থায়ী হইতে পারে কিন্তু অত্যাচারীর রাজত্ব কোনদিন স্থায়ী হতে পারে না। ইতিহাসে আছে এই জগতে অগ্নিপুজকদের রাজত্ব একহাজার এই বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাহাদের রাজত্ব ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা তাদের ধর্মের নির্দেশানুযায়ী অন্যান্য অত্যাচারকে বৈধ বলে ঘোষণা করতনা। তারা ন্যায় এবং সুনিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শহর সমূহকে আবাদ করেছিল। গোবিন্দ অত্যাচারী রাজা ছিলেন। এই জন্যই রাষ্ট্রনীতি সাধারণ নীতি অনুসারেই তার পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। বস্তুত হয়েছেও তাই।[৯৭]

গৌড়গোবিন্দ পলায়নের পর হযরত শাহজালাল (রহ.) মুসলিম বাহিনী সহ সুরমা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। কবির ভাষায়-

যখন পৌঁছিলা তিনি নদীর কিনার,

নৌকা বিনা সেই নদীও হইলেন পার।

বর্তমান সিলেটের শেখ ঘাটে নিকট দিয়ে সুরমা নদী অতিক্রম করিয়া মুসলিম বাহিনী সিলেট শহরে প্রবেশ করেন। আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে সিলেটের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠিল। কবির ভাষায়-

আকাশ বাতাস আওয়াজে আল্লাহু আকবার

প্রতিধ্বনিতে গুজরে উঠে সেই একই স্বর

মায়া মন্ত্রে মুগ্ধ আসাম-বাঙ্গাল

কণ্ঠে কণ্ঠে রব জয় শাহজালাল।

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর আদেশে তিন দিন পর্যন্ত আল্লাহর শুকর গুজারী করা হল। অতঃপর তারই আদেশে হযরত নুর উল্লাহ বা শাহচট (রহ.) সিলেটে প্রকাশ্যে আযান দিলেন। আযানের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের সাধের পৌত্তলিক প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ল।

---

৯৬. প্রাগুক্ত পৃ- ১২৭
৯৭. প্রাগুক্ত পৃ- ১২৭-১২৮

আল্লাহু আকবার আওয়াজ তুলতে তুলতে সসৈন্যে সিলেট শহরে প্রবেশ করলেন দরবেশ শাহজালাল। মনারায়ের টিলার চুড়ায় অর্ধ চন্দ্রাঙ্কিত সবুজ পতাকা উড্ডীন হল।

শ্রীহট্টে পদার্পন করে হযরত দু বছর চৌকিদেখি মহল্লার লাক্কাতুড়ায় অবস্থান করেন। এখনো দরগা হতে বৎসরে একবার লাক্কাতুড়ায় খাদিমরা গমন করেন। হযরত শাহজালাল যখন শ্রীহট্ট বিজয় করেন তখন শহর উভয় দিকে বরশালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বরশালা, আখালিয়া ইত্যাদি স্থানে তৎকালে রাজা গৌড় গোবিন্দের সভাসদগণ বাস করতেন। বর্তমান শহরের অধিকাংশ স্থান তখন জলাভূমি ছিল। চালিবন্দর ইত্যাদি মহল্লার নাম তৎকালীন অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। কালেক্টরীর দক্ষিণ ভাগে ও তখন এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছিল। শহরের কালিঘাট মহল্লায় তখন থেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাস করতে আরম্ভ করেন।

গোবিন্দের দুর্গ প্রাসাদ গড়দুয়ারে ছিল। মনারায়ের টিলা নামক সু-উচ্চ টিলার উপর থেকে শত্রু পক্ষের গতিবিধি লক্ষ করা সহজ ও সুবিধাজনক ছিল। মনারায়ের পতনের পর গোবিন্দের মনোবল নষ্ট হয় ও তিনি পেচাগড়ে পলায়ন করেন। পেচাগড়ে সম্ভবত গোবিন্দের দ্বিতীয় দুর্গ ছিল। পেচাগড়ের কাছে নাকি নানাবিধ দালান ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল।

হযরত শাহজালালের অন্যতম আরবীয় সঙ্গী চাষনী পীর সিলেটের মাটি পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন এর সহিত আরবের মাটির হুবহু মিল। হযরত আনন্দে অধীর হলেন।

কি আশ্চর্য তার উস্তাদের দেওয়া মাটির সঙ্গে সিলেটের মাটির হুবহু মিল রয়েছে। একই গন্ধ বর্ণ ও স্বাদ। দরবেশের ভ্রমন পিপাসা এতদিনে পরিতৃপ্ত হল। উস্তাদের নির্দেশ স্মরণ করে তিনি স্থায়ীভাবে সিলেটে বসবাসের মনস্থ করলেন। সিলেটে এসে হযরত প্রথম চৌকি দীঘি মহল্লায় কিছুদিন বাস করেন। সেখানে তিনি একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেন। শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের সময়ে এই মসজিদ পূর্ণ নির্মিত করা হয়। সেই মসজিদ সংলগ্ন ৮৮৪ হিজরী (১৪৭৯ খ্রিঃ) তারিখের একটি শিলালিপি এখনও দরগাহে রক্ষিত আছে। চৌকিদেখিতে হযরতের সঙ্গী কোন কোন দরবেশের সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। তৎপরে হযরত স্থান পরিবর্তনের মনস্থ করলেন। উচ্চ টিলার উপরে এক মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করা হল তাঁর হুজরা। বিজয়ের পর শাহজালাল সিলেটের শাসনভার সেনাপতি সিকান্দর গাজীর উপর ন্যস্ত করেন। তাঁর ওফাতের পর হযরতের সঙ্গী নুরুল হুদা আবুল কেরামত সাইদী হোসেনীর উপর এই বিজিত ভূমির শাসন ভার অর্পন করা হয়। এই নুরুল হুদাই শ্রীহট্টের হায়দর গাজী নামে পরিচিত।[৯৮]

---

৯৮. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ১৬, ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল ৭০৩ হিজরী (১৩০৩ ঈসায়ী) শ্রীহট্ট বিজয় করেন। এই বিজয়ের তারিখ বঙ্গের (১৪৯৩-১৫১৯ঈ.) সুলতান আলা উদ্দীন হোসেন শাহের আমলের (১৫১২ ঈ) এক শিলালিপিতে পাওয়া যায়। শিলালিপিটি বর্তমানে ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। শিলালিপিটির লিখন ও ধরণ নিম্নরূপঃ

بعظمت شيخ المشائخ مخدوم شيخ جلال مجرد بن محمد

اول فتح اسلام شهر عرصه

سريهت بدست سكندر خان غازي

در عهد سلطان فيروز شاه

دلوي سنة ثلثة و سبعمائة اين

عمارت ركنخان كه فتح كنده

هشت كامهار يان و وزير لشكربوده

شهر هاوفت فتح كامر وو كامتا

و جاز نكرو اريشا لشكري كرده باشند جابجا

مدنبال بادشاه سنة ثمان وعشرو تسعمائة ৯৯

ভাষা ফার্সী লিপিকাল ১৫১২-১৩ঈ. প্রাপ্তিস্থান, সিলেট।

উল্লেখ্য এই শিলালিপিতে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর প্রকৃত পরিচয় ও সিলেট বিজয়ের সংক্ষিপ্ত প্রমান্য ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

শিলালিপিটির বঙ্গানুবাদঃ

মুহাম্মদের পুত্র চিরকুমার শায়খুল মাশায়েখ দরবেশ জালালের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্য সুলতান ফিরুজ শাহ দেহলভীর আমলে ৭০৩ হিজরীতে সিকান্দর খান গাজী কর্তৃক সিলেট সর্ব প্রথম মুসলমান অধিকারে আসে। হাসত- গামহারিয়ান (সম্ভবতঃ জৈন্তা পাহাড়ের অধিবাসী) বিজয়ী রুকন খান কর্তৃক এক অট্টালিকা নির্মিত হয়। তিনি (রুকন খান) বাংলার সুলতান হোসেন শাহের ও সেনাপতি ছিলেন এবং কামরু (কামরুপ) কামতা (কামতাপুর বর্তমান কুচবিহার) যাজনগর (উড়িষ্যার একটি শহর) ও উড়িষ্যা বিজয় কালে সুলতানের সেনা বাহিনীতে অনেক দিন নিয়োজিত ছিলেন। ৯১৮ হিজরীতে (১৫১২ ঈ.) লিখিত।[১০০]

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমন সম্পর্কিত কাহিনী জনশ্রুতি হলেও এর সমর্থনে প্রমাণ্য তথ্য রয়েছে। কাহিনীর খুটিনাটিতে কল্পনার প্রলেপ থাকতে পারে তবে মূল বক্তব্য সত্য। রাজা গৌড় গোবিন্দ, শায়খ বুরহান উদ্দীন, সুলতান শামস উদ্দীন ফিরুজ শাহ, সিকান্দর খান গাজী এবং শাহজালাল (রহ.) সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। রাজা গৌড় গোবিন্দ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে সিলেটে প্রচলিত বিভিন্ন লোক গীতি থেকে তার সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যায়। তিনি সিলেট বিভাগস্থ সাত গাঁওয়ের দত্তদের পূর্ব পুরুষ বলে জানা যায়।

---

৯৯. ৯১৮ হিজরী/ ১৫১২ ঈসাব্দে উৎকীর্ণ হোসেন শাহী শিলালিপি। এতে শাহজালালের পরিচিতি ও সিলেট বিজয়ের তারিখ বর্ণিত আছে।
Source: J.A.S.B 1873/1922.

১০০. শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ-২৫

শায়খ বুরহান উদ্দীন কোন রাজনৈতিক কারণে সিলেটে পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শাহজালাল (রহ.) সিলেট আগমনের অনেক পূর্বে শায়খ বুরহান উদ্দীন রাজনৈতিক কারণে পলাতক আশ্রয় প্রার্থীদের কোন একজনের বংশধর ছিলেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ফিরুজ শাহের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্নই উঠে না। তাঁর উৎকীর্ণ মুদ্রা ও শিলালিপিতে প্রমাণ হয় যে, তিনি ১৩০১ থেকে ১৩২২ ঈসাব্দ পর্যন্ত লখনৌতির সুলতান ছিলেন। সিকান্দর খান গাজীর নাম ও শিলালিপিতে পাওয়া যায়।[১০১]

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। শিলালিপি ছাড়াও সুলতান ফিরুজ শাহের সমসাময়িক তার প্রমাণ বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার সাক্ষ্য। মরক্কোর এই বিখ্যাত পর্যটক ১৩৪৬ ঈসাব্দে সিলেটে গিয়ে শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।[১০২] উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার আলোকে সিলেটে ইসলাম ও শাহজালালের আগমন সম্পর্কে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি।

সিলেট অভিযানের মূল কারণঃ সম্প্রসারণ বাদী নীতি নয় বরং জিহাদঃ

অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম বলেন, বুরহান উদ্দীন কর্তৃক গরু জবাই এবং রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্তৃক তাঁকে শাস্তি দেয়ার ঘটনা কতদূর সত্য তা বলা যায় না। কাহিনীটির সত্যতা থাক বা না থাক শাহজালাল এ সময় সিলেট আগমন করেন এবং সিলেট বিজয়ের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।[১০৩] তবে এ কাহিনীটি সত্য হলেও ফিরুজ শাহের রাজ্য সম্প্রসারন এই ঘটনা মুখ্য নয়। এরূপ ঘটনা না ঘটলে ও ফিরুজ শাহের সম্প্রসারণনীতির অংশ হিসেবে সিলেটে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হত।[১০৪] অধ্যক্ষ শামসুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, বুরহান উদ্দীন কর্তৃক গরু জবেহকে কেন্দ্র করে সিলেট বিজয়ের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা হলেও মুসলিম রাজ্য বিস্তার নীতির প্রচেষ্টাই ছিল সিলেট বিজয়ের পেছনে মুল প্রেরণা।[১০৫]

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক যদুনাথ সরকার বলেন, Imperialism wheather Hindu Muslim or christian, never cries a half way in the fall sueing of its success. So the poor cow need not to be held responnible for the invasion of Sylhet by the muslims. He addded saying these saints surrounded by a horde of less scrupulous follower used to enter the territory of Hindus Rajas as squatters on some pretet or other. এ.টি দেবের অভিধানে Squatter এর বাংলা প্রতিশব্দ লেখা হচ্ছে জবরদখল কারী।

---

১০১. প্রাগুক্ত পৃ- ১৫
১০২. Hasan Mahdi. Dr. The Rihla of Ibn Batuta, Baroda 1953, P. 253, 239
১০৩. বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, পৃ- ১৬৯
১০৪. সিলেট ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ- ১০৬
১০৫. প্রাগুক্ত ২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ বুরহান উদ্দীন কোন রাজনৈতিক কারণে সিলেটে পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শাহজালাল (রহ.) সিলেট আগমনের অনেক পূর্বে শায়খ বুরহান উদ্দীন রাজনৈতিক কারণে পলাতক আশ্রয় প্রার্থীদের কোন একজনের বংশধর ছিলেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ফিরুজ শাহের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্নই উঠে না। তাঁর উৎকীর্ণ মুদ্রা ও শিলালিপিতে প্রমাণ হয় যে, তিনি ১৩০১ থেকে ১৩২২ ঈসাব্দ পর্যন্ত লখনৌতির সুলতান ছিলেন। সিকান্দর খান গাজীর নাম ও শিলালিপিতে পাওয়া যায়।[১০১]

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। শিলালিপি ছাড়াও সুলতান ফিরুজ শাহের সমসাময়িক তার প্রমাণ বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার সাক্ষ্য। মরক্কোর এই বিখ্যাত পর্যটক ১৩৪৬ ঈসাব্দে সিলেটে গিয়ে শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।[১০২] উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার আলোকে সিলেটে ইসলাম ও শাহজালালের আগমন সম্পর্কে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি।

সিলেট অভিযানের মূল কারণঃ সম্প্রসারণ বাদী নীতি নয় বরং জিহাদঃ

অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম বলেন, বুরহান উদ্দীন কর্তৃক গরু জবাই এবং রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্তৃক তাঁকে শাস্তি দেয়ার ঘটনা কতদূর সত্য তা বলা যায় না। কাহিনীটির সত্যতা থাক বা না থাক শাহজালাল এ সময় সিলেট আগমন করেন এবং সিলেট বিজয়ের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।[১০৩] তবে এ কাহিনীটি সত্য হলেও ফিরুজ শাহের রাজ্য সম্প্রসারন এই ঘটনা মুখ্য নয়। এরূপ ঘটনা না ঘটলে ও ফিরুজ শাহের সম্প্রসারণনীতির অংশ হিসেবে সিলেটে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হত।[১০৪] অধ্যক্ষ শামসুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, বুরহান উদ্দীন কর্তৃক গরু জবেহকে কেন্দ্র করে সিলেট বিজয়ের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা হলেও মুসলিম রাজ্য বিস্তার নীতির প্রচেষ্টাই ছিল সিলেট বিজয়ের পেছনে মুল প্রেরণা।[১০৫]

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক যদুনাথ সরকার বলেন, Imperialism wheather Hindu Muslim or christian, never cries a half way in the fall sueing of its success. So the poor cow need not to be held responnible for the invasion of Sylhet by the muslims. He addded saying these saints surrounded by a horde of less scrupulous follower used to enter the territory of Hindus Rajas as squatters on some pretet or other. এ.টি দেবের অভিধানে Squatter এর বাংলা প্রতিশব্দ লেখা হচ্ছে জবরদখল কারী।

---

১০১. প্রাগুক্ত পৃ- ১৫
১০২. Hasan Mahdi. Dr. The Rihla of Ibn Batuta, Baroda 1953, P. 253, 239
১০৩. বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, পৃ- ১৬৯
১০৪. সিলেট ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ- ১০৬
১০৫. প্রাগুক্ত ২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

এসব বক্তব্যের মূল সুর অভিন্ন। এর থেকে মুসলিম সম্প্রসারণ নীতির বাস্তবায়ন তথা আগ্রসানকেই সিলেট অভিযানের মুল কারণ বলার চেষ্টা করা হয়েছে। সমালোচক মনে রাখা উচিত যে, দেশ বিজয়ের জন্য হযরত শাহজালার (রহ.) এদেশে আসেন নাই। তিনি এসেছিলেন ইসলামের শ্বাশত বাণী প্রচার করতে। যে ভাবে নবী রাসুল সাহাবায়ে কিরাম তাবেয়নি ও তাবে তাবিয়ীনরা করে আসছিলেন। মূলতঃ তিনি এসেছিলেন পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিতে। তিনি এসেছিলেন দ্বীনে হক তথা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে মানুষকে অশ্রেয় দিতে। ইয়ামনের শাহজাদার রাজ্য ইয়ামান হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি (হযরত শাহজালাল (রহ.) ইয়ামনে অবস্থান করেন নাই।

এমনকি ইয়ামনের শাহজাদা নিজেও প্রতিষ্ঠিত পিতৃরাজ্যের মসনদ ত্যাগ করে পরবর্তী কালে দরবেশ শাহজালাল (রহ.)'র সঙ্গী হয়ে সিলেট আগমন করেছিলেন। হযরত শাহজালালের পাশেই তিনি চির নিদ্রায় শায়িত। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, এসকল দরবেশের পররাজ্য দখলের কোন মোহ ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে ফকীর দরবেশ তথা ওলী আউলিয়াগন ইহা হতে বহু উর্ধ্বে। সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায় হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়া তথাকথিত সম্প্রসারণ বাদী আগ্রাসী বাহিনীর সহায়তার জন্য সিলেট অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাই না কি? দু'টি দৃষ্টিকোন থেকে এর জবাব মিলবে। প্রথম কথা হল হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়া রাজ্য সম্প্রসারণে পার্টি হতে যাবেন কেন?এতে কি স্বার্থ থাকতে পারে তাদের? তাঁরা তো এসেছিলেন নির্যাতিতনিপীড়িত মানুষের ত্রানকর্তা হিসেবে। ইয়ামনের রাজ্য পরিত্যাগকরেই তারা এসেছিলেন। সুতরাং পররাজ্য দখলে তাঁদের আগ্রহ থাকবে কেন? আর কেবল মার খাওয়া, নির্যাতিত হওয়া, কিংবা খুন হওয়ার জন্যই কি মুসলমানের জন্ম। প্রতিবাদ প্রতিরোধ করার জন্য নয়। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ তাই-তো জিহদ। দীন-ই-হক প্রতিষ্ঠার যুদ্ধই জিহাদ। জিহাদর অভিধানিক অর্থ চেষ্টা সাধনা পরিভাষায় আল্লাহর দ্বীনের বুলন্দির জন্য ধন সম্পদ ও শক্তি ব্যয় করা।

মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী (এবং পরবর্তী) সময়ের মুশরিকদের হত্যা নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করার যৌক্তিকতা ও কি ইতিহাসবেত্তারা স্বীকার করতে নারাজ? তাঁরা কি ইসলামের ইতিহাসের জিহাদের প্রেক্ষাপটগুলো বিস্মৃত হয়ে গেলন? মানবাধিকার তথা মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার গ্যারান্টি কি মানুষ দিতে পারে না? স্বৈরাচারী জালিমদের কি রুখে দাঁড়ানো যাবে না? জংলী আচরন কি মেনে নিতে হবে?

রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির বাস্তবায়নই যদি সিলেট অভিযনের মূল প্রেরণা হয়ে থাকে তাহলে পাশ্ববর্তী জৈন্তা কেন মুসলমানেরা দখল করে নিলনা? আবার সেন রাজারা পাল বংশকে উৎখাত করেছিল কি জন্যে? বৌদ্ধদের ধরে ধরে হত্যা করেছির কারা? যে কারণে প্রাণভয়ে পালিয়ে দেশান্তরিত হয়েছিল বৌদ্ধরা। সিলেট বিজয়ের পর তো এক ফোঁটাও রক্ত ঝরার প্রমাণ নেই। বরং গৌড় গোবিন্দকে মক্কা বিজয়ের অনুকরণে ক্ষমা ও করে দেওয়া হয়েছিল। সকল বিবেচনায় সিলেট অভিযান কে জিহাদ গণ্য করেই শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়া এবং তাদের ভক্তরা সিলেটের জিহাদে শরীক হয়েছিলেন।[১০৬]

---

১০৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ- ১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ সিলেট বিজয়ের তারিখ

সিলেট শহরের আম্বরখানা মহল্লায় হোসেন শাহী শিলালিপি আবিস্কারের পূর্ব পর্যন্ত হযরত শাহজালাল এই সিলেট আগমনের সময় সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ ছিল। এখন যে মতবিরোধ দুর হয়ে গেছে তা বলা যায় না। শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী লেখকরা বিশেষ সময়ে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে নিজস্ব কল্পনা শক্তির সাহায্যে তাঁরা সিলেট আগমনের সময় নির্ধারণ করেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) ৭০৩ হিজরীতে (১৩০৩খ্রিঃ) শ্রীহট্ট বিজয় করেন। এই বিজয়ের তারিখ বঙ্গের সুলতান আলা উদ্দিন হোসেন শাহের আমলের (১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে) এক শিলালিপিতে পাওয়া যায়। শিলালিপিটি বর্তমানে ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

শিলালিপির লেখা নিম্নরূপ

In honour of the greatness of the respected Shaikul Mushaik Shakh Jalal. The hermit, Son of Muhammad.

The first conquest day Islam of the town Arsoh Srihat was by the hand of Sikundar Khan Ghazi in the time of sultan firuz Shah Delhavi in the yea 703. This building (has been created by) Rukan Khan the conqueror of Hazrat Gamharlyan. Who being wariter and general for many moths to the time of the conquest of Kamru Kamata Jurgnagar and urisha Served in the army in several place in the reign of the king (written) in the year 918. The execllent state of preservation of this inscription is due to the fact that (like the inscription of Shams Uddin Firuz Shah's son. Hatim Khan of 715). The back was subsequently used for another inscriptions (that of a certain masnad -1- Ali Khan in 996) the trustworthiness of the statement made the first portion of the insceription is shown by the following considerations;

1. Sultan Firuz Shah was actually on the throne of Bengal in 703 A.H.

2. As the grandson of Ghiyas Uddin Balban he is rightly called Dehlawin (of also the connexion of Firuz Shah with Delhi in the satgawn tradition. [১০৭]

---

১০৭. হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ- ১২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, সিলেট শহরের আম্বরখানা মহল্লায় ১৫১২ঈ. হোসেন শাহী শিলালিপি আবিস্কারের পূর্ব পর্যন্ত হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের সময় সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ ছিল। এখন যে মতভেদ দুর হয়ে গেছে তা বলা যায় না। শাহজালাল (র.) এর জীবনী লেখকরা বিশেষসময়ে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে নিজস্ব কল্পনা শক্তির সাহায্যে তাঁর সিলেট আগমনের সময় নির্ধারণ করেছে।

সুহাইল-ই-ইয়মানের তথ্যঃ

১. হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী রচয়িতা নাসির উদ্দীন হায়দারের মতে ৫৬১ হিজরীতে (১১৬৫-৬৬ঈ.) হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট আগমন করেন এবং সিলেটে ৩০ বছর অবস্থানের পর ৫৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত সেনাপতি সিকান্দর শাহ ছিলেন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর ভাগিনেয়।

তার এ তথ্যের জবাবে বলা যায় মুন্সীফ নাসির উদ্দিন হায়দার কত্বক সন তারিখ সঠিক হতে পারে না। ১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে (৫৬১ হিঃ) হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের তারিখ সত্য হলে বুরহান উদ্দিন কর্তৃক কোন বাংলার সুলতান বা দিল্লীর সুলতানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার প্রস্নই উঠেনা।

কারণ ১১৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হয়নি এবং মোহাম্মদ ঘোরিও দিল্লী জয় করেননি। সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী এবং মহারাজা পৃথিলাজের মধ্যে তরাইনের যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১১৯১ এবং ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে, বখতিয়ার খিলজী নদীয় জয় করেন ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে।[১০৮]

হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট বিজয়ের সাল ১১৬৫ খ্রিষ্টাব্দ (৫৬১ হিঃ) ধরে নিলে শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সিকন্দর গাজীর আগমন, শামসুদ্দীন ফিরুজশাহ অথবা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ অথবা আলা উদ্দিন হোসেন শাহ বা অপর কোন গৌড় নৃপতির কাছে পুত্র শোকাতুর বুরহান উদ্দিনের সাহায্য প্রার্থনা অসম্ভব।

মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার লিখেছেন যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) দিল্লীতে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া সম্বন্ধে প্রামান্য ইতিহাস রয়েছে তিনি ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩২৫ খ্রিঃ (৭২৫ হিঃ) ইনতিকাল করেন। মুন্সীফ নাসির উদ্দীন হায়দারের বর্ণনা সত্য বলে ধরে নালে আমাদেরকে বিশ্বাস

করতে হয় যে, হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার জন্মের ৭১ বছর (১২৩৬-১১৬৫) পূর্বে তাঁর সঙ্গে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাক্ষাত হয়।

---

১০৮. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.) পৃ- ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

নাসির উদ্দীন হায়দর শাহজালাল (রহ.) এর মাতুলের নাম উল্লেখ করেছেন সৈয়দ আহমদ কবির বলে- সৈয়দ আহমদ কবিরের পিতা হযরত সৈয়দ জালাল উদ্দিন সুরুখ বুখারী ৫৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা মহের জন্মের ৩৪ বছর (৫৯৫-৫৬১=৩৪ বছর) পূর্বে পৌত্র কর্তৃক সিলেট বিজিত হতে পারেনা।

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওটে যে, নাসির উদ্দিন হায়দার কতৃক 'সুহেল-ই-ইয়ামন'- বর্ণিত সন তারিখ সত্য হতে পারে না। নাসির উদ্দিন হায়দর কতৃক প্রদত্ত ভুল তারিখের কি ব্যাখ্যা হতে পারে? খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিমদের যোগযোগ স্থাপিত হয়। মুসলিম বিজেতাদের বাঙলায় আগমনের বহু পূর্বেই আরব বনিক এবং ধর্ম প্রচার করা বাংলাদেশে আগমন করেন। সওদাগরী তথা ব্যবসা বাণিজ্যের লক্ষ্যে আরব বনিকরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জে আগমন করেন।

উত্তর বঙ্গের পাহাড় পুরের বৌদ্ধপীটের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আব্বাসীয় সম্রাট খলিফা হারুনুর রশীদ নামাঙ্কিত (৭৮৮ খ্রিঃ) একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এটা খুব সম্ভব যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের চার শতাব্দীর মধ্যেই কিছু কিছু মুসলিম বাংলাদেশের সিলেট এমনকি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জে বসতি স্থাপন করে। শাহ বুরহান উদ্দীন হয়ত সিলেটে আদি মুসলিম বাসিন্দাদের কার ও বংশধর। এ হতে পারে যে, নাসির উদ্দীন হায়দার শাহ বুরহান উদ্দীনের পূর্ব পুরুষদের সিলেটে আগমনের তারিখেই শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের তারিখ বলে ভুল করেছেন।[১০৯]

(২) ১৩৫৪ - ৫৬ খ্রিষ্টাব্দ ঃ

অনেকের মতে হযরত শাহজালাল ১৩৫১ এবং ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সিলেট আগমন করেন। নাসির উদ্দীন চেরাগে দিল্লী নামে এক দরবেশের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। তার সম্বন্ধে- Beale সাহেব লিখেছেনঃ

He is also called by Feristha Nosir Uddin Mahmud awardi, Surnamed Cherag-1 Delhi or the candle of Delhi a celebrated Mohammedan saint who was a disciple of shah Nizamuddin Aulia whom he succeeded on the Masnad of Murshid of spiritual Guide and died on Friday the 10th Septembet 1365 A.D. the 8th - Ramdhan 757 A.H. He is buried at Delhi in mausoleum which was biult before his death by sultan Firoz Shah Barbak - one of his disciples and close to his tomb sultan Barbak was afterwards buried. He is the author of a work called Khairul Majalis.[১১০]

---

১০৯. আল-ইসলাহ, শাহ-জালাল সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৬৪ বাংলা, পৃ-৬৪
১১০. হযরত শাহজালাল কুনিয়াজী (রহ.) পৃ- ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

নাসির উদ্দীন চেরাগে দিল্লী সম্বন্দে ঐতিহাসিক বদাউনি লিখেছেন যে, ফিরোজ তুঘলককে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে নাসির উদ্দীন চেরাগের দিল্লীতে বন্দী করা হয এবং ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে ফাঁসিতে নিয়ে যাওয়া হয়। খুব সম্ভবসুলতান ফিরুজ তুঘলক সিংহাসনের আরোহনের পর নাসির উদ্দীন চেরাগে দিল্লী মুক্তি লাভ করেন এবং ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ১৩৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

সিলেট প্রচলিত প্রবাদে শোনাযায় যে, সেনাপতি নাসির উদ্দীনের মৃত দেহ শাহজালাল (রহ.) এর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে শূন্যে মিলিয়ে যায়। রজনী রঞ্জন দেব মনে করেন যে, সুলতান ফিরোজ তুগলকের নির্দেশে নাসির উদ্দীনের মৃত দেহ দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। তাঁর ধারণা সুলতান ফিরুজ তোঘলকের বাঙলা অভিযান কালে ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ নাসির উদ্দীন বাংলায় আগমন করেন। খুব সম্ভব ঐ সময়ে বাঙলা ভ্রমন কালে সৈয়দ নাসির উদ্দীন রাজা গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে সিকান্দর শাহকে সাহায্য করেন। উপরে বর্ণিত তথ্যে উপর ভিত্তি করে রজনী বঞ্জন দেব নাসির উদ্দীন চেরাগে দিল্লীকে সিকান্দর গাজী এবং শাহজালাল (রহ.) এর সহযোগী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং সিলেট বিজয়কালে ১৩৪৫-৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ধরে নিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে বুরহান উদ্দিন বঙ্গের সুলতান আলাউদ্দীন আলী (১৩৩৯-৪২ খ্রিঃ) শাহ নিকট রাজা গোবিন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করেন ১৩৪১-৪৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি দত্তক ভ্রাতা শামসুদ্দীন ইলিয়াসের পুত্র সিকান্দর শাহকে গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াছ শাহের আমলেই সিলেট বিজিত হয়।[১১১]

সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দীন এবং নাসির উদ্দীন চেরাগে দিল্লীকে এক ব্যক্তি ধরে নেয়া যায় না। যদি চেরাগে দিল্লী এবং সেনাপতি নাসির উদ্দীন এক ব্যক্তি হন তবে তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতম ঘটনা সিলেট বিজয়। বদাউনি, ফিরিশতা প্রমুখ ঐতিহাসিকরা চেরাগে দিল্লীর জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেণ্ তারা কিছুতেই নাসির উদ্দীন চেরাগে দিল্লীর জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিতে ভুল বরতেন না। যদি ফিরুজ শাহ তুঘলক বাস্তবিকই নাসির উদ্দীনের মৃতুদেহ দিল্লীতে স্থানান্তরের নির্দেশ দিতেন তা ঐতিহাসিক দৃষ্টি এড়াত না। অন্ততঃ দিল্লীতে প্রচলিত উপকথার মধ্যে সেটা স্থান পেতো। সুলতান ফিরুজ তুঘলকের সঙ্গে সিলেট বিজয়ের কোন সংযোগ থাকলে তা ঐতিহাসিক বারানী শামসের সিরাজ অফিফ অবশ্যই উল্লেখ করতেন। অতএব, বর্নিত তারিখ সিলেট বিজয়ের সঠিক তারিখ হতে পারে না।

---

১১১. আব্দুল আজিজ মাষ্টার মো. জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস (সিলেট, মো. এম.এ ফজলুর রহমান, লিপিকা প্রিন্টার্স -১৯৬৫, ২সং) পৃ- ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

(৩) ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দঃ

পুরাতত্ত্ববিদ মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন মনে কনের যে, ১৩৫৪ সালে শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক সিলেট বিজিত হয়। তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি সিলেট জেলার প্রচলিত প্রবাদ ও মুতাওয়াল্লী পরিবারের নিকট প্রাপ্ত একখানি প্রচারপত্র, রজনী রঞ্জন দেবকৃত পুস্তক সুবিখ্যাত চিকিৎসক চক্রপানি দত্তের সিলেট আগমনের কল্পিত তারিখ এবং তাঁর নিজস্ব সাধারণ বুদ্ধি।

চন্দ্রপক্ষ নেত্রবানে যে আঙ্ক হয়, সেই সনে খাই রাজা পাইল পরাজয়। এর ব্যাখ্যা করে পাওয়া যায় ১২৩৫ শতাব্দ (১৩১৩খ্রিঃ) আশরাফ হোসেন সাহিত্য রত্ন মনে করেন যে, ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় গোবিন্দ খাসিয়া রাজাকে পরাজিত করেন এবং তার দুই/এক বছর পূর্বে গৌড় গোবিন্দ সিংহাসনে আরোহন করেন। গৌড় রাজ্য ছোট বিধায় সেখানে শান্তি স্থাপন রাজা গোবিন্দের ৫ বছর লাগার কথা নয়। তার মতে গৌড় রাজ্যে শান্তি স্থাপনে তিন বছরের অধিক প্রয়োজন হয়নি। তার ধারণ হযরত শাহজালাল (রহ.) কতৃক সিলেট জেলায় আগমনের এক বছর পর গৌড় গোবিন্দ শেষ ভারের মত পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন। এ হিসেবে পুরাতত্ত্ব বিদ আশরাফ হোসেনের মতে শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক সিলেট জেলায় আগমনের এক বছর পর গৌড় গোবিন্দ শেষ বারের মত পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন্ এ হিসেবে পুরাতত্ত্ববিদ আশরাফ হোসেনের মতে শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের তারিখ দাড়ায় ১৩১২+৩+২৪+১৪+১=১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দ। [১১২]

পুরাতত্ত্ববিদ আশরাফ হোসেন মুতাওয়াল্লী পরিবারের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রচার পত্রের উল্লেখ করেছেন, তাতে লেখা ছিল ১৮, ১৯, ২০ শে জিলহজ্ব ১৩৬৩ হিজরী মেতাবেক ১৯, ২০, ২১ শে কার্তিক ১৩৫১ বাংলা (১৯৪৪খ্রি)হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী ৬২২ তম মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপিত হলে মৃত্যুর সাল দাঁড়ায় ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ (১৯৪৪-৬২২=১৩২২ খ্রিঃ) হায়দারের বর্ণনা ৩২ বছর বয়সে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট আগমন করেন তা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। আশরাফ হোসেন সাহবে মনে করেন যে, ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মৃত্যু সাল হতে পারে না। তা হবে তাঁর জন্ম সাল। তাহলে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের সাল দাঁড়ায় ১৩২২+৩২=১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং এ সাল প্রচলিত গানের ছড়ায় প্রবাদের সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ। তিনি সিলেট ৩০ বছর অবস্থানের পর জান্নাতবাসী হন। ১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বা w.w. Hunter এবং A.C. Allen সিলেট বিজয়ের সাল মনে করেছেন।

(৪) ১৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দ ঃ

সিলেটে প্রচলিত ছড়ায় দেখা যায় গৌড় গোবিন্দ ১৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত হয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করেন। পন্ডিত রাজ চন্দ্র চৌধুরী পানের ছড়া এবং গোতুল রাজ গান সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া এ গানগুলোর রচয়িতা পাগল ঠাকুর। ছড়ায় দেখা যায় ১২৩৫ শকাব্দ বা ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দ গোবিন্দ সিংহ বংশোদভুত খাসিয়া রাজাকে পুনিবিলে এক নৌযুদ্ধে পরাজিত করেন।

---

১১২. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.) পৃ- ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া রাজাকে পরাজিত করার পর ৫বছর কাল রাজা গোবিন্দ রাজ্যে শান্তি স্থাপনে ব্যয় করেন। অতঃপর রাজা গোবিন্দ দুই যুগ ধরে শান্তিতে রাজত্ব করেন। মুসলিম বাহিনী গৌড় রাজ্যে প্রথম অভিযান চালাবারপরও সুদীর্ঘ ১৪ বছর রাজা গোবিন্দ বীর বিক্রমে মুসলিম আক্রমন প্রতিহত করেন। রাজা গোবিন্দের অগ্নিবান নিক্ষেপে বার বার পর্যদুস্ত হয়ে সেনাপতি সিকন্দর দরবেশ শাহজালালের শরণাপন্ন হন। সিকান্দর গাজীর সাহায্যার্থে ফকির শাহজালাল (রহ.) সিলেট আগমন করেন। ফকির শাহজালালের আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে রাজা গোবিন্দের সকল ইন্দ্রজাল এবং যাদু বিদ্যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।[১১৩] তিনি পরাজিতহয়ে বনে পলাযন করেন। ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গৌড় গোবিন্দের সিংহাসেন আরোহন, ৫ বছর শান্তি স্থাপন ব্যয়, সুদীর্ঘ দু যুগেব্যাপী শান্তিতে রাজত্ব, ১৪ বছর ব্যাপী মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রা কাল ইত্যাদি যোগ করে ১৩১৩+৫+২৪+১৪=১৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

(৫) ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দঃ

সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে হযরত শাহ জালাল (রহ.) কর্তৃক গৌড়রাজ গোবিন্দ পরাজিত হওয়ার সাল ১৩৫৭খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর মতের ভিত্তি ভাটেরার হোমের টিলায় প্রাপ্ত প্রথম তাম্র ফলক। বাংলা ১২৭৯ সালে শেখ কটাই নামক এক ব্যক্তি আট হাত মাটির নীচে দু'খানা তাম্রফলক পানা বাংলা ১২৭৯ সালে ডক্টর মিত্র ভাটেরায় প্রাপ্ত প্রথম তাম্রফলকের কেশব দেব এবং সিলেটের গৌড় গোবিন্দকে এক ব্যক্তি মনে করেছেন। প্রথম তাম্রফলকে কেশব দেবের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

"নারায়ন দেব পুত্র কেশব দেব তৎপুত্র ঈশান দেব। কেশব দেব অশেষ গুনকীর্ত্তিযুক্ত। তার পাদপীট রাজগনের মুকুটমান দ্বারা শোভিত। তিনি রাজগণের মধ্যে ভূষণ স্বরূপ এবং কংস বিজেতা গোবিন্দের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বি বিনাশক।

তিনি মনুষ্যত্বের সীমা ভূমিস্বরূপ, যশের আজন্ম স্থানস্বরূপ, সৌন্দর্যের আশ্রয় স্বরূপ, সর্ব প্রকার সুশিক্ষার আধার স্বরূপ, ন্যায়ের আশ্রয় ও বদান্যতা, বাগ্মিতা, অদ্রতা প্রভৃতি সদগুনের আকর বা প্রতিমূর্তি স্বরূপ। তদীয় তরবারী দ্বারা চতুর্দিক বিজিত হয়েছে। প্রাচ্য রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রধান।

তার ভক্তিতে অনাদি লিঙ্গরূপী তিলোকনাথ ভগবান বটেশ্বর কৈলাস পরিত্যাগ করতঃ হট্টপাটকে বাস করিতেছেন। পাশ্ববর্তী নৃপতি গনের মুকুট চুম্বিত পাদপীঠ রাজ চুড়ামনি কেশব দেব তার প্রীতার্থে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হতে ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২৯৬ বাড়ি দান করেন। তিনি শিবানুরুক্ত এবং শ্রীহট্ট নাথ শিবকে বহুতর ক্রীতদাস এবং নানা জাতীয় ভৃত্য দিয়েছেন। এই ভূমি ২৩২৮ পান্ডব কুলাধি পালাব্দে প্রদত্ত হয়।[১১৪]

---

১১৩. গাজী সাহেবের নাম শেখ সিকন্দর/ ১৪ বছর যুদ্ধ করল কুড়লির ভিতর/ অগ্নিবান খাইয়া বেটা শেখ সিকন্দর গেল পালাইয়া/কুথাইতনে শাহজালালরে লইয়া আইল গিয়া। এইবার হইলল্যাটা গোড়ল রাজার/ হড়াহড়ি পাড়াপাড়ি সুরমা সঙ্গে পাড়। অগ্নিবানে ভটটানি সৈত্য জানা তাগে/ কোমার বান্দিয়া রাজা খাড়া হইল আগে/ আচম্বিতে ভনিল রাজা মনায়ার মইল / রাজ্যের আশাছাড়িয়া এখন জঙ্গেলেতে গেল।

১১৪. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পৃ- ১৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শিলালিপিতে কেশব দেবের বর্ননা নিম্নরূপঃ

সাহসের প্রতিমূর্তি কেশব দেব। তিনি গোবিন্দের কৃষ্ণ ন্যায় শত্রু মর্দক ছিলেন। তাহার পাদপীঠ রাজগনের মুকুট রত্নে ভূষিত হত। তদীয় গুনকীর্তি শ্রবনে যেসব বিদ্যান ব্রাহ্মনগন আগমন করিতেন, অভীষ্ট লাভে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহারা নিজিদের জন্মস্থান ভূলিয়া যাইতেন। তাঁহার শাসন কালে পার্শ্ববর্তী রাজগন কখন ধনরত্ন তাহাক উপহার দিতে পপারিবেন চিন্তায় বিনিদ্র থাকিতেন। অসংখ্যপদাতিক সময়তরী তুরঙ্গ সেনা রণ মাতঙ্গের অধিপতি সেই মহরাজের কুন্দ কুসুম শুভ্র যশে পৃথিবী গৌরবান্বিত হয়েছিল।

ডক্টর রাজেন্দ্র মিত্র কেশব দেব সম্বন্দে লিখেছেন- This Sovereign was over thrown by shah jalal alias Jalaluddin Khay who following the footsteps of his predecessor muck Tuzbek, led his army to the eastern part of Bengal, Invaded sylhet in 1257 A.D.

জালাল উদ্দীন খানী সম্বন্ধে ড. রাজেন্দ্র মিত্র আরো লিখেনঃ

Was Suddenly called back to defend Gour from invasios of Irsalan Khan and soon after killed in the Battle. [১১৫]

ভাটেরার তাম্রফলকের পাটোদ্ধারে সিলেটের তদানীন্ত ডেপুটি কমিশনার লটমন জনসন সাহেব শিলালিপি খানা সুবিখ্যাত মারাটা পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে দেখান। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন সিলেট আগমন করেছিলেন। তিনি তাম্রফলকের কাল নির্ণয় করেছেন ২৯২৮ যুধিষ্টিরাব্দ কিন্তু ড. রাজেন্দ্র মিত্র তাম্রফলকের কলি নির্ণয় করেছেন ৪৩২৮ যুধিষ্টিরাব্দ।

তিনি লেখেনঃ

"In the original the first figure is very unlike the third and hasbeen more over scratched over and is abundantly doubtful. Thesecound is also open to question. I am dispased to take the first for 4 and the second for 3 which would make the date equal 4328 - 1245 A.D. Or about the time when shah jalal invaded sylhet. That the gobinda of the tillah is the same with the record. I have no reason to doubt.

রাজেন্দ্র মিত্র কেশব দেব ও গৌড় গোবিন্দকে একইব্যক্তি মনে করেছেন এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) ও জালাল উদ্দীন খানীকে একই ব্যক্তি ধরে নিয়েছেন। এই বিশেষ কারণেই তিনি তাম্রফলকের সালটি ২৯২৮ যুধিস্টিরাব্দে স্থলে ৪৩২৮ যুধিষ্টিরাব্দ ধরেছেন। তাম্রফলকের কেশব দেবকে রাজা গোবিন্দ মনে করার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেশব দেবের অপর নাম গোবিন্দ বলে তাম্রফলকে উল্লেখ নেই। শুধু কেশব দেবকে শত্রু বিমদক ও শত্রু বিনাশক হিসেবে গোবিন্দের (কৃষ্ণ) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় তাম্রফলকে দেখা যায় কেশব দেবের পুত্র ঈষান দেব রাজ্য শাসন করেন।

---

১১৫. প্রাগুক্ত পৃ- ১৬

Dhaka University Institutional Repository

অচ্যুৎচরণ চৌধুরী লিখেছেন, "যদি কেশবদেবের নামান্তর কল্পনা স্থির রাখিয়া তাহাকে শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক পরাজিত বলা হয় তবে তৎপুত্র ঈশান দেব কিরূপে পিতৃপরিত্যাক্ত রাজ্য শাসনে সমর্থ হইলেন? পরন্ত শাহ্ জালাল (রহ.) যে গোবিন্দকে পরাজিত করেন তিনি পলায়ন পূর্বক পর্বত আশ্রয় করেন। সেই অবধি শ্রীহট্ট যবনাধীন হয়"।[১১৬]

জালাল উদ্দিন খানীকে সিলেট বিজয়ী শাহজালাল (রহ.) কল্পনা করেও ড. রাজেন্দ্র মিত্র ভুল করেছেন। অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যা বিনোদ লিখেছেন।

Jalauddin Khan fought and died in Gour while shah jalal's tomb still stands at sylhet to mark his place of devotion death and burial. The fact is shah Jalal was not Jalaladdin Khani not was Raja Govinda Keshva of Sylhet.

অচ্যুতচরণ চৌধুরী ড. রাজেন্দ্র মিত্রের ভ্রান্তি সম্বন্ধে লিখেছেন।

"কিন্তু যদি তিনি একটু খানি অনুসন্ধান করিতেন তাহা হইলে জানিতে পরিতেন যে, শ্রীহট্টের শাহজালাল (রহ.) সংসার বিরাগী সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যুদ্ধ ব্যবসায়ী জালাল উদ্দীন খানি হইতে ভিন্ন লোক। উভয় সে এক ব্যক্তি নন তাহার প্রমাণ উল্লেখিত প্রসিডিং এ আছে। তিনি লিখেছেন শ্রীহট্ট বিজেতা জালাল উদ্দীন ইরসালান খাঁর আক্রমণ হইতে গৌড় ভূমিকে রক্ষা করিতে গিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন।"

অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যা বিনোদ ও মনে করেন যে, তাম্রফলকের সালটি ড. রাজেন্দ্র মিত্র ভুল পড়ছেন। সিলেটের কোন কোন প্রবাদে দেখা যায় রাজা গোবিন্দ এক যুগ শান্তিতে রাজত্ব করেন। কেশবদের এবং রাজা গোবিন্দকে এক ব্যক্তি ধরে নিয়ে ড. রাজেন্দ্র মিত্র মনে করেছেন যে, তাম্রফলক উৎকীর্ণ হওয়ার ১২ বছর পর শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক রাজা গোবিন্দপরাজিত হন। সে হিসেবে সিলেট বিজয়ের সাল দাড়ায়-

১২৪৫+১২=১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। কেশবদেব ও গোবিন্দ এবং শাহজালাল (রহ.) ও জালাল উদ্দিন খানী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিধায় ডক্টর রাজেন্দ্র মিত্রের বিশ্লেষণ গ্রহণীয় নয়। ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে অবশ্য কামরূপে একটি ব্যর্থ মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়। সে অভিযানের ভাগ্য বিড়ম্বিত নায়ক ছিলেন সুলতান মুগিস উদ্দীন ইয়াজবুক (১২৫১-৫৭ খ্রিঃ) জালাল উদ্দীন খানী বা শাহজালাল (রহ.) নন। কামরূপ রাজ্যের বিরুদ্ধে সে মুসলিম অভিযানের পরিণতি হয়েছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদারক।[১১৭]

(৬) ১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী লেখকদের অনেকেরই ধারণা যে, শাহজালাল (রহ.) ১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট বিজয় সম্পন্ন করেন।

১৩৮৪খ্রিষ্টাব্দে এ তারিখ নির্ধারনে খানিকটা কারণ আছে। সিলেটে প্রচলিত কোন কোন লোক কথায় বলা হয় যে, সুলতান শামসুদ্দীনের আমলে সিকন্দর শাহ্ কর্তৃক সিলেট বিজিত হয়।

---

১১৬. প্রাগুক্ত পৃ- ৩৫

১১৭. Sarkar Jadunath, The History of Bangal (Muslim period) (D.U-1948 Vol, II), P. 52-54

Dhaka University Institutional Repository

মি. Blockman লিখেছেন- According to legend the district was wrested from Gourgobinda by King Shamsuddin 1384Ad/ 786 AD.H whilst king Shamsuddin can only refer to Shamsuddin Ilias shah Sikandar's father.

Blockman অনুসরণে w.w. Hunter প্রমুখ ১৩৪৮ খ্রিষ্টাব্দকে সিলেট বিজয়ের সাল মনে করেছেন। ১৯০৫খ্রিঃ B.C. Allen কৃত গেজেটিয়ার প্রকাশের পর অনেকেই ১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দেই ফকির শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক সিলেট বিজিত হয় বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াছ শাহের আমলে সেনাপতি সিকন্দর শাহ কর্তৃক সিলেট বিজয়ের সাল ধরে নেওয়ার অসুবিধা এই যে, সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াছ শাহ ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর দত্তক ভ্রাতা আলা উদ্দীন আলী শাহকে হত্যা করে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে মসনদে আরোহন করেন এবং ১৩৫৭ কি ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে / ৭৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

মিঃ Stewart লিখেছেন যে, ত্রৈপুরাজ প্রতাপ মানিককে পরাজয় কারী এবং জাজনগর অভিযানকারী সুলতান শামসুদ্দীনের সম সাময়িক ছিলেন গৌড় রাজ গোবিন্দ। তিনি আরো লিখিছেন যে, রাজা দ্বিতীয় মামসুদ্দীন ১৩৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। খুব সম্ভব দ্বিতীয় শামসুদ্দীন বলতে তিনি সুলতান সিকান্দর শাহকেই (১৩৫৮ - ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) বুঝিয়েছেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) সঙ্গে দিল্লীতে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সাক্ষাৎ একটি স্বীকৃত ঘটনা। ১৩৮৪ সালে যদি হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট বিজয় করে থাকেন তবে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত অসম্ভব। কারণ হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে (৭২৫হি.) জান্নাতবাসী হন।

মজলুম বুরহান উদ্দীন বিচারের প্রার্থনায় কোন সুলতানের কাছে যান সেটা ঠিক হলে সিলেট বিজয়ের সময় সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ আছে। সুহারল-ই-ইয়ামন এর লেখকের মতে বুরহান উদ্দীন দিল্লীর সুলতান আলা উদ্দিন ঘোরীর কাছে গিয়েছিলেন ।

কিন্তু মুহাম্মদ ঘোরীর ভ্রাতা আলা উদ্দীন ঘোরী দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেননি। ডক্টর আব্দুল কাদির এবং মীর্জা সুলতান আহমদ মনে করেন যে, বুরহান উদ্দীন প্রথমে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াছ শাহের কাছে যান এবং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দিল্লীর সুলতান আলা উদ্দিন ফিরোজ শাহের কাছে যান। আলা উদ্দিন ফিরোজ সেনাপতি নাছির উদ্দিন কে প্রেরণ করেন। সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুত মিশের নিকট গমনের সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন মুফতি আজহার উদ্দীন। [১১৮]

---

১১৮. হিষ্ট্রি অব শাহজালাল এন্ড হিজ খাদিমস, পৃ-৪১।

মজলুম বুরহান উদ্দিন বিচারের জন্য আলা উদ্দীন ফিরূজ শাহের কাছে গিয়েছিলেন বলে অধিকাংশ লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দিল্লীতে আলা উদ্দিন ফিরুজ শাহবলে কোন সুলতান রাজত্ব করেননি। আলা উদ্দীন খিলজী এবং ফিরুজ শাহ তোঘলক দুই ভিন্ন ব্যক্তি। ফিরুজ শাহ তোঘলক আলা উদ্দিন বলে পরিচিত ছিলেন না। বাঙলার সুলতানদের মধ্যে আলা উদ্দীনে আলী শাহ ১৩৩৯-৪২) শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ (১৩০১-২২) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮)।

(৭) ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দ ঃ

সিলেট শহরের আম্বরখানা মহল্লায় শিলালিপি (১২৭৯ বাংলা) আবিস্কারে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমন সময় সংক্রান্ত বিতর্কের উপর নূতন আলোপাত করেছে। এই শিলালিপি আবিস্কারের পর পূর্বতন বহু তর্ক বিতর্কেই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। শিলালিপি খানা র মূল অর্থ এবং ছবি এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। মি. E.H.E. stapleton সর্ব প্রথম আম্বারখানা শিলালিপির উপর ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে Dhaka Review তে একটি প্রবন্ধ লিখেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত আরবীর সমন্বয়ে এই শিলালিপি খানা বর্তমানে ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এর ইংরেজী ভাষ্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিলেট বিজয়ের ২৯৫ বছর পরে (৮১-৭০৩ হিঃ) সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯১৮ হিজরীতে শিললিপি খানা আঙ্কিত হয়। তবুও এটাই হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে সর্ব প্রাচীন দলিল। সে পর্যন্ত না এর আগেকার এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য কোন দলিল পাওয়া যায়। তাই এটাকেই এ পর্যন্ত গ্রহণীয় দলিল ধরতে পারি। অন্ততঃ একটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সিলেট বিজয়ের সময় সম্বন্ধে এই শিলালিপির বর্ণনা সবচেয়ে কম প্রমাদ পূর্ণ এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই শিলালিপি সম্বন্ধে Stapleton লিখেছেন।

Thought not a contemperaious record, it giues almost certainly (both from the date as well as jnternal evidence) a truer version of the first invasion of sylhet than local traditions hither to been supplied to us.[১১৯]

শিলালিপির প্রদত্ত তারিখ স্থানীয় প্রবাদের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতি পূর্ণ। স্থানীয় উপকথায় দিল্লীর সুলতান আলা উদ্দীন ঘোরী এবং আলা উদ্দীন ফিরুজ এবং বাংলার সুলতান শামসুদ্দীনের উল্লেখ দেখা যায়। ৭০৩ হিঃ (১৩০৩ খ্রিঃ) শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহর (১৩০১-১৩২২) ছিলেন। বাঙলার সুলতান আর আলা উদ্দিন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ) ছিলেন দিল্লীর সুলতান। সামন্তের ব্যবধানে হয়ত সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের নামের শেষাংশ সমকালীন খিলজী সম্রাট আলা উদ্দিনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

---

১১৯. জার্নাল অব দ্যা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা ১৯২২ পৃ ৪১৩।

আলা উদ্দিন ফিরুজ শাহে পরিণত হয়েছে। আর বাঙলার সুলতানের নাম থেকে ফিরুজ শাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে শামসুদ্দীনই থেকে যায়। আলা উদ্দীন ফিরুজ শাহ ও দিল্লীর সুলতান ফিরুজ শাহ তোঘলক কে এক ব্যক্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ- আলা উদ্দিন শব্দ ফিরোজ শাহ তোঘলকের নামের প্রথমাংশে ছিল না।

৭০৩ হিজরীতে সিলেট বিজয়ের সময়কাল হলে শাহজালালের সঙ্গে নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার সাক্ষাত সময়ের দিক থেকে তা স্বাভাবিক এবং সম্ভব হয়। কারণ হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫/ ৭২৫হিঃ) ৭০৩ হিজরীতে জীবিত ছিলেন।

শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ সোনারগাঁও এবং পূর্বাঞ্চল জয় করে ১৩০৫খ্রিষ্টাব্দে সোনার গাঁ থেকে এবং ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহের নিজাম পুর থেকে স্বীয় নামাকিত মুদ্রা প্রচলন করেন।১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দের হোসেন শাহী মুদ্রা সিলেট শহরের কালিঘাট মহল্লায় অবস্থিত হয়েছে।

হোসেন শাহী শিলালিপি আবিস্কারের পর আধুনিক লেখকদের অনেকেই মনে করেন যে, সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের আমলই ৭০৩ হিজরী। ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিকন্দর খান গাজী হযরত শাহজালাল (রহ.) সাহায্যে সিলেট জয় করেন।[১২০]

সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ দেহলভী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে (৭০৩ হিঃ) সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলেই তদীয় সেনাপতি সিকন্দর গাজী এবং নাসির উদ্দীন কর্তৃক হযরত শাহজালাল (রহ.) সাহায্য সিলেট বিজিত হয়।

---

১২০. আবে কাউসার পৃ- ৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সিলেটে ইসলাম ও হযরত শাহজালাল (রহ.)

প্রথম পরিচ্ছেদঃ
তাসাওফ বা তরিকত ও হযরত শাহজালাল (রহ.)

তাছাওওফ শব্দটি কোথা হতে আসল? তাছাওওফ শব্দটি সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মোহাক্কিকীনদের মতে শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে (ছাফউন) বা'ব তাফাউল হতে।

আরবী ভষায় অনেক বিশেষত্ব আছে। তন্মধ্যে একটি বিশেষত্ব এই যে, খুব বেশীর উৎপাদন করাতে হলে অন্যান্য ভাষায় একটি বিশেষণ শব্দ বাড়াতে হয়। যেমন মহাপন্ডিত, মহাজ্ঞানী ইত্যাদি। কিন্তু আরবী ভাষায় অন্য শব্দ বাড়ানো ব্যতিরেকে একই শব্দের ভিতর অক্ষর বাড়িয়ে খুব বেশী অর্থ উৎপাদন করা যায়। যেমন 'সাফা ইয়াসফু' মানে পরিস্কার হওয়া।

আর তাছাওয়াফা 'ইয়াতাসাওয়াফু' অর্থ খুব বেশি পরিস্কার হওয়া। 'আলিম' অর্থ পন্ডিত বিদ্যান জ্ঞানী আর 'আল্লামা' মহা পন্ডিত, মহাজ্ঞানী, খুব বড় বিদ্যান হওয়া ইত্যাদি।[১]

তাসাওফ পরিচিতিঃ

তাছাউফ শব্দটি 'সাফা' শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, আলো অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আরবীতে বলা হয় 'সাফাল মায়' অর্থাৎ- পানি স্বচ্ছতা লাভ করেছে। এমনিভাবে মেঘমালা মুক্ত পরিচ্ছিন্ন আকাশ ও দিন কে বলা হয় 'সাফাল জাও ওয়াল ইয়াউম' পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মসৃন পাথর কে বলা হয়। 'সাফওয়ান'[২]

পরিভাবায় ইলমে তাসাউফের বিশেষজ্ঞদের কতিপয় ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হল।

১। শায়খ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ.) মৃ. ৯১১হি. প্রণীত 'ইলমুত তাসাউফ' নামক কিতাবে তাসাওফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- هو تجريد القلب لله تعالي واحتقارا ماسواه

অর্থাৎ- তাসাওফ হচ্ছে অন্তর আত্মাকে শুধুমাত্র আল্লাহ তালার জন্য খালি রাখা এবং তিনি ব্যতিরেকে সকল কিছুকে মুল্যহীন মনে করা।

২। মুহাক্কিক বুজুর্গানে দ্বীনের মতে, তাছাওফ হচ্ছে- تعمير الظاهر والباطن

অর্থাৎ- বাতিন (অপ্রকাশ্য) ও জাহির (প্রকাশ্য) উভয়কে দুরুস্ত করা।

---

১. শামসুল হক ফরিদপুরী মাওলানা, তাছাওওফ তত্ত্ব (ঢাকা খাদিমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স ১৯৯৮, ৫সং) পৃ. ১১

২. আল মায়াজামুল ওয়াসিত, (দেওবন্দ, কুতুবখানা হোসাইনিয়া, ইউ.পি দারুল উলুম, দিল্লী, মার্চ- ১৯৭২, ২সং) পৃ- ৫১৭

Dhaka University Institutional Repository

৩। হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী বিন ইমাম হোসাইন বিন আল মুরতাদা (রা.) বলেন-

التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف

অর্থাৎ- পূত পবিত্র চরিত্রের নাম হচ্ছে তাসাউফ, যার যত বেশী চরিত্র মার্জিত ও অনুপম হবে, সে তত বেশী সুফি হিসেবে গণ্য হবে।

তাসাওফ দীন ও শরীয়তেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারাই তাসাওফের নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করার কাজ পূর্ণতা লাভকরার পর হাদিছ সংকলন ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। একই সঙ্গে পূর্ণ সুন্নাত অনুযারী জীবন গঠনের সাধনা শুরু করার তাকিদ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত হয়। সর্ব প্রথম যিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পূর্ন অনুসারী হিসেবে আমর বিল মারুফ তথা সৎ কাজে আদেশ এবং নাহি আনিল মুনাকার তথা অসৎ কাজের নিষেধ দানকারী হিসেবে সচেতন মানসিকতা নিয়ে অন্তর আত্মাকে পূতঃ পবিত্র রাখতে গিয়ে গাফলত থেকে নিজেকে রক্ষা করে সুফী উপাধি পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন- তিনি আবু হাসিম সুফী (মৃ. ১৫০ হি, কাসফুজজুনুন) এই উপাধীধারী তিনিই হচ্ছেন সর্বপ্রথম মুসলমান।

সুফীর ব্যাপারে আমাদের একজন বুজর্গ এর বাণী হচ্ছে এই যে, 'সুফী' হচ্ছেন তিনি যিনি স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ঢিল-ঢাল পশমী পোশাক পরিধান করে থাকেন, স্বীয় কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে সর্বোপরী রাসুলে মোস্তফা (সা.) এর পূর্ন অনুসারী হবেন। যার ফলে দুনিয়া তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে।[৩] উপরোক্ত গুণাবলী হালজামানায় প্রকৃত সুফীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তাদেরকে সুফী বলা হয়।

তাসাউফ শব্দের মমার্থ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা, শয়তানের আত্মা, মানবাত্মা এবং দেবাত্মা (ফেরেশতার আত্মা) এই পাঁচ প্রকার আত্মার সমন্বয়ে, মানবাত্মার মধ্যে পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা এবং শয়তানের আত্মা হতে যেসব ময়লা অনবরত আসতে থাকে মানুষের বিবেককে কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুর যেসব ময়লা অনবরত আচ্ছন্ন করতে থাকে, ময়লা হতে মানবাত্মাকে এবং মানুষের বিবেককে অনবরত খুব তীক্ষ দৃষ্টি রেখে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

যদিও তাসাউফ শব্দটি কোরআন পাকে নেই কিন্তু সত্যিকার অর্থে ইলমে তাছাউফ এর মূল উৎস কুরআন পাক। যেমন ইলমে ফেকাহর সব শাখা প্রশাখাদি কুরআনে নেই কিন্তু মূল উৎস কুরআন পাক। কুরআন পাকে 'ইহসান' 'তাজকিয়্যাহ' 'খুলুক' শব্দ আছে।[৪]

ইসলাম একটি ব্যবহারিক ধর্ম। ইসলামে সংসার ত্যাগের বিধান নেই। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সংসার ধর্ম ও পালন করেছেন। তিনি সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন, কিন্তু সংসারে বিরাগ ছিলেন না। বরং তিনি বলেছেন- ইসলামে কোন বৈরাগ্যতা নেই। খলিফারা ও তার অনুসরণে সংসারী ছিলেন।

৩. মমতাজ উদ্দীন মাওলানা ফাজিলে দেওবন্দ, আইনুল ইলিম, (ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি) পৃ- ৪
৪. তাছাওওফ তত্ত্ব, পৃ- ১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু কালক্রমে ইসলামের মত ব্যবহারিক ধর্মেও এমন একটি মতবাদ গড়ে ওঠে যার প্রধান নীতি সংসার ত্যাগ না হলেও এই মতাবলম্বীদের অনেকেই সংসার বিরাগী ছিলেন। এই মতবাদকে বলা হয় তাসাওফ এবং মতাবলম্বীদের বলা হয় সুফী।

তাসাউফ বা সুফী শব্দটি আরবী। 'সুফ' শব্দ থেকে উদ্ভুত। 'সুফ' শব্দের অর্থ উল বা পশম অর্থাৎ- যারা পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন। প্রাথমিক যুগের ধর্ম তাত্ত্বিকরা পশমী বস্ত্র পরিধান করে সাধনা করতেন বলে তাদেরকে সুফী বলা হত। পন্ডিতরা সুফী শব্দের মূল বের করতে গিয়ে আরও কয়েকটি শব্দের অবতারনা করেছেন যেমন কেউ কেউ বলেছেন যে, 'আহলুস্‌সুফফা' অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে যারা মসজিদে নববীর মেঝেতে বসে সাধনা করতেন, প্রয়োজনে তারা জিহাদে যেতেন। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ এসব সাহাবায়ে কেরামদেরই 'আহলুস সুফফা' বলা হত। তাদের থেকেইসুফী শব্দের উৎপত্তি। সে যাই হোক আধুনিক পন্ডিতদের গ্রহণযোগ্য মত এই যে, সুফ শব্দই সুফী বা তাসাওফের মূল।[৫]

কেউ কেউ 'সফ' তথা সারি 'সাফফুল আউয়াল' অর্থাৎ প্রথম সারিতে তারা অবস্থান করতেন বলেও তাদেরকে সুফী বলা হয়।

'কাশফুল মাহজুব' নামক কিতাবে তাসাওফের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে 'প্রত্যেক অবস্থায় জাহির ও বাতিন এর স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয় ও সুপ্রিয়। তার বিপরীত হচ্ছে অসচ্ছতা, অপরিচ্ছন্নতা। এ থেকে মুক্ত করাই হচ্ছে তাসাওফের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। যেমন নবী করিম (সা.) বলেছেন- 'দুনিয়ার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা চলে যাবে।'

অন্তরের পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার মৌলিক নীতিমালার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে (১) অন্তর আত্মাকে অপরাপর সব কিছু থেকে পবিত্র করা (২) প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে পরিপূর্ণ দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখা। এ দু'টি মৌলিক গুণ সাইয়্যিদিনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর চারিত্রিক ভূষণ ছিল এবং তিনি অনন্য আশিকে রাসুল ও সিদ্দিকে আকবর (সবচেয়ে বড় সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বিধায় তিনি ত্বরিকত পন্থী পথ প্রদর্শকদের ইমাম।[৬]

তাসাওফ কোন নূতন জিনিষ নয়

প্রশংসনীয় চরিত্র অর্জন এবং নিন্দনীয় চরিত্র বর্জন একটা কোন নূতন পদ্ধতি নয় বরং নবী করিম (সা.) এর যুগ হতে চলে আসা উহা একটি প্রমাণিক বিষয়। কেননা তা পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তালার বাণী, যার অর্থ হচ্ছে- 'আমি তোমাদের নিকট এমন একজন রাসুল প্রেরণ করেছি যিনি তোমাদের মধ্য হতে আবির্ভুত। তাঁর অতীব পালনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, তিনি আমার আয়াত সমূহ তোমাদেরকে শুনাবে এবং নিন্দনীয় আচরণ থেকে তোমাদেরকে পবিত্র করবে এবং কিতাব ও হিকমাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিবে।'[৭]

---

৫. আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য, (ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, ১সং) পৃ-১৮২

৬. আলী হাজাবিরি পীর কামিল, মাখদুম সৈয়দ, হযরত দাতাগঞ্জ বখশ নামে পরিচিত, 'কাশফুল মাহজুব' মুফতি গোলাম মঈনুদ্দীন কর্তৃক অনুদিত ভারত রাহুতী কিতাব ঘর, ১৯৮৮) পৃ- ৬৩

৭. আল কুরআন- ২: ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী-

আমাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ চরিত্র ও পছন্দনীয় আচরণের পূর্ণতা দান। নবী করিম (সা.) এর পবিত্র যুগের পর এ পূতঃ পবিত্র দায়িত্বের অধিকারী হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। যাদের মোকাবেলায় দ্বিতীয় কোন অভিধায় মহাত্মতা ও গুরুত্ব বিবেচনায় নেই। এরা এমন মহান ব্যক্তিত্ব যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেছেন- যার অর্থ নিম্নরূপ-

'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং যারা তাদের সঙ্গী সাথী তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর তাদের নিজেদের মধ্যে কোমল। আপনি তাদের দেখবেন রুকু সিজদা কারী রূপে আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়। তাদের চেহারায় রয়েছে নামাজের চিহ্ন। তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে এরূপ তাদের গুণাবলী রয়েছে।'[৮]

সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র যুগের পরিসমাপ্তির পর তৎসংলগ্নবর্তী যুগের সালফে সালেহিন যারা তাঁদের নিকট হতে ফয়েজ হাছিল করেছেন তারা হচ্ছেন তাবেয়ীন। যাদের মহাত্মতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, যার অর্থ হচ্ছে- 'যারা মুহাজির ও আনছার দের অনুসরণ করেছেন নেক কাজে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা ও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।'[৯]

পবিত্র কোরআনে অন্যত্র আল্লাহ তালা বলেন, যার অর্থ হচ্ছে- 'তিনি প্রেরণ করেছেন এ রাসুল (সা.) কে (শিক্ষক ও আত্মীক পরিশুদ্ধ কারী রূপে) অপরাপর আসন্নদের জন্য যারা পরবর্তীতে ঈমান আনয়ন করবে।'

<u>তাসাওফের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্নাতে নববীর অনুসরণঃ</u>

সায়্যিদুত ত্বায়েফা জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) বলেছেন- 'আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি প্রাপ্তির প্রতিটি রাস্তা বন্দ কেবল মাত্র তার জন্য মুক্ত যিনি রাসুল পাক (সা.) এর অনুসরণ অনুকরণ করে থাকেন। হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.) এক বার তাঁর কতিপয় সঙ্গী সাথীদের নিয়ে চললেন যে, আস আমরা দেখতে যাব অমুক জায়গায় যিনি নিজেকে ওলী হিসেব প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। যে ব্যক্তির অলৌকিক কর্মকান্ডের সুখ্যাতি ও বিস্তৃতি সার্বজনীন। এক পর্যায়ে তারা যখন সেখানে পৌছলেন তখন দেখতে পেলেন তিনি কিবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ করেছেন। তা দেখেই বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.) সোজা ফিরে আসলেন এবং তাঁকে সালাম ও করেননি এবং বললেন এই ব্যক্তি নবী করিম (সা.) এর আদাবে নববী তথা সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্যপাত করেনি। সুতরাং উহা কিভাবে মেনে নেয়া যাবে যিনি নিজ কারামত বর্ণনা করে যাচ্ছেন এ ব্যাপারে তিনি সত্য হবেন।

আবার বললেন যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে বাতাসে উড়তে দেখ তখন তাঁর প্রতারণার ফাঁদে পা দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অবহিত না হবে আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে সে শরীয়াতের নির্ধারিত সীমারেখায় রক্ষণাবেক্ষণ ও উহার পূর্ণ অনুসারী আছে কি না।

---

৮. আল কুরআন- ২৬: ২৯

৯. আল কুরআন- ১১: ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী (রহ.) একদিকে যেমন উঁচুস্তরের ওলী অপরদিকে একজন খাটি আলিমে দ্বীন ছিলেন। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তার বাস্তব জীবনই উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর সঙ্গী সাথীরা ছিলেন একজন বড় বড় মাপের আলিম, হাফিজ, খতিব ও আউলিয়া সহ সাথ সাথে শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ ছিলেন। তাছাউফ চর্চার জন্য খানকাহ, ইসলামী শিক্ষার জন্য মাদরাসা এবং খিদমতে খলক এর জন্য লংগরখানা সহ বহুবিধ সেবা প্রদানের বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গী সাথী আউলিয়াগণ সুদূর অতীত কালের মসজিদ মাদরাসা ও খানাকার গৃহ অবশিষ্ট না থাকলেও যুগে যুগে যুগে উহার নির্মাণ কাজ যুগ-যুগান্তরের সাক্ষ্য হিসেবে আজও বিদ্যমান। তাঁর মাজার শরীফকে কেন্দ্র করে এখন ও হাজার হাজার বনি আদমের আহার, সাধনা ও তীর্থস্থান হিসেবে পরিণত হয়েছে।

তাসাওফ ও সুফী দর্শন

মহান আল্লাহ তালা মানব জীবনের কর্মকান্ডকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান পেশ করেছেন তাঁর নাম ইসলাম। আল্লাহর কাছে ইসলামই একামত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা জীবন বিধান। সঠিক পর্যায়ে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারিক জীবন বিধান। কেননা এতে পার্থিব বা অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই।

জীবনের এসব দিক সাধারণতঃ দু ভাগে ভাগ করা যায় বাহ্যিক (বস্তুগত) এবং আভ্যন্তরিন (আধ্যাত্মিক)। ইসলাম ইহলৌকিকরে চেয়ে পরলৌকিক জীবনকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহ জীবনকে পরিত্যাগ করেছ বা সন্নাস্ব্রত পালনে প্রেরণা দিয়েছে বরং তা নিষেধই করেছ। এ বৈরাগ্যবাদ মানবরচিত অন্যান্য ধর্মে মনগড়া রচনা করা হয়েছে।

আমাদের ধর্মে এ ধরণের কোন ব্যবস্থার স্বীকৃতি নেই। স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছেন-

মহানবী (সা.) ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সংসার জীবন ও পালন করেছন তিনি বা তাঁর সাহাবী (রা.) কেহই সংসার বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু কালক্রমে ইসলামের মত কর্মের ধর্মেও আধ্যাত্মিকতা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। ফল এমন একটি চিন্তাধারা গড়ে উঠে যার প্রদান নীতি সংসার ত্যাগ না হলেও এ চিন্তাধারার অনুসারীদের অনেকেই সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ন। এ চিন্তা ধারাকে বলা হয় তাসাউফ আর এ মতানুসারীদেরকে বলা হয় সুফী।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে জাহির (বাহ্যিক) ও বাতিন (আভ্যন্তরীন) এ দুটি ভাগের কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন আমি তোমাদেরকে একটি বিধিবদ্ধ জীবন ব্যবস্থা ও একটি বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।[১০]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে দু প্রকার জ্ঞানলাভ করেছি। এক প্রকার সাধারণ জ্ঞান, যা আমি সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করেছি আরেক প্রকার বিশেষ জ্ঞান যা সবার কাছে প্রকাশ করিনি। যদি তা প্রকাশ করতাম তবে আমার গর্দান যেত।[১১]

---

১০. আল কুরআন ৫: ৪৮

১১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল- জামে আস-সহীহ, (দিল্লী, কুতুবখানা রশিদিয়া ১৩০৫ হিজরী, ১খ) পৃ- ২৩

Dhaka University Institutional Repository

শরীয়ত শব্দটি আরবী 'শরয়ুন' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ পথ বিধান, জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি। কুরআন, হাদিছ ইজমা ও কিয়াস এই চারটি মৌলনীতির উপর নির্ভর করে যে জীবন ব্যবস্থা তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বাহ্যিক রূপে যে বিধান তাই হচ্ছে শরীয়ত। ইহ জীবনের প্রয়োজন, গুরুত্ব, অভাব অভিযোগ এবং ঈমান, আক্বিদা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদির বাহ্যিক ক্রিয়া পদ্ধতি শরীআতের অন্তর্গত। এগুলো হচ্ছে ইসলামের জাহিরী বা বাহ্যিক দিকের পরিচায়ক আর ইসলামের বাতিনী বা আধ্যাত্মিক দিকের পরিচায়ক হচ্ছে তাসাওফ বা সুফী দর্শন। যেমন একটি বৃক্ষের শিকড় গুড়ি, পাতা, ডালপালা প্রভৃতি ঐ বৃক্ষের বাহ্যিক দিকের পরিচয় বহন করে এবং সেজন্য তা ঐ বৃক্ষের শরীআত। আবার ঐ বৃক্ষের ফুল, ফল ও জীবনী শক্তি ঐ বৃক্ষের তাসাওফ বা আভ্যন্তরীন দর্শন। [১২]

উল্লেখ্য বৃক্ষের শাখা প্রশাখা শিকড় গুড়ি পত্রাদি না থাকলে যেমন ফুল ফল ও বৃক্ষের জীবন অসম্ভব তেমনি শরীআত ব্যতিত তাসাওফের স্থান ও কল্পনা করা যায় না।

শরীআত হচ্ছে তাসাওফের ভিত্তি ভূমি। শরীআত দেহ আর তাসাউফ হচ্ছে আত্মা বা প্রাণ। যার সমর্থনের কুরআন ও হাদীসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। সুফী তত্ত্ব মূলত কুরআন হাদীসের মগজ তথা ইসলামের রুহ বা আত্মা।

পরিশেষে বলা যায় শাস্ত্রীয় বাহ্যিক বিধান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিজ্ঞান অধিকতর মূল্যবান। এ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ধারক বাহক হলেন শরীয়তপন্থি প্রকৃত নায়িবে নবী তথা সূফী সাধক গন।

এই জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীস জাহিরী ও বাতিনী জ্ঞান সম্পন্ন এমন এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও দর্শন যাতে জাহির (বস্তুবাদ) ও বাতিন (আধ্যাত্মবাদ) এর এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। যাহিরী ও বাতিনী এ উভয় দিক ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ।

তাসাউফের অভিজ্ঞতা অপ্রকাশ্য ও আকর্ষনীয়। শরীয়াতের জ্ঞানের উৎস পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ফিক্‌হ। পক্ষান্তরে তাসাওফের মূলভিত্তি পবিত্র কুরআন হাদিস হলেও এর জ্ঞান সুফীর অভিজ্ঞত প্রসূত। এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে সরাসরি গমন করে। এ জ্ঞান যৌথিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষনের উপর প্রতিষ্ঠত সমপ্রত্যয়গত (Conceptual) জ্ঞান নয় বরং অনুভূতি ও অনুধাবনের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বজ্ঞা (Intuting) প্রসূক্ত জ্ঞান। এটি এমন এক ধরণের জ্ঞান যা ব্যক্তি মানব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অপরোক্ষভাবে অর্জন করে থাকে। [১৩]

---

১২. আব্দুর রশীদ ফকীর, সুফী দর্শন, (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮০ইং) পৃ- ৫

১৩. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফিদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭) পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬ ঈ.) পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাইয়াত পরিচিতি

বাইয়াত এর আভিধানকি অর্থ হচ্ছে শপথ ও অঙ্গীকার ক্রয়-বিক্রয় করা, অন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করা, আনুগত্যের শপথ করা ইত্যাদি।

সাহাবাগন তরবিয়ত হাসিল করার জন্য, চরিত্র গঠন করার জন্য দ্বীন জারীর কাজে দুনিয়ার মায়া, জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে অটল সত্য থাকার জন্য নবীর হাতে হাত দিয়ে যে শপথ ও অঙ্গীকার করতেন তাকেই বাইয়াত বলে। এখনও হক্কানী মুহাক্কিক আলিম, সাচ্ছা নায়েবে রাসুল বুযুর্গ পেলে তার হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করা (হওয়া) সুন্নাত কিন্তু শুধু বাইয়াত হলে চলবে না তদ্রুপ জীবন ও গঠন করত হবে।[১৪]

এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা সমুহের অন্যতম একটি পরিভাষা।

البيعة في اللغة معناها العهد والميثاق والبيع والشراء وقبول سيادة الغير والميثاق للاطاعة–
قال معجم الوسيط التولية وعقدها–
وهي من اهم المصطلاحات الاسلام فمعناه في الاصطلاح الشرعي العهد والوعد علي يد من
ولي عليه تنفيذ والامور بحياة المسلمين كلها دينيا او دنيويا– [১৫]

ইলমে তাসাউফের আমল এবং শুগুল সমূহে সফলকাম হওয়ার জন্য শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী শায়খের হাতে এ সমস্ত শুগুল ও আমল সমূহকে নিজের জন্য অত্যাবশ্যক করে নেয়া এবং গুরত্বসহকারে সম্পন্ন করে নেয়ার অঙ্গীকার করাকে পরিভাষায় বাইয়াত বলা হয়।[১৬]

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল বাইয়াত বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। 'আইনুল ইলম' কিতাবে বায়াতের প্রকারভেদ নিম্নরূপঃ

(١) بيعة علي الجهاد (٢) بيعة علي الهجرة (٣) بيعة علي التزام اركان الاسلام (٤) بيعة علي الثبات والقرار (٥) بيعة علي التمسك بالسنة النبوية (٦) بيعة علي الاجتناب عن البدعة (٧) بيعة علي حرص الطاعة (٨) بيعة علي الخلافة النبوية (٩) بيعة علي الاسلام–

এখানে বাইয়াত দ্বারা 'বায়আত আলাততামাসসুক বিহাবলি ত্বাকওয়া উদ্দেশ্য।[১৭]

'আল ফুরকান বাইনাল হাক্কে ওয়াল বাতিল' প্রনেতা আল্লামা মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রহ.) 'আল বাইয়াত' অধ্যায়ে উল্লেখ করেন 'বাইয়াত' কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে।

(١) بيعة علي الاسلام (٢) بيعة علي الخلافة وهي البيعة علي السمع والطاعة (٣) بيعة علي الجهاد (٤) بيعة علي العدم الفرار (٥) بيعة علي الموت (٦) بيعة علي ترك المعاصي والثبات علي طريقة المصطفي ﷺ

---

১৪. তাসাউফ তত্ত্ব, পৃ- ৩৭
১৫. আল মায়জামুল ওসিত পৃ- ৮৯
১৬. আইনুল ইলম, পৃ- ৫
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ- ৬

Dhaka University Institutional Repository

এই শেষোক্ত বাইয়াত অর্থাৎ 'বাইয়াত আলা তারকিল মাআছি ওয়াস সাবাত আলা ত্বরিকাতিল মুস্তফা (সা.) এই বাইয়াতকে "বাইয়াতে তাওবা" ও বলা হয়। এই বাইয়াতের আলোচনা তাসাওফের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই বাইয়াত পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[১৮]

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন-

فالحق ان البيعة علي اقسام منها بيعة الخلافة ومنها بيعة الاسلام ومنها بيعة التمسك وبحبل التقواي ومنها بيعة الهجرة والجهاد ومنها بيعة التوثق في الجهاد- ১৯

বাইয়াত প্রথা সুন্নাত

হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) প্রণীত "আল কাউলুল জামিল" গ্রন্থে বলেছেন- 'ইন্নাল বাইআতা সুন্নাতুন' অর্থাৎ- নিশ্চয় বাইয়াত প্রথা সুন্নত। [২০]

উল্লেখ্য সুফীয়ায়ে কেরাম প্রচলিত বাইয়াতকে পবিত্র কুরআন হাদিসের দলিল দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত করেছেন। শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) বলেন এই প্রথা হুজুর (সা.) এর পবিত্রযুগে বিভিন্ন কাজে প্রাযোজ্য হলেও বর্তমানে উহা শুধুমাত্র একটি কাজই বুঝায়। তথাপি উহা যে সুন্নাত বিরোধী নহে বরং সম্পূর্ণ আনুকল্যে তা বনিত হবে। আল্লাহ তালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

"নিশ্চয় যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করে তারা আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত উহাদের হাতের উপর সুতরাং যে উহা ভঙ্গ করে উহা ভঙ্গ করার পরিনাম তারই। এবং যে আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহাপুরুস্কার দেবেন।" (সুরা ফাতহ- আয়াত ১০)।

মশহুর হাদিসে বর্ণিত আছে- হযরত (সা.) কখন ও লোকদিগকে হিজরত করার জন্য কখন ও জিহাদ, কখন ও আরকানে ইসলাম অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্জ যাকাত ও সঠিকভাবে সমাধা করার জন্য বায়আত গ্রহণ করেছেন। যেমন বায়আতে রিদ্বওয়ান। আবার কখনও সুন্নতে নববীতে সুদৃঢ় থাকার জন্য বিদআত হতে বিরত থাকার জন্য, ইবাদত-বন্দেগীতে উৎসাহিত করার জন্য বায়আত গ্রহণ করতেন। উদাহরন স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একদা হুজুর (সা.) আনসার মহিলা দিগকে কোন লোক মারা গেলে চুল ছিড়ে, বুক চাপড়িয়ে বিলাপ না করার জন্য বায়আত গ্রহন করলেন। ইহা সহীহ হাদিস।

---

১৮. মুশাহিদ আলী মাওলানা বাইয়মপুরী সিলেটী, আল ফুরকান বাইনাল হাক্বে ওয়াল বাতিল, (সিলেট, আহমদীয়া লাইব্রেরী, কানাইঘাট বাজার, ১৩৭৬ হি. ১সং) পৃ- ১৩০ ।

১৯. আব্দুল লতিফ মাওলানা ক্বারী ছাহেব ফিবলাহ, আনওয়ারুল সালিকিন, (সিলেট, মাওলানা মোঃ হুমায়ুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী, ফুলতলী ছাহেব বাড়ী, ১৯৮৪, ১সং) পৃ- ৩১

২০. আইনুল ইলম, পৃ- ৬

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে মাজা হতে বর্ণিত- হুজুর (সা.) একবার কতিপয় দরিদ্র মুহাজির সাহাবা হতে বায়আত গ্রহণ করলেন যে, তারা কখনও কারো নিকট কিছু চাইবেন না। আবার হুজুর (সা.) সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে কোন এক সাহাবী সম্বন্ধে উল্লেখ করে বললেন- ঘোড়ার পিটে আরোহী অবস্থায় তাঁর হাত হতে চাবুক পড়ে গেলে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে হতে নেমে চাবুক উঠিয়ে নিলেন। অথচ কাহাকেও উঠিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন না। সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, হুজুর (সা.) হতে যে সমস্ত কাজ ইবাদত রূপে এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে উহা কস্মিন কালে ও সুন্নাত হয়ে নিম্নস্তর হিসেবে পরিগনিত হতে পারে না। বর্ণিত বাইয়াত প্রথার প্রমাণ সমূহ সবই দৃঢ় এবং ইবাদত স্বরূপ ছিল। তাই বর্তমানে বাইয়াত প্রথা যে সুন্নাত এতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না।

আল্লাহ পাক হুজুরে আকরাম (সা.) কে সারা বিশ্বের জন্য প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মহান ওস্তাদ। বিশ্ববাসীকে পবিত্রতা শিক্ষা দানকারী। তিনি এই পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে যা কিছু করেছেন ও বলেছেন উহা যে পরবর্তীকালীন যাহেরী ও বাতেনী বিদ্যায় পারদর্শী আলেমদের জন্য সুন্নাত, এতে কারও কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না।

এখন দেখা যাক বর্ণিত বায়আত কোন প্রকারের ছিল। কারও মতে উহা শুধু সিংহাসন আরোহন কালীন মামুলী বায়আত বা শপথ বানী উচ্চারণ মাত্র। সুফীদের চিরাচরিত বাইয়াত প্রথা কিছুই নহে। কিন্তু ইহ ভ্রান্ত মতবাদ।

কেননা হুজার (সা.) এর সময় সাহাবাদের কেরামদের নিকট হতে আরকানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে বাইয়াত বা শাপথ গ্রহণ করতেন। আবার কখনও সুন্নত প্রতিপালনে সৃদুঢ় থাকার জন্য শপথ গ্রহণ করেছেন।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে একদা হুজুর (সা.) হযরত জাবির হতে বাইয়াত গ্রহণ কালে শর্তারোপ করলেন 'প্রত্যেক মুসলমানকেই উপদেশ দান করবে'। অন্যত্র বর্ণিত আছে তিনি আনসারদের একটি সম্প্রদায় হতে এই শর্তে বায়আত গ্রহণ করলেন যে, তারা আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ প্রচারে কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারকে ভয় করবেন না এবং সর্বাবস্থায় হক কথা বলবেন।
অতঃপর তাদের মধ্যে অনেকেই রাজা বাদশাহরে দরবারে অকোতভয়ে স্বীয় মতবাদ প্রকাশ করেছেন। আনসার মহিলাদের নিকট হতে ও এই শর্তে বায়আত গ্রহণ করেছেন যে, স্বজনের মৃত্যুতে বুক চাপড়িয়ে বা মাথার চুল ছিড়ে বিলাপ করতে পারবে না। এ রূপ বহু কাজই তার বাইয়াত প্রথার প্রমাণ দেয়। উপরোক্ত কার্যাবলী সৎকাজে আদেশ এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার এবং আত্মশুদ্ধির জন্যই ছিল। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, বাইয়াত কেবল খেলাফত কালীন শপথ বা অঙ্গীকারের নাম নহে।
আবার কেহ কেহ বায়আত প্রথা সম্পর্কে তর্ক উত্থাপন করে যে, যদিও হযরত (সা.) হতে কয়েক প্রকারের বাইয়াত প্রমাণিত হয়েছে বটে কিন্তু সাহাবায়ে কেরামদের যুগে তো ইহা দেখা যায় নাই। কাজেই বর্তমানে প্রচলিত বাইয়াত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই।
শাহ সাহেব (রহ.) বলেন ইহাও এক প্রকার সন্দিহান মনের অমুলক ধারণা মাত্র। কারণ হুজুর (সা.) হতে যখন কোন কাজ প্রমাণিত হয়ে যায় তখন পরবর্তীকালে অন্য কেহ করুক না করুক

Dhaka University Institutional Repository

তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা জগত গুরু ছিলেন সকল যুগের সকল মানুষের জন্য আদর্শ, অন্য কেহ তার আদর্শ নহে। কাজেই এরূপ তর্ক অর্থহীন। মোট কথা বাইয়াত বিভিন্ন প্রকার হতে পারে (১) খেলাফত কালীন বাইয়াত (২) ইসলাম গ্রহন কালীন বাইয়াত (৩) পরহেজগারীর রশীকে দৃঢ়তার সাথে ধারণের জন্য বাইয়াত (৪) হিজরত ও জিহাদের মানসে বাইয়াত এবং (৫) জিহাদে অটুট থাকার জন্য বাইয়াত।

খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগে ইসলাম গ্রহণের মানসে বায়আত গ্রহণ প্রথা ছিল না। কারণ সেই সময় প্রায় লোকই ইসলামের শান-শওকত ও শক্তি দাপট দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। স্বেচ্ছায় বা ইসলামের নির্মল পবিত্রতা দেখে খুব কম লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। খোলাফায়ে রাশিদিনের পর আব্বাসীয় এবং মারওয়ানী শাসন যুগে বাইয়াত প্রথা এই কারণে বর্জিত ছিল যে, অধিকাংশ শাসকই ছিল অত্যাচারী রুঢ় এবং সুন্নাতে নববী পালনে উদাসীন তদ্রূপ পরহেজগারীর রশিকে মযবুতভাবে ধারণ করার বায়ত প্রথা খলিফাদের পবিত্র যুগে বর্জিত থাকার কারণ এই ছিল যে, নবীয়ে আকরাম (সা.) এর পবিত্র সঙ্গ লাভে তাদের চত্রি এত মহান এবং উজ্জল হয়ে উঠেছিল যে, তখন বাইয়াতের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। খোলাফায়ে রাশিদিনের পরবর্তী যুগে বায়আত গ্রহণ এই কারণে বর্জিত প্রথা ছিল যে বাইয়াত কারী ওলামাদের পরস্পরের মদ্যে শত্রুতা কারী ওলামাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির আশংকা বিদ্যমান ছিল। তাই তখনকার বুযুর্গগন বাইয়াত করার পরিবর্তে খেরকা প্রদান করতেন এবং ইহাকেই শ্রেয় মনে করিতেন। রাজা বাদশাহ দের বায়আত প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর মহান বুজুর্গগন সুযোগ বুঝে মৃত সুন্নাত বাইয়াত প্রথাকে পুনজীবিত করা অন্যতম কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই কারণেই মরহুম মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) বলেছেন বুযুর্গ সুফী সম্প্রদায় রাসুলুল্লাহ (সা.) বাইয়াত প্রথাকে পুণ: প্রচলন করে প্রকৃত পক্ষে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসে মারফুর বর্ণিত ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) লুপ্ত সুন্নাতকে পূণজীবিত করে তাকে (অজস্র) পুরস্কার দেওয়া হবে। আর যাহারা সেই সুন্নাত মোতাবেক কাজ করবে তাদেওর ও প্রচুর পুরস্কার দেয়া হবে।

শাহ সাহেব (রহ.) বলেন পাঠক বৃন্দ প্রশ্ন করতে পারেন যে, শরীয়তের বিধানমতে বাইয়াত করা ওয়াজিব না সুন্নাত?

উত্তরে বলব- বায়আত করা ওয়াজিব নহে বরং সুন্নাত কেননা সাহাবায়ে কেরামগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের মানসে হুজুর (সা.) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে শরীয়তের কোন দলিল বলেনাই বাইয়ত বর্জনকারী গুনাহগার এবং কোন ইমামই তাদেরকে অমুসলমান বলেন নাই কাজেই ইমাম সাহেবানদের না বলাই দলীলে ইজমায় পরিগণিত হয় যে, বাইয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব নহে বরং সুন্নাত। যদি পরহেজগারীর এই বাইয়াত প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হত তবে ইমাম সাহেবগণ বাইয়াত বর্জন কারীদিগকে পাপী বলে উল্লেখ করতেন। অথচ এমন কথা কোন ইমামই উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রমাণিত হল বাইয়াত করা সুন্নাত। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের যাবতীয় কাজে ওয়াজিব হওয়ার দলিল পাওয়া না গেলে উহা সুন্নাত ব্যতিত আর কি হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন হতে পারে বাইয়াত প্রথা শরীয়তে জায়িজ হওয়ার কারণ কি?

উত্তরে শাহ সাহেব (রহ.) বলেন- কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন ক্রিয়া মোতাবেক স*কল কাজও কথা মানুষের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লুকায়িত অবস্থায় থাকে। বাহ্যিক কথাবার্তা কাজকর্ম সেই লুকায়িত বিষয়ে প্রকাশমাত্র। যেমন আল্লাহ রাসুল ফেরেশতা কেয়ামত ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন করা অন্তরেরই একটি গোপন বিশ্বাস। কেবল মৌখিক উচ্চারণ করা ঐ সমস্ত আন্তরিক বিষয় গুলিকে প্রকাশ করে। যেমন ক্রেতা বিক্রেতার উভয়ের সম্মতিতে মালের নির্ধারিত মূল্য ও ক্রেতাকে মাল হস্তান্তর করে দেয়ার বিষয়টি নিহিত থাকে। তেমনি মৌখিক বিষয়টি নিহিত থাকে। তেমনি মৌখিক প্রস্তাব ও সমর্থন উভয়ের আন্তরিক রাজির বিষয়টি প্রকাশ করে।

তদ্রুপ পাপ কার্য সমূহ হতে বিরত থাকার মানসে তওবাহ করা এবং সৎকার্যাবলী করার আকাঙ্খা অন্তরে লুকায়িত থাকে। পীর ও মুমিনদের নিকট অন্তরের এই আশা প্রকাশ করা। তাই কামিল পীরের নিকট বাইয়াত গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক দোষ সংশোধন করে যে সৎ গুণাবলী অর্জন করে মহা পন্ডিত ও জ্ঞানী হয়ে ও কামিল পীরের নিকট মুরিদ ও তাঁর সাহচার্য ব্যতিত শুধু ইলমে তাসাউফের কিতাব পাঠ করে কখনও কামিল এবং মারিফতের সুপক্ক এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হতে পারে না। আউলিয়ায়ে কেরামদের ইতিহাসই উহার জীবন্ত প্রমাণ।[২১]

সোহেল-ই-ইয়ামনে ত্বরিকতের দিক দিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) কে 'সোহরাওয়ার্দীয়া' তরীকার অনুসারী ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'গুলজার-ই-আববার' এ তাঁকে সুফীদের খাজা বা 'নকশবন্দিয়া' ত্বরিকার অনুসারী ছিলেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। যেহেতু তাঁর মামা ও মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দী বলে খ্যাতি রয়েছে। বিধায় তিনি সোহরাওয়ার্দী ত্বরিকার বুজুর্গ ছিলেন বলে অনেকের ধারণা।

পরিশেষে সুফিয়ায়ে কেরাম এর সুপ্রসিদ্ধ চারটি ছিলছিলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। (ত্বরিকতের প্রসিদ্ধ চারটি ছিলছিলা)।

১. ছিলছিলায়ে ক্বাদিরিয়াঃ এই ছিলছিলা হযরত শাহ আব্দুল কাদির জিলানী (মৃ. ৫৬১ হি) এর দিকে সম্পর্কিত যা ষোলটি মাধ্যমে নবী করিম (সা.) পর্যন্ত পৌছেছে।
২. ছিলছিলায়ে সোহরাওয়ার্দীয়াঃ এই ছিলছিলা হযরত শায়খ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) (মৃ. ৬৩২হি) এর দিকে সম্পর্কিত। যা এগারটি মাধ্যমে হুজুরে পাক (সা.) পর্যন্ত পৌছেছে।
৩. ছিলছিলায়ে চিশতিয়াঃ এই ছিলছিলা হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতি (রহ.) (মৃ. ৬৩২ হি.) এর দিকে সম্পর্কিত। পনেরটি মাধ্যমে হুজুর পাক (সা.) পর্যন্ত পৌছেছে।
৪. ছিলছিলায়ে নকশবন্দিয়াঃ এই ছিলছিলাখাজা বাহা উদ্দীন নকশবন্দী (রহ.) (মৃ. ৭৯১হি.) এর দিকে সম্পর্কিত, পনেরটি মাধ্যমে হুজুর পাক (সা.) পর্যন্ত পৌছেছে।

اللهم افض علينا من بركاتهم ونور قلوبنا بانوارهم امين يارب العالمين [২২]

---

২১. ওয়ালি উল্লাহ হযরত শাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী, আল কাওলুল জামিল অনুদিত হাফিজ মাওলানা আব্দুল জলিল, (ঢাকা হক লাইব্রেরী, বায়তুল মুকাররাম, ২০০০, ৪সং) পৃ- ১০,১১
২২. আইনুল ইলম, পৃ- ৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কারামত-ই-আউলিয়া ও হযরত শাহজালাল (রহ.)

কারামত শব্দটি কারুমা শব্দের ক্রিয়ামূল বলে ধারণা করা হয়। যাহার অর্থ উদার হওয়া দায়লু হওয়া সম্মানিত হওয়া (ইহা আল্লাহ তায়ালার ৯৯ টি সুন্দর নামের একটি) শব্দটি আল কুরআনুল করিমে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং আল্লাহ তালা সেখানে আল কারীম অর্থাৎ উদার বা দয়ালু হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত রূপ কারামত অবশ্য সেখানে পাওয়া যায় না। কারামত শব্দের বহুবচন (কারামাত)।

কারামাত শব্দের অর্থ আল্লাহর দেয়া দান, সম্পূর্ণ মুক্ত ও অবারিত অনুগ্রহ (ইহসান, ইনআম এই অর্থ বহন করে) তবে অধিকতর যথাযথ ব্যাখ্যাটি হল কারামত শব্দটি গঠিত হয়েছে আল্লাহর বন্ধুদের অলৌকিক ঘটনাবীলিকে নির্দেশ করার জন্য। যা আল্লাহ তালা অনুগ্রহ করে তাদেরকে ইহা সম্পাদন করার ক্ষমতা দান করেছেন। এই সমস্ত ঘটনাবলী বস্তু জগতে সংগটিত অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনার সমন্বয়ে সংগঠিত। নতুবা ইহা ভবিষ্যতের কোন পূর্ব সংকেত স্বরূপ বা আধ্যাত্মিক বিবরের কোন ব্যাখ্যা স্বরূপ হতে পারে।

কারামত শব্দের ভাবার্থ মুজেযা তবে প্রতিটি বস্তুর স্বাভাবিক নিয়ম কানুনের (সুন্নাহুল্লাহ) স্বাভাবিক ধারাকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু মুজিযা হইল পার্থিক ঘটনা সম্বলিত যাহা কোন দাবী বা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নবীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা নবীগণ তাহাদের শ্রোতার অক্ষমতাকে অখন্ডনীয় ভাবে সুনিশ্চিত করে থাকেন।

কারামত হইল সাধারণ ব্যক্তিগত অনুগ্রহ ইহাকে গোপন রাখা উচিত এবং কোন ক্রমেই নবীর মিশনের নিদর্শন নয়। কোন ধার্মিক ব্যক্তির বিস্ময়কর ঘটনাবলীকে মুজিযা বলা বিভ্রান্তিকর হবে। গতানুগতিক স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী নবীকর্তৃক সম্পাদিত বিস্ময়কর ঘটনাবলীকেই মুজিজা বলা হয় এব ওলী দরবেশ কর্তৃক সাধিত বিস্ময়কর ব্যাপারকে কারামত বলা হয়।

কারামত-ই-শাহজালাল (রহ.)

কারামত পীর দরবেশ আউলিয়ার জীবন কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভক্ত অনুগত পীর দরবেশেদের জীবনে অলৌকিক ঘটনা মনে প্রাণে কামনা করে। শ্রদ্ধা উৎপাদন করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হতে হবে। উপমহাদেশের আউলিয়ার জীবনে প্রায় দেখা যায় মনোমুগ্ধকর অলৌকিক ঘটনার অপূর্ব সমাবেশ। জনশ্রুতির মাধ্যমে চলে আসা এসব কাহিনী বাদ দিলে মনীষিদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়ে যায়। আবার কেউ কেউ হয়ত অতি উৎসাহী হয়ে মুল বিবরের পাশাপাশি অনেক কিছু সংযোজন করেছেন তা থেকে যথার্থ ইতিহাস বের করা বেশ কষ্টকর ব্যাপার।

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্পন্ন আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনে কারামত বা সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত এমন কিছু প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়, যা সাধারণ মানুষের জীবনে ঘটে না। আকাইদ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত বা অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সত্য জেনে বিশ্বাস করতে হয়। দুঃখ বেদনাগ্রস্ত মানুষ যখন শান্তি ও সুখের আকাঙ্খায় সুফী দরবেশ আউলিয়াদের মাজারে উপস্থিত হয়, খাদিমদের বর্ণিত অলৌকিক কাহিনী তাদের মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। তারা মনে প্রাণে ঐসব অলৌকিক ক্রিয়া কলাপে পূর্ন আস্তা স্থাপন করে থাকে।

মাজার বা কবর জিয়ারত শরীয়ত সম্মত একটা বিষয় যা সুন্নাত। এ ব্যাপারে কটুক্তি না করে পদ্ধতিগত দিক সংশোধন করা আবশ্যক। মাজার ও কবর জিয়ারত করে যুগ যুগ ধরে মানুষ অন্তরের খোরাক পায় যা তাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় অন্তরে আল্লাহ ভীতির সঞ্চার করে। আল্লাহর ইচ্ছায় তার মকবুল বান্দাদের ওসিলায় অনেক জটিল সমস্যার সমাধান ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন ইমাম শাফী (রহ.) কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হলে ইমাম আ'যম আবু হানিফা নু'মান বিন সাবিত (রহ.) এর কবর জিয়ারতে যেতেন এবং তিনি বলতেন বিদ্যুতের গতির ন্যায় তাঁর প্রার্থীত বিষয় পূর্ণই হতো।

এ ধরণের অনেক বাস্তব ঘটনা আউলিয়ায়ে কেরারেম মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। মুলতঃ এসব আল্লাহরই কুদরতের বহিঃ প্রকাশ জিয়ারতের বরকতে তিনিই তাঁর ওলীর মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করে থাকেন যা আধ্যাত্মিকতার বিষয়। অনুভূতি সম্পন্ন দুরদর্শি ক্ষমতা সম্পন্ন ওলী আউলিয়া সম্পর্কে নবী করিম (সা.) বলেন-

অর্থাৎ "তোমরা প্রকৃত মুমিনের দুরদর্শি ক্ষমতাকে ভয় কর কেননা তারা আল্লাহ প্রদত্ত নূর দ্বারা দেখে থাকেন।"

আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনের অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে মালিক আহমদ নিজামী লিখেছেনঃ

As years roll on the real and human figure of the saints gets obscured by the legend and fiction which grous round him. Their legendary stories may reveal the working of the mind of people among whom they are current but they do not help the least understanding the saint himself or interpre ting his teaching properly. [২৩]

বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। আউলিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে কাল্পনিক উপাখ্যান। তাঁদের জীবনের বাস্তব এবং মানবীয় দিকটি ক্রমশই ম্লান হতে থাকে। এই সমস্ত কাল্পনিক উপাখ্যান সমকালীন জন সমাজের মানস ধারাই প্রতিফলিত করে। এসব কাহিনী আউলিয়ার জীবনাদর্শ আগত হতে অথবা শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে বিন্দুমাত্র সহায়ক হয় না।

হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে নানাবিধ উপাখ্যান জনমনে প্রচলিত আছে। এগুলোর অধিকাংশই ইতিপূর্বে লিখিত বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

---

২৩. নিজামী মালিক আহমদ, লিলাইফ এন্ড টাইম অব ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশাকর (আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫ই.) পৃ- ৫

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিচ্ছেদে এসব উপাখ্যান গুলো হতে কিছু উল্লেখ করব। এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সম্পূর্ন অবিশ্বাস্য বলবনা তবে এর মধ্যে কৃত্রিমতা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। নিম্নে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সু-প্রসিদ্ধ কয়েকটি কারামত প্রদত্ত হল।

(১) আগাম মৃত্যু সংবাদ ও নছিহত প্রদানঃ বিশ্ব পরিব্রাজক ইবন বতুতা কামরু পাহাড় অঞ্চলে শাহজালাল (রহ.) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গমন করেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, তিনি কামারু থেকে দু'দিনের পথ দুরে থাকাকালে শাহজালাল (রহ.) এর চারজন শাগরিদ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। শাগরিদরা ইবনে বতুতাকে বলেন যে, শয়খ তাদেরকে বলেছেন- "পশ্চিম দেশ থেকে এক পরিব্রাজক তোমাদের দেশে আসছে। যাও তাঁকে সাদর অভ্যর্ত্তনা জানিয়ে নিয়ে এসো।"

ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, তাঁর কামরু অঞ্চলে গমন সম্বন্ধে অবগত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই শায়খের ছিল না কিন্তু তিনি তা অলৌকিক শক্তি বলে জানতে পেরেছেন।

ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব দিনে শাহজালাল (রহ.) স্বীয় শাগরিদের কাছে আহবান করে নানাবিধ নছিহত করেন পরিশেষে বলেন- "আমি আগামী কল্য তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটই সোপর্দ করে যাচ্ছি, যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমানরাখবে। আল্লাহকে ভয় করবে"।

পরদিন জোহরের নামাজের শেষ সিজদার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর হুজরার কাছেই দেখা যায় সদ্য খনন করা একটি কবর, সুগন্ধি কাপড় এবং দাফনের অন্যান্য সরঞ্জাম।

(২) জায়নামাযে উপবেশন করে নদী অতিক্রমনঃ হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট অভিযান কালে মুসলিম বাহিনী সহ হরিন চর্ম নির্মিত জায়নামাযে উপবেশন করে পথিমধ্যে সকল নদ নদী অতিক্রম করে পরিশেষে তাঁর ৩৬০ জন আউলিয়া সহসুরমা নদী অতিক্রম করে শ্রীহট্টে উপনীত হয়েছেন। কোন কোন গবেষক বাঁশ ও কলা গাছ কাটিয়া ভেলা বানিয়ে তাঁর উপর জায়নামায বিছিয়ে নদী অতিক্রম করেছিলেন বলে অভিমত পেশ করেন।

ইহা কখনও কারামতের পর্যায়ই পড়েনা। ভেলা দ্বারা নদী পারাপার এটা তো স্বাভাবিক। অলৌকিক কোন কর্ম তথা কারামত নয়। কারামত বা অলৌকিকতার সংজ্ঞাই পড়েনা। যুগ যুগ ধরে চলে আসা শাহজালাল (রহ.) এর অন্যতম কারামত অস্বীকারের নামান্তর। অথচ আকইদ শাস্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে কারামতুল আউলিয়ায়ে হক্কুন ওলী আউলিয়া কর্তৃক সংগঠিত অলৌকিক কর্মকান্ড তথা কারামত সত্য।

(৩) ধনুতে গুন যোজনঃ মুসলিম বাহিনী সিলেটের সুরমা নদীর তীর এসে উপস্থিত হলে গোবিন্দ বেশ বুঝতে পরলেন আর রক্ষা নেই। তবু ও তিনি নিজ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তার অস্ত্রাগারে অতি প্রাচীন একটা লৌহ ধনুক ছিল। এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, যে ব্যক্তি সেই ধনুকের গুন যোজনা করতে পারবে কেবলমাত্র সেই গৌড়রাজ্য জয়ে সমর্থ হবে। গৌড় গোবিন্দের বিশ্বাস ছিল যে, কেহ এতে গুন যোজনা করতে পারবেনা। তাই

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হযরতের কাছে উহা পাঠিয়ে জানলেন যে, তাঁর মধ্যে কেহ যদি গুণ আরোপ করতে পারেন, তবে তিনি বিনাযুদ্ধেই রাজ্য ছেড়ে যাবেন। শাহজালাল (রহ.) নিকট তাহা নীত হলে তিনি সঙ্গীদিগকে ডেকে বললেন, যে ব্যক্তি কোন দিন আসরের বা ফজরের নামাজ কাযা করেন নাই, তিনিই এই কার্য সাধনে সক্ষম হবে। সকলের মধ্যে কেবল মাত্র দরবেশ সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার এই কার্যের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়াতে হযরত তাকেই ধনুতে গুন যোজনা করতে বললেন।

আল্লাহর হুকুমে দরবেশ সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার সহজেই কৃতকার্য হলেন। এই কথা জানতে পেরে গোবিন্দ পলায়নের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।[২৪]

(৪) গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদ ধ্বংসঃ

কথিত আছে যে, একদিন হযরত শাহজালাল (রহ.) তার সঙ্গীসাথী দরবেশ দের সহিত মসজিদ প্রাঙ্গনে উপবিষ্ট ছিলেন। গড়দুয়ারে অবস্থিত গৌড় গোবিন্দের দুর্গ তার দৃষ্টি পথে নিপতিত হল হযরত শাহজালাল (রহ.) দুর্গের গঠিত উচু শিখরের প্রতি তাকিয়ে বললেন অত্যাচারী রাজার প্রাসাদটি যদি রাজার ন্যায় দুরীভূত হয়ে যেত, তার অত্যাচারের স্মৃতি খুব সম্ভব বিলীন হয়ে যেত। এই বিশাল দুর্গ প্রাসাদ অত্যাচারী রাজার শৌর্যবীর্যের প্রতীক। ফকীরের এই কথার সাথে সাথেই প্রাসাদটি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।[২৫]

জনবসতি আছে এই গড়দুয়ারে প্রকাশিত মজুমদারী নামক স্থানে পূর্বে মাটির নীচে উক্ত দুর্গের প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক পাওয়া যাইত। সৈয়দ বখত মজুমদার কর্তৃক ১২৭৬ হিজরীতে একটি পুকুর খনন করবার সময় নয় দশহাত মাটির নীচে একটি পাকা দেওয়াল বের হয়।

(৫) আযানের ধ্বনিতে দুর্গ পতনঃ

শাহজালাল (রহ.) ইচ্ছা প্রকাশ করেন আযানের ধ্বনির সাথে সাথেই যেন দুর্গ ধ্বংশ হয়। তিনি যে কোন এক শাগরিদকে আযান দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁরা গোবিন্দের যাদু বিদ্যার ভয়ে ইতস্ততঃ করতে থাকেন। শাহজালাল (রহ.) তখন বলেন যে, যিনি ফজরের নামায কখনও কাযা করেননি এমন ব্যক্তি আযান দিক। নাসির উদ্দীন শাহচট (নুরুল্লাহ) ব্যতিত এমন কাউকে ও পাওয়া গেল না। তার প্রথম ও প্রকাশ্য আযানের সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকের রাজ প্রাসাদ ধসে পড়ে।

২৪.হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ- ২০৭-২০৮
২৫. শ্রীহট্ট নূর, পৃ- ৫১

কোন কোন জীবনীকার বলেন, আযান শেষ হওয়ার সংগে সংগে শাহচট তীব্র বেদনায় আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন এবং বলেন যে, একদিনকার নামাজ তাঁর কিঞ্চিত বিলম্ব হয়েছিল। তিনি বিস্মিত ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ইনতিকাল করেন।[২৬] তাঁর ইন্তেকাল সম্পর্কিত এ ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

নাসির উদ্দিন শাহচটের আকস্মিক মৃত্যুর পর গোবিন্দ ছদ্মবেশে শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কিন্তু তা ফকীর শাহজালাল (রহ.) অজানা ছিল না। তিনি রাজা গৌড় গোবিন্দ কে বলেন যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে এ রাজ্য তোমারই থাকবে। কিন্তু গোবিন্দ তা অস্বীকার করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে শাহজালাল বলেন, দুর হও। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ শুন্যে মিলিয়ে যায় আর তাঁকে দেখা যায়নি।

(৬) সাপুড়িয়ার ঝুড়িতে রাজা গৌড় গোবিন্দঃ ছদ্মবেশে রাজা গোবিন্দের শাহজালাল (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, ফকীর শাহজালাল (রহ.) নিকট বিনা যুদ্ধ পরাজিত রাজা গৌবিন্দ রাজ্য ত্যাগের পূর্বে একবার অলৌকি শক্তি সম্পন্ন ফকীরকে চোখে দেখার ঘোষণা করেনা। তিনি সাপুড়ের ঝুড়িতে লুকিয়ে শাহজালাল (রহ.) এর আস্তানায় উপস্থিত হন। সাপুড়ে ফকীরকে বিভিন্ন প্রকার সাপ প্রদর্শন করে। কিন্তু একটি ঝুড়ির সাপ একবার ও বের করেননি। ফকির শাহজালাল দৈব শক্তির প্রভাবে ঝুড়ির মধ্যে রাজা গোবিন্দর অীস্তত্ব অবগত হন এবং রাজা গোবিন্দকে ঝুড়ি থেকে বের হয়ে আসতে নির্দেশ দেন। তাঁর ইন্দ্রজাল ব্যর্থ হতে দেখে নিরুপায় রাজা ফকীরের পদতলে পতিত হন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ফকির তাঁকে ক্ষমাপ্রদান করে রাজ্য ত্যাগকরতে নির্দেশ দেন।[২৭]

(৭) মনারায়ের দুর্গ পতনঃ রাজা গোবিন্দের প্রধান সেনাপতি মানারায় শহরের সর্বোচ্চ শিখরে বৃহৎ সপ্ততল হরমে বাস করতেন। এক একবার আযানের ধ্বনির সাথে সাথে এই প্রাসাদের এক একটি তলা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মনারায়ের টিলা উচ্চতায় সিলেট টাউনে সর্বোচ্চ। বর্তমানে জেলা জজের বাংলা এই টিলায় অবস্থিত।

(৮) সুরমা নদীর পানি সুপেয় ও স্বাস্থ্যকরঃ হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর অনুগতই শাগরিদ শাহ জিয়া উদ্দিনকে বৃন্দাচল এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। সেই অঞ্চলের সুরমা নদীর পানি ছিল অস্বচ্ছ ও পানের অনুপযুক্ত। পানি পান করে লোক অসুস্থ হয়ে পড়ত। সে অঞ্চলের লোকজন হযরত শাহজালাল (রহ.) কাছে এস তাদর খাবার পানির সমস্যা সমধানের আবেদন জানায়। শাহ জিয়া উদ্দীন মনে করেন যে, শাহজালাল (রহ.) একবার ওই অঞ্চলে গেলে খাবার পানির দুরবস্থা এবং অন্যান্য সমস্যা দুরভূতি হবে। তাই তিনি স্বীয় মুর্শিদকে সেই অঞ্চলে তাশরীফ আনার আবেদন জানান।

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ- ৫১

২৭. হিস্ট্রি অব শাহজালাল এন্ড হিজ খাদিমস, পৃ- ২২

Dhaka University Institutional Repository

শাহজালাল (রহ.) বৃন্দাচলের অবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্য সেখানে যান। তিনি জন সাধারণের দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যাথিত এবং বিচলিত হন। একদিন জুমার নামাজান্তে তিনি এক মুষ্টি বালুকা সুরমা নদীর ঘোলাটে পানিতে নিক্ষেপ করেন। তখন থেকে সে অঞ্চলে সুরমা নদীর পানি স্বচ্ছ সুপেয় হয়। যে স্থানে শাহজালাল (রহ.) বালুকা নিক্ষেপ করেছেন বলে কথিত আছে, আজও দেখা যায় তার পূর্বে দিকের নদীর পানি ঘোলাটে এবং অপরিস্কার কিন্তু পশ্চিম দিকের পানি পরিস্কার, স্বচ্ছ। আরও কথিত আছে যে, পাহাড় থেকে অবতরণের পর ওই অঞ্চলে নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রখর ছিল। প্রায় সময়ই নদীর দুইকুল প্লাবিত হয়ে ঘড় বাড়ী শস্য ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়ে যেত। হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক বালুকা নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর থেকে সে অঞ্চলে সুরমার গতি শান্ত ও সমাহিত অবস্থা লাভ করে। [২৮]

(৯) দু'টি দৈত্য হত্যা ঃ

শাহ জিয়া উদ্দীন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে শাহজালাল (রহ.) যখন বৃন্দাচল যাচ্ছিলেন তখন সিলেট শহরের অনতি দুরে কুশিয়ারা নদীর তীরে বহু সংখ্যক লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। স্থানীয় জন সাধারণ তাঁর কাছে ধুলাকেনু নামক দৈত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাঁর অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করেন। এই দৈত্য একস্থান থেকে অপর স্থানে গমন কালে এত অধিক ধুলা উড়াতে যে, লোকজন ঘন্টার পর ঘন্টা কিছুই চোখে দেখত না। তারা আরও জানায় এই দৈত্যের গর্জন কালে লোকজন ভয় ভীতিতে মৃত প্রায় হয়ে যায়। ধুলাকেনু রাজা গৌড় গোবিন্দের অনুগত দৈত্য ছিল। এর সাহায্যে গোবিন্দ সোনাপুর নামকস্থানে সিকন্দর গাজীকে পরাস্ত করেন। শাহজালাল (রহ.) দৈত্য ধুলাকেনুকে নিজের সামনে এনে নিহত করেন। ধুলীকেনুর মৃত্যুতে স্থানীয় লোকজন স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেল।

বৃন্দাচল অঞ্চলে দেওরাইল নামে আর একটি ভীষনকার দৈত্য বাস করতে সে বিভিন্ন উপায়ে জনগনের উপর নির্যাতনচালাত। এরই নামানুসারে করিমগঞ্জ মহকুমার দেওরাইল পরগনার নামকরণ হয়। দেওরাইল দৈত্যটি ছিল আসলে একটি ভন্ড পীর সে বিভিন্ন প্রাণীর রং ধারণ করতে পারত এবং নিজের স্বর যে রকমের ইচ্ছা রূপান্তরিত করতে পারত। ভীত সন্ত্রস্থ মানুষ আশ্রয় এবং সাহায্যের জন্য তার নিকট আগমন করত। দিনের বেলায় এই পীরের নিকট আগমন করে নানা রকমের নজরানা পেশ করত। দেওরাইল কে হত্যা করে শাহজালাল (রহ.) দীর্ঘ দিনের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে জনগণকে মুক্তি দান করেন।

(১০) ব্যাঘ্রের উপযুক্ত বিচারঃ

জনশ্রুতি যে, একদা একটি হরিন স্বীয় শাবক ব্যাঘ হস্তে হারিয়ে সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) শরনাপন্ন হন। তিনি ইহার ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে দয়াদ্র হলেন এবং ভাগিনা শাহজালাল (রহ.) কে বলিলেন, তুমি কি ইহার কোন উপকার করতে পারনা? তিনি মামার মনের ভাব বুঝতে পেরে ব্যাঘ্রের অনুসন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। ওলী-দরবেশের স্বচ্ছ দর্পন, তার ক্ষমতা সর্বব্যাপী (আল্লাহর ইচ্ছায়)। সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু তাঁদের কারায়ত, কিন্নর পরী

---

২৮. হিষ্ট্রি অব শাহজালাল এন্ড হিজ খাদিমস, পৃ- ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বাধ্য। বাঘটি উপস্থিত হয়ে শাহজালাল (রহ.) পদচুম্বন করত প্রার্থনা করল। তিনি ইহাকে আমার সামনে হাজির করলেন এবং তার আদেশে বাঘের দক্ষিণ হস্ত ভেঙ্গে দেওয়া হল। অতঃপর ব্রাঘটি বনে চলে গেল। হরিণীটি ও বিচার পেয়ে সন্তুষ্ট হল। শাহজালাল (রহ.) পরীক্ষার পাশ করলেন। মামা বললেন "জালাল সুমা বকমালে রছিদি" অর্থাৎ জালাল তুমি আত্মোন্নতির চয়ন সীমায় পৌছেছে।

জনাব নুরুল হক ইহার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। "একদা এক বাঘ একটি হরিণীকে আক্রমণ করে। হরিণ বাঘের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য প্রাণপনে দৌড়াইয়া অবশেষে আহমদ কবীর (র.) এর কুটিরের সম্মুখে আসে। শাহজালাল (রহ.) তাহা দেখিতে পাইয়া হরিনকে তাঁদের কুটিরে আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং বাঘটিকে এক চড় মারিয়া তাড়াইয়া দেন"।[২৯]

১১. ইয়ামন রাজ্যের মৃত্যুঃ শাহজালাল (রহ.) কে জব্দ করার জন্য ইয়ামন রাজ কৌশলে ও সঙ্গেপনে শরবতের সাথে বিষ মিশ্রিত করে হযরত শাহজালাল (রহ.) কে পান করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ গোমর ফাঁক করলেন না। শরবত সামনে রেখে কেবল বললেন, ভাল মন্দ সবই তকদীরে আছে ফকীরের জন্য ইহা শরাবান তাহুরা, কিন্তু যে ইহা প্রদান করেছে তার জন্যই ইহা বিষ। অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে তিনি শরবত পান করলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর কোন প্রতিক্রিয়া করলনা শরবত। ইয়ামন রাজ ভাবতে লাগলেন একি। বিষও কার্যকরী হইল না। অবশেষে কি রাজ্য হারাতেই হবে।

এই সব চিন্তা করতে করতে ইয়ামন রাজ চির নিদ্রায় অভিভূত হলেন।

১২. শাহজালাল (রহ.) এর ঝরনাঃ শাহজালাল (রহ.) জীবদ্দশায় তাঁর আস্তানার নিকটে একটি কুপ খনন করা হয়। সৌভাগ্য ক্রমে এই কুপটি একটি প্রাকৃতিক ঝরনার সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। এই কুপটি বর্তমানে শাহজালাল (রহ.) এর মাজারের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এর পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যকর এবং রোগ নিবারক। এ ঝরনার পানির রোগ নিবারক ক্ষমতা এখনও দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ পেটের অসুখে ঝরনার পানি অত্যন্ত উপকারক। কবির ভাষায়-

কত রোগী ভালো অইলা
ঝরণার পানি খাইয়া
বাবা শাহজালাল আউলিয়া

ঝরণার পানি সিলেটে তথা বহিরাগত জিয়ারতকারীদের সকলেই পবিত্র মনে করেন। এ পানিতে গোসল করা হয় না ঝরণার পানি দিয়ে অনেকে ইফতার করেন।

কথিত আছে যে, কুপ খনন শেষ হলে শাহজালাল (রহ.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, কুপটি যেন মক্কার জমজম কুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তিনিকুপের তল দেশে আপন লাটি প্রোথিত করার সঙ্গে সঙ্গে এটি মক্কার জমজম কুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং জমজম কুপের পানি প্রবাহিত হতে থাকে। এই কুপটির নাম ও জমজম চশমা।

---

২৯. আল-ইসলাহ, শাহজালাল সংখ্যা, পৃ- ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

Dr. wise এর বর্ণনায় দেখা যায় Shaikh jalal wished that a fountain like holy zanzum of Makkah might spring of near his abode and immediately the fountain appeared.[৩০]

কথিত আছে যে, খিত্তা পরগনার চান্দাইটিলা নামক এক গ্রামে আব্দুল ওহাব নামে একব্যক্তি তাঁর বন্ধু মুনসুর আহমদের সঙ্গে হজ্জ আদায় করার জন্য পবিত্র মক্কা গমন করেন। হজ্জ সমাপনান্তে তিনি দেখেন যে, তার কাছে রাহা খরচের উপরেও নয়টি স্বর্ণ মুদ্রা উদ্বৃত ছিল। তিনি আশঙ্কা করলেন যে, পথিমধ্যে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দস্যু-তস্কর লুন্টন করতে পারে। শাহজালাল (রহ.) এর চশমার সাথে জমজম কুপের সংযোগে তিনি পূর্ন বিশ্বাসী ছিলেন। তাই একটি কঠের ডিব্বায় স্বর্ণমুদ্রাগুলো প্রবেশ করিয়ে তিনি তা পবিত্র মক্কার জমজম কুপে নিক্ষেপ করেন। আর প্রার্থনা করেন যে, শাহজালাল (রহ.) এর চশমার সাথে জমজম কুপের সংযোগে তার বিশ্বাস যদি সত্য হয়। তবে তার কৌটাটি যেন সিলেটে পৌছে যায়। এক সুন্দর প্রভাতে শাহ খায়রুদ্দীন নামে মাজারের এক খাদিম কুপটি পরিস্কার করার জন্য অবতরণ করেন। তিনি স্বর্ণ মুদ্রাপুর্ণ কৌটাটি প্রাপ্ত হন। হজ সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবতনের পর হাজী আব্দুল ওহাব খায়রুদ্দীনের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। খায়রুদ্দীন বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করে মৃদ্যু হাস্য করলেন এবং কোটাটি তাঁকে অর্পন করেন। হাজী আব্দুল ওহাব দুটি স্বর্ণ মুদ্রা মাজারের খেদমতের জন্যে অর্পন করে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা সহ হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।[৩১]

(১৩) জ্বলন্ত অঙ্গারের খাদ্যে পরিণতঃ হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার এক শাগরিদ শাহজালাল (রহ.) এর দিল্লী অবস্থান কালে তার সাথে সাক্ষাত করেন। উক্ত শাগরিদ নিজাম উদ্দীন আউলিয়াকে জানান যে, দিল্লীতে এক সুফী সাধক এসেছেন যার দর্শনের সমগ্র চিন্তা ভাবনা দুরীভুত হয়। শান্তির পুর্তধারায় হৃদয় স্নাত হয। তিনি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। অজানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সুদূর বিস্তৃত। নিজাম উদ্দীন আউলিয়া ফকীর শাহজালাল (রহ.) অলৌকিক শক্তি পরীক্ষা করতে মনস্থ করেন।

তাই তিনি রুটি জড়িয়ে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার তার সমিপে প্রেরন করেন। শাহজালাল (রহ.) দিব্যদৃষ্টি বলে হযরত নিজামুদ্দীনের মনোভাব অবগত হন। আল্লাহর নাম নিয়ে তিনি খাবারের কোটাটি খুললেন। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার হতভম্ভ শাগরিদ বিস্মিত হয়ে নেত্রে অবলোকন করল যে, জ্বলন্ত আঙ্গারের পরিণত হয়েছে সুস্বাদু খাদ্যে। তিনি এই অতি অস্বাভাবিক ঘটনাটি নিজামুদ্দীন আউলিয়া নিকট বর্ণনা করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হয়ে নিজাম উদ্দিন আউলিয়া শাহজালাল (রহ.) এর আস্তানায় উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[৩২]

---

৩০. ড. ওয়াইজ জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৭৩ পৃ- ২২৯।
৩১. প্রাগুক্ত পৃ- ২৩০
৩২. শ্রীহট্ট নূর, পৃ- ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

১৪. টগা তীরের সাহায্যে সপ্তকোদালী ছেদ

অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ফকীরের সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রামে নিরর্থক ভেবে রাজা গৌড় গোবিন্দ চাতুর্যের আশ্রয় নেন। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) নিকট সাতটি কোদালী ও বাঁশের ধনুক এবং টগার তীর প্রেরণ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, যদি মুসলিম টগার তীরের সাহায্যে সাতটি কোদালী একত্রে ছিদ্র করতে পারে তবে তিনি বিনা যুদ্ধে রাজধানী ত্যাগ করবেন। শাহজালাল (রহ.) শুধালেন যে, এমন কে আছ যিনি ফজরের নামাজ কাযা করনি? বিলম্ব পদক্ষেপে শাহচট এগিয়ে এলেন।

শাহজালাল (রহ.) শাহচটকে গোবিন্দের প্রস্তাবিত কার্য সম্পাদন করতে অনুরোধ করেন। শাহচট এই টগার তীরে সাতটি কোদালী ছেদ করেন। যদিও তিনি তাঁর কাজে সমর্থ হন কিন্তু তিনি তীর নিক্ষেপের সাথে সাথেই ছিটকে পড়েন এবং হাপাতে থাকেন। তার সঙ্গীর কাছে নিয়ে দেখেন যে, তার লোম কুপের গোড়া থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছে। তাঁরা শাহচটের এমন অবস্থায় আশ্চার্যান্বিত হন। তিনি সঙ্গীদের বলেন যে, তার জানামতে তিনি কখনও ফজরের নামাজ কাযা করেননি। কিন্তু একদিন অতি দ্রুত নামাজ সমাধা করেছিলেন।[৩৩]

১৫. সিলেটের নামের উৎপত্তিঃ

সৈন্য বাহিনী সহ শাহজালাল (রহ.) সিলেট আগমন বার্তায় ভীত সন্ত্রস্ত রাজা গোবিন্দ সুরমা নদীর সমস্ত খেয়া বন্ধ করে দেন। অলৌকিক শক্তির প্রভাবে শাহজালাল (রহ.) জায়নামাজে উপবেশন করে নদী অতিক্রম করে দেখেন যে, নদী তীরের সমস্ত রাস্তা ঐন্দ্রজালিক প্রস্তর প্রাকারে বন্দ। কথিত আছে যে, অধিনস্থ দৈত্যদানবদের দ্বারা ঐ দুলঙ্ঘ প্রস্তর প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল । প্রস্তর প্রাচীর লক্ষ্য করে শাহজালাল (রহ.) নির্দেশ দিলেন সিলহট (পাথর সরে যাও) তাঁর নির্দেশের সাথে সাথে প্রস্তর প্রাকার আন্দোলিত হল এবং শিলা খন্ডগুলো আস্তে আস্তে অপসারিত হয়ে গেল। নগর পথ উন্মুক্ত হল। তখন থেকেই শহরের নাম হয় সিলহট। বর্তমানে সিলেট 'সিলহট' শব্দেরই মার্জিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ।[৩৪]

(১৬) গজার মাছের উপাখ্যানঃ

সেনাপতি সিকান্দর গাজী মাছ ধরতে ভালবাসতেন। বড়সী দিয়ে মাছ ধরা ছিল তাঁর নেশা সিকান্দর গাজীর মাছ ধরা সম্বন্ধে সিলেটে নানা ছড়া এবং উপকথা প্রচলিত আছে। একদিন শাহজালাল (রহ.) সুরমা নদীর তীরে বেড়াতে যান। কতকগুলো গজার মাছ মাথা তুলে শায়খের নিকট নালিশ করে যে, সিকান্দর গাজী বড়শীর সাহায্যে তাদেরকে বিনাশ করছে। ফকীর শাহজালাল (রহ.) তাদেরকে বললেন বড়শীর টোপ না গিলতে। মাছগুলো তাকে বললোঃ তা কি করে সম্ভব হয়? ক্ষুধার সময় আমাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা। ক্ষুধার তাড়নায় বাঘিনী নিজের সন্তান পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। আমরা কি করে বড়শীর টোপ খাওয়ার লোভ স্মরণ করি? আমাদেরকে আপনি আশ্রয় দিন।

---

৩৩. প্রাগুক্ত পৃ- ২১
৩৪. আল ইসলাহ, পৃ- ৬২

Dhaka University Institutional Repository

শাহজালাল (রহ.) তাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। গজার মাছগুলো নিয়ে এসে তিনি তাঁর খানকার কাছের পুকুরে আশ্রয় দেন। সে মাছগুলোর বংশধর আজও মাজারের ধারের পুকুরে রয়েছে। মাজার জিয়ারত কারীরা মাছগুলোকে যত্ন করে নানা খাদ্য খাওয়ায়। এ মাছ কেউ খায় না। মারা গেলে মাছগুলোকে পুতে ফেলা হয়। দরগার মাছকে সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। অনেক বিদেশী মাজার পরিদর্শন করতে যান। কথিত আছে জনৈক ইংরেজ মাজারের পুকুরে এতো গজার মাছ এবং এগুলোকে নির্ভয়ে নিকটে আসতে দেখে আনন্দিত হয়। খেলাচ্ছলে সে মাছ গুলোকে গুলি করে। একটি গজার মাছেরও কিছু হয়নি। কিন্তু ইংরেজটি সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বমি করতে করতে মারা যায়।[৩৫]

(১৭) মাজারের বৃহৎ ডেকচিঃ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ওরসের সময় মাজারে একটি বৃহৎ ডেকচি ব্যবহৃত হয়। এটা কোন এক মোগল যুবরাজ কর্তৃক মাজারে প্রেরিত হয়। ডেকচির উপরের লেখা নিম্নরূপ "১২ই রমজান ১১১৫ হি. জাহাঙ্গীর নগরের শাহ আবু সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ জাফর ইবনে ইয়ার মুহাম্মদ কর্তৃক এটি নির্মিত হয় এবং শাহজালাল (রহ.) এর মাজারে ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয়। হযরতের কসম। এটা যেন কখনও মাজারের পরিসীমার বাইরে নেওয়া না হয়। এর ওজন পাঁচ মন তিন সের দুই পোয়া"।

যে যুবরাজ ডেকচিটি পাঠিয়ে ছিলেন তিনি তা নদীতে ছেড়ে দিয়ে বললেন "তোমাকে শাহজালাল (রহ.) এর মাজারের জন্য তৈরী করা হয়েছে। চলে যাও সেখানে।" ভাসতে ভাসতে ডেকচিটি সিলেট শহরের নিকটে সুরমা নদীর চাঁদনি ঘাটে পৌঁছে গেল। এই বৃহৎ ডেকচিটি দেখার জন্য শত শত লোক নদী তীরে জমায়েত হল। ডেকচিটির গায়ে মাজারের নাম খোদাই দেখে লোকজন মাজারের খাদমিকে খবর দিল। শহরের বহু লোক ডেকচিটি ধরতে চাইল। কিন্তু ধরতে পারলো না। কারণ লোকজন ধরতে গেলেই ডেকচিটি দূরে সরে যায়। কথিত আছে যে, বহু লোক পথিমধ্যে ডেকচিটি ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তি নিকটে এলেই ডেকচিটি নদীর মাঝখানে চলে যেত। ফলে কেউ তাতে হাত লাগাতে পারে না। এভাবে বহু দস্যু তস্করের লোলুপ দৃষ্টি উপেক্ষা করে ডেকচিটি সিলেট শহরে উপস্থিত হয়। দরগার খাদিম আবুল আয়াস মুহাম্মদ আহমদ ওরফে আনা মিয়া ডেকচিটি ধরতে গেলে দেখা গেল যে, তা মোটেই আর গেল না। খাদিম আনা মিয়া একটি সুসজ্জিত হস্তীতে ছড়িয়ে ডেকচিটি মাজারে নিয়ে আসেন। এক বিরাট জনতার মিছিল হস্তীপৃষ্টে স্থাপিত ডেকচিটি মাযার পর্যন্ত অনুসরণ করে। সাতমন চাল এবং সাতমন গরুর গোশত এতে এক সঙ্গে রাঁধা যায়।[৩৬]

---

৩৫. শ্রীহট্ট জ্যোতি পৃ- ২৯
৩৬. হযরত শাহজালাল, পৃ- ৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

(১৮) সিপাহসালার নাসিরুদ্দীনের মৃতদেহ শূন্যে বিলীনঃ সিপাহসালার নাসির উদ্দীনের সমাধি সিলেটে নেই। তার সমাধি বলে যে স্থানটি আছে তাতে তাঁর মৃত দেহ বহনের খাটিয়া দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, সেনাপতি নাসির উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ জানাযার জন্য আনায়ন করা হয়। জানাযায় অংশগ্রহণ কারী সালাম ফিরিয়ে দেখে যে, মৃতদেহ বহনের খাট শুন্যে পড়ে রয়েছে, মৃতদেহ নেই। জনশ্রুতি এই যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সেনাপতি নাসির উদ্দীনের মৃতদেহ দিল্লী নীত হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।

Dr. Wise এর ভাষায় He caused the carpse of Nasiruddin Sipahsalar who died at Sylhet to disapear from Mosque while the friends were mourning over it.[৩৭]

(১৯) সিলেট-১ আসনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে থাকে ঃ

বহুল আলোচিত ও বাস্তব সত্য এই যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে দল সিলেট-১ আসনে পাশ করে থাকে, সে দলই সরকার গঠন করে। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ওফাতের অদ্যাবধি সাতশত সাত বছর পরও এ মহান ওলীর ইহা কত বড় কারামত। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দিবালোকের ন্যায় বিষয়টি বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

(২০) বিবি গয়রত এবং বিবির মোকামঃ বিবির মোকাম ও বিবি গযরত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত জনশ্রুতি নিম্নরূপ। শাহজালাল (রহ.) এর মাজারের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি নীচু স্থান বিবি গয়রত নামে পরিচিত ছিল। কথিত আছে উক্ত স্থানে পূর্বে একটি পুস্করিনী ছিল। একদিন বিকেল বেলা হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর হুযরা থেকে অযু করার জন্যে বা ভ্রমনের জন্যে বের হয়ে আসেন। শুক্লা নাম্নী একজন হিন্দুনারী তখন স্নানরত ছিলেন। ইতিপূর্বে শাহজালাল (রহ.) কখনও নারী দেখেননি এবং জীবনে কখনও নারী মুখ দর্শন করবেন না এ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। শুক্লাকে স্নানরতা দেখে শাহজালাল (রহ.) জিজ্ঞেস করেন 'এটা কোন প্রাণী'? তাঁকে জানানো হল ওটা কোন প্রাণী নয়; ও একজন নারী।

কথিত আছে যে, মোকামদোয়ার থেকে সিলেট শহরে প্রবেশের সময় চৌকিদেখি এলাকায় পথিপার্শ্বে দন্ডায়মান একজন মহিলা শাহজালাল (রহ.) এর দৃষ্টি পথে পতিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন এটা কোন প্রকার জীব? তাঁকে জানানো হয় এটা একজন নারী। তিনি আক্ষেপ করে বললেন "আমি কি হতভাগ্য যে, আমাকে নারী মুখ দেখতে হলো।" সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি স্বাভাবিক ভাবে মৃত্তিকা তলে পতিত হয়ে যায় এবং স্থানটি বিবি গয়রত নামে পরিচিত হয়।

উল্লেখ্য বিবির মোকাম সিলেট শহরের সুবিদ বাজার ড্রামারটুলি মহল্লায় আম্বরখানা দস্তিদার বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এলাকাটি মিয়া ফাজিল চিস্তি মহল্লা নামে ও পরিচিত। কারওকার ও মতে চৌকিদীঘি এলাকায় বিবির মোকাম অবস্থিত।

এ প্রসিদ্ধ ঘটনাটি Dr. wise নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

---

৩৭. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৭৩ কলকাতা, পৃ- ২৩০

Dhaka University Institutional Repository

It is beleived that shah jalal never looked on the face of woman. one day however standing on the bank of a stram he saw one bathing. In his simplecity he asked what strange creature It was On being informed. hewas enraged and prayed that the water might rise and drown her. He had no sooner expressed this wish than water rose and drowned her. [38]

বিবির মোকাম সম্বন্ধে আর একটি জনশ্রুতি আছে। সোহাগী নামক এক নপুংসক ব্যক্তি সুবদিবাজার এলাকায় বাস করত। সে আরবীয় মুখন্নাসদের তরীকায় নারীর বেশভূষা ও অলংকার পরিধান করতো। কৌতুক করে লোকজন সুদাই সোহাগীর বাড়ীকে বিবির মোকাম বলতো। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর কলন্দররা বিবির মোকামের সঙ্গে হযরত শাহজালালের নাম জড়িয়ে এক গল্প প্রচার করে। অলৌকিক গল্প কাহিনী প্রিয় লোকজন সহজেই বিশ্বাস করে এবং শাহজালাল (রহ.) এর পবিত্র নামের সঙ্গে আর একটি আজগুবী কাহিনী উদ্ভব হয়।

অন্ধ ভক্তের অনুসারীরা বিবি গয়রত এবং বিবির মোকামকে পবিত্র স্থান মনে করে মোকামে বাতি দেয় নজর নেয়াজ পেশ করে । শাহজালাল (রহ.) এর অভিশাপে প্রোথিত হওয়া নগ্ন নারীর শারীর গোরে বাতি দেয়া কেমন অদ্ভুত কুসংস্কারই বৈ কিছু নয়। এগুলো শরীয়ত অনুমোদিত কোন ব্যবস্থা নয়। এটা অস্বাভাবিক যে, খানকার পরিসীমার পুকুরে কোন হিন্দু নারী নগ্ন দেহে স্নান সমাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে।

যেহেতু শাহজালাল (রহ.) উচুস্তরের আলিম ও শায়খুল মাশাইখ ছিলেন বিধায় তিনি পর্দার অনুশাসন কঠোর ভাবে মেনে চলবেন। রাস্তায় চলাকালে মুখ ঢেকে রাখতেন যেন কোননারী তার দৃষ্টি পথে পতিত না হয়। তবে এটা অবিশ্বাস্য যে, তিনি জীবনে নারী মুখ দর্শন করেননি হাতের কব্জির নীচের অংশ, পায়ের গিরার নিম্নাংশ এবং যা স্বাভাকিক ভাবে দৃষ্টি গোচর হয় তা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ ঢেকে রাখার নির্দেশ ইসলামী শরীয়ায় আছে তবে মুখ মন্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ ইসলামে ফরজ করা হয়নি। তাছাড়া নারীকে গৃহে খাচার মধ্যে আবদ্ধ করে লালন পালনের নির্দেশ ও ইসলামে নেই। বিশেষত পুরুষের ক্ষেত্রে মুখ ঢেকে রাখার কোন চিন্তাই করা যায় না। হাঁ এতটুকু বলা যায় শাহজালাল (রহ.) নারী দর্শন থেকে নিজেকে হেফাজতের লক্ষ্যে অতীব সতর্কতার সহিত চলাফেরা করতেন। তাই তিনি পথ চলাকালে মাথার উপর চাদর তথা আরবীয় রুমাল রেখে নীচের দিকে তাকিয়ে চলতেন এটা ঐতিহাসিক সত্য যে তিনি নারী সাহচার্য এড়িয়ে চলতেন। আজও মহিলারা তার মসজিদ বা মাজারের সন্নিকটে যাননা। যাওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই। খাদিমরা কঠোর ভাবে নিষেধ করেন। তবে একথা অবিশ্বাস্য যে, শাহজালাল (রহ.) জীবনে কোন দিন নারীমুখ দেখেননি এবং নারী দেখলে জিজ্ঞেস করতেন। এটা কোন জীব।[৩৯]

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩০
৩৯. হিষ্ট্রি অব শাহজালাল এন্ড হিজ খাদিমস, পৃ- ৩২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলব কোন কিছু অন্ধভাবে গ্রহণ করা যেমন গোড়ামী তেমনি কোন কিছু চিন্তাহীনভাবে সত্যাসত্য বিচার না করে বর্জন করা ও অযৌক্তিক। চন্দ্রযুগের মানুষ অতি প্রাকৃতিক জগতে আধিপত্য স্থাপনের মানবিক সম্ভাবনা আজো পরীক্ষা করে দেখেনি। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগন অতি প্রাকৃতিক জগতের গোপন তথ্য উম্মোচনে পেশাগত চেষ্টা চালায়নি।

কারামত বা অলৌকিক ঘটনা কি কাল্পনিক অথবা বাস্তব সত্য এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে ইসলামের আকাইদ শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের স্বতঃ সিদ্ধ বিধান কারামতুল আউলিয়া হক্কুন। অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত তথা অলৌকিক কর্মকান্ড বাস্তব সত্য। এ বিষয়ে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র আজও প্রকৃত পীর দরবেশ ও আউলিয়া একচেটিয়া বা অধিকার করে রেখেছেন। তারাই হলেন এ বিষয়ের যোগ্যতম মহান ব্যক্তিত্ব। এ বিষয় অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। প্রাকৃতিক জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে অতি প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সত্যাসত্য বিচারের প্রবনতা অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব, ও অজ্ঞতাপ্রসুত গোড়ামী বৈ কিছু নয়। আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে ওহী হচ্ছে সব জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস। জাগতিক বিদ্যাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে কোরআন সুন্নাহ দ্বারা এটাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.) জীবনাদর্শ ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব

হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন আসহাবে সুফফার আদর্শে অনুপ্রাণিত এক মহান ওলীকুলশিরমনি। মহান সৃষ্টিকর্তার ইবাদত বন্দেগী ও বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনা ব্যতিরেকে অপর কিছু কল্পনা করার অবকাশ তার ছিল না। আসহাবই সুফফার অন্তর্ভুক্ত সাহাবা-ই কেরামগণ ছিলেন ইসলামের জন্য তথা আল্লাহ তার রাসুলের জন্যে নিবেদিত প্রাণ।

মসজিদে নববীর দক্ষিণ পার্শ্বের মেঝেতে তারা সর্বদা অবস্থান করতেন আজও এই পবিত্রস্থান তথায় চিহ্নিত রয়েছে। জনগণের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার, জিহাদের আহবান এলে পরম উৎসাহ উদ্দীপনায় অংশগ্রহণ এবং মানবতার কল্যাণ মূলক যে কোন কার্যক্রমে ঝাপিয়ে পড়া ছিল তাদের কার্যক্রম। এক কথায় আল্লাহর রাসুল (সা.) এর নির্দেশে যে কোন ধরণের ত্যাগ স্বীকার ও সার্বক্ষনিক তাঁর সাহচার্য লাভ করে নিজেদেরকে ধন্য করে নিয়েছিলেন। স্বেচ্ছায় আল্লাহর রাস্তায় যেন নিজেদেরকে তারা ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসুল তাদেরকে নিজের আপনজনের মত ভাল বাসতেন। স্নেহ করতেন, নিজের আহারে তাদেরকে শরীক করতেন শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহ জালাল (রহ.) এর জীবনাদর্শ ও সামাজিক দর্শন ছিল আসহাবে সুফফার আদর্শের অনুরূপ।

নিম্নে তাঁর জীবনাদর্শের কিছুটা আলোকপাত করা হলঃ

(১) অবিবাহিত জীবন যাপনঃ

দার পরিগ্রহ করে সংসার করা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভোগ-লালসা, কামনা-বাসনাকে জয় করে আজীবন অবিবাহিত থেকে তিনি মানবতার সেবা করে গেছেন। শুধুমাত্র জিকির আযকার নামাজ রোজা প্রভৃতিতে তিনি নিয়োজিত থাকতেন না। আদম সন্তানের কল্যাণ কামনায় এবং তাদের দুঃখ মোচনে তার সময় ব্যয় হত। বিয়ে সাদী করার চিন্তা ভাবনা করার সময় তার কোথায় যদিও তিনি সংসার বিরাগী ফকীর ছিলেন তবুও তিনি মানব সংসার থেকে দুরে ছিলেন না।

(২) সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ

হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গী আউলিয়ারা প্রয়োজন বেধে তরবারি ধারণ করেছেন, জঙ্গল কেটেছেন। কুপ খনন করেছেন, খাল কেটেছেন, রাস্তা তৈরী করেছেন। তখনকার দিনে সিলেটের অধিকাংশ অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য গাছ গাছড়া অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেত। সমতল ভূমিতে গাছ পালা এত বেশি ছিল যে, সে অঞ্চলকে অরন্য ভূমি বলে মনে হত। রাজা গৌড় গোবিন্দের আমলে রাজধানী ও বল বলে মনে হত। গাছ পালা কেটে বনভূমি

Dhaka University Institutional Repository

আবাদ করা খুব সহজ সাধ্য ছিল না। যারা শহর থেকে দুরে থাকতেন তাদেরকে বাঘ, শুকর ইত্যাদি বন্য জানোয়ার সাপ বিচ্ছু ইত্যাদির সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হত। শাহজালাল(রহ.) সঙ্গীরা শহর আবাদকরী ভূমিতে না থেকে পাহাড়িয়া অঞ্চলে বসবাস করতেন। পাহাড়ের উপর খানকা স্থাপন, চারিদিকে লোকালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং স্থানীয় লোকদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতেন।

বনজঙ্গল কেটে পরিস্কার করায় হিংস্র প্রাণী তথা বাঘ, ভল্লুক বন্য হস্তী, সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি জীবজন্তু লোকালয় থেকে দুরে সরে যায়।

স্থানীয় জনসাধারণ হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বাঘের আক্রমন থেকে মুক্তি পেয়ে কৃতজ্ঞ মানব সন্তান ফকির দরবেশদের পদতলে আশ্রয় নিত। হিংস্র জন্তু জানোয়ার বিতাড়নে শাহজালাল (রহ.) এর কোন একশিষ্য ব্যাঘ্র পৃষ্টে আরোহন করে বিষধর সর্পকে আশ্বারোহী চাবুক হিসেবে ব্যবহার করতেন।

(৩) অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ করাঃ

অন্যান্য অত্যাচার অবিচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা শাহজালাল (রহ.) এর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। নিপীড়তদের ক্রন্দনে তাঁর দরদী প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠত। তিনি সর্বদাই দুর্বল এবং সহায় সম্বল হীনের পক্ষ নিতেন প্রাথমিক জীবনে তিনি বাঘিনীর আক্রমন থেকে এক অসহায় হরিণ শাবককে রক্ষা করেছিলেন। ইয়ামনের যুব রাজ শাহ আলী যখন রাজ্য রাজধানী এবং সিংহাসন ত্যাগ করে ফকির শাহজালাল (রহ.) সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে উৎসাহিত করেননি বরং বারবার নিবেধ করেছেন এবং রাজ্য সিংহাসনে বসে মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েমের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

রাজা গৌড় গোবিন্দ এবং রাজা আচক নারায়নের বিরুদ্ধ সংগ্রামের মূল কারণ ও ছিল নিরীহ প্রজার প্রতি জালিম শাহির অমানুবিক জুলুম এবং নির্যাতনের প্রতিবিধান।

(৪) নিরীহ জন্তু জানোয়ার ও পশুপক্ষীর প্রতি দয়ার ব্যবহারঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন- "তোমরা জগতবাসীর প্রতি দয়ার ব্যবহার কর।আকাশ অধিপতি (আল্লাহ তালা) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" যেহেতু স্বয়ং শাহজালাল (রহ.) উচু স্তরের দরবেশ হওয়ার সাথে সাথে অনেক বড় আলিমে দ্বীন তথা আল্লামা ছিলেন তার সঙ্গী সাথীরা ও অনেক বড় বড় আলিম ছিলেন। বিধায় তারা জীবকুলের প্রতি অশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন।

শাহজালাল (রহ.) করুনা শুধুমাত্র মানুষের প্রতি ই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিরীহ বোবা জীব জানোয়ার ও তার দরদী মনের পরশ পেয়েছিল। সিলেটের জালালী কবুতর, গজার মাছ আজও জীব প্রীতির স্বাক্ষর বহন করে।

গাভী পালতেন বেশীর ভাগ রোজা থাকতেন দুধ দ্বারা ইফতার করতেন। অসীম দয়া প্রবন হওয়া সত্বেও তিনি অহিংসা পরম সত্য নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রয়োজন বোধে অস্ত্রধারণ করা কর্তব্য মনে করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) আধ্যাত্মিক শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধন

সিলেট বিজয় শুধু মাত্র সামরিক শক্তি বলে হয়নি। সিকান্দর গাজী বাহুবলে সিলেট দখল করার চেষ্টা করে বার বার বিফল হন। শহজালাল (রহ.) দুদর্শীতা, বাস্তব বোধ, এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সিলেট বিজয়ে অধিক কার্যকরী হয়। রাজা গৌড় গোবিন্দের যাদু বিদ্যা, শাহজালাল (রহ.) এর বুদ্ধিমত্তা, দুরদর্শিতা, তথা আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। এ বিষয়ে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর "স্ট্যাটিকটিক্যাল একাউন্ট অব আসাম" (সিলেট) বিস্তারিত লিখেছেন-

(৬) সিলেট জেলার নওয়াবী সনদ প্রত্যাখ্যান এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে কসবে সিলেট (নিস্কর সিলেট) ঘোষণা

শাহজালাল (রহ.) এর কোন জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, বাঙলার সুলতান ফকির শাহজালাল (রহ.) এর অলৌকিক ক্ষমতা বলে সিলেট বিজয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে সম্মানিত করার জন্য সিলেট জেলার নওয়াবী সনদসহ একজন সম্মানিত আমীর সিলেট প্রেরণ করেন। নওয়াব প্রেরিত আমীর ফকীর শাহজালাল (রহ.) এর বাসস্থান থেকে তিন মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) কে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে নওয়াবী সনদ গ্রহণ করতে সংবাদ পাঠান। শাহজালাল (রহ.) নবাব প্রেরিত আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। আমীর শাহজালাল (রহ.) সিলেট শহরের জায়গীরদারী গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হন।

হতভম্ব আমীর আগত্যা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের অনুমতি প্রার্থনা অস্বীকৃতি জানান এবং আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হন। অতঃপর উক্ত আমীর তাতে তিনি সিলেট শহরকে কসবে সিলেট বা নিস্কর সিলেট ঘোষণা করে প্রস্থান করেন।

(৭) সহজ সরল জীবন-যাপন

ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁর জীবন যাত্রা এবং আহার ছিল অত্যন্ত সাধারণ ধরণের। তিনি ৪০ বছর পর্যন্ত রোজা রেখেছিলেন এবং দশদিন অন্তর একবার আহার করতেন। তাও ছিল নিজের গাভীর সামান্য দুধ। উপমহাদেশের প্রায় সব ওলী দরবেশের মাজারে অত্যন্ত জাকজমক এবং আড়ম্বরপূর্ণ প্রকান্ড অট্টালিকা, মনোরম চাঁদোয়ার চাকচিক্য সমাহিত ওলীর অস্তিত্ব ঘোষণা করে। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার ও সাধারণ নিয়মের বিরাট ব্যতিক্রম। তাঁর মাজার হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী, কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী, বাহা উদ্দিন, যাকারিয়া (রহ.) প্রমুখের মাজারের ন্যায় জৌলুস পূর্ণ নয়। হযরত শাহজালাল (রহ.)এর মাজারের উপর কোন ছাদই নেই। সিলেট শহরের ১৮০ ডিগ্রী বৃষ্টিতে সারা বছর নিরাবরন মাজারটি সিক্ত হয়। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ ঘনবর্ষার বারিধারা, শীতের শিশির হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজারের মাহাত্ম বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক জীবনে শাহজালাল (রহ.) এর প্রভাব

হযরত শাহজালাল এর ধার্মিকতা, সহজ সরল জীবন যাত্রার প্রভাব সিলেটের সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গভীর। সিলেট জেলায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করে থাকেন। অবশ্য চা বাগানের উৎকর্ষের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা এবং স্থরের বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কোনকোন আধুনিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ধার্মিকতা ও নেই, সেইরূপ সরলতা ও নেই। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পরিবার গুলোর জীবন যাত্রা এখন ও সরল অনাড়ম্বর এবং নৈতিকতা কেন্দ্রীক।

<u>নিম্নে এ নিয়ে কিছু আলোকপাত করছিঃ</u>

(১) কিস্তিটুপিঃ

সিলেট জেলাবাসীদের সরল জীবন যাত্রার একটি ছোট উদাহরণ দেয়া যাক। এখানকার শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের সাদা কাপড়ের টুপি (কিস্তি) পরতে দেখা যায়। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও দরিদ্রগনই কিস্তিটুপি পরে থাকেন কিন্তু সিলেট জেলায় অত্যধিক সমৃদ্ধশালী, ইংরেজী শিক্ষিত, মার্জিত রুচি সম্পন্ন শরীফ লোকদেরকে ও অফিস আদালতে, ঘরে বাইরে সর্বত্র একটি অতি পরিস্কার ধবধবে সাদা কাপড়ের কিস্তি টুপি পরে চলাফেরা করতে দেখা যায়।

(২) ধর্মপরায়নতাঃ

সিলেট বাসীরা সাধারণভাবে অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের চেয়ে সম্ভবত বেশী ধর্মপরায়ন। ক্ষমতা ও সম্পদের দাপটে মানুষ সাধারণত ঃ অপরাধ মূলক কাজে বেশি লিপ্ত হয়ে দেখা যায় মদ ও নারী শক্তিশালী জমিদার তালুকদারদের সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও বৈশিষ্ট। কিন্তু সিলেট জেলার জমিদার বা ভূ-স্বামীদের সে বদনাম খুবই কম। হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের শিক্ষা ও দীক্ষা সর্বোপরি এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মপরায়নতা এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে আসছে।

(৩) হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতিঃ

সিলেটের সামাজিক জীবন হযরত শাহ জালাল (রহ.) এর অন্যতম প্রভাব হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির ক্ষেত্র। এটা অবশ্য সত্য যে, হযরত শাহজালাল হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেটে মুসলিম আধপিত্য স্থাপন করেন। কিন্তু হিন্দুদের প্রতিতার তাঁর কোন রূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিল না। রাজা গোবিন্দ অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তার অত্যাচারের শিকার শুধু বুরহান উদ্দীনের ন্যায় মুসলিমরাই ছিলেন না, হিন্দুরাও বরং বেশী ছিল। গোবিন্দের পরাজয়ে অধিকাংশ হিন্দুই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। উল্লেখ্য হযরত শাহজালঅল (রহ.) হিন্দু ধর্মে আঘাত দেননি। তিনি কোন হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেননি। তাঁর কাছে হিন্দু মুসলিম সকলেই ছিল আদম সন্তান।

Dhaka University Institutional Repository

দীনকান্ত চক্রবর্তী সাহিত্য সিন্দু লিখেছেন 'পীর শাহ জালাল (রহ.) এর গুনগানে বিমোহিত হইয়া বহু হিন্দু ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ দেবের আত্মীয় স্বজন ও স্বধর্ম পরিত্যাগ করিল, এমনকি লাউড়ের ব্রাক্ষন রাজ পরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া অতঃপর রাজার স্থলে রোজা উপাধিতে সম্মানিত হইলেন।'[৪০]

সুরেন্দ্র কুমার দাস চৌধুরী লিখেছে হযরত শাহজালাল এবং তদীয় অনুসঙ্গীদের মধ্যে কেহ তখনও কোন অবস্থায় হিন্দুদের দেবীর প্রতি কোনরূপ অন্যরা ব্যবহার করিয়াছিলেন লিয়া শুনা যায় নাই। শ্রীহট্ট বিজয় অসি সাহায্যে সম্পন্ন হয় নাই। পাশবিক বল প্রয়োগের কোন নির্দশন কোথাও নাই। হযরতের অসুঙ্গীরা প্রায়শ নির্জন ভূমিতে বাস করিয়া ইসলাম রূপ করতঃ কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তাহারা নিজ নিজ তপসিদ্ধির প্রভাবে শত্রু হৃদয় জয় করিয়া বিনা রনে বিনাম্বক্তপাতে শ্রীহট্টে ইসলামের বেজয়ন্ত্রী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"[৪১]

সিলেট জেলায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির প্রধান কারণ হযরত শাহজালাল (রহ.) আদর্শ এবং শিক্ষা। তাঁর সংগীরা যেখানেই গিয়েছেন মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন। জাতি ধর্ম নির্বশেষে ভাল বেসেছেন। সাধারণত দেখা যায় যারা অন্ধভাবে ধর্মাসক্ত তারা অনেক ক্ষেত্রে পরধর্ম অসহিষ্ণু। এর কারণ ইসলামের সত্যিকার আদর্শ সম্বন্ধে তারা সুপরিচিত নয়।

হযরত শাহজালাল (রহ.) ইসলামের আদর্শে শুধুমাত্র বিশ্বাসীই ছিলেন না। তিনি ইসলামী আদর্শকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করে দেখিয়েছেন। তাঁর আদর্শ এবং শিক্ষাই যে সিলেটের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলিভূত কারণ তা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবেনা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সিলেট জেলা এ উপমহাদেশের এক গৌরবময় আদর্শ স্বরূপ।[৪২]

সামাজিক জীবনে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর প্রভাব অপরিসীম। তিনি সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসারী এক মহান মনীষি ছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতর স্তরের একজন কামিল শায়খুল মাশাইখ ছিলেন। ত্বরিকত বযুজ খিদমতে খলক নেছত আল্লামা শায়খ সাদী (রহ.) চিরন্তন বানী অনুসার তিনি নিজে এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে জনসেবার জন্য উৎসর্গ করতে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়েছেন। যার বাস্তব প্রমান শত শতবৎসর পর আজ ও তার এই খিদমত ও বদান্যতা জনশ্রুতি হিসেবে মানবের স্মৃতি কোটায় স্বর্ণাক্ষরে ভাস্বর হয়ে আছে। ইসলাম ও মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের সুদুর প্রসারী কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে আমাদের সামাজিক জীবনে উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রভাব ফেলবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

---

৪০. শ্রী চক্রবর্তী সাহিত্য সিন্দু দীনকান্ত, পীর শাহজালাল মাসিক শ্রী ভূমি, (ফরিদগঞ্জ, শ্রীভূমি কার্যালয়, ভাদ্র- ১৩২২ বাংলা) পৃ- ৩১১-৩১২

৪১. সুরেন্দ্র কুমার দাস শ্রী চৌধুরী, শাহজালালের মাটি (শ্রী কনীন্দ্র চন্দ্র সা কুন্টি চাঁদ প্রিন্টিং ওয়ার্ক শ্রীহট্ট ১৩৪৪ বাংলা) পৃ- ৩৩।

৪২. হযরত শাহজালাল কুনিয়াতী (রহ.), পৃ- ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনীকারগণ

১। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী সম্বন্ধে প্রাচীনতম গ্রন্থ আখবারুল আখিয়ার, হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ৯৯৯হি. একটি প্রমাণ্য গ্রন্থ। গুলজারে আবরার ১৬১০ঈ. গাউস মানডুবী প্রণীত ভাষা ফার্সী।

২। রাওজাতুস সালিহীন ১২২৪ হিজরী ১৭১৩ঈ. দিল্লির সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে লিখিত এর লেখক হযরতের সঙ্গী হামিদুদ্দীন নার্নূলীর বংশধর ছিলেন।

৩। 'রিসালা' হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগার খাদিম মঈন উদ্দীন ১১৩৪ হিজরী ১৭২৩ ঈ. মুর্শিদাবাদের মুর্শিদ কুলীখানের (১৭১৭-২৭) উদ্যোগে প্রণয়ন করেন। এই উভয় গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়েছে। গোলাম সলীম ১৭৮৮ঈ. ফারসীতে রচনা করেন 'রিয়াজুস সালাতিন'। ১৯০৪ঈ. এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন মৌলভী আব্দুস সালাম। আকবর উদ্দীন অনুদিত গ্রন্থটির বঙ্গানবুদ 'বাংলার ইতিহাস' বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গোলাম সলীমের গ্রন্থটি আধুনিক ইতিহাসের প্রামান্য সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন নলীনী কান্ত ভট্টাশীল, ড.এম.এ.রহিম ও ড. আব্দুল করিম প্রমুখ ঐতিহাসিক।[৪৩]

৪। সোহেল ই ইয়ামন সিলেটের তৎকালীন মুন্সেফ নাসির উদ্দীন হায়দার ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় এবং প্রচলিত উপমহাদেশীয় গ্রন্থাটি ও স্থানীয় ঘটনাবলী অবলম্বনে লিখেন। প্রধানত এই গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্তী জীবনী সকল লিখিত হয়েছে।

১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সেফ শান্ত চন্দ্র দে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী লেখেন।

৫। ইলাহী বকস বাংলা ভাষায় সোহেল ই ইয়ামন গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। ১৮৭১ঈ.

৬। তাওয়ারিখে জালালী নামে মৌলভী নাসির উল্লাহ সোহেল-ই-ইয়ামনীর উর্দু অনুবাদ বের করেন।

৭। তাওয়ারিখে জালালী নামে উর্দু ভাষায় ভাদেশ্বরের মৌলভী মবশ্বির আলী আর একটি জীবনীগ্রন্থ লিখেন।

৮। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটের তৎকালীন কালেকটর লিওসে তার আত্ম জীবনীতে হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রেখেছেন তাতে দেখা যায় যে, কালেক্টরের প্রথমত দরগা জিয়ারত পূর্বক কাজ শুরু করতে হত।

৯। ডক্টর ওয়াইজ ১৮৭৩ খ্রিঃ সুহেল-ই-ইয়ামন অবলম্বনে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে হযরত শাহজালাল সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন।

১০। হান্টার সাহেব ১৮৭৩ সালে w.w. Hunter Satistical Account of Assam নামক গ্রন্থে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ঐ বছর কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করে H. Block mann এর Contribution to the Geography and History of Bengal (Mohammadan period) এ গ্রন্থে ও হযরত শাহজালাল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

---

৪৩. আল ইসলাহ, হযরত শাহজালাল সংখ্যা (জানুয়ারী-মে ২০০৪), পৃ- ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে Clolonel H. Yule ইবনে বতুতার সফরনামা ভিত্তিক দীর্ঘ গবেষনা নিবন্ধ The Geography of Ibn Batuta's trabels in India প্রকাশ করেন The Indian Antiquareg (Jaurnal of Research) এ।

১১। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে চোয়াল্লিশ পরগনার দুল্লভপুর নিবাসী কাজী মুহাম্মদ আহমদ 'শ্রীহট্ট দর্পণ' নামে শ্রীহট্টের এক ইতিহাস লেখেন। ঐইতিহাসে ও হযরতের জীবনী আলোচিত হয়েছে। ঐ পুস্তক হামিদ বখত মজুমদার কর্তৃক ফারসীতে লিখিত 'আইন-ই-হিন্দ' নামক ভারতের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত হয়। বর্তমানে আইন-ই-হিন্দ দুস্প্রাপ্য।

১২। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ (১৩০৮ সালে) রমনী হোমন দাস এম.এ (পরে রায় বাহাদুর ও District Magistrate) আরতি পত্রিকায় পীর শাহজালাল মুজাররদ নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৩। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বরায়া পরগনার বাগর খলা নিবাসী মুন্সী আব্দুর রহীম 'শ্রীহট্ট নুর নামে হযরত জীবনী লেখেন। হযরতের জীবনী সম্বন্ধে এটি একটি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ।

১৪। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে শমসের নগর পরগনার বাড়ই গাও নিবাসী পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর আব্দুল ওহাব চৌধুরী 'শ্রীহট্টে শাহজালাল' লিখেন।

১৫। স্যার এড ওয়ার্ড গেইট তাঁর 'হিষ্ট্রি অব আসাম' (১৯০৪) ও মি. বি.সি. এলেন সিলেট ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৫) পুস্তকে ডক্টর ওয়াইজের প্রবন্ধ অনুসরন করেন।

১৬। ১৯০৪ - ১৯০৫ সালে বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায়। পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ফকির শাহজালাল নাম দিয়ে দুইটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখেন। রজনী রঞ্জন দেব বি.এ. হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'মৈত্রী' নামক পত্রিকায় হযরত সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন।

১৭। ঐ সকল প্রবন্ধ পরিবর্ধিত করে তিনি ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে 'শাহজালাল' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে ঐতিহাসিক দের দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে হযরতের জীবনী আলোচিত হয়েছে।

১৮। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে অচ্যুত চরন চৌধুরী তত্ত্বনিধি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রথম খন্ড প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রধানত পদ্মনাথ বাবুর প্রবন্ধ অবলম্বনে হযরতের জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে গোটিটিরক নিবাসী ইব্রাহিম আলী সাব রেজিষ্ট্রার শাহজালাল সম্বন্ধে 'শ্রীহট্ট বিজয়' কাব্য লিখেন।

২০। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুফতি আজহার উদ্দিন আহমদ History of Shah Jalal and his Khadims লিখেন। তিনি পরে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি' নাম দিয়ে ঐ গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ বের করেন। হযরতের জীবনী সম্বন্ধে উহাই সবচেয়ে প্রামানিক গ্রন্থ। ১৯২১ সালে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর 'হযরত শাহজালাল' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২২

Dhaka University Institutional Repository

সালে প্রকাশিত নলিনী কান্ত ভট্টাশালী এর "Chronology of Early Idependent Sultans of Bengal" গ্রন্থে হযরত শাহজালাল সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২১। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তাদেশ্বরের সু সাহিত্যিক আব্দুল মালিক চৌধুরী 'শ্রীহট্টে শাহজালাল' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। হযরতের জীবনী সম্বন্ধে ইহা একখানি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ তিনি এর পূর্বে কাকিনার কবি ফজলুল করিম সম্পাদিত 'বাসনা' পত্রিকায় হযরত সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন।

২২। ১৯২৯খ্রিষ্টাব্দে মুন্সিবাজারের মুন্সী আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন 'হযরত শাহজালালের কেচ্ছা' পদ্যে লিখেন।

২৩। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে চারুচন্দ্র চৌধুরী 'আদর্শ চরিতাবলী' সিরিজে 'ছেলেদের জন্য শাহজালাল' লিখেন।

২৪। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জৈন্তাপুরের উকিল সুরেন্দ্র কুমার দাস চৌধুরী 'শাহজালালের মাটি' লিখেন।

২৫। জৈন্তার মুন্সী আব্দুল আজিজ 'হযরত শাহজালাল' নামে কবিতায় একখানি জীবনী লিখেছেন। এইসব গ্রন্থ এখন দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য।

২৬। ১৯৫৭-৫৮ খ্রিষ্টাব্দে নুরুল হক সম্পাদিত আল ইসলাহ পত্রিকায় হযরত শাহজালাল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৪৪]

২৭। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ড. আব্দুল করিম 'স্যোসাল হিষ্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল' গ্রন্থে হযরত শাহজালাল সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

২৮। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ড. এম.এ. রহিম 'সোস্যাল এন্ড কালচারাল হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নামে বাংলা একাডেমী ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাতেও শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে মুল্যবান আলোচনা করা হয়েছে।

২৯। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ মুর্তাজা আলী 'হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস' সম্বন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার প্রথম সংস্করন বাংলা একাডেমী ১৯৬৫ সনে প্রকাশ করে।

৩০। ১৯৮৩ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক জনাব এ.জেড.এম. শামসুল আলম প্রণীত ২৩৩+১১ পৃষ্টায় 'হযরত শায়খ জালাল' গ্রন্থটি এই বিষয় লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট গবেষণা গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। খোশরোজ কিতাব মহল লিমটেড ঢাকা হতে উক্ত লেখকের বইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্কারণ ১৯৮৮ ও ১৯৯৬ সনে 'হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.)' নামে প্রকাশিত হয়। [৪৫]

---

৪৪. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৬৪-৬৭

৪৫. হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ- ২৩২- ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৩১। ১৯৮৭ সনে ইফাবা কর্তৃক জনাব দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রণীত 'হযরত শাহজালাল' একটি ব্যতিক্রম ধর্মী গবেষণা মুলক গ্রন্থ। লেখক হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি এক ও অভিন্ন প্রমাণ করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। এ বিষয় যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত লেখক কর্তৃক 'জালালাবাদের কথা' গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী ১৯৮৩ সালে প্রকাশ করে। হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস সম্পর্কে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

৩২। আব্দুল ওহাব চৌধুরী বড়াইগ্রাম শমসের নগর মৌলভী বাজার 'হযরত শাহজালাল' গ্রন্থ রচনা করেন (১৯০৫ঈ.)

৩৩। আব্দুল বারী চৌধুরী এম.এল.এ এম.পি.এ সুনামগঞ্জ লোকাল বোর্ডের প্রথম মুসলিম চেয়ারম্যান, জন্ম আশার কান্দি, জগন্নাথপুর (১৯০১ - ১৯৫০) শাহজালাল (রহ.) গ্রন্থ রচনা করেন।

৩৪। আব্দুল আজিজ মাষ্টার (১৮৯৩-১৯৬০) কানইঘাট সিলেট হযরত শাহজালাল (রহ.) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (১৯৫৫)।

৩৫। মুসলিম চৌধুরী ছৈলা, ছাতক (১৯১১-১৯৯৪) 'উজ্জল এক পায়রা' ১৯৮০।

৩৬। মুহাম্মদ নুরুল হক (১৯০৭ -১৯৮৭) দশঘর, বিশ্বনাথ আজীবন সম্পাদক আল ইসলাহ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্রীয় মুসলমান সাহিত্য সংসদ 'হযরত শায়খ জালাল মুজাররদ এর শিষ্যগণ' ১৯৮২।

৩৭। সৈয়দ মোস্তাক কামাল জন্ম সু প্রসিদ্ধ তরফের মাসাজান ১৯৪৬, শিকড় সন্ধানী লেখক, হাল আমলের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক, মরমী লেখক গবেষক, গবেষণা সংগঠক, কলামিষ্ট। প্রকাশিত সম্পাদিতগ্রন্থ সমূহ 'হযরত শাহজালাল ও তার কারামত' ২৫তম সংস্করণ এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের সাতশত বছর পূর্তি উপলক্ষে সংশোধিত পরিবর্ধিত শোভন সংরক্ষণ ২০০৪ বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

৩৮। 'শ্রীহট্ট জ্যোতি' জনাব রিয়াছত আলী ১৯৬২ ইং। তিনি ছবির সাহায্যে মাঝে মধ্যে দুর্লভ ও ঐতিহাসিক বিষয় উপস্থাপন করেছেন।

৩৯। আলহাজ্ব কাজী গোলাম রহমান ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'হযরত শাহজালাল ও শাহপরান' নামক ১৫৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটি সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন মাওলানা মোঃ ইউনুস ও মাওলানা মাজহার উদ্দিন প্রমান্য সূত্রের উল্লেখ থাকলে বইটা প্রমান্য বলে স্বীকৃতি পেত।

৪০। খন্দকার মাওলানা বশির উদ্দিন কতৃক লিখিত ঢাকার বিউটি বুক হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠার ১৩৮৮ বাংলাতে প্রথম প্রকাশিত হয় 'হযরত শাহজালাল'।

৪১। চৌধুরী গোলাম আকবার সাহিত্য ভূষণ ১৯৮১ সালে 'ইসলাম জ্যোতি ও হযরত শাহজালাল' লিখেছেন। আলী মাহমুদ খান ১৯৮৪ সনে 'প্রাচ্য সূর্য হযরত শাহজালাল' লিখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪২। মাওলানা শাহ ওলী উল্লাহ্‌ ১৯৮৫ সনে হযরত শাহজালাল নামে একখানা পুস্তক লিখেছেন। ঢাকা বুক কর্পোরেশন থেকে প্রকাশিত মোট পৃষ্ঠা- ২৪০।

৪৩। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড এবং ইসলামী বিশ্বকোষ ২৩তম খন্ডে শাহজালাল (র.) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী মনিষীরা স্বীয় পুস্তকে আংশিক হলেও গুরুত্ব পূর্ণ তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকজন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত শামসুদ্দীন আহমদের ইনসক্রিপশন অব বেঙ্গল (ভল্যুম ৪) গ্রন্থে হযরত শাহজালাল সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. হাসান জামান সংকলিত ও ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সম্পাদিত পাকিস্তান এন এন্থলজী গ্রন্থে মীর মোহাম্মদ আনোয়ার আলী এবং মর্তুাজা আলীর 'সেইন্টস অব বাংলাদেশ' ১৯৭১ এ হযরত শাহজালাল সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

ঢাকার নওরোজ কিতাবিস্তান প্রকাশিত 'সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ' (১৯৬৯) বি.এন.আর প্রকাশিত 'কয়েকটি জীবন' পৃ- ১-১৭ ও সমাজ ও ঐতিহ্য সংকলন গ্রন্থে ১৯১১ এবং ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রণীত ইসলাম প্রসঙ্গ গ্রন্থে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী উল্লেখিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষের ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ঐতিহাসিক অভিধান ও চরিতাভিধান। ডক্টর আব্দুল করিমের 'বাংলার ইতিহাস' (সুলতানী আমল) ১৯৭৭ বাংলার সুফী সমাজ ১৯৮০। ডক্টর ওয়াকিল আহমদের মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক- ১৯৬৮। ১৯২১ কলকাতাস্থ মুসলিম ওরিয়েন্টেল প্রিন্টার্স এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক কবি মোজাম্মে হকের সহায়তায় অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খানের হযরত শাহজালাল (পৃ-৪৮৪) প্রকাশিত হয়। মৌলানা নুর মোহাম্মদ আজমীর হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস ও ড. এনামুল হকের সুফিজম ইন বেঙ্গল বঙ্গে সুফী প্রভাব প্রভৃতি গ্রন্থেও হযরত শাহজালাল (রহ.) জীবনী আলোচিত হয়েছে। এস.এম. একরাম এবং আবে কাওসার (উর্দু) সাদেক শিবলী জামানের বাংলাদেশের সুফী সাধক ও ওলী আউলিয়া ১৯৮১ আ.ন.ম বজলুর রশিদ প্রণীত আমাদের সুফী সাধক (১৯৭৭) আব্দুল জলিল প্রনীত পাক ভারতের আউলিয়া (১৯৭০)।

বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি ঐতিহ্যতথা রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকায় হযরত শাহজালাল ও তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে এখানে আর কয়েকটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করে এ বিষয় শেষ করতে চাই।

জাতীয় অধ্যাপক মুহাম্মদ মুনসুর উদ্দীন আহমদের হারামান ৮ম খন্ড (১৯৭৬) পৃ ১৮, ড. নাজিম উদ্দীনের ইসলামিক 'হরিটেজ অব বাংলাদেশ' (১৯৮০)। ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১) ১৯৬৮। ড.মুহাম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' ১৯৬৫ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৬৬)।[৪৬]

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মুহাম্মদ মুতিউর রহমানের আয়না-ই-ওয়াইসী ১৯৭৬ (উর্দু) পাটনা। অধ্যাপক আনোয়ারুল করীমের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক' সৈয়দ আলী আশরাফ এর 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য' (১৯৭০) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাংলা সাহিত্যের কথা'।

আব্দুল জলিল বিসমলের 'শায়খ সাইয়্যেদ জালাল মুজাররদ' (সিলেট ১৩৮৭ হিঃ), মুহাম্মদ আব্দুল্লাহর 'বাংলাদশে ফারসী সাহিত্য', এ.এইচ. দানী মুসলিম আর্কিটেক্ট অব বেঙ্গল, ফকির আব্দুর রশীদের 'সুফী দর্শন'। ড. ওয়াকিল আহমদের 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' আবিদ আলী খানের 'মোমোয়ার্স গৌড় এন্ড পান্ডুয়া' ষ্টাপলটন অনুদিত ১৯৭৭। ড. আহমদ শরীফের 'মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' ১৯৭৭। জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মাঃ আজরফের 'ব্যাক গ্রাউন্ড অবদি কালচার অব মুসলিম বেঙ্গল' ১৯৭৯ইং, ইসলাম ও মানবতাবাদ ১৯৮০ (ই.ফা.বা) সিলেটের ইসলাম ১৯৯৫। (ইফাবা) বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য' শরীফ উদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় জুলাই ১৯৯৯ গ্রন্থে ও হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য প্রসিদ্ধ মিসরীয় পর্যটন ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৮) ১৩৪৬ ঈসায়ীতে সিলেটে হযরত শাহজালালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সফরনামা চতুর্দশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে আরবীতে রচিত হয়। এ গ্রন্থে উল্লিখিত প্রামাণ্য বিবরণ উত্তরকালে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনী লেখকগণ গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ নাসির আলী, ইবনে বতুতার সফরনামা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।[৪৭]

---

৪৭. আল ইসলাহ পৃ- ৭৭, ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতে শাহজালাল (রহ.)

হযরত শাহজালাল (রহ.)

আজ থেকে সাতশ সাত বছর পূর্বে (১০০৩-২০০৯) হযরত শাহজালাল (রহ.)ও তাঁর সাথী তিনশত ষাট জন আধ্যাত্মিক রাজধানী নামে খ্যাত পূণ্যভূমি সিলেটে আসেন। বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারে রয়েছে তাদের সীমাহীন অবদান।

আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সাথী তিনশ ষাট আউলিয়ার প্রভাব সীমাহীন। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবন ও শান নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক গ্রন্থ, পুথি-পুস্তক গান গজল কাসিদা ও কবিতা। এসব বিষয় নিয়ে বাস্তিরারিত লিখতে হলে হাজার পৃষ্টার গ্রন্থ প্রণয়ন প্রয়োজন এ মহান দরবেশের নামে দেশে বিদেশে কত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মক্তব মাদরাসা মসজিদ স্কুল কলেজ, ইউনিভার্সিটি হল হোষ্টেল জনপথ, সংঘ, সংস্থা, হোটেল, রেস্তোরা, শহর, উপশহর, একাডেমী, এসোসিয়েশন, ব্রীজ, কালবার্ট যানবাহনের নাকরণ করা হয়েছে এর সংখ্যা পরিসংখ্যান নিরূপন করা রীতিমত গবেষণার বিষয়।

মনে রাখা প্রয়োজন এজনপদে হযরত শাহজালাল (রহ.)'র আগমন ইতিহাসের নিছক মামুলী কোন ঘটনামাত্র নয়, তার আগমন নিপীড়িত, নিগৃহীত, অত্যাচারিত, মজলুম মানবাত্মার আহাজারী ও ফরিয়াদের ফসল। তাঁর আগমনে ইতিহাসের বাক পরিবর্তন হলো। শুরু হল অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তোরন। যুগ যুগ ধরে বাংলা ও আসামের আদম সন্তানের কলবে যে ব্যাধি বিরাজ করছিল তাওহীদ ও রিছালাতের সুমহান বাণী শ্বাশত মূল্যবোধের কালজয়ী আদর্শ নিয়ে তাঁর আগমন শিফা হিসেবে কাজ করল, উত্তরণ ঘটল জাগতিক ও আধ্যাত্মিতার সকল দিগন্ত প্রান্তরে।

এ পর্যায়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) কে নিবেদিত কয়েকজন কবির কাবাংশের উদ্ধৃতি দেবো। যদিও তা মহান দরবেশের শানে নিবেদিত কাব্য কর্মের বিশাল সিন্ধুতে বিন্দুর মতো।

১. তুমি রহমতের নদীয়া
দোয়া কর মোরে হযরত শাহজালাল আউলিয়া
যেই দেশে আছিলা রাসুল দয়ার পারাবরে
সেই দেশহইতে আইলায় তুমি ইনসাফ আল্লার
সিলেট ভূমি ধন্য হইল
তোমার পরশ পাইয়া।।
জায়নামাজ বিছাইয়া জলে সুরমা দিলায় পাড়ি

Dhaka University Institutional Repository

শুইনা রাজা গৌড় গোবিন্দের দিশা গেল উড়ি
উঠিলো জয়ধ্বনি আকাশ কাঁপাইয়া।
কতরোগী হইলো ভালা খাইয়া ঝরণার পানি
কাজল বরন কৈতর উড়ে মুইছা মনের গ্লানি
কত পাপী পায়গো নাজাত তোমার দর্গায় যাইয়া।

---- দিলওয়ার।

২. বঙ্গদেশের বড় ওলী শাহজালাল পীর
আনন্দে বিদায় দিয়া আমার কর স্থির।
আমি তোমার তুমি আমার আর তো কেহ নাই
জন্মের মতে বিদায় হয়ে মদীনাতে যাই
ছহীফা খাতুন হাজী বিবি হাছন রাজার বোন।

৩. আরবের মাটি পাকপুত খাটি সাথে নিয়ে শাহজালাল
এলেন সিলেটে তুল্য মাটি পেয়ে জ্বালেন দ্বীন মশাল।
প্রচার করেণ সাম্য মৈত্রী মহামিলনের বাণী
সেই সে সিলেটে জনম লভিয়া নিজেরে ধন্য মানি

---- ফজলুর রহমান।

৪. কৃপা গুণে দেখাও তোমার ছুরত জামাল
বাবা শাহজালাল।
তোমার দরগায় কান্দে অনাথ কাঙ্গাল।।
আল্লাহর মাহবুব তুমি ওলীগুণ ধাম
পাক জুনাবেতে ভেজি হাজার ছালাম।

---- আব্দুল আজিজ মাষ্টার।

৫. এলে তুমি লয়ে মুজদা নবীন বাদশা পীর
শত অনাচার তোমার চরণে নুয়ালো শির
আছিল যাদের চিত্ত পাতক পাংকলীন
তুমি এসে দিলে পুণ্য বিমল জ্ঞান নবীন।

--- কবি আব্দুর রাজ্জাক।

৬. তোমার পুণ্যে সিলেট ধন্য
আরিফ শ্রেষ্ঠ শাহ জালাল
দিকে হতে দিক করছে মুখর
তোমার দীপ্ত রূহ জামাল।

----কবি আব্দুর রকীব (রকীব শাহ)

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাবা শাহজালাল ইয়ামনী
মুর্শিদ শাহজালাল ইঁয়ামনী, তুমি গুণের গুণমনি
সয়াল জুড়িয়া তোমার নামের উঁড়ে ধ্বনি।
-------- সারীগাণ।

৮. শাহজালাল শাহজালাল
আঁধার সিলেটে তুমি এনে দিলে
দ্বীনের নওহেলাল
শাহজালাল শাহজালালা
দুর ইয়ামনের অরুনকান্তিত
মরমে আনিলে পরম শান্তি
দেখাইলে পূত পবিত্র জীবন
আমাদের তুমি নওবেলাল
শাহজালাল শাহজালাল।
---- আমীনুর রশীদ

৯. তোরা শোন সেই আজান ধ্বনি আজও হইতাছে
ছিলট পরথম আজান ধ্বনি বাবার দিয়াছে।
ছিলট পরথম আজান ধ্বনি
শোনাইলা জালাল ইঁযামনী রে
সেই ধ্বনিতে পাথর গইলা পানি হইয়াছে।
রাজা ছিল গৌড় গোবিন্দ
বাবার পথ করিল বন্ধরে
জায়নামাজ বিছাইয়া সুরমা পাড়ি দিয়াছে।
--------গিয়াস উদ্দিন আহমদ

১০. তুমি এনেছিলে ঈমানের আলো
আখেরী নবীর এই নয়া মদীনাতে
সত্য সাধক জালালী ফকীর
হযরত শাহজালাল .
---- কবি ফররুখ আহমদ

১১. ধন্য তুমি দ্বীনের ফকীর ফকীর শাহজালাল
করেছে সারা আজম আলো তোমার রং মশাল।
ধন্য সে দেশ যে দেশেতে রাখছ তোমার পাও।
ধন্য সে দেশ যাহারা বুকে রাখছো পাকি গাও।
----- রওশন ইজদানী।

Dhaka University Institutional Repository

১২. এসেছ কি হেথা তুমি
উয়ায়েস ইশকে কাবার গিলাপ চুমি?
য়্যামন করনে মরুভূ লংগি গিয়েছে কি মদিনায়
সেথা কি নবীর এরশাদ নিয়ে এলে এই বাংলায়।
----- শাহ মুত্তাফিজুর রহমান।

১৩. বাবা শাহজালাল আউলিয়া
বাদশাহ শাহ জালাল আউলিয়া
বঙ্গভূমি পাইলো নাজাত তোমায় বুকে পাইয়া।।
শত শত লোক আসে তোমার মাজারে
বিনয় করি দোয়া মাঙে আল্লাহর দরবারে
দীলের কথা জানায় তাকে তোমারে ধরিয়া।।
তোমার বাণী লইয়া ঠোটে হাজার কবুতর
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায় দেশ দেশান্তর
সময় মতো আসে তারা বাসাতে ফিরিয়া।।
----------- দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী

১৪. তুমি আউলিয়ার ছরতাজ তুমি কুতুবে রাব্বানী
দয়ার ভান্ডার বাবা শাহজালাল ইয়ামনী
অসত্যের আন্দাইরে আইলো সত্যের চন্দনী
অধর্মের ইমারত ভাঙ্গে শুইনা আজান ধ্বনি
বাবা শাহজাজলাল ইয়ামনী।
------- এ.এইচ. ফয়জুল হাসান

১৫. কোমলের দেশে সবুজের বেশে একি জ্বলওয়ার লালী
শ্যামল কিশলে এলো কি ফাগুন নিয়ে কুসমের ডালি?
পেশানীতে যার জুহল তারার টাকা
পেশানীতে যাঁর নবী করীমের স্নেহ চুম্বন লিখা
বঙ্গাসামের সেই বীর আবদাল আসে আউলিয়া
বাহিনীর আগে হযরত শাহজালাল
---- মুকাখখারুল ইসলাম

১৬. তিনব বাইট আউলিয়ার দেশে কড়ার কাঙাল বেশে
আইলেন আজিব আল্লা ওয়ালা কেউ না চিনে কে-সে।
আইলেন আজিব আল্লা ওয়ালা কেউ না চিনে কে সে।
আইলেন আজির আল্লা ওয়ালা খিলকা দিয়া গায়
রাজার আসন হেলেদুলে আঙ্গুল ইশারায়।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাওয়ালা আল্লাহর ফকীর আল্লাহর বাণী মুখে
পাক ইমানের কুওত এবং তৌহিদী জুশ বুকে।

---- রওশন ইজদানী।

১৭। সুরমা গাঙের পারে বন্ধু আমার ঠিকানা
শাহজালাল যে মাটিতে বসাইলেন আস্তানা
এই মাটিতে শুইয়া আছেন বাবা শাহজালাল
দোয়া নিতে আসেন রাজা, আসে যে কাঙ্গাল
আইলে হেথায়, পাওয়ারে যায় মনে শান্তনা
সুরমা গাঙের পারে বন্ধু আমার ঠিকানা
মসজিদের ই পাশে মাজার শাহজালাল বাবার
জিয়ারতে হইবো রে দুর মনের অন্ধকার
হাজার ফকির সাধু দরবেশ চেয়ে আনাগুনা
সুরমা গাঙের পারে বন্ধু আমার ঠিকানা।
হেথায় বন্ধু আমীর ফকীর কোন তফাৎ নাই
বাবার চরণ ধুলা পাইয়া ধন্য যে সবাই
আমি অধম কপাল দোষে তাঁরে চিনলাম না
সুরমা গাঙের পারে বন্ধু আমার ঠিকানা

--- মোহিবুর রহমান মোহাম্মদ

১৮. হে দরবেশ
বহু যোজনের পথ পেরিয়ে এলে সিলেটের বুকে
তাওহীদের ঝান্ডা হাতে কালেমার বাণী মুখে।
নুরানী তোমার আলোর জ্যোতিতে চারদিক হল আলো
সেই আলোতে দুর হয়ে গেল মিথ্যার যত কালো
গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদ চুড়ে হানিল ন্যায়ের বান
দাম্ভিক রাজার মিথ্যা অহমিকা ভেঙে হল খান খান
আযানের সুরে প্রাসাদ ভেঙে হয়ে গেল চুর চুর
ঐশী সে দুর ধ্বনিতে হল সপ্ত পাড়া দুর
হাতেতো তোমার অস্ত্র ছিল না, ছিল যে, ঐশি বাণী
সেই বাণীতে ধুয়ে মুছে গেল শত বছরের গ্লানি।

--------- গালীব পাশা

১৯. আজকে হে বর, পারে যদি এসো একটি বার
দেখে তুমি অবাক হবে অন্যায় অবিচার।
মুসলিম আজ নামটি শুধু সার

Dhaka University Institutional Repository

শেরেক বেদাত আজ তারি কন্ট হার
দলিত, লাঞ্ছিত, গাফলাতিতে সে যে নতশির,
জীবন মৃত মুসলিম জাতি নহে সে আর বীর
ইসলাম নাই শুধু রয়েছে কঙ্কাল
ফরিয়াদ শুনো ওহে শাহজালাল
হে খোদা বারেক তুমি কর কবুল মোদের মোনাজাত
আকুল চিত্তে ডাকি তোমায় জোড় দুটো হাত
পাঠাও পুণঃ এক বজ্রপুরুষ বীর
উঠুক আবার গগণ ভেদী নারায়ে তাকবীর

--- ডাঃমোহাম্মদ ফুদয়ত উল্লাহ।

২০. ইসলাম প্রচার করতে জালাল এলেন বাংলাদেশে
শান্তি সুখের মধুর বাণী উড়লো অবশেষে।
অত্যাচারী গৌড় গোবিন্দ মুসলমানের তরে
বিনা দোষে তাদের উপর অত্যাচার যে করে।
বুরহানেরই সুখের স্বপ্ন ধুলায় গেল মিশে
গৌড় গোবিন্দের রাজ্যে তখন শান্তি দিল কিসে?
ঠিক তখনই জালাল বাবা সিলেটেতে এলে
গৌড় গোবিন্দ প্রাণটি নিয়ে সবই গেলো ফেলে
মধুর সুরে আযান যখন চারিদিকে পড়ে
গৌড় গোবিন্দের সোনার প্রাসাদ সবই গেলো ঝরে।
এমনি ভাবে বিনা যুদ্ধে ইসলাম দেশে আসে
শ্রীহট্টের মানুষ তখন প্রাণটি খুলে হাসে।
সব বিজয়ের মূলে ছিলেন সবার আগে যিনি
বিশ্ববাসীর গর্ব যে ভাই শাহজালাল (রহ.) তিনি

---- নাজমুল হক চৌধুরী

২১. দরবেশ তুমি কহ আজ কোন ভালবাসা দিয়ে
এই বাঙলার বুকে এসে ছিলে মরু আরবদের নিয়ে।
কোন সুরে তুমি পড়িতে কোরান তাহার মধুর বোলে
ভুলি ব্যবধান সকলি মানুষ চরণে পড়িল ঢুলে।
হাজার যুগের মিথ্যার আর অন্ধ ধরম রীতি
পদাঘাতে নর ছুটিয়া আসিল শুন তব কোন গীতি

Dhaka University Institutional Repository

জড় পুতুলের পুজা করে যারা আছিল পুতুল হয়ে
কেমন করিয়া গড়িল এ জাত তুমি তাহাদের লয়ে।
জায়নামাজের পটি পাটি ছিল ক্ষুদ্র পরিসর।
অর্ধেক বাংলা বসাইলে তুমি কোন বলে তারিপর?
সুদুর আরব মরুপারাবার খজ্জুর ছায়াতলে
উঠেছিল সেই এক পালি চাঁদ নাহিয়া জোছনা জলে।
ডালিম শাখার বসিয়া দোয়েল গাহিতে তাহার গান
খোমার পাতা দোলিত বাতাসে শুনি সেই মধুর তান।

যে চাঁদেরে বেঁধে দিয়ে গেলে বাঙলার আসমানে
আজো সে আঁধারে ছড়ায় জোছনা সবখানে সব প্রাণে।
দরবেশ তুমি কহ কহ আজ কোন বাণী শিখেছিলে
এই বাঙলার শ্যামল বুকেতে আরবের এনে দিলে।
কবে তুমি সেই প্রথম ফজরে দাঁড়ায়ে মিনার পরে
নিখিল নরেরে ডাক দিয়েছিলে আজানের মধু সুরে
আজো সেই সুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া মানুষের বুকে বুকে
খোদা তালার আরশের পরে মুরছি পড়িছে সুখে।
বহু পথ ঘুরে আসিয়াছি আমি তোমার কবর পরে
শিখিতে এসেছি কোন ডাকে তুমি ডাকিতে নিখিল নরে। [৪৮]

----- পল্লী কবি জসীম উদ্দিন।

উল্লেখ্য বাংলা সাহিত্যের সার্থক পল্লী কবি জসিম উদ্দীন খুব সম্ভব কোন এক সময়ে শাহজালাল (রহ.) এর কবর জিয়ারতে করতে সিলেট এসেছিলেন। লিখেছিলেন শাহজালালের কবরে শিরোনামে ২৪ পংক্তির একটি কবিতা। আল ইসলাহ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল হক সাহেব কবিতাটি দিয়েছিলেন আল ইসলাহ প্রকাশের জন্য। যথারীতি প্রকাশিত হয়েছিল চতুর্থ বর্ষ সংখ্যাতে কার্তি ১৩৪৬ সনে।

---

৪৮. আল ইসলাহ শাহজালাল সংখ্যা, (জানুয়ারী- মে, ২০০৪) পৃ- ৬৭-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও পত্রিকা সম্পাদকীয়

ওলীকুল শিরোমণী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওলী হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলা ও আসাম অত্র জনপদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নিয়ামত ও রহমত। প্রকৃত নায়িবে নবী তথা ওরাসাতুল আম্বিয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ইসলাম ও মানবতার সেবায় সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার সঙ্গী সাথীগণ ছায়ার ন্যায় তাকে অনুসরণ ও সাহচার্য লাভে ধন্য হয়েছেন। তার ইন্তেকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সাতশত বছরে পদার্পণ করেছে। কিন্তু অদ্যাবধি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তাকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও আলোচনা সভা হয়েছে বলে মনে হয় না।

জাগতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.)। খিদমতে খলক তথা জনসেবা এবং দায়ী ইলাল্লাহ তথা ইসলাম প্রচারের মহান ব্রত ছিল তাঁর জীবনের প্রকৃত মিশন। কথায় বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। হযরত শাহজালাল (রহ.) কে জাগতিক কোন প্রকার লোভ স্পর্শ করতে পারে নি। ত্রিবেণীতে নাসির উদ্দীন ও সিকন্দার গাজীর সাথে মিলিত হয়ে শ্রীহট্ট বিজয়ের পর তাঁকেই হযরত শাহজালাল এখানের শাসকর্তা নিযুক্ত করার কথা জানালেন। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন দিল্লীর সম্রাট আলা উদ্দীন হযরত শাহজালাল (রহ.) কে বাংলা, আসাম ও সিলেট অঞ্চলের নবাব মনোনীত করে সনদসহ একজন উজীরকে পাঠালেন তাঁর খেদমতে। উজীর শাহজালালের কাছে এ প্রস্তাব পাঠালেন তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন দুনিয়াবী বাদশাহীতে আমার কিহরে, খসরুর রাজপ্রাসাদ কি ধুলায় বিলীন হয়ে যায় নি? কোথায় আজ আসিরীয়, মিশরীয়, রুশীয়, ব্যাবিলনীয় ও চৈনিক সভ্যতা? কোথায় সম্রাট আলেকজান্ডার? আমি নবাবী চাই না শুধু চাই সেই আল্লাহকে যিনি সারা জাহানের মালিক। তারপর উজীর সিলেটের জায়গীর দানের প্রস্তাব করেও ব্যর্থ হলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) বললেন, লোভের পরিনাম কম বেশীতে কিছু যায় আসে না। এতে আসক্তি আসবেই এবং তাই ডেকে আনবে মৃত্যুকে। অবশেষে হযরতের ইজ্জতে সিলেট শহরকে 'কসবে সিলহেট' নিস্কর ঘোষণা করা হল। এ পর্যন্ত মানুষ সিলেট শহরকে নিষ্করই ভোগ করে আসছে।

দিল্লীর সম্রাটের পক্ষ থেকে নবাবী ও জায়গীর প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান। পরিশেষে তারই সম্মানার্থে কসবে সিলহেটে দিল্লীর সম্রাটের পক্ষ থেকে কম কথা নয়। যা যুগ যুগ ধরে মুসলিম আমলের দিল্লীল সম্রাট আলা উদ্দিন ও তার শাসনামলকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখবে আবহমানকাল পর্যন্ত। তাছাড়া মুসলিম শাসনামলের শিলালিপির মাধ্যমে ও মহান ওলী শাহজালাল (রহ.) সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত লাভ করা যায়। তারপর থেকে বৃটিশ, পাকিস্তান এবং

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বাংলাদেশ আমলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জিয়ারত ও অট্টালিকা নির্মাণ ব্যতিরেকে সুদূর প্রসারী কোন প্রকার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বল মনে হয় না।

বেসরকারীভাবে সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই মহান ওলী শাহজালাল (রহ.) সম্পর্কে আল ইসলাহ পত্রিকার মাধ্যমে "শাহজালাল সংখ্যা" বের করে যুযোপযোগী ও প্রশংসনীয় একটি গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছে। আল ইসলাহ পত্রিকার আজীবন সম্পাদক মরহুম জনাব নুরুল হক এ ব্যাপারে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। বিগত ২০০৩ সালে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাতশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উক্ত সংসদ কর্তৃক বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান এ কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে বলিষ্ট ভূমিকা পালন ও সংসদের উন্নতি কল্পে অর্থায়ন ও পৃষ্টপোষকতা করেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ কোন এক জনসভায় হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্মানার্থে সিলেটকে বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। আমার মতে এ ঘোষণাকে পরবর্তী সরকারগণ ইচ্ছে করলে অথবা এরশাদ সরকার ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রীয় রেকর্ড পত্রে সংযোজনসহ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা পেশ করা হল।

১। জাতীয় শিক্ষাক্রমে এ মহান ওলীর জীবন ও কর্ম অন্তর্ভূক্তি করণ।
২। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক ঘোষিত 'বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেট'-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।
৩। সরকারী ব্যবস্থাপনায় তাঁর ওফাত দিবস পালনসহ গেজেট প্রকাশ করাও এখন সময়ের দাবী।

২০০৩ সালে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের সাতশত বছর পূর্তি (১৩০৩-২০০৩) উপলক্ষ্যে র‍্যালী ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

শাহজালাল (রহ.) এর মহান জীবন ও কর্মক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান

১৮ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, সকার ১০টায় শুরু হয় নগরীর সুরমা নদীর তীরবর্তী শাহজালাল ঘাট বা শেখ ঘাট থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালী। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক এ বিশাল র‍্যালীতে সিটি মেয়র বদর উদ্দীন আহমদ কামরান জেলা বি.এন.পির সভাপতি এম.এ. হক সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক চৌধুরী, মহানগর জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান, প্রপেসর কবি আফজাল চৌধুরী, অর্থ মন্ত্রীর একান্ত সচিব কাইয়ুম চৌধুরী বিভাগীয় কমিশনার আব্দুসসালাম খান, জেলা প্রশাসক আবুল হোসেন, লে. কর্ণেল (অব.) সৈয়দ আলী আহমদ, বিটিভির সিলেট প্রতিনিধি মোহাম্মদ ফয়জুর রহমানসহ সাহিত্য সংসদ নেতৃবৃন্দ, সিলেটের রাজনৈতিক, সামাজিক সাহিত্য সংস্কৃতিক সংস্থা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটের রাজনৈতিক, সামাজিক সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক সংস্থা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সরকারী- বেসরকারী বিভিন্ন শ্রেনী পেশার শাহজালাল অনুরাগী হাজারো মানুষ অংশ নেয়। নানা রকম ব্যানার, ফেষ্টুন বাহী উজ্জীবিত শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত র‌্যালিটি নগরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতি সহজে। নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে অতি সহজে। নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এ র‌্যালী সাহিত্য সংসদ প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়।

র‌্যালী পূর্ব সমাবেশে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এমন সাইফুর রহমান বলেন শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের ফলেই আজ আমরা আধ্যাত্মিক নগরীর দাবীদার হতে পেরেছি। তিনি তাঁর মহান জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। এখানে অর্থমন্ত্রী শাহজালাল (রহ.) এর নামে শেখঘাটে একটি তোরণ নির্মাণের ঘোষণা দেন।

সংসদের সাধারণ সম্পাদক রাগিব হোসেন চৌধুরী তাঁর পঠিত ঘোষনা পত্রে বলেন, হযরত শাহজালাল (রহ.) আগমন সিলেট তথা সমগ্র বাংলা আসামের জীবন ধারায় সৃজন করেছিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজাতীয় লেখকদের দৃষ্টিতে এটাকে বৈদিক সংস্কৃতির উপর মুসলিম সংস্কৃতির আধিপত্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এ অঞ্চলের জনগোষ্টি আবদ্ধ বর্ণ ব্যবস্থার পুঁতি গন্ধময়তা হতে সুচিলাভ করে মানবিকতার মুক্ত নির্ঝরে অবগাহন। মহান দরবেশ শাহজালাল (রহ.) এর এ অঞ্চলে আগমনের লক্ষ্যে শুধুমাত্র স্বৈশাষা গৌড়গোবিন্দকে অপসারিত করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা তথা রাজ শক্তিকে হাটিয়ে নতুন বা বিকল্প প্রশাসন প্রতিষ্টা করা ছিল না। বরং তার জীবন ব্যাপী মিশন ছিল অন্যায়, জুলুম ও অমানবিকতার স্থলে মানবাধিকার প্রতিস্থাপন। তিন স্রেফ একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন না বরং ছিলেন একজন মানবদরদী সমাজ সংস্কারক।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদর উদ্দীন আহমদ কামরান হযরত শাহজালালের সিলেট আগমনের সাতশ বছর পূর্তিতে সাহিত্য সংসদ গৃহীত কর্মসূচীর প্রশংসা করে বলেন, "মহান এ দরবেশের জীবন ও কর্ম অনুসরণ করে চললে আধ্যাত্মিক রাজধানীর বাসিন্দা হিসেবে আমরা আরো সমুজ্জল হবো।"

সাহিত্য সংসদ সভাপতি অধ্যক্ষ মাসউদ খানের সভাপতিত্বে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রাগিব হোসেন চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উদযাপন কমিটির আহবায়ক এহিয়া রেজা চৌধুরী এবং শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমণের সাতশ বছর পূর্তি উদযাপনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকা বক্তব্য রাখেন কমিটির সদস্য সচিব আব্দুল হামিদ মানিক। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কর্মসূচীর উদ্বোধক অর্থ পরিকল্পনামন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান। জনাব সাইফুর রহমান শাহজালাল (রহ.) এর পরশে সিলেট প্রথম আলোকিত হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, এ মহান দরবেশের প্রদর্শিত পথ ও তাঁর প্রত্যয়ে প্রোজ্জল সংগ্রামী জীবন আমাদেরকে শান্তি ও কল্যাণের অনুপ্রেরণা যোগায়।

এ পথ অনুসরণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ ও রাসুল (সা.) নির্দেশিত পথে চলতে সক্ষমহই। সিলেটে শান্তি ও সমৃদ্ধির বীজ হযরত শাহজালাল (রহ.) ই বপন করেন এ মন্তব্য করে জনাব সাইফুর রহমান বলেন, তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও সুশাসনের ফলে এ অঞ্চল থেকে বাতিল শক্তি পরাভূত হয়। মহান এ দরবেশ ও তার সঙ্গী ৩৬০ জন আউলিয়ার পদস্পর্শে সিলেট বাসী ধন্য হয়েছেন। তিনি বলেন, সামাজে বিরাজমান অনাচার, অবিচার, অশান্তি ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেতে শাহজালাল (রহ.) নির্দেশিত ইসলামী আদর্শ মেনে চলতে হবে। তার জীবন ও কর্ম আমাদের ঈমানী জযবা নিয়ে সর্বদা সততার পথে থাকতে প্রেরণা যোগায়।

আব্দুল হামিদ মানিক বলেন, শাহজালালের আগমন আমাদের ইতিহাসের বৈপ্লবিক পট পরিবর্তন ঘটে। এ অঞ্চলে ও একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মহান নায়ক হযরত শাহজালাল আমাদের প্রেরণার উৎস। জনাব মানিক মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রসঙ্গে বলেন, সিলেট মুক্ত চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা এবং এর লালন ও বিকাশে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। এরই ধারাবাহিকতায় সিলেট শাহজালাল (রহ.) এর আগমনের ৭০০ বছর পূতি অনুষ্ঠান। তিনি বলেন হযরত শাহজালাল (রহ.) এর প্রভাব ও ভাবমূর্তিকে কল্যাণকর খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে।

সংসদের কার্যকরী পরিষদের সদস্য আজিজুল হক মানিকের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মালিক খান এবং সংসদের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথির হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন জেলা বি.এন.পির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন উপকমিটির আহবায়ক এহিয়া রেজা চৌধুরী।

উল্লেখ্য ঐ দিন (১৮ ডিসেম্বর) সিলেটের সবক'টি দৈনিক কাগজ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের সাতশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পূর্ণ পৃষ্ঠার বিশেষ ক্রোড়পত্র সৌজন্যে প্রকাশ করে। বিশেষ ক্রোড়পত্রটির সার্বিক অঙ্গসজ্জা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংসদের কার্যকরী পরিষদের সদস্য সেলিম আউয়াল।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ মাসউদ খান বলেন, হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার সিলেট মিশনের অনুপ্রেরণা ও ধারাবাহিকতায় জ্ঞান সাধনা, সাহিত্য চর্চা, উন্নতি ও পরিশীল সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ। ❑ আল ইসলাহ প্রাগুক্ত পৃ- ২৪২, ৪৩, ৪৪।

সেমিনার ২১ ডিসেম্বরঃ

কর্মসূচীর অংশ হিসেবে 'হযরত শাহজালার (রহ.)' এর সিলেট আগমন ও আমাদের সমাজ জীবনে তার প্রভাব শীর্ষক সেমিনার ২১ ডিসেম্বর রোববার বিকালে শহীদ সোলেমান হলে অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সংসদের সহ সভাপতি শামসুল আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

অতিথির বক্তব্য রাখেন মেয়র বদর উদ্দীন আহমদ কামরান সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হারুন আকবর আলোচনায় অংশ নেন- বিশিষ্ট গবেষক প্রাক্তন যুগ্ম সচিব দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রমুখ।

প্রফেসর কবি আফজাল চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুর রব দৈনিক জালালাবাদের নির্বাহী সম্পাদক আব্দুল হামিদ মানিক, কবি মুকুল চৌধুরী ও সংসদের সহ সভাপতি এহিয়া রেজা চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র কামরান বলেন, অব্যাহত অন্যায় অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট এসেছিলেন। তিনি ইসলামের শ্বাশত বাণী প্রচারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে একটি কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের মহান বন্ধন। এর প্রভাব এখনো এ অঞ্চলের সমাজ জীবনে অত্যন্ত প্রবল। যার ফল সিলেট অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রং ভ্রাতৃত্ববোধের একটি প্রবল প্রভাব লক্ষনীয় এবং যা গোটা বাংলায় সমাদৃত।

তিনি বলেন, পূণ্যভূমি সিলেট শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাধ্যমে। তিনি যে শান্তির বাণী নিয়ে সিলেট এসেছিলেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, সে ধারাকে অব্যাহত রেখে সিলেটকে সত্যিকারের একটি আধ্যাত্মিক নগরীতে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তা হলেই হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের সাতশ বছর পূর্তি পালন সার্থক হবে।

মুল প্রবন্ধে হারুন আকবর বলেন, সিলেটের সামাজিক জীবন দেশের সামগ্রিক পরিবেশ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এর পরও এখানকার কিছু স্বকীয়তা সব মহলে স্বীকৃত। সিলেটকে বলা হয় পূণ্য ভূমি, আধ্যাত্মিক রাজধানী। সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর সহাবস্থান এ মর্যাদার কারণ। শাহজালাল গবেষক দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী শাহজালালকে সিলেটের এক সময়ের নির্যাতিত মানুষের ত্রানকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবাধিকারের বিকাশ ঘটাতে শাহজালালের শিক্ষা অতুলনীয়। এটা আজ স্পষ্ট যে, মহান এ পুরুষ সম্প্রসারণ বাদ নয় বরং জেহাদী মনোভাব নিয়ে আল্লাহর সুমহান বাণী প্রচারে সিলেট এসেছিলেন। জনাব নুরুল আনোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে রেফারেন্স বুক হিসেবে ব্যবহৃত শাহজালাল (রহ.) এর বিকৃত ইতিহাস গ্রন্থ প্রত্যাহার করে বস্তুনিষ্ঠ গ্রন্থ সংযোজনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

কল্যাণব্রতের কবি আফজাল চৌধুরী বলেন, সিলেট অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ ইসলামী আদর্শে আদর্শায়িত হলেও তারা গভীরভাবে অসামপ্রদায়িক চেতনার অধিকারী। হযরত শাহজালালের আধ্যাত্মিক প্রভাব এখানকার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে কয়েক

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দী থেকে একাধারে প্রভাবিত ও আলোকিত করে রেখেছে। তিনি সিলেটকে সত্যিকার অর্থে একটি আধ্যাত্মিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট রূপরেখার একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের প্রতি আহবান জানান।

প্রফেসর ড. আব্দুর রব বলেন সিলেটে প্রচলিত পৌত্তলিক আচার আচরণের পরিবর্তে ইসলাম ধর্মের আধুনিক এবং কল্যাণকামী রীতিনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই সত্যিকার সানপ্রদায়িক সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায়। পীর আউলিয়া যুগে যুগে যে শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছেন।

❑ আল ইসলাহ প্রাগুক্ত পৃ- ২৪৬।

২৩ ডিসেম্বর

নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর

হযরত শাহজালার (রহ.)কে নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর ২৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেল থেকে শুরু হয়। শহীদ সোলেমান হলে সাহিত্য সংসদের সহ সভাপতি আলহাজ্ব বদরুল ইসলামের সভাপতিত্বে নবীন প্রবীণ প্রায় অর্ধশত কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদের হুইপ ফজলুল হক আসপিয়া। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশ বরেণ্য কবি আল মাহমুদ এবং মুখ্য আলোচক ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কবি আফজাল চৌধুরী। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিক। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন গবেষক সৈয়দ মোস্তফা কামাল এবং ভূমিকা বক্তব্য রাখেন আব্দুল হামিদ মানিক।

প্রধান অতিথি ফজলুল হক আসপিয়া মানুষ মানুষের প্রভু কিংবা দাস নয় উল্লেখ করে বলেন, মানুষ মানুষের ভাই। মহান দরবেশ হযরত শাহজালাল (রহ.) ভ্রাতৃত্বের এ বাণী বহন করেই সিলেট এসেছিলেন। তাঁর মিশন ছিলো ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। আজ সুদীর্ঘ সাতশ বছর পরও তার প্রতিষ্ঠিত সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সিলেটে অটুট অম্লান। জনাব আসপিয়া বলেন শাহজালাল মিশনের অন্তর্নিহিত সুর কয়েক শতাব্দী ধরে যে জীবন বোধের জন্ম দিয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে পঠিত কবিতামালায়। আর এতেই প্রমাণিত হয় আমরা শেকড়হীন নই।

সমাপনী অনুষ্ঠানঃ ২৫ ডিসেম্বর

আমাদের সাহিত্যে শাহজালাল (রহ.) শীর্ষক আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আয়োজন করা হয় সমাপনী অনুষ্ঠানের।

শহীদ সোলেমান হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ আজাদ এম.পি।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ সভাপতি অধ্যক্ষ মাসউদ খানের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রভাষক বাছিত ইবনে হাবিব। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট লোক সাহিত্য গবেষক অধ্যাপক আছদ্দর আলী, বর্ষীয়ান সাংবাদিক বোরহান উদ্দিন খান, রস সাহিত্যিক সৈয়দ মোস্তফা কামাল। কবি আব্দুল মুকিত অপির উপস্থাপনায় শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব আব্দুল হামিদ মানিক, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংসদের সাধারণ সম্পাদক রাগিব হোসেন চৌধুরী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উদযাপন উপকমিটির আহবায়ক এহিয়া রেজা চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, আমাদের সমাজ জীবনে হযরত শাহজালালের সময়ে সিলেট অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনে এক ধরণের স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে শাহজালাল (রহ.) এর প্রভাব খুব বেশি এজন্য এতদঞ্চলের গানে, কবিতায়, শাহজালাল প্রসঙ্গে বার বার এসেছে। তিনি বলেন তার মিশনের প্রভাবেই এ অঞ্চলে জন্ম নিয়েছে জাতীয় অধ্যাপক দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কথাশিল্পী অধ্যাপক সাহেদ আলী সাংবাদিক মকবুল হোসেনের মত ক্ষনজন্মা গুণীজনের।

জনাব সামাদ আজাদ বলেন হযরত শাহজালাল বিএনপি, আওয়ামীলীগ বা জামায়াত এ ধরণের কোন রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে সিলেটে আসেননি, কিন্তু তাঁর মাঝে একটি রাজনীতি ছিলো আর সেটা হচ্ছে মানবতার কল্যাণে নিবেদিত হওয়া। তিনি বলেন, হযরত শাহজালাল (রহ.) আমাদেরকে বিশ্বের দরবারে একটি সম্মানজনক পরিচিতি দিয়েছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে এ পরিচিতি উজ্জল হয়েছে।

জনাব সামাদ আজাদ বলেন, শুধু আমি সত্য আর সকলে মিথ্যা এ ধরণের বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি আমি বিশ্বাস করি না। অন্যের বাক স্বাধীনতা, বিশ্বাস রক্ষা আর আশ্বাস পূরণের রাজনীতি হচ্ছে মৌলিক রাজনীতি। অধ্যাপক আছদ্দর আলী বলেন, শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট আগমনের ফলে এ অঞ্চলে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার উর্বর ক্ষেত্র রচিত হয়। ছিলটী নাগরী লিপি এর সমুজ্জল প্রমাণ।

বোরহান উদ্দীন খান বলেন, সিলেট বিজয়ের পর শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সাথীরা এখানকার অধিবাসীদের উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে ক্রমে তাদেরকে আপন করে নেন। পরবর্তীতে এখানকার সামাজিক জীবনে এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। যা এখনো বিদ্যমান। সৈয়দ মোস্তফা কামাল বলেন, মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে একাকার হতে পীর আউলিয়া দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, হযরত শাহজালাল আমাদেরে তেমন নির্দেশনাই দিয়েছেন। তিনি বলেন, শাহজালাল (রহ.) কে অনুধাবন করতে হলে তাঁর মিশন ও কর্ম নিয়ে গভীর চর্চা প্রয়োজন।

❑ আল ইসলাহ প্রাগুক্ত পৃ- ২৪৮-২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগায় বোমা বিস্ফোরণঃ
পত্রিকা সম্পাদকীয় ও প্রতিবাদ

১২ জানুয়ারী ২০০৪ ঈসায়ী দরগা শরীফে বোমা বিস্ফোরণে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়।

শাহজালাল (রহ.) দরগায় বোমা বিস্ফোরণ

হযরত শাহালাল (রহ.) এর দরগা শরীফের দুই দিন ব্যাপী ওরস চলাকালে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে দুইজন নিহত ও অর্ধ শতাধিক আহত হওয়ার সংবাদে সমগ্র জাতি স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। সোমবার রাত প্রায় সাড়ে আটটায় দরগা শরীফের পশ্চিম উত্তর দিকে ঝরনার পার এলাকায় লালসালু পরিহিত ফকির ও সাধুদের গান বাজনা করার সময় এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। অকুস্থলের মাত্র একশত গজ দুরে পুলিশ ক্যাম্প ধারণা করা হচ্ছে বোমাটি পূর্ব হতেই ঐ স্থানে পুতিয়া রাখা হয়েছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগা শরীফে বার্ষিক উরসে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নিন্দনীয় এতে সন্দেহ নাই।

বিগত কয়েক বৎসরে দেশের বিভিন্ন স্থানে উপর্যুপরি সংগঠিত ১২টি চাঞ্চল্যকর বোমা হামলায় তদন্তকালে একটিতে ও সাফল্য লাভ করা যায় নাই। ঘন ঘন মামলাগুলির তদন্তকারী কর্মকর্তা বদল, সংশ্লিষ্ট আলামতগুলির রিপোর্ট দানে বিলম্ব ও আলামাত নষ্টের কারণে ভবিষ্যতে উহার রহস্য উদঘাটন আদৌ সম্ভব হবে কি না বলা দুষ্কর। উল্লেখ্য যে, বিগত ডিসেম্বর মাসে দরগার পুকুরে ৫৬০টি গজার মাছ পানি বিষাক্ত কীটনাশক প্রয়োগে মারা যায়। অনেকের ধারণা বিষ প্রয়োগের সহিত বিস্ফোরনের যোগসূত্র থাকতে পারে। এমতাবস্থায় সকলেই আশা করবেন সেনা বাহিনীর অন্যান্য সংস্থাগুলি সম্মিলিতভাবে এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার রহস্য উদঘাটনে তৎপর হইবে। এই ঘটনার সহিত পূর্ববর্তী বোমা বিস্ফোরনের ঘটনা সমূহের সম্পর্ক আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মাজার শরীফ প্রাঙ্গনে অর্থ কড়ির লেনদেন ও ইহার সহিত সম্পর্কিত হইতে পারে। যা হোক, হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার শরীফের বার্ষিক ওরসে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরনের সকল রহস্য উদঘাটিত হবে এবং দুস্কৃতিকারী ধরা পড়বে, ইহ দেশবাসীর কাম্য। ❑ দৈনিক ইত্তেফাক বুধবার ১লা মাঘ ১৪১০।

শাহজালাল (রহ.) এর মাজারে বোমা
ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই

সিলেট হযরত শাহজালাল (রহ.) দরগায় উরস চলাকালে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আমাদের ক্ষুব্ধ, মর্মাহত ও হতবাক করেছে। শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে ও আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধ শতাধিক। যে বা যারাই এর বর্বর ঘটনা ঘটাক না কেন

Dhaka University Institutional Repository

একটি ধর্মীয় স্থানে সমবেত ধর্মপ্রাণ সাধারণ লোকজনের উপর এই হামলা চালিয়ে তারা কি উদ্দেশ্য সফল করল তা আমাদের বোধগম্য নয়।

এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, পরিকল্পিতভাবে এবং লোকজন মারার জন্যই এই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে প্রতিবছর উরসের সময় মাজার প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। দুর্বৃত্তরা এই সময়টিকে তাদের হামলার জন্য বেছে নিয়েছে। যে স্থানটিতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে সেখানে প্রায় ২০০ তাবু ছিল এবং হাজার খানেক লোক সেখানে অবস্থান করছিলেন। ক্ষয়ক্ষতি আরো ব্যাপক হলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না।

কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তা নিয়ে সিলেটবাসীর মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কোন্ গোষ্টি বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা নিয়ে এখনো অনেক কথাবার্তা আলোচিত হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও ঘটনার পেছনে কারা রয়েছে তা উদঘাটন করাই সবচেয়ে জরুরী হয়ে পড়েছে। তা না হলে এ নিয়ে বিভ্রান্তি বাড়তেই থাকবে।

কিন্তু অতীতে বিভিন্ন বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার ব্যাপারে যাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমরা এই ঘটনার জড়িতের চিহ্নিত করার ব্যাপারে খুব আশাবাদী হতে পারছি না। বিভিন্ন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আমরা দেখেছি যে, ঘটনার কোন কুল কিনারা হয়নি এবং কারা এর সংগে জড়িত তা বের করা সম্ভব হয়নি। শাহজালাল (রহ.) দরগায় বোমা বিসেফারণ ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না।

উরসকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর মাজার প্রাঙ্গনে হাজার হাজার লোকের জমায়েত হয়। এরূপ একটি শান্তিপূর্ণ বার্ষিক ধর্মীয় সমাবেশে বোমা বা গুলি বা রক্তারক্তি হাওয়ার মতো ঘটনার আশংকা আগে কখনও করা হয়নি। তবে সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে যে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন দরকার ছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে পুলিশ ও প্রশাসনের অবহেলা ছিল। বিস্ফোরিত বোমাটি পুতে রাখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। উরসের আগে যদি পুরো এলাকায় যথাযথ নিরাপত্তা তল্লাশি হতো হবে এ ঘটনা হয়তো ঘটতে পারত না।

সাম্প্রতিক সময়ে মাজার সংলগ্ন পুকুরের সবগুলো গজার মাছের মৃত্যু ও গত সোমবার রাতের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ভক্তদের জন্য এক বড় আঘাত। আমরা এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চাই। নিহতদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি রইল আমাদের গভীর সমবেদনা। ❑ দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারী ২০০৪ইং

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজারে বোমা

ওলীকুল শিরমণী হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পবিত্র মাজারে উরস চলাকালে সোমবার রাতে যে শোকাবহ ঘটনা ঘটে গেল, তা অকল্পনীয়, অনভিপ্রেত। আমরা গভীর মর্মাহত চিত্তে নিন্দা

Dhaka University Institutional Repository

জানাই। অবিলম্বে সুষ্ঠু তদন্ত, দ্রুত বিচার দাবি করছি। শুধু সিলেট বিভাগ বাসী নয়, সারাদেশের মানুষ এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকার্ত।

সবাই উদ্বিগ্ন। পবিত্র মাজারে হানা দিতে পারে পাপিষ্ট আততায়ী দরগা শরীফ টার্গেট হতে পারে, অশুভ শক্তির এটা সুস্থ বিবেকবান সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত। স্বাভাবিকভাবে বিস্ময়ে বিমুঢ় দেশবাসী। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই কোন বিলম্ব নয়। কোন ও গাফলতি নয়, তদন্তের নামে কোন প্রকার টালবাহানা নয়, যতদ্রুত সম্ভব অপরাধীদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদেরকে আইনের হাতে সোপর্দ করে এমন দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি দিতে হবে যাতে অশুভ শক্তির এই চরম স্পর্ধার নিপাত ঘটে। আর যেন তাদের দুঃসাহস না ঘটে পবিত্র স্থানে সন্ত্রাস সংগঠনের।

কি অপরাধ এই ধর্মপ্রাণ মুসলমানের। সন্ত্রাসী রাহুশক্তি কোন্ প্রশ্রয়ে মাজার শরীফের মতো পবিত্র স্থানে বোমাবাজির সাহস পেল তাদের এই দর্পের উৎস কি?

ইতিপূর্বেও শাহজালাল (রহ.) এর দরগায় অশুভ শক্তির কালো থাবা আমরা দেখেছি। দরগার বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পুকুরকে তারা টার্গেট করেছিল। তাদের বিষ ছোবলে মারা পড়েছিল গজার মাছ। সে ঘটনাতেই বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। কারা এই ঘাতকদল যারা মৎস্যকেও হত্যা করতে দ্বিধা করছেনা। সোমবার রাতে আততায়ীর শিকার হয়েছে ভক্তপ্রাণ। বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন দুইজন, আহত হয়েছেন অর্ধ শতাধিক। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে আহতদের অনেকে। এই দরগা শরীফের উরস একটি ধর্মীয় সম্মিলন। সারা দেশ থেকে ধমপ্রাণ, ভক্তপ্রাণ মানুষ ছুটে আসেন এখানে। তারা জিকির আজকার সহ ইবাদতে শামিল হন। অথচ অবাঞ্চিত ঘটনা উরসে বিছিয়ে দিয়েছে শোকের চাদর। দলমত নির্বিশেষে সবাই এর কঠিন শাস্তির দাবিতে সোচ্ছার। ওয়াকিফহাল মানুষের প্রায় অভিন্ন অভিযোগ, এর নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।

এই পবিত্র ভূমির আধ্যাত্তিক মাহাত্ম্য প্রায় ৭০০ বছরের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মহল বিশেষ সক্রিয়। মাছ হত্যা, মানুষ হত্যা একের পর এক ঘটনা তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

ইতিপূর্বে আমরা গজার মাছ হত্যার রহস্য সমাধানে পুলিশকে কামিয়াব হতে দেখনি। তারা নাম কা ওয়াস্তে তদন্ত করেছে। কিন্তু প্রকৃত রহস্য ভেদ করতে পারে নি। এবার যেন সেই অকর্মন্যতার পুণরাবৃত্তি না ঘটে। সংশ্লিষ্টদের বুঝতে হবে ব্যর্থতা উৎসাহ যোগায় অপরাধীদের। গজার মৃত্যুর পর এক মাসেও কেন সেই অপরাধের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করা গেল না। বিবেকবান মানুষ অবশ্যই তার জবাব জানতে চায়। এবার অশুভ শক্তি হত্যা করেছে মানুষকে। এই অশুভ চক্রকে রুখতে হবে। উৎপাটন করতে হবে বিষদাত।"

❑ দৈনিক মানব জমিন, ১৪ জানুয়ারী ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

Deaths at shriue Sabateurs baring their teeth at will

The bomb that went off at the holy Shrine of Hazrat Shahjalal on Monday, Killing two people and injuring at least 40 others, has sent shock waves across the country. It is the latest proof of the presence of subversive clements ready to commit ghoulish crimes to further their highly obscure, yet starkly ominous, agenda.

The place Known for its religious serenity and spiritual ambience has been attracting countless devotees over many centuries. It is an oasis of peace and tranquility that has broght solace to men and women seeking blessings of this saint. But the peace has been suver tedina way that has rocked the nation.

The exact motive behind such wanton and mindless violence is not eassy to ascertain, but the law enforcers should press relentlessly on to get at the bottom of it. Killers and saboteurs are showing their fangs from time to time taking advantage of the fect that none of the bomving cases has yet been resolved. Suspectswere arrested but police couldnot goto beynd that. The possibilily of local rivalry leading to the blood letting cannot be ruled out, particularly when we consider the December 3 poisoning of some big fish in a pond near the shrine which surpised many.

But the killers have used some sophisticated divice to detonate the omb, which is a clear indication of the terrorists access to lethal weapons. The discovery and seizure of a huge quantity of such weapans in recent times hit head lines. But hauling up of arms wouldn't mean much unless the supply routes can be sealed. So the task of the law enforcers does not end with the seizure of caches.

The question uppper most in the minds of people is, who are these clements and what are they after?

The law enforers must set the themselves the task of resolving the mystery behind the bomb explosion at the shirine a very unlikely place for subversive activities.

The ghastly loss of lives must not sufer the fate that all such in cidents did in the past, that investigation into it should not end inconclusively.

❑ The Daily star, January 14, 2004.

Dhaka University Institutional Repository

Attack on Holy Shrine

Even the shrines of saints are no longer spared by terrorist gangs in this country. If the mazar (shrine) of Hazrat Shahjalal (R.A), one of the most revered saints in this part of the world, comes under bomb attack, no holy place is sacrosanct enough for the subversive elements bent on descerating it. Who there criminals are ones. Who have not the slightest fear of hesitation to unleash such a barbarie attack on the mazar premise where the devotees have gathered on the occasion of the annual urs? what is their motive? it is really important to know the motive being this attack that has left at least two people dead and a couple of scores injured. Why of all places, The mazar has been made a target of such a powerful bomb attack can't have a simple answer. If there is someone's hand behind the death of the famous Gazar fish in the Mazar's pond, this attack may have some link with that act of sacrilege. Are some quarters eyeing the mazar property? one thing is almost certain that this is no madman's act. Those who have carried out this attack surely have a method in madness.

Whether their purpose is to send the message or not that no holy place in this land is immune from their attack, is rather insignificant. people will get the message all right any way. Hazrat Shahjalal (R.A) is accepted and revered by people of all religions. Even those who are not religious, hold him in high esteem. His message of universal love and peace hardly makes him a candidate for drawing wrath from the religious fanatics or non behlevers. The Mayor of Sylhet has succinctly put the sentiment of the people when he said that nothing of this order has ever happened in the past 700 years of mazar's history.

Clearly some thing has gone terribly worong with this country which has been grappling with threats of sismilar attacks on crowded places and public meettings functions ever since the bomb blast at an udichi function. Who knows whichplace will be the next target. It seems such bombs and higly sophisticated arms find their way in to the countyr quite easily. A number of arms hauls support this view. If there are chances of detection at the time of carrying the firearms, the bombs can be transported undetected. So they

Dhaka University Institutional Repository

pose a greater danger to public life and security. Now there is no way of leaving anything to chances. Wheather it is a tabling of Eidgah congregation or jumma prayer, the venue has to be under constant surveillance and checked before hand to ensure that no power full device has been planted there. The dog squad has cost the public exchequer quite a sum. Had it been developed in to an efficient branch of police investigation. It surely would be pretty useful. Even the crowded places need to be brought under regular monitoring if we are seriou avoiding any further bomb tragedy.

As for the mazar blast, it is now incumbent upon the Government to get to its origin. All the previous bombing incident have had no through investigation to quell the doubts in public minds. Now the Government owes them a clear and authentic report. If the criminals still remain beyond reach of our intilligence, we diffnitely have the right to call for hiring in inteligence from abroad. We must get to the root of this problem for its redress once for all.

❑ The Bangladesh observer 14, January 2004.

মাজার প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশঃ

দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে সরকারের ভূমিকা হতাশাজনক। উরস চলবে, অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। --- আল্লামা ফুলতলী

ষ্টাফ রিপোর্টারঃ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার প্রাঙ্গণে বোমা বিসফোরণের ঘটনা তদন্তে দীর্ঘ সুত্রিতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী তিনি বলেন, 'বিচার বিভাগীয় তদন্ত পূর্বক দোষীদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর ওলীর এই পবিত্র প্রাঙ্গণকে কলঙ্কিত করার যে কোন অপচেষ্টা মোকাবেলায় আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছি। তিনি বলেন সরকারের কোন মন্ত্রী কিংবা উচ্চ পদস্থ কোন সরকারী কর্মকর্তার বাসায় এ ধরণের হামলা হলে সরকারের তোড় জোড়ের শেষ থাকে না। অথচ যার বিপ্লবী প্রচেষ্টায় সিলেট তথা এই উপমহাদেশের মুসলমনরা বীর দর্পে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে সেই সুলতানে সিলেট হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগা প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণের পর সরকারের ভূমিক হতাশামূলক।"

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ফুলতলী গতকাল শুক্রবার বাদ জুমা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগাহ প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরনের ঘটনার প্রতিবাদে তাঁর আহবানে ও আঞ্জুমানে আল ইসলাহের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এক বিশাল মিছিল পরবর্তী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন।

দরগাহ শরীফ প্রাঙ্গণে জনসভার এক পর্যায়ে আল্লামা ফুলতলী উপস্থিত হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে নিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার জিয়ারত, মীলাদ শরীফ ও মুনাজাত করেন। এসময় তিনি বলেন যারা মাজার জিয়ারত ও মুনাজাতকে বেদআত বলেন, আমি তাদের চ্যালেঞ্জ করি। কোরআন হাদীসের আলোকে প্রমাণ করুন, তাহলে আমরাও মেনে নেব।

তিনি সুষ্ঠুভাবে দরগাহ পরিচালনা এবং সকল প্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধে খ্যাতনামা আলেম উলামা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। দরগাহ শরীফ সম্পর্কে কটুক্তি ও উস্কানি মূলক বক্তব্য বন্ধ রাখারও দাবী জানান এবং নিহতদের মাগফিরাত কামনা করেন।

❑ দৈনিক সিলেটের ডাক, ২৪ জানুয়ারী ২০০৪।

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবন দর্শন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে

....ড. আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস

ডাক ডেস্কঃ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড.আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস বলেছেন, ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের জন্য ৩৬০ আউলিয়া নিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) ৭০৩ হিজরী ১৩০৩ সালে সিলেট আগমন করেন। অত্যাচারী গৌড় গোবিন্দ রাজাকে পরাজিত করে তিনি এখানে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ান। সিলেট বিজয়ের পর তার মামা ও মুর্শিদ পীর সৈয়দ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দীর প্রদত্ত মাটির সাথে সিলেটের মাটির মিল পাওয়ায় এখানে স্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। ওলীকুল শিরমণি হযরত শাহজালাল (রহ.) আগমনে এ অঞ্চলের মানুষ ইসলামের দাওয়াত কবুল করতে শুরু করেন। এ জন্যে শাহজলাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়াকে ঈমান ও আধ্যাত্মিকতায় অনেক পরীক্ষা দিতে হয়।

গত ১৮ নভেম্বর কাজীটুলায় রকীবশাহ পরিষদ আয়োজিত হযরত শাহজালাল (রহ.) উরস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. বিশ্বাস একথাগুলো বলেন। পরিষদের সভাপতি ড. কাজী কামাল আহমদের সভাপতিত্বে ও আব্দুল মজিদের পরিচালনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রাগীব রাবেয়া ফাউন্ডেশন সচিব এস.এম. এস. ইসলাম, গনদাবী পরিষদের নেতা বদরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, কাজী আরেফ আহমদ, মাওলানা নুরুজ্জামান প্রমুখ। শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন গোলাম মাওলা।

❑ ২৫/১১/২০০৮ দৈনিক সিলেটের ডাক।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইবনে বতুতার সফর ও হযরত শাহজালাল (রহ.)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবনে বতুতার পরিচয় ও সিলেট সফরঃ

বিশ্ব বিখ্যাত পরিব্রাজক আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে বতুতা মরক্কোর তনজা (Tanjiers) শহরে ৭০৩ আব্দে (খ্রীষ্টিয় ১৩০৪) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৭২৫ সালের রজব মাসে (১৩২৬ঈ.) ২২ বৎসর বয়সে হজের উদ্দেশ্যে তিনি জন্ম ভূমি হতে রওয়ানা হন।[১] এটাই তাঁর ভ্রমণের শুরু।তার প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। ইবনে বতুতা তাঁর বংশগত উপাধি।

ইবনে বতুতা খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশে আগমন করেন ৭৩৪ হিঃ ১৫ই মুহাররম (১২ সেপ্টেম্বর ১৩৩৩ খৃঃ) আরব সাগরের তীরে সিন্ধু প্রদেশের তৎকালীন সমুদ্র বন্দরে অবতরণ করেন।[২] পদব্রজে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পর্যটন করেন তিনি। তাঁর ভ্রমন কাহিনী বিভিন্ন দেশের তৎকালীন ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থার এক স্বচ্ছ দিগদর্শন।

ইবনে বতুতা ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন এক মহান ব্যক্তিত্ব। যে দেশেই তিনি গিয়েছেন প্রতিভার উজ্জল্যে তিনি দিগদিগন্ত আলোকিত করেছেন। বিনা অনায়াসে বা স্বল্প প্রয়াসে তদনীন্তন রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে রাজদরবারে স্থান লাভ করেছেন।

দিল্লির রাজ দরবারে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি দিল্লিতে মালিক মাযহাব অনুসারীদের জন্য সম্রাজ্যের কাজীউল কুজাত নিযুক্ত হন।[৩]

তিনি মোট ২৮ বৎসর ৯৫,০০০ হাজার মাইল পথ পর্যটন করেন। পরিশেষে ১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুসলমান জাতির মধ্যে এত বড় ভ্রমনকারী আর কেহ হয় নাই।

৭৫৬হিজরী (১৩৫৪ খ্রিঃ) তিনি তার ভ্রমন বৃত্তান্ত একত্র করেন। পর বৎসর ইবনে জযয়্যী ইহার সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেন। এই ইবনে জযয়্যী মরক্কোর সুলতান আবু ইনাতমারয়ীনীর সেক্রেটারী ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ফতহুল্লাহ বিলুনি ইবনে জযয়্যী -

---

১. শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, ৪৬৮পৃ.
২. হযরত শাহজালাল কুনিয়াত্তি (রহ.) পৃ- ২২৭।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

পুস্তকের এক সার সংগ্রহ করেন। ইবনে বতুতার মুল পুস্তকে এক্ষনে পাওয়া যায় না। ফারসী অনুবাদ সহ ইবনে জযয্যী পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ড. লিবিলুনীর পুস্তকের এক ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৯ সালে প্রকাশ করেন। খান সাহেব মৌলভী মুহাম্মদ হুসয়ন এম.এ লাহোর হতে ইবনে জযয্যী পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ডের এক সার্থক উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এই দ্বিতীয় খন্ডে ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমন হতে শেষ পর্যন্ত বৃত্তান্ত আছে। বর্তমান প্রবন্ধ তার উক্ত অনুবাদ অবলম্বন করে লিখিত হয়েছে। এই জন্য প্রবন্ধ লেখক তার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে।[৪]

মরক্কোর সুলতান আবু ইনাই মরিনিরে নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে জুযয্যী ইবনে বতুতার ডিকটেনশন অনুযায়ী আরবী ভাষায় তার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন ৭৫৬ হিঃ ১৩৫৫ ঈ. তুহফাত উন নুজ্জার ফি যারাইবিল আমসার ও আজায়িবিল আসফার।[৫]

দিল্লীতে দীর্ঘ দিন অবস্থানের পর তিনি ৭৪৬ হিজরীতে (১৩৪৫ খৃঃ) বাংলাদেশে আগমন করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বাংলাদেশের তদানিন্তন সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জনগণের জীবন যাত্রার ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ভ্রমণ কালেই তিনি ৭৪৬ হিজরীতে বাংলার পুর্বদিকে কামরু (সিলেট) পার্বত্য অঞ্চলে জালাল উদ্দীন তাবরিযি (শাহজালাল) নামক এক সুফী তাপসের সাক্ষাৎ লাভের জন্য গমণ করেন।

জালাল উদ্দিন তাবরিযি উত্তর বংগে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি কামরা পার্বত্য অঞ্চলে বা পূর্ব ভারতে (সিলেট) আগমন করেন নি। তাই অধিকাংশ গবেষকের ধারণা যে, ইবনে বতুতা সিলেটের হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। কিন্তু ইবনে বতুতার বর্ণনা এবং শাহজালাল (রহ.) এর জীবন কাহিনীর মধ্যে বেশ খানিকটা অমিল থাকায় শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে ইবনে বতুতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ড. এ.বি.এম হাবিবুল্লাহ, রামপ্রাসাদ চন্দ্র, মুফতি আজহার উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, দীনকান্ত চক্রবর্তী সাহিত্য সিন্ধু এবং আরও অনেকে মনে করেন যে, ইবনে বতুতা সিলেট আসেনি এবং শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি খুব সম্ভব আসামের উর্ধ্ব অঞ্চলে কামরূপ পাহাড়ের সন্নিকটে ১৪৯ বছর বয়স্ক কোন এক ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।[৬] কিন্তু তাদের এ মত সত্য মনে করা যায় না। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা আলোচনা করা হয়েছে।

---

৪. শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, পৃ- ৪৭৩

৫. ওয়াকিল আহমদ ড. মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, (ঢাকা- ১৯৬৮) পৃ- ২৬

৬. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.), পৃ- ২১৯, ২০

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে বতুতা বলেন- "সাদকওয়ান হইয়া আমি কামরূপের দিকে রওয়ানা হইলাম। এই দেশ সাদকাওয়ান হইতে এক মাসের পথে। ইহা বহু বিস্তৃত পাহাড়িয়া দেশ, এবং ইহা ও যে তিব্বে কাস্তরী হরিণ পাওয়া যায় তাহার সংলগ্ন। এই দেশের অধিবাসীরা আকৃতিতে তুর্কীর্দের ন্যায়। ইহাদের ন্যায় কর্মট কদাচিত অন্য স্থানে দেখা যায়। সেখানের একজন চাকর অন্য স্থানের কয়েকজন চাকরের সমান কাজ করে। ইহারা বিখ্যাত যাদুকর।

আমার এই দেশে যাইবার উদ্দেশ্যে ছিল যে, আমি বিখ্যাত আউলিয়া শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযীর সহিত সাক্ষাত করিব। এই শায়খ নিজ সময়ের কুতুব (পীরশ্রেষ্ঠ) ছিলেন। ইহার অলৌকিক কার্য প্রসিদ্ধ। ইহার বয়স ও অনেক বেশি হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহকে বাগদাদে দেখিয়াছিলেন। তিনি ১৫০ বৎসর পূর্ণ করিয়া মরেন। তিনি ৪০ বৎসর হইতে বরাবর রোজা রাখিতে ছিলেন দশ দশ দিন আন্তর তিনি একবার ইফতার (পারনা) করিতেন। তাহার শরীর রোগা পাতলা ছিল। তাহার আকৃতি লম্বা এবং গন্ডদ্বয় ক্ষীন ছিল। তাহার হস্তে সেই দেশের অধিকংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার একজন সঙ্গী আমাকে বলিলেন যে, তাহার মৃত্যুর একদিন পূর্বে তিনি তাহার সকল বন্ধুকে ডাকিয়া এই উপদেশ দিলেন যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করিবে, আল্লাহ চহেনত কাল আমি তোমাদের নিকট হইতে বিদায় হইব। আল্লাহই তোমাদের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত রহিলেন। জোহরের নামাজের সময় শেষ সিজদায় অবস্থায় তাহার দম বাহির হয়। তাঁহার গুহায় একটি খোড়া কবর দেখা গেল। তাহাতে কাফন এবং খোশবু মৌজুদ ছিল। তাহার সঙ্গীগন তাহাকে গোসল দেওয়াইয়া কাফন পরাইয়া দাফন করিলেন। আল্লাহ তাহাকে দয়া করুন।

যখন আমি এই শেখ সাহেবের দর্শনের জন্য গিয়া ছিলাম, তখন তাঁহার বাসস্থানের দুই আড্ডা দুরে তাহার চারিজন সঙ্গীর সহিত আমার সাক্ষাত হয়। তাহারা বলিলেন যে, শায়েখ সাহেব ফকিরদিগকে বলিয়াছিলেন যে, একজন মরক্কো দেশীয় ভ্রমনকারী আমার এখানে আসিতেছেন, তোমরা তাহাকে আগু বাড়াইয়া আন। আমরা শায়খের হুকুম অনুসারে আসিয়াছে। আমার সম্বন্ধে তাহার কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান ছিল না। তিনি যাহা কিছু জানিয়াছিলেন তাহার দিব্য জ্ঞানে জানিয়াছিলেন। আমি তাহাদের সহিত শায়খের খেদমতে হাজির হইলাম।

আমি শায়খের খানকায় পৌছিলাম। এই খানকাহ একটি গুহার বাহিরে ছিল। তাহার নিকট কোন লোকালয় ছিল না। সেই দেশের হিন্দু মুসলমান সকলে শায়খের দর্শনের জন্য আসিত এবং তাঁহাকে ভেট ও নজর দিত। তাহা ফকীর কাঙ্গাল সকলে খাইত; কিন্তু শায়খ নিজে কেবল একটি গরুর দুধ খাইয়া দিন গুজরান করিতেন। যখন আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম, তিনি খাড়া হইয়া আমার সহিত গলায় গলায় মিলিলেন এবং আমার বাড়ী ও আমার সফরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্থ অবস্থা বলিলাম।" তিনি বলিলেন, "তুমি আরবদের মধ্যে (বিখ্যাত) ভ্রমনকারী।" তাহার একজন সঙ্গি বলিলেন আরব ও আজমের মুসাফির তোমরা ইহার সম্মান কর। তারপর আমাকে খানকায় লইয়া গেলেন এবং তিন দিন পর্যন্ত আমার অতিথ্য সংকার করিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

যেদিন আমি প্রথমে শায়খের সাক্ষাৎকারের জন্য যাই তিনি এক উলের চোগা পরিয়া ছিলেন। আমি আপন মনে বলিলাম 'যদি শায়খ সাহেব আমাকে এই চোগা দান করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।' আমার বিদায় সময়ে শায়খ সাহেব গুহার দিকে গিয়া আপনার শরীর হইতে চৌগাটি খুলিয়া আমাকে পরাইয়া দিলেন এবং নিজের মাথার টুপি খুলিয়া আমার মাথায় রাখিয়া দিলেন। ফকীরেরা বলিল যে, চোগা পরা শায়খের দস্তর নয়। কেবল তোমার আসার খবর শুনিয়া শায়খ সাহেব চোগা পরিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মরক্কো নিবাসী আমার নিকট এই চোগা চাইবে এবং কাফের রাজা ইহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে এবং সেই রাজা ইহা আমার ধর্ম ভাই বুরহান উদ্দীনকে দিবে। ফকির দিগের মুখে ইহা শুনিয়া আমি আপন মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম যে, শায়খ আমাকে আপনার পোশাক দান করিয়াছেন এবং আমার এক অপূর্ব ধনলাভ হইয়াছে। আমি কখনই এই চোগা পরিয়া কোন মুসলমান বা কাফির রাজার নিকট যাইবনা। আমি শায়খের নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

ইহার দীর্ঘকাল পরে আমার চীন দেশে যাওয়া ঘটে। আমি চীনের খানসা শহরে সঙ্গীদের সহিত বেড়াইতেছিলাম। ভিড়ের জন্য এক স্থানে আমিসঙ্গি হইতে আলাদা হইয়া পড়ি। আমি এই চোগা পরিয়াছিলাম। পথে উযীরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে নিজের কাছে ডাকিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া আমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। কথায় কথায় আমরা রাজ প্রাসাদের দরজায় উপস্থিত হইলাম। আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় লইতে ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না, তিনি আমাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা আমাকে মুসলমান বাদশাহ দিগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিলাম, রাজার দৃষ্টি আমার চোগার উপর পড়িলে তিনি তাহার বড়ই প্রশংসা করিলেন। উযীর বলিলেন 'তুমি ইহা খুলিয়া দাও।' আমাকে সহজে হুকুম মানিতে হইল। রাজা চোগা লইয়া তাহার বদলে আমাকে দশটি খিলাত একটি ঘোড়া সহ সাজ সরঞ্জাম এবং খরচের জন্য কিছু নগদ অর্থ প্রদান করিলেন। আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। পরে শায়খের উক্তি স্মরণ হইলে আমার ভারি আশ্চর্যবোধ হইল।

ইহার পর বৎসর আমি চীনের রাজধানী খানবালিকে (পিকিংয়ে) যাই। তখন শায়খ বুরহান উদ্দিন সাঘরজীর খানকায় ঘটনাক্রমে উপস্থিত হই। সেখানে দেখি শায়খ কিতাব পড়িতেছেন এবং এই চোগা পরিয়াছেন। আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলাম এবং সেই চোগাটি ওলট পালট করিয়া দেখিতে লাগিলাম। শায়খ আমাকে বলিলেন "তুমি কেন উহা ওলট-পালন করিয়া দিতেছ? তুমি এটা চিন? আমি বলিল হাঁ; এই চোখা খানসার রাজা আমার নিকট হইতে লইয়া ছিলেন। শেখ বলিলেন- 'শেখ জালালূদ্দীন এই চোগা আমার জন্য তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে, অমুক লোকের মারফত তোমার নিকট এই চোগা পৌঁছিবে।' শায়খ আমাকে সেই পত্র দেখাইলেন। আমি সেই চিঠি পড়িলাম এবং শেখর সত্য ভবিষ্যৎ জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তারপর আমি সমস্ত কাহিনী শায়খ বুরহান উদ্দীনের নিকট বর্ণনা করিলাম। শায়খ বলিলেন- আমার ভাই শায়খ জালালুদ্দীনের পদ ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, সংসারে সমস্ত ব্যাপারে তাহারঅধিকার আছে। এক্ষনে তিনি পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। পূণরায় বলিতে লাগিলেন আমি জানি তিনি প্রত্যেকদিন ফজরের নামাজ মক্কাশরীফে পড়িতেন এবং প্রত্যেক বৎসর হজ্ব করিতেন। তিনি আরফা ও ঈদের দিন অদৃশ্য হইয়া যাইতেন কাহারও কোন খবর হইত না।[৭]

---

৭. শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থ, পৃ- ৪৭৪-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সুনার কাওন (সোনারগাঁও)

শায়খ জালালুদ্দীনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি 'হবনক'* শহরের দিকে গেলাম। ইহা একটি বড় শহর। ইহার মধ্য দিয়া নদী বহিতেছে। এই নদী কাপরূপের পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে ইহাকে (নাহরে আজরক) নীলনদী বলে। এই নদী দিয়া লোক বাঙ্গালা এবং লখনৌতি গিয়া থাকে। এ নদীর উভয় পাশে ক্ষেত, বাগান ও গ্রাম দৃষ্ট হয়, যেমন মিশরের নীল নদের তীর দেখা যায়। সেখানকার বাসিন্দা কাফির। কিন্তু বাদশাহ বায়ত। তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক ভাগরূপে লওয়া হয়। খাজনা ইহার অতিরিক্ত। আমি এই দেশে পনের দিন পর্যন্ত সফর করিয়াছিলাম। গ্রাম এবং বাগান এখানে এতবেশী যে, বোধ হইতেছিল যে, বাজারে দিয়া যাইতেছি। অসংখ্য জাহাজ এই দেশে যাতায়াত করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাহাজে এক একটা ঢাক থাকে। দুই জাহাজে সাক্ষাৎ হইলে তাহারা ঢাক বাজায় এই হইল তাহাদের সালাম। সুলতান ফখরুদ্দীনের হুকুম এই যে, এই দেশে ফকীর দিগের নিকট হইতে কোন মাসুল আদায় করা হইবে না।

ফকীর কোন শহরে উপস্থিত হইলে বাদশাহের তরফ হইতে তাহাকে আধ দিনার দেওয়া হয়। ১৫ দিন সফরের পর আমি সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হইলাম। এই শহরের অধিবাসীগন শয়দাকে ধরিয়া বাদশাহের হাতে দিয়াছিল।"

উল্লেখ্য ইবনে বতুতা ছিলেন মানব জাতির গৌরব এক বিস্ময়কর প্রতিভা। চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি সুদুর মরক্কোর রাজ দরবার থেকে বিদায় নিয়ে বহু দেশ ভ্রমন করে ভারত হয়ে চীনের রাজদরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভ্রমনকালে তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সংগে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে কামারু (সিলেট) আসেন (৭৪৬হিঃ /১৩৪৬ খ্রিঃ) ।

ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশ পরিভ্রমন করেন। ভারতীয় বাদশাহদের মধ্যে তুঘলক রাজ বংশের সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক জুনা খা ছিলেন সম-সাময়িক কালের একজন শ্রেষ্ঠ পন্ডিত। তাঁরই সময়ে ইবনে বতুতা দিল্লী আসেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক অতি সহজেই উপলব্ধি করেন যে, ইবনে বতুতা এক অসাধারণ ও তুলনাহীন প্রতিভা। তাঁকে রাজদরবারে ধরে রাখার জন্য তিনি ইবনে বতুতাকে ভারত সাম্রাজ্যের মালিকী মাজহাবের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতির সম্মান ও তাঁর সুদুরের পিয়াস নিবৃত্ত করতে পারেনি। চঞ্চল মতি সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক কারাবন্দী করেও ইবনে বতুতাকে ভারত থাকতে সম্মত করতে পারেনি।

ছাড়া পেয়েই ইবনে বতুতা দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে চীন দেশের পথে বাংলায় আসেন। দক্ষিণ ভারত থেকে সমুদ্র পথে আগমনকরে তিনি বাংলাদেশের সাদকাওয়ান বন্দরে অবতরণ করেন।

✪ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন 'হবনক' শহরের অবস্থান বুঝা যাইতেছে না।

Dhaka University Institutional Repository

এই সাদকাওয়ান বন্দরটি কোথায় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে হুগলি জেলার অন্তর্গত সাতগাঁও ছিল ইবনে বতুতা উল্লেখিত সাদকাওয়ান বন্দর। কর্নেল এইচ ইউল এবং ব্লকম্যান মনে করেন চাটগাঁও বন্দরই ইবনে বতুতা বর্ণিত সাদকাওয়ান বন্দর।[৮]

ইবনে বতুতার কামরু (সিলেট) সফরে তিনি নাম, কাল, পথ ও স্থান বিভ্রাটে পতিত হন। নিম্নে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হল।

(১) নাম সম্পর্কিত বিভ্রাটঃ

বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা কি সিলেটের হযরত শাহজালাল ইয়ামনী কুনিয়াভি (রহ.) অথবা শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্য কামরূ (সিলেট) আগমন করেন? এ বিষয়টি খুবই জটিল আকার ধারণ করেছে বলে অনেক লেখককে ভাবিয়ে তুলেছে। তার জবাবে বলা যায় শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি একজন মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।

তাঁর সম্বন্ধে প্রামানিক ইতিহাস আছে। তিনি সুলতানুল মাশাইখ খাজা মইনুদ্দীন মুহাম্মদ হাসান সিজজী চিশতি (৫৩৭-৬৩৩/১১৪২-১২৩৬) দিল্লীর খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী উশী (৫৩৭-৬৩৩/১১৪২-১২৩৫-৬ এবং উপমহাদেশে সুহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রবর্তক শায়খ বাহা উদ্দীন যাকারিয়া সুলতানীর (৫৬৫-৬৬৫/১১৬৯-১২৬৬) সম সাময়িক ছিলেন। কিন্তু তিনি সিলেট বা কামরু বা আসাম অঞ্চলে এসেছিলেন বলে প্রামানিক দলিল নেই। শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযি উত্তরবংগে গৌড় পান্ডুয়া এবং বারিন্দ্র ভূমিতে প্রায় দশ বছর যাবত ইসলাম প্রচার করেন। মালদহ জিলার পান্ডুয়ায় জালাল উদ্দীন তাবরিযির ইবাদত খানা আছে। বাংলার সুলতান আলী শাহ (৭৪০-৪৬/১৩৩৯-৪৫) স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়া (৭৪২/১৩৪২) মূল দরগাটি নির্মাণ করেন। উক্ত সুলতান কর্তৃক ১৩৪২ সনে শায়খের ধ্যানময় (মুরাকাবার) স্থানে একটি জামে মসজিদও নির্মাণ করা হয়।

বাদশাহ হুমায়ুনের সম সাময়িক মাওলানা জামালী লিখেছেন যে, পান্ডুয়া শহর থেকে ১৭ মাইল দুরে দেওমহল নামক স্থানে শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযী সমাহিত আছেন।

জালাল উদ্দিন তাবরিযির মত্যু তারিখ সম্বন্ধেও নানা অভিমত আছে। ৬৪২ হিজরী. ১২৪৪ ঈ. সর্বাধিক স্বীকৃত মৃত্যু সন।[৯] কেউ কেউ ৬২২হিজরী/ ১২২৫ তাঁর মৃত্যু সন বলেছেন।

শায়খ ফরিদ উদ্দীন গাঞ্জে শাকর ৫৭১-৬৬৬/ ১১৭৫-১২৬৯) বলেন যে, তিনি শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযির ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলেন। শায়খ তাবরিযি সেই সময় হাসিতেছিলেন। জনৈক বন্ধু এই অবস্থা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন: মুমূর্ষ ব্যক্তির ইহা কি রকম হাসি? উত্তরে বলা হইল আল্লাহ সম্পার্কিত তত্ত্বজ্ঞানের ইহাই নিদর্শন।

---

৮. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.) পৃ- ২২৭, ২২৮

৯. ইসলামিক বিশ্বকোষ, ২৩ শ খন্ড, পৃ- ৫৬২

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিযির সঙ্গে ইবনে বতুতার সাক্ষাত না হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি তা উল্লেখ করলেন? এটা অস্বাভাবিক নয় যে, পরবর্তীকালে কোন নকলনবিশ জালালুদ্দীন নামের সংগে তাবরিযি শব্দটি জুড়ে দিয়েচে। ইবনে বতুতার বর্ণনায় অন্যত্র দেখা যায় একই সুফী সাধক সম্পর্কে জালালুদ্দীন সিরাজী নামেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

N.K Bhattasali লিখেছেন Ibn Batuta once calles the saint Tabrizi once shirazi which shows that he was not sure of either.

এটা অস্বাভাবিক নয় যে ইবনে বতুতা নিজেই এই ভুল করেছেন কারণ ১৩৪৬/৪৭ ঈসায়ী বাংলাদেশ ত্যাগ করার বহুকাল পর মরক্কোর সুলতানের রাজদরবারে অর্থাৎ ১৩৫৪ সাল তিনি তার ভ্রমন বৃত্তান্ত একত্র করেন এর পরবর্তী বৎসর ১৩৫৫ সালে ইবনে জয্যী ইহার সংক্ষিপ্ত সার সংকলন করেন।

জালালুদ্দীন সিরাজী ও জালালুদ্দীন তাবরিযি দুই ব্যক্তি ছিলেন। জালালুদ্দীন সিরাজী কখনও বাংলাদেশে আসেননি।

নাম বিভ্রাট এবং দুইজন সুফী সাধকের এ সম্পর্কীয় বর্ণনার মধ্যে নানা অসংগতি থেকে কেউ কেউ ধারণা করেন যে, ইবনে বতুতা যে, শাহজালালের সঙ্গে সাক্ষাত করেন তিনি সিলেটের শাহজালার (রহ.) নন, জালাল উদ্দীন তাবরিযীও নন। তাঁদের ধারণা আসামের পার্বত্য অঞ্চলের কামরূ পাহাড়ে অবস্থান কারী কোন শাহজালাল উদ্দীনের সঙ্গে ইবনে বতুতা সাক্ষাৎ করেন। কামরূপের এই শাহজালাল উদ্দীনের চীন দেশের খান বালিক শহরের বুরহান উদ্দীন সাগরজীর পত্র যোগাযোগ ছিল। ইবনে বতুতা খান বাশিক পৌছার পূর্বেই বুরহান উদ্দিন সাগরজী শাহজালাল (রহ.) এর পত্র পেয়েছিলেন। ইবনে বতুতা চীন সফর কালে বুরহানুদ্দীন সারগরজীর সঙ্গে খানিকু খানবালিক শহরে অবস্থান কর। খানুক শব্দের অর্থ খানদের শহর যা বর্তমানে পিকিং নগরী নাম পরিচিত। [১০]

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে ইবনে বতুতার সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে Barua লিখেছেন This Jalal uddin (when Ibn Batuta met) was no other than the famous shahjalal of sylhet who died about 1346A.D.Shortly after Ibn Btuta Visited him. [১১]

(২) কাল সম্পর্কিত বিভ্রাটঃ

শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরিযির সঙ্গে ইবনে বতুতার সাক্ষাত কালপঞ্জীর দিক থেকে ও অসম্ভব। জালালুদ্দীন তাবরিযি ৬৪২হিঃ ১২৪৪ ঈসায়ী ইন্তেকাল করেন। কিন্তু ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন ১৩৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দে। জালালুদ্দীন তাবরিযি দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ এবং বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহ রাজত্বকাল বাংলায় আগমন করেন।

---

১০. Journal of Asiatic Socity of Bengal Calcata, May 1913, P- 711

১১. Rahim M. A Socialand Cultural history of Bengal (Karahi, Pakistan Publishing house 1963, Vol- 1, 1201, 1576), P- 101-102

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে বতুতা যে সময় বাংলাদেশে আসেন তখন দিল্লির সুলতান ছিলেন মুহাম্মদ তুঘলক, এবং বাংলার সুলতান ছিলেন ফখর উদ্দীন মোবারকশাহ। যে জালালুদ্দীনের সঙ্গে ইবনেবতুতা সাক্ষাৎ করেন তিনি ৭৪৬ হিজরীতে ১৫০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাহলে এই জালালুদ্দীনের জন্মসন পড়ে (৭৪৬-১৫০) ৫৯৬ হিজরীতে।

ঐতিহাসিক ফিরিশতা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকীর বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, ৫৮৮ হিজরীতে জালালুদ্দীন তাবরিযি খোরাসানে ইসলাম প্রচার করেন্ এটা সত্য হলে জালালুদ্দীন তাবরিযর সঙ্গে ইবনে বতুতার সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। কারণ জালালুদ্দীন তাবরিযি যখন খোরাসান সফর করেছিলেন তখন সিলেটের শাহজালাল (রহ.) এর জন্মও হয়নি।

সিলেটের শাহজালাল (রহ.) দিল্লীতে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। নিজামুদ্দীন আউলিয়া ৭২৫ হিজরী ১৩২৫ঈ. ইন্তেকাল করেন। হযরত নিজামুদ্দীন ছিলেন জালালুদ্দীন তাবরিযির অনেক পরবর্তী কালের ওলী।

ইবনে বতুতার সফর নামায় উল্লেখ রয়েছে যে, কামারুতে অবস্থানকারী শায়খ জালাল উদ্দীন সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং খলিফা মোতাসেম বিল্লাহর হত্যার সময়ে বাগদাদে ছিলেন। ১৪ই সফর ৬৫৬ হিজরী মুতাবেক ২০ ফেব্রুয়ারী ১২৫৮ ঈসায়ী মোতাসিম বিল্লাহ তার পুত্র এবং ৫ জন ইউনুখা খোজা প্রহরী সহ নিহত হন। তার ১৪ বছর পূর্বে জালাল উদ্দীন তাবরিযি (১২৪৪ঈ.) ইন্তেকাল করেন। এ ঘটনা ঘটেছিল ইবনে বতুতা বাংলাদেশ আগমনের (১৩৪৫খ্রিঃ) ৮৮ বছর পূর্বে। কামরূপ অবস্থানরত শায়খ জালাল উদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইবনে বতুতা খানিকু বা খানাবালিক শহরে বুরহান উদ্দীন সাগরজীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সেখানে তিনি অবগত হন যে, কামরূর শাহজালাল ১৫০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এ থেকে অনুমিত হয যে, বাগদাদে মুতাসিম বিল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার বয়স ছিল ৬২ বছর (১৫০-৮৮)।

কিন্তু সুহায়ল-ই-ইয়ামন এর বর্ণনায় দেখা যায় সিলেটের শাহজালাল (রহ.) ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তবে সুহায়ম ই. ইয়ামন এর বর্ণনা তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত গ্রন্থের লেখক নাসির উদ্দীন হায়দার লিখেছেন যে, সিলেটের শাহজালাল ১১১৪ঈ. ইন্তেকাল করেন। এটা সত্য হলে ১৩৪৬ ঈসায়ী কি করে তাঁর সঙ্গে ইবনে বতুতার সাক্ষাত লাভ হতে পারে।১২

(৩) পথ সম্পর্কিত বিভ্রাটঃ

ইবনে বতুতার সফরনামায় উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি শায়খ জালাল উদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাত করে 'নাহরে আজরাক' হয়ে হবংক নগরীতে পৌছেন।

এখন ইবনে বতুতা উল্লেখিত 'নাহরে আজরাক' কোন নদী এবং হবংক শহরে কোন নগরী এবিষয় আলোচনা প্রয়োজন, তাহলে তার 'পথ সম্পর্কিত বিভ্রাটের সমাধান হবে।

আরবীতে নাহর শব্দের অর্থ হচ্ছে নদী এবং আজরাক বলা হয় নীল রং কে। এখন এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন নিয়ে আলোচনা করি।

---

১২. হযরত শাহজালাল কুনিয়াতী (রহ.) পৃ- ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

(ক) Col. H. Yule মনে করেন বর্তমান সুরমা নদী ই তৎকালীন 'নাহরে আজরাক'। তিনি নাহরে আরজক সম্বন্ধে লিখেছেন-

Akzar river is no doubt Surma, by descending which the traveller would come direct upon sonargaon.

যদি সুরমা নদী ইবনে বতুতা কথিত নাহরে আজরাক বা নীল নদী না হয় তবে অন্য কোন নদীটি নাহরে আরজক হতে পারে?

ইবনে বতুতা বলেনঃ

"দরবেশ আমাকে বলেছিলেন তিনি আব্বাসীয় খলিফা মোতাসিম বিল্লাহকে বাগদাদে দেখেছেন। ৬৫৬ হিজরী (১২৫৮খ্রিঃ) উক্ত খলিফাকে হত্যার সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দরবেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হাবাঙ্গ নামে এক বিশাল ও পরম রমনীয় শহরে পৌছলাম। নাহরে আজরাক নামে একটি নদী কামরূপের পাহাড় থেকে বেরিয়ে ঐ শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদী দিয়ে বাংলাদেশ ও লাখনৌতিতে (গৌড়ে) যাওয়া যায়। মিশরের নীল নদের মত এই নদীর দুই তীরে অনেক কারখানা বাগান ও গ্রাম দেখতে পাওয়া যায়। আমরা এই নদী দিয়ে চলে পনের দিনে সোনার গাঁয়ে পৌঁছিলাম।"[১৩]

(খ) H.A.R. Gibb মতে বর্তমান মেঘনা নদী ইবনে বতুতা বর্ণিত নাহরে আজরাক।

(গ) উর্ধ আসামে কৃষ্ণতোরা নামে একটি নদী আছে। একজন চীন দেশীয় পরিব্রাজক তাঁর ভ্রমন বৃত্তান্তে এই অঞ্চলে Le Grand Tcinn- Che-Tci নামে নদীর নাম উল্লেখ করেছেন। একই নদী Eau Naire অথবা Krishnatoa নামেও পরিচিত ছিল।

(ঘ) Ibboult Callier এর মতে উক্ত নদী কৃষ্ণতোয়া, মেকং অথবা সেলুয়েন ও হতে পারে। ব্রম্মপুত্র নদী উর্ধ্ব আসামে কোন অংশ লোহিত নদী নামে পরিচিত। ইবনে বতুতা বাংলাদেশ সফরের বহুপর তার ভ্রমন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন লোহিত অথবা লাল নদীয়ে অনুবাদ নাহরে আজরাক বা নীল নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ইবনে বতুতা কথিত 'নাহরে আজরাক' মেকং, সেলুয়েন, ইরাবতি, হতে পারে না। এমনকি কৃষ্ণ তোয়া, ডিহিং বা লোহিত সাগর ও হতে পারে না। কারণ এসব নদীর উপত্যকায়, অবস্থিত কোন শহর থেকে ১৪ দিনে নৌকা পথে ইবনে বতুতার পক্ষে সোনারগাঁও পৌছা সম্ভব ছিল না।

তদুপরি লোহিত, কৃষ্ণতোয়া ডিহিং নদীর উপত্যকা সুলতান ফখরুদ্দীনের রাজ্যভুক্ত ছিল না।

<u>**N.K. Bhattasali**</u> নাহরে আজরাক সম্বন্ধে লিখেছেন- Three rivers answer to the term blue river. Viz. the Surma, the Kalni and the Meghna, but I think no other than Surma is meant by the traveller. It really leads to Lakhawati country as well at to Sonargaon.

---

১৩. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

Col. H.Yule লিখেছেন Akzar river is doubt, the surma, by which the traveller would come direct upon scnargaon. It is possible that the name of the river Surma Suggesting black collyrium so called my have originated the title used by ibn Batuta.

ইবনে বতুতা সফর নামায় রয়েছে 'দরবেশের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমি হাবঙ্গ নামে এক বিশাল ও পরম রমনীর শহরে পৌছলাম। নাহরে আজরাক নামে একটি নদী কামরূপের পাহাড় থেকে বেরিয়ে ঐ শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে বুঝা যায় হাবংক একটি বৃহৎ ও সুন্দর শহর। এই শহর কামরূপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত (নাহরে আজরাক) নীল নদের তীরে অবস্থিত। ব্রম্মপুত্রের তীরে চতুদর্শ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে হাবঙ্গ নামে একটি শহর ছিল। হাবুঙ্গ নামে কোন শহর শ্রীহট্ট জিলায় কখনও ছিল না। বদরপুরের নিকটবর্তী ভাঙ্গা অনেক পরে স্থাপিত হয়। স্থানীয় অদিবাসীদের যাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা থেকে বুঝা যায় ইবনে বতুতা কামরূপে গিয়ে ছিলেন শ্রীহট্টে নয়। ব্রহ্মপুত্র নদী প্রাচীন কালে লৌহিত্য নামে পরিচিত ছিল। ইবনে বতুতা বহু বৎসর পর তার ভ্রমন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন কাজেই নদীর নাম লোহিত্য না বলে ভুলক্রমে নাহরে আজরাক নীল নদী বলে থাকবেন। ড. শহীদুল্লাহ বলেন- 'হবনক শহরের অবস্থান বুঝা যাইতেছেনা। আর আজরাক নদী ব্রহ্মপুত্র জানিয়া বোধ হইতেছে'।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অধিকার সমুহ জরিপ করার জন্য Major James Renuel লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে ১৭৬৭ ঈসায়ী হতে ১৭৭৬ ঈসায়ী পর্যন্ত ভারতের পুর্বাঞ্চল জরিপ করেন এবং তখনকার প্রামানিক নকশা তৈরী করেন। রেনেলের ম্যাপ হতে নদীর গতিপথ সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইবনে বতুতা সম্ভবত দুটি জলপথ অনুসরণ করতে পারেন। তবে এখানকার নদী গতিপথ আর চতুর্দশ শতকের গতিপথ হয়ত এক ছিল না। সিলেট শহর হতে ১০ মাইল পশ্চিমে নওগঞ্জ নামক স্থান থেকে কুশিয়ারা নদী পথে বর্তমান বিশ্বনাথ, জগন্নাথপুর ও বালাগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুশিয়ারা নদী বরাক নদীর প্রধান স্রোতে পতিত হয়েছে। এই নদীর তীরের প্রধান স্থান গুলোর মধ্যে রয়েছে বনবুগ, আওরঙ্গপুর, সৈয়দপুর, এবং বরাক নদীর দক্ষিণ তীরস্থ হবিগঞ্জ। ইবনে বতুতার হবংক শহর উপরোক্ত যে কোন একটি স্থানহতে পারে। তবে হবিগঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সিলেট হতে সোনারগাঁয়ে আসার দ্বিতীয় জলপথ সিলেট শহর হতে ৪০ মাইল উর্ধ পথে ভাঙ্গার বাজার হয়ে। ভাঙ্গার বাজারের নিকটই নদীর প্রধান স্রোতধারাটি সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বিভক্ত হয়ে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়েছে। ইবনে বতুতা এই নদী পথে অগ্রসর হলে তাঁর কথিত হবংক নগরী ভাঙ্গার বাজারও হতে পারে। কিন্তু তা স্বাভাবিক মনে হয়না। কারণ সিলেট হতে সোনারগাঁও আসতে হলে সাধারণতঃ উর্ধ্ব গতিপথে ভাঙ্গার বাজার হয়ে আসা হয় না। তবে হতে পারে ইবনে বতুতা এ শহরটি দেখার মানসেই সেখানে গিয়েছিলেন। প্রাখ্যাত James Rennel কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ম্যাপের পূর্বেকার কোন ম্যাপই এখন পাওয়া যায় না।[১৪]

১৪. শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.) পৃ- ২৩৪-২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

(৪) স্থান সম্পর্কিত বিভ্রাটঃ

বাংলার সুলতান ফখর উদ্দীনের রাজত্বকালে ইবনে বতুতা বাংলাদেশ ভ্রমন করেন। তাঁর ভ্রমন বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন যে, ৭৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৩৪৫/ ৪৬ ঈসায়ী ইবনে বতুতা শাইখুল মাশাইখ জালাল উদ্দীন তাবরিযির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কামরু আসেন। তাঁর বর্ণনায় শ্রীহট্ট বা সিলেট বলে কোন স্থানের উল্লেখ নেই। কামরুর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, কামরু হতে পর্বতমালা শুরু হয়ে চীন এবং তুব্বত (তিব্বত) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তারপর শায়খ জালালের কয়েকটি আলৌকিক ঘটনার উল্লেখ তার বর্ণনায় আছে।

যদিও ইবনে বতুতার বর্ণনায় শ্রীহট্ট বা সিলেটের উল্লেখ নেই, তবুও বহু লোকের ধারণা ইবনে বতুতা সিলেট আগমন করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন স্যার যদুনাথ সরকার, নলিনী কান্ত ভট্টাশীল কর্নেল এইচ.ইউল প্রমুখ।

Col. H. Yule লিখেছেন Kumru is of Course Kamahupa is term of some what wide opplication, but which anciently included Sylhet. The sheikh Jalal Uddin was Idoubt not the patron saint of Sylhet. Now Known as Sah Jalal the subject of many legends. Jo whom ascribed the converssion of the peole of the country to Islam and whose shrine at Sylhet flanked by four Mesques, is still famous.

অনেকের ধারণা ইবেন বতুতার কামারু কারূপ বা কামাখ্যা হতে পারে। তবে ঐ সময় কামাখ্যা পর্যন্ত ইসলাম প্রকৃতই প্রচারিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ, যদিও ইসলামের বাণী বহনকারী সাহবী গণ সুদূর চীন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তবে শ্রীহট্ট সাধারণ ভাবে কামরূপের অংশ হিসেবে পরিগণিত। কর্ণেল এইচ. ইউলের দৃঢ় বিশ্বাস, ইবনে বতুতা সিলেট আগমন করেছিলেন এবং তৎকালে শ্রীহট্ট প্রাচীন রাজ্য কামরূপের অংশ ছিল। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র হতে পদ্মা নদী পরিবেষ্টিত উত্তরবঙ্গ হতে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর বঙ্গ অঞ্চলই মুসলিম লেখকগন মধ্যযুগে কামারু নামে অভিহিত করতেন।

ড. মুহাম্মদ এনামূল হক মনে করেন যে শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য ১৩৪৫ ঈসায়ী (৭৪৬ হিজরী) ইবনে বতুতা কামরূপ গমন করেন।

N.K. Battasali লিখেছেন No serious doubt is now entertained that itwas Shaj Jalal, the famous saint of Sylhet. Whom raveler to see. That vasit took place about 746 A.H. 1345 A.D.

নালিনী কান্ত ভট্টাশালী (তিনি আরও) মনে করেন ইবনে বতুতার সঙ্গে শাহজালালের (যিনি জালাল উদ্দীন তাবরিযি নামে খ্যাত ছিলেন) সাক্ষাত হয়েছিল তিনি লিখেছেন- Shah jalal was traditional conquerer of Sylhet and one who converted the people of Sylhet to Islam. Ibn-E-Batuta also says that the people of

Dhaka University Institutional Repository

the tract received Islam at his hands. This achevement of Hazrat Shahjalal worked on papular fancy and gave rise to a multitude of legends which are still current among the Bengal peasntry and which, on analysis revel an amazingly admiture of fiction and history.

ইবনে বতুতা হযরত শাহজালাল (রহ.) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি করেননি তা নির্ভর করে ইবনে বতুতা উল্লেখিত কয়েকটি তথ্যের উপর। এগুলো হল (১) শাহের নাম ও বর্ণনা (২) যে নদী বয়ে তিনি শাহের খানকাহ হতে হবংক নগরীতে পৌছলেন সে নদী ও হবংক শহরের পরিচিতি।

যারা মনে করেন ইবনে বতুতা অদৌ সিলেটে আসেনি তাদের মধ্যে রয়েছেন রাজ প্রাসাদ চন্দ্র, মুফতি আজহার উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী, সৈয়দ হাবিবুল্লাহ, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, রজনী রঞ্জন দেব। তাঁদের ধারণা, তিনি উর্ধ্ব আসামে শাহজালাল উদ্দীন নামে সে সাধু পুরুষের সাক্ষাৎ করেন তিনি অতি বৃদ্ধ, প্রায় দেড়শত বৎসর বয়স্ক ছিলেন। শ্রীহট্টের শাহজালাল উনসত্তর বৎসর বয়সে ওফাত হয় এবং সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী বয়ে শিব সাগর জেলায় অবস্থিত হবংক শহর হয়ে সোনার গাঁয়ে পৌছেন। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় ইবনে বতুতা আদৌ শ্রীহট্টে আসেননি।[১৫]

নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা অবশ্যই দিক নির্দেশনা ও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাবে যে, ইবনে বতুতা সিলেটে হযরত শহাজালাল মুজাররদ কুনিয়াভী / ইয়ামনী (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন।

পীর দরবেশ, সুফী সাধকদের প্রতি এদেশের হিন্দু এবং মুসলিম জনসধারণের শ্রদ্ধাবোধ একটি ঐতিহাসিক সত্য ও স্বীকৃত বিষয়। জন সাধারণ বড় বড় সম্রাট ও রাজাদের ভুলে যায়, উৎপীড়ন কারী শাসককে বিস্মৃত হয়। কিন্তু পীর মাশাইখ সূফী দরবেশকে ভুলে না তাঁদের কে তারা বুকে ধারণ করে আসছে যুগ যুগধরে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত বাগদাদ শহরে আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ, মামুনুর রশীদ বা অন্যান্য আব্বাসীয় খলিফা কোথায় কে সমাহিত আছেন তার কোন খবর কেউ বলতে পারে না। কিন্তু বড় পীর দস্তগীর মহী উদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) সাইদুত ত্বারিফা জুনাইদে বাগদাদী (রহ.), মানসুর হাল্লাজ প্রমুখ অনেক আউলিয়ার মাজারের খবর তারা রাখে এবং সেখানে আজও জনসমাগম হয়।

ইবনে বতুতা বর্নিত শায়খ জালাল উদ্দীন(রহ.) হিন্দু-মুসলিম সকলের কাছে (যিনি শাহজালাল (রহ.) নামে সুপরিচিত) সমভাবে শ্রদ্ধার্জন করেছেন। সকলেই যুগ যুগ ধরে তার আস্তানায় নানা রূপ নযর-নিয়াজ পেশ করত। ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন যে, আস্তানার দরবেশ গণ অতভ্যাসগত হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের প্রদত্ত নজর নিয়াজ আহার করে দিন কাটাত।

---

১৫. শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণ পীর-দরবেশদের সাময়িক বিশ্রামের স্থানকেও পবিত্র মনে করেন। যেমন চট্টগ্রামে বায়েজিদ বোস্তামী এবং শেখ ফরিদের চিল্লা দেখতে পাওয়া যায়। কুমিল্লায় এবং হবিগঞ্জের পরগনা ফতেপুর প্রভৃতিস্থানে শাহজালাল (রহ.) স্বল্পসময়ের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলেন। কিন্তু এস্থানগুলো ও জনসধারণ পবিত্র মনে করে এবং অনকে জায়গা সংরক্ষণ করে রাখে। ইবনে বতুতা বর্ণিত জালাল উদ্দীন কোন ছোট দরের সুফী ছিলেন না। দেশে বিদেশে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং অন্য গুণাবলীর বিষয় শুনে ইবনে বতুতা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেকালে কামরুপ অধীনে সিলেট ছিল বিধায় সুবিখ্যাত স্থানের নামই তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে ওলী আউলিয়াগণের সাধনা ক্ষেত্র তথা খানকা সংলগ্ন বা সে স্থানেই তাদের মাজার হয়ে থাকে। অতএব, শায়খুল মাশায়েখ শাহজালাল (রহ.) খানকাহ সংলগ্ন স্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। এজন্য পূর্ণ নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় যে, শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী কুনিয়াভী (রহ.) সিলেটে তাঁর সাধনা ক্ষেত্রেই শায়িত আছেন। যদি তিনি শিব সাগর জেলার কোন জায়গায় আস্তানা স্থাপন করতেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন, তবে স্থানীয় লোকজন তা ভুলে যেত না। রাজা বাদশাহগণ শ্রদ্ধাবশত অথবা জনগণের আনুগত্য ও আস্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে অনেক সময় পীর-দরবেশ আউলিয়ার মাজারে জাক জমক পূর্ন ইমারত প্রস্তুত করে দিতেন। এটা নিতান্ত অস্বাভাবিক যে, শিব সাগর জেলায় বা আসামে এমন কেউ ছিলেন না যিনি উক্ত মাজারের উপরে একটি ছোট খাট দালান তৈরী করে দিবেন। এটা অসম্ভব যে, হিন্দু মুসলিম কর্তৃক সমভাবে নন্দিত এমন একজন দরবেশের মাজার এত অবহেলিত থাকবে যে, পরবর্তী কালে তার চিহ্ন ও পাওয়া যাবেনা।

ইবনে বতুতা বর্ণিত হবংক নগরী সোনার গাঁও হতে নদী পথে মাত্র ১৫ দিনের পথ। কিন্তু শিবসাগর জেলার কোন অঞ্চল হতে বা গৌড় পান্ডুয়া হতে নৌকা যোগে ১৫ দিনের মধ্যে সোনারগাঁও আসা সম্পূর্ন অসম্ভব। দ্বিতীয় হবংক নগরীর নিকটস্থ বর্ধিষ্ণু গ্রাম গুলো ইবনে বতুতার মতে সুলতান ফখর উদ্দীনের রাজ্যের অন্তরগত ছিল। কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানা যায় সুলতান ফখর উদ্দীনের রাজ্যের সীমা শিব সাগর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। তাছাড়া সোনার গাও হতে শিবসাগরের অন্তর্গত হবংক নগরী পর্যন্ত প্রত্যক্ষ নৌকা যোগে আসা অনেকটা অসম্ভব মনে হয়।

রজনী রঞ্জন দেব প্রশ্ন তুলেছে যে, যদি ইবনে বতুতার সঙ্গে সিলেটের শাহজালাল (রহ.) এর সাক্ষাত হত তবে তিনি অবশ্যই শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার নাম উল্লেখ করেছেন। সিলেট ভূমি অতি প্রাচীন। রামায়ন মহাভারতে এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে। তাই রজনী রঞ্জন দেব মনে করেছেন যে, ইবনে বতুতা সিলেটে আগমন করে থাকলে অবশ্যই সিলেট শহরের কথা উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। এটা যদিও সত্য যে, রামায়ন মহাভারতে এবং পূরানে এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে কিন্তু তা শ্রীহট্ট নামে উল্লেখ নেই। বিভিন্ন তন্ত্রে শ্রীহট্ট নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্ত্র রচিত হয় অনেক পরে। এমনকি গৌড় গোবিন্দের রাজত্ব কালে এই অঞ্চল বা শহর শ্রীহট্ট নামে পরিচিত ছিল না।

পরিশেষে বলা যায়। ইবনে বতুতা জালাল উদ্দীন তাবরিযির সঙ্গে সাক্ষাত করেননি। আসামের শিব সাগর জেলায় অথবা পূর্ব আসামের অপর কোথাও আস্তানা স্থাপনকারী কোন সাধকের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেননি। তিনি সাক্ষাতকরেন ১৩৪৫/৪৬ ঈসায়ী ৭৪৬হিজরী সিলেটে অবস্থানরত শাহজালাল উদ্দীন কুনিয়াভী/ ইয়ামনী এর সঙ্গে। সুরমা এবং মেঘনা নদী বেয়ে তিনি সিলেট হতে ১৪ দিনে সোনারগাঁও এসে পৌছেন। তিনি ১৩০৩ ঈসায়ী ৭০৩হি. অতি বয়োবৃদ্ধ বয়সে সিলেট আগমন করেন এবং ৪৪ বছর সিলেটে অবস্থান করেন। শাহজালাল (রহ.) ১৫০ বছর বয়সে ১৩৪৭ ঈসায়ী সিলেটে ইন্তেকাল করেন।[১৬]

---

১৬. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.) পৃ- ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ওফাত

মুন্সেফ নাসির উদ্দীন হায়দার এর ভাষ্য অনুযায়ী হযরত শাহজালাল (রহ.) ৫৯১ হিজরী (১১৯৪ ঈ.) ২০ জিলক্বদ ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুন্সেফ নাসির উদ্দীন হায়দারের ভাষ্য কাল্পনিক। তাঁর এই তারিখ মেনে নিলে শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের তারিখ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

শায়খের বয়স সম্বন্ধে মুফতি আজহার উদ্দিন সাহেব প্রণীত শ্রীহট্ট ইসলাম জ্যোতিতে বলা হয়েছে ৭৯/৮০ বছর। কিন্তু তাঁর History of Shah Jalal and his Kadims গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে বতুতার বর্ণনা মতে শাহজালালের বয়স ১৫০ বছর। শায়খের বয়স সম্বন্ধে তিনি আরো লিখেছেন- The authors of the legend say that Shahjalal lived 62 years and the compare it with the age of the prophet who lived 63 years painting out the difference of one year owing to the position of the propeht and a saint. I think this prophet age is really a fiction and not a fact state in the legend. [১৭]

মুফতি আজহার উদ্দিন ও আরো অনেকের মতে হযরত শাহজালাল (রহ.) ২০ জিলকদ ৭৪০ হি. ১৩৩৯ ঈসায়ী ১৫০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

১৫০ বছর জীবন কালের সূত্র ইবনে বতুতা এবং ৭৪০ হিজরীর সূত্র হযরত শাহজালাল (রহ.) এর নাম এবং পরিচিতিমূলক পদবী। ''শাহজালাল (রহ.) মুজাররদ কুতুব বুওদ' এই নাম হতে আবজাদ প্রক্রিয়া অনুসারে তিনটি অক্ষরের গানিতিক নম্বর দিয়ে যোগফল পাওয়া যায় ৭৪০। ওলী দরবেশদের কোন মহত্তম বা স্মরণীয় ঘটনার বছর আক্ষরিক ভাষায় প্রকাশ করে নামের অংশ করে দেয়া হয়। ৭৪০ শাহজালাল (রহ.) এর মৃত্যু জন্ম, সিলেট বিজয়, স্বীয় মুর্শিদ থেকে খেলাফত প্রাপ্তি বা অন্য কোন ঘটনার সাল হতে পারে। তবে তার মৃত্যু সাল হওয়ার সম্ভানাই বেশি। ৭৪০ হিজরীতে মৃত্যুর ধারণা কোন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে নয় তা নিতান্ত অনুমান।

উল্লেখ্য, শাহজালাল (রহ.) ৭৪০ হিজরীর দিকে জীবিত ছিলেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখা যায় তিনি ৭৪৬ হিজরীতে শাহজালাল (রহ.) সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। ১৩৮৪ ঈসায়ী ৬২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন বলে কারো কারো অভিমত।

শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের তারিখ সম্বন্ধে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য হলো হোসেন শাহী শিলালিপি। আর তাঁর মৃত্যু কালের বয়স সম্বন্ধে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য হলো ইবনে বতুতার বর্ণনা। ইবনে বতুতা ১৩৪৫-৪৬ ঈসায়ী বাংলাদেশ

---

১৭. হিস্ট্রি অব শাহজালাল এন্ড হিজ খাদিমস পৃ- ২৪

Dhaka University Institutional Repository

সফর করেন এবং কামরু পর্বতে শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি ১৩৪৮ ঈসায়ী চীন দেশে পৌঁছে খবর পান কামরূ পর্বতে যে শাহের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন তিনি এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জান্নাতবাসী হয়েছেন। এই সময় সিলেট কামরূপের অন্তর্গত ছিল বিধায় সিলেট না বলে ইবনে বতুতা কামরূ পর্বত বলেছেন। ইবনে বতুতা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শাহজালাল (রহ.) এর কোন শাগরিদের কাছ থেকে শুনেছেন যে, শাহজালাল (রহ.) ১৫০ বছর জীবিত ছিলেন। বয়স সম্বন্ধে এই শ্রুতি কতটুকু নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। যদি আমরা শাহজালাল (রহ.) জীবনকাল ১৫০ বছর ধরে নেই তবে সময় পঞ্জি দাড়ায় নিম্নরূপ। শাহজালাল (রহ.) ১১৯৭ ঈসায়ী কুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন ১২৫৮ ঈসায়ী ৬৫৬ হিজরী আব্বাসীয় সুলতান মুতাসিম বিল্লার হত্যার সময় তিনি বাগদাদ ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ৬১ বছর। সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ দেহলভীর রাজত্বকাল ১৩০৩ ঈসায়ী (৭০৩হিঃ) তিনি ১০৬ বছর বয়সে সিলেট আগমন করেন। বিজয়ের পর সিলেটে ৪৪ বছর অবস্থান করে ১৫০ বছর বয়সে ১৩৪৭ ঈসায়ী (৭৪৬ হিঃ) জান্নাতবাসী হন।

ইবনে বতুতার তারিখের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার আলোকে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল তথ্য উপাত্তের মধ্যে ইবনে বতত্বার বর্ণনাই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বলা ছাড়া উপায় নেই। [১৮]

---

১৮. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.) পৃ- ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দরগাহ-ই-হযরত শাহজালাল (রহ.)

শুধু মুসলমানদেরই নয়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছেই শাহজালালের দরগা একটি পুণ্যতীর্থ। এখানে এসে অনেক পায় হৃদয়ে প্রশান্তি, বিরহী ভুলে তার বিরহ বেদনা, পীর ফকির পায় আধ্যাত্মিক জ্যোতির সন্ধান, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মজলুমের সেটা সান্তনার স্থল, গরীব মজলুম জনসাধাণ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এখানে নালিশ জানিয়ে লাঘব করে বেদনা ভার। সাধক এখানে পায় তত্ত্বজ্ঞানের আবে হায়াত। জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ দুরারোগ্য ব্যক্তি গ্রস্ত পায় শিফা।[১৯] মোট কথা, সকল মানুষ এখানে এসে শান্তি পায় আর প্রার্থনা জানায় আল্লাহর নিকট তাঁর ওসিলা নিয়ে স্ব স্ব মাকসাদ পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে। আল্লাহর ওলীর ফয়েজ ও বরকতে যুগে যুগে মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক জগতের সুলতান শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনী (রহ.) দরগাহ শরীফ জিয়ারত করার জন্য যুগযুগ ধরে দুর দুরান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান সিলেটে আসেন এমনিভাবে তাঁর পাক দরগাহ জিয়ারতের জন্য ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট শাহ আলমের দৌহিত্র মির্জা ফিরুজ শাহ এই দরগাহ জিয়ারত করতে আসেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম আমলের বিখ্যাত কালেক্টর মিঃ রবার্ট লিন্ডসে (১৭৭৯-১৭৮৯ ঈসায়ী) তাঁর আত্ম-জীবনীতে বলেছেন, এখানে নূতন কালেক্টর এলে তার প্রথম কর্তব্য ছিল এই দরগাহ শরীফ জিয়ারত করে হযরত শাহজালাল (রহ.) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। ভারতের নানা স্থান থেকে দর্শনার্থী এই মাজার শরীফ জিয়ারত করতে আসেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লিন্ডসে নগ্নপদে দরগায় গিয়ে পাঁচটি আশরাফী নিয়াজ দেন। এরূপে অভিষিক্ত হয়ে তিনি তর কুঠিতে ফিরে গিয়ে প্রজাদের আনুগত্য গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান আমল হতে শুরু করে অদ্যাবধি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্র প্রধান ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই মাযার শরীফ জিয়ারতে আসেন। তাছাড়া পীর ফকির ওলী আউলিয়াগণ অলিখিত খেলাফত প্রাপ্তির চূড়ান্ত সনদ এখান থেকেই লাভ করেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

দরগাহ ফার্সী শব্দ আভিধানিক অর্থ আস্তানা, দরবার, চৌকাট, খানকাহ, রুওজা, মাজার। যেমন বলা হয় দরগাহে এলাহী অর্থাৎ- আল্লাহর দরবার।[২০] পরিভাষায় দরগাহ বলতে আউলিয়ায়ে কেরামদের কবর বা মাজার শরীফকেই বুঝায়। অতএব, দরগা-ই-শাহজালাল (রহ.) বলতে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পবিত্র মাজার শরীফও তৎসংলগ্ন চত্বরকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

শ্রীহট্ট শহরের উত্তর প্রান্তে একটি মনোরম টিলার উপর হযরত শাহজালালের শেষ শয্যা বিরচিত হয়েছে। ইহা শাহজালের দরগাহ বলে দীর্ঘ শতাব্দী যাবত মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্মীয় লোকের ভক্তি অর্ঘ্য পেয়ে আসছে।[২১]

---

১৯. শ্রীহট্ট জ্যোতিঃ পৃ- ১৩৩।

২০.ফিরুজুল লুগাত, উর্দু (করাচি, ফিরোজ, সন্স লি. ১৯৬৭) পৃ- ৫৬৭।

২১. শ্রীহট্ট ইসলাম জ্যোতি, পৃ- ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় লেখা সিলেট অঞ্চলের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ (১৮৮৬) শ্রীহট্ট দর্পণ এ বলা হয়েছে- হযরত শাহজালাল (রহ.) বেঁচে থাকতে যে ছোট্ট টিলার উপর বাস করতেন মৃত্যুর পর সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। দাফনের পর তাঁর কবরের চারপাশে ছোট দেয়াল তোলা হয়। পাশেই বানানো হয় একটি ছোট মসজিদ। আজকে যে বিশাল মসজিদ সেদিনের মসজিদটি আজকের মত ছিল না। চার পাশে একটি নিরিবিলি শান্তভাব। আজকের পাঁচতলা মসজিদের সামনে যে ছোট্ট ঈদগাহ চত্তর সেখানে ছিল একটি ছোট পুকুর। মসজিদের পূর্ব দিকের অংশ মাঝে, মসজিদের মুল ভিত্তির টিলাটি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ছিল দুটো পাকা কবর। মসজিদের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণের ফলে সে দুটো কবরকে এমনভাবে মসজিদ কমপ্লেক্সের সাথে একীভুত করা হয়েছে সেই কবর দুটো সহজে দেখা যায় না। তবে মসজিদের নীচতলায় সামনের গ্রীল দিয়ে তাকালে এখনো কবর দুটো দেখা যায়। নগরীর দর্শন দেউড়ীতে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে দরগা মহল্লা ওয়ার্ড কে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১ (এক) নং ওয়ার্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সিলেট রেলস্টেশন, সিলেট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে কীন ব্রীজ পার হয়ে কোর্ট পয়েন্ট (জিরো পয়েন্ট) থেকে উত্তর দিকে প্রথমে মাজার। তবে এলাকাটি এখন দরগা মহল্লা নামে পরিচিত। হযরত শাহজালাল (রহ) এর জিন্দাবাজার পয়েন্ট ছেড়ে চৌহাট্টা পয়েন্ট থেকে কয়েকশ গজের উত্তরে যাবার পর বাঁ দিকে দরগা-ই-শাহজালাল (রহ.) এর প্রবেশ পথ।

বাংলা বিশ্বকোষে দরগা শাহজালাল (রহ.) বর্ণনা নিম্নরূপঃ

দরগাহের সৌধাবলী প্রাক মুসলিম ধংসাবশেষের উপর নির্মিত বলে মনে হয়। একাধিক শিলালিপি রক্ষিত আছে। এতে মনে হয় সৌধাবলী বিভিন্ন সময়ে নির্মিত। কোনটিই ১৭ শতকের আগের নহে। দরগাহের আয় হতে পূর্ণনির্মাণের সুবিধা হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে ফৌজদার বাহরাম খানের আমলে ১৭৪৪ সালে নির্মিত হয় একটি মসজিদ। যা ইষ্টক নির্মিত। সম্মুখে পরবর্তীকালে সংযুক্ত করা হয় একটি বারান্দা। আসল মসজিদের চারকোনে মিনার। গম্বুজ সমূহ দীর্ঘ চূড়া বিশিষ্ট। সম্মুখে একটি দরওয়াজা। পরবর্তী সৌধ বড় গম্বুজ নামে পরিচিত। আমিল ফরহাদ খান কর্তৃক ১৬৭৭ এ নির্মিত। সৌধটির উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। সমাধির জন্য বলিয়া মনে হয়। ইহা এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতি; কোণে ওষ্টাভুজ মিনার উপুর করা কলসীর উপর নির্মিত। পূর্বদিকে ৩টি দরওয়াজা। মধ্যেরটি বড়। দুইট দরওয়াজার মধ্যে একটি করিয়া ছোট কুলুঙ্গি। মধ্যের দরওয়াজার উপর শিলালিপি। গম্বুজটির উপরে চুড়া, অভ্যন্তরে কারুকার্যময়। অন্য কোন দরওয়াজা বা মিহরাব নাই। বড় গম্বুজের পিছনে ১৯ শতকে সিলেটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ওয়ালিস কর্তৃক নির্মিভ একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ইহাকে উপরে বর্ণিত মসজিদের ছোট সংস্করন বলা যায়। যে পরিবেষ্টিত স্থানের কেন্দ্রস্থলে পীর শাহজালালের কবর তাহারই এক পার্শ্বে মসজিদটি অবস্থিত। কবরটি ইষ্টক নির্মিত। বেষ্টনির চারি কোনে'দীর্ঘ মিনার। মিনারের চুড়ায় কাপড়ের চাপোরা বাঁধিয়া কবরটি আবৃত করা হয়। একই উচ্চতায় আরো দুইটি বেষ্টনী আছে। ইহাতে পীর সাহেবের চিল্লাখানা ও তাঁর সঙ্গীদের

Dhaka University Institutional Repository

কবর অবস্থিত। টিলার সম্মুখে খোলা প্রাঙ্গন হতে বড় গম্বুজে উঠবার সিঁড়ি। নিকটেই উযুর পুকুর এতে রঙিন মাছ। প্রাঙ্গনের উত্তরে লঙ্গরখানা, এখানে দরিদ্রভোজন হয় এবং ভোজ্য বন্দনের জন্য দু'টি বিশাল কড়াই দেখা যায়। পূর্ব দিকে মি. ওয়ালিস নির্মিত মোগল রীতি গম্বুজ বিশিষ্ট ফটক ছিল। ইহা ১৮৯৭ এর ভূমিকম্পে বিধস্ত হয়। ফটকের উপর তারালায় লঙ্গরখানা ছিল। টিলার পিছনে পীর সাহেবের বিখ্যাত চশমা বা কুপ (ইহার পানি পবিত্র মনে করা হয়) স্থানটি প্রাচীর বেষ্টিত ও প্রস্তর দ্বারা আবৃত।[২২]

অধুনা দরগাহ শরীফ চত্বরে বেশ সংস্কার সাধিত হয়েছে এরই আলোকে নিম্নে কিছু হল।

১. শাহজালাল (রহ.) গেইটঃ

নগরীর প্রধান সড়ক সিলেট আন্তর্জাতিক ওসমানী বিমান বন্দর সড়ক থেকে কয়েকশ গজ ভেতরে হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার। দরগাহ প্রবশে পথেই আধুনিক কালে নির্মিত পবিত্র কলিমা খচিত একটা গেইট পাওয়া যাবে। গেইটটির নকশা তৈরী করেন ঢাকার মেসার্স ডমার্স কন্সালটেন্ট। ১৯৮৯ সালে ২৮শে এপ্রিল গেইটটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় একই বছর আগষ্টে শেষ হয়। এই গেইটটি নির্মাণ করতে পাচ লাখের ও বেশী টাকা ব্যয় হয়। কালেমা খচিত গেইটটি পেরিয়ে কিছু দুর যাবার পর আধুনিক কালে নির্মিত একটি মনোরম তোরণ। আধুনিক কালে নির্মিত হলেও এতে রয়েছে মোগল স্থাপত্য শিল্পের ছাপ। গেইটটির ঠিক পশ্চিমে মোগল ফৌজদার ফরহাদ খাঁ একটি মসজিদ বানিয়ে ছিলেন, সেই মসজিদের নির্মাণ শৈলীর সাথে তোরণটি একটি সামঞ্জস্য রয়েছে। গণপূর্ত বিভাগের স্থাপত্য অধিদপ্তর এই তোরণের ডিজাইন করে। ২০০৩ সালের মে মাসে এই তোরনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৩রা অক্টোবর ২০০৩ তোরণটির উদ্বোধন করা হয়। তোরণটি নির্মাণে ব্যয় হয় সাতশ লাখ পয়ত্রিশ হাজার টাকা।

বিশাল এই তোরণটির গম্বুজসহ উচ্চতা ২৮ফুট। ৪৪ ফুট দীর্ঘ ও ১৮ ফুট প্রস্থের ভূমিতে তোরনটি তৈরী হয়েছে। মূল প্রবেশ পথের প্রস্থ ২৪ ফুট। প্রবেশ পথের দুপাশে তোরণের অংশ হিসেবে দোতলা বিশিষ্ট চারটি রুম তৈরী করা হয়েছে। একটি ভি.আই.পি একটি মোতাওয়াল্লী কক্ষ, একটি মহিলা কক্ষ এবং অপরটি দরগা শরীফের অফিস কক্ষ। সিলেট জেলা পরিষদ এ তোরণটি নির্মাণ করে। অর্থ পরিকল্পনা মন্ত্রী মরহুম এম. সাইফুর রহমানের ব্যক্তিগত উৎসাহে তোরণটি নির্মিত হয়। ২০০৩ সালে নির্মিত তোরণটি নির্মাণের আগেও এ স্থানে আরেকটি দোতলা তোরণ ছিলো। এরও পূর্বে এখানে একটি সুদৃশ্য গেইট ছিলো। এই গেইটটি নাক্কারখানা বলা হত।

দরগাহর আভ্যন্তরিন এলাকার পূর্ব সীমার উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল এক প্রকান্ড প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যস্থলে রয়েছে প্রবেশদ্বার। প্রবেশ দ্বারটি ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট। উপর তলায় রয়েছে একটি সুদৃশ্য গম্বুজ। দ্বিতলটি নাক্কারখানা নামে পরিচিত। এতে প্রকান্ড ঢোল রাখা হয়। প্রত্যূষে এবং গোধুলিতে ঢোলের আওয়াজে নামাজের সময় ঘোষিত হত। ঈদ, শবেবরাত এবং বাৎসরিক ওরসের সময় নক্কার শব্দ ৬/৭ মাইল দুর থেকেও শোনা যেত। সিলেটের কালেক্টর (১৭৮৯-১৭৯৩ঈ.) মিঃ willis কর্তৃক নাক্কার হাউজ নির্মিত হয়। ১৮৯৭ ঈসায়ী ভূকিম্পে এটা বিধ্বস্ত হয়।

---

২২. ইসলামী বিশ্বকোষ (২৩শ খন্ড) (বাংলা বিশ্বকোষ ৪র্থ খন্ড, ৪৫২ পৃ. থেকে উদ্বৃত) প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৫৬-৬৫৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

২. দরগাহ চত্তরঃ

এক সময় দরগাহ চত্তর অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। বর্তমানে মাজারের টিলা সংলগ্ন ভূমির আয়তন প্রায় ১০ একর এবং নাক্কারখানা থেকে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার চত্তর শুরু। নাক্কারখানা থেকে সোজা রাস্তা দিয়ে খানিকটা যাবার পর সিঁড়ি বেয়ে উপর উঠতে হয়। মাজারে যাবার পথের দু'পাশের চত্বরে টাইলস বসানো। কিন্তু এক সময় দু'পাশই ছিলো মাটির। ১৯৯৬ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের উদ্যোগে মাজারে যাবার রাস্তার বামপাশে টাইলস বসানো হয়। পরে ২০০৩ সালের শেষ এবং ২০০৪ সালের প্রথম দিকে পুরো মাজার এলাকায় টাইলস বসানো হয় একই সময়ে মাজারের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরো দুটো ছোট গেইট বানানো হয়।

অধুনা দরগাহ চত্বরের দক্ষিণে সরকারী আলিয়া মাদরাসা মাঠের পশ্চিম-দক্ষিণ কোনে চৌহাট্টা সদর হাসপাতাল সংলগ্ন দরগাহে প্রবেশ তোরনের নির্মাণ কাজ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩. দরগাহ মসজিদ

সিড়ির বাঁ পাশে চারতলা বিশিষ্ট দরগাহে শাহজালাল (রহ.) মসজিদ। বাংলার সুলতান আবু মুজাফফর ইউসুফ শাহের মন্ত্রী মজলিসে আতার আমলে ১৪০০ঈ. এখানে মসজিদটি নির্মিত হয়। এটি সিলেট শহরে একটি অন্যতম প্রধান মসজিদ। ১৭৪৪ঈ. বাহরাম খাঁ ফৌজদারের (১৭৪০-৪৮ঈ.) সময়ে এটি পূণঃ নির্মিত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে মসজিদটি আজকের রুপ লাভ করে।

৪. মহিলা ইবাদতখানাঃ

মাজারে উঠার সিঁড়ির ডান পাশে মহিলাদের ইবাদতের জন্য একটি ঘর রয়েছে।

৫. মাজারে প্রবেশ পথ হলঘর ও গম্বুজঃ

সিড়ির উপরে উঠে বড়ো গম্বুজ বিশিষ্ট একটি হল ঘরের ভিতর দিয়ে মাজারে প্রবেশ করতে হয়। এই হল ঘরটি ১৬৭৭ সালে মোগল ফৌজদার ফরহাদ খাঁ বানিয় ছিলেন, চার কোনা উঁচু ভিত্তির উপরে এই হল ঘরটি স্থাপিত। হলের চারকোনে চারটি আটকোনাকৃতি বুরুজ আছে। হল ঘরের উপরের স্থপতি এক অভিনব কৌশলে গম্বুজের মাধ্যমে ছাদ নির্মাণ করেছেন। গম্বুজের ভিতরের অংশটা কারুকাজ খচিত। কার্ণিশের পেরাপেট তৈরীর কাজে মিস্ত্রিরা মোগল স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করলে ও নির্মাণে স্থানীয় স্থাপত্য রীতির প্রাধান্য দেখা যা। বড় গম্বুজের পেরাপেটে দেশীয় রীতির অনুযায়ী ধনুকের বাঁক লক্ষণীয়। পেরাপেটের কিছু নীচে আরবী একটি শিলালিপি দেয়ালের সাথে গাঁথা। পশ্চিমের দেয়ালে কোন মেহরাব বা মিম্বর নেই।

৬. ঘড়ি ঘর

হল ঘরের ঠিক পশ্চিমে একটি ভবন দেখা যায়। এটি ঘড়িঘর নামে পরিচিত। ভবনটিতে একটি গম্বুজ ও তিনদিকে তিনটি অর্ধবৃত্ত খিলান আছে। এই দালনটি জন উইলিসের আমলে তৈরী

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। ঘড়িঘরের উত্তরে দুটো মাজার রয়েছে। মাজারের পশ্চিমে বেশ ক'টা শিলালিপি রয়েছে।

৭। চিল্লাখানাঃ

ঘড়িঘর আংগিনার পূর্বদিকে চারটি মাজার রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি হচ্ছে হযরত শাহজালাল (রহ.) ঘনিষ্ট সাথী হাজী ইউসুফ, হাজী খলিল ও হাজী দরিয়ার। তাদের মাজারের দক্ষিণে গ্রীলঘেরা তারকা খচিত ছোট্ট যে ঘরটি রয়েছে, এটা হযরত শাহজালালের চিল্লাখানা। স্থানটি মাত্র দু ফুট চওড়া। কথিত আছে এই চিল্লাখানায় হযরত শাহজালাল জীবনের ২৩টি বছর আরাধানায় কাটিয়েছেন।

৮. হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজারঃ

চিল্লাখানার উত্তর দিকের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকেই হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার। মাজারটি উচু ইট দিয়ে বাঁধানো। হযরতের মাজার ও পাকা আবেষ্টনী ১৬৫৯ ঈ. (১০৭০ হি.) নির্মিত হয়। চারপাশে চারটি বিরাট স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলো আধুনিক কালে তৈরী। এই স্তম্ভগুলোতে একটির উপর একটি করে চারটি চাঁদোয়া টাঙগানো হয়। মাজারের পাশের তিন গম্বুজ ওয়ালা ছোট্ট মসজিদ, যেখানে বসে লোকজন কোরআন শরীফ পাঠ করে, এটি মেগাল স্থাপত্য রীতির তৈরী।

৯. অন্যান্য মাজারঃ

হযরত শাহজালালের মাজারের দু'পাশে আরো দুটো মাজার রয়েছে। পূর্ব দিকের অতি সন্নিকটবর্তী মাজারটি ইয়ামনের শাহজাদা শায়খ আলীর। তিনি ইয়ামনের যুবরাজ ছিলেন। হযরত শাহালাল (রহ.) সংস্পর্শে এসে রাজ্যের উত্তরধিকার ত্যাগ করে হযরতের সহযাত্রী হয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তাঁকে বেশী মহব্বত করতেন এবং কাছে রাখতেন। ওফাতের পরও কবরটি রয়েছে তার অতি নিকটে। পশ্চিম দিকের কবরটি ১৪৪০ সালে গৌড়ের (সিলেটের) শাসনকর্তা মুকাবিল খান উজিরের।

১০. চশমা (ঝরনা)ঃ

হযরত শাহজালালের মাজার থেকে পশ্চিম দিকে অল্প দুরেই এ ঝরণাটি পাওয়া যায়। চারদিকে দেয়াল ঘেরা একটি আঙিনার ভেতরে উঁচু করে চার কোনা বিশিষ্ট চমশার (ঝরনার) অবস্থান ঝরনার উপর লোহার গ্রীল দেয়া। ঝরণা থেকে অনবরত পানি বের হচ্ছে। এক সময় এই ঝরণায় সোনালী কৈ মাছ, মাগুর মাছ দেখাযেতে। এখন আর দেখা যায় না। কিংবদন্তী আছে মক্কার পবিত্র জমজম কুপের সাথে এই ঝরনার সংযোগ আছে।

প্রাচীরের বাহিরে আরেকটি ছোট পুস্করনী আছে। ইহারও চারিদিকে উঁচু দেওয়াল ছিল। কিন্তু ১৮৯৭ ঈসায়ী ভূমিকম্পে তাহা ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১১. দরগাহ শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনঃ

আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ওলী আউলিয়াগণ। মৃত্যুর পরেও তাদের কবর অন্যান্যদের কবর থেকে মর্যাদার দিক দিয়ে আলাদা। তাই সে জায়গা কে মানুষ মাজার, কবর, দরগা শরীফ বলে যুগযুগ ধরে সম্মান দিয়ে থাকেন পূণ্যস্থান মনে করে। জিয়ারতের লক্ষ্যে সেখানে প্রতিনিয়ত ভিড় চলতে থাকে।

(ক) শ্রীহট্ট জেলার মুসলমান শাসনকর্তাগন বাদশাহী আমল হতেই নানা ভাবে শাহজালাল (রহ.) এর দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। যখনই কোন রাজপুরুষ শ্রীহট্টের শাসন কর্তা নিযুক্ত হয়ে এ অঞ্চলে এসে পৌছিতেন, কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বে তিনি দরগাহ যিয়ারত ও দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে সর্ব প্রধান কার্য বলে মনে করতেন। কারণ দরগাহর খাদিমগন কর্তৃক অভিসিক্ত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণ তাকে শাসনকর্তা বলে স্বীকার করতেন না। রাজ পুরুষ রাজকীয় আড়ম্বরে দরগায় এসে পৌছতেন, খানকাহর শায়খ তার মাথায় পাগড়ী বেঁধে অনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রতি হযরত শাহজালঅল (রহ.) এর মনোনয়ন জ্ঞাপন করতেন। অনন্তর কিছু দান খয়রাত করার পর খাদিমগন কর্তৃক শ্রীহট্টের গদিতে অভিষিক্ত হতেন। এই প্রথা বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভের দিক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

শ্রীহট্টের তদানীনন্তন রেসিডেন্ট মিষ্টার লিন্ডসে দরগাহ সম্পর্কে এরূপ বলেছেন, 'আমাকে বলা হল যে, নূতন রেসিডেন্টগণের পক্ষে নূতন নিয়ম এই যে, তাহাদিগকে এখানে আসিয়াই সর্ব প্রথম বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহজালালের দরগাহ জিয়ারত করিয়া তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেহয়। আমি দেখিলাম যে, মুসলমান তীর্থ পর্যটকগণ ভারতের নানা স্থান হইতে প্রতি বৎসরই এই দরগাহ দর্শন করিবার জন্য আসেন। আমি পরে জানিতে পারিলাম যে, দরগায় যেসমস্থ ধর্মপ্রাণ লোক আসেন তাহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী । কোন ধর্মমতের বিরুদ্ধোচরণকরা আমার উদ্দেশ্য ছিলনা, সুতরঅং আমার পূর্ববর্তী রাজপুরুষগণের প্রথানুসারে রাজীকয় আড়ম্বরে আমি দরগায় উপস্থিত হলাম। ফটকের কাছে জুতা খুলিয়া উপরে গিয়া যথারীতি সেই দরবেশের সমাধি দর্শন করিলাম এবং পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রা রাখিয়া নিচে নামিয়া আসিলাম এবং প্রজাদের আনুগত্য গ্রহণ করিলাম। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজাই এতদ্দোদ্যেশ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অন্ততঃ একটি করিয়া টাকা নিয়া আমার সেঙ্গ দেখা করিল। ইহাতে অতি অল্পক্ষনেই আমার টেবিল ভরিয়া উঠিল। পরিবর্তে আমিও তাহাদিগকে পান ও আতর পরিবেশন করিলাম। [২৩]

(খ) দিল্লির বাদশহ আলমের দৌহিত্র মির্জা ফিরুজ শাহ ১২৬৫ হিজরীতে (১৮৪৯ঈ.) শাহজালাল (রহ.) এর দরগা জিয়ারভের অভিপ্রায়ে মুফতি পরিবারের তদানীন্তন মৌলভী নাজমুদ্দীন মুহাম্মদের নিকট যে পত্র লিখেছিলেন তাহা ফার্সী পাঠের বংলা অনুবাদ নিম্নে দেয়া গেল।

---

২৩. শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, পৃ- ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

খামের উপর মোহর মির্জা ফিরুজ শাহা বাহাদুর ওলদে মির্জা সুলাইমান শাইখ বাহাদুর ওলদে বিজয়ী সম্রাট শাহ আলম।

পরম উৎকর্ষ ও সমুন্নত হৃদয়ের আবাসস্থল ও গৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্টিত মৌলভী নাজমুদ্দীন মোহাম্মদ। খোদা তালা তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন্ আমি আমার রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত মৃগয়া, প্রমোদ্দ ভ্রমন ও মানসিক ক্লান্তির অপনোদন উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদ শহরের মধ্য দিয়া দিল্লীর রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে ছিলাম। তখন কয়েকটি জনপদ অতিক্রম করার পর প্রাকৃতিক আবহাওয়া পরিবর্তন হেতু আমার শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য উপস্থিত হয়। ভ্রমন স্থগিত করিয়া উক্ত অস্বাচ্ছন্দের প্রতিকার উদ্দেশ্যে ঔষধ ব্যবহারের জন্য দেশী ও বিদেশী চিকিৎসকের অধ্যুষিত (কর্মস্থল) ঢাকা শহরে যাইতে মনস্থ করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া অসুস্থতা দুরীকরণার্থে চিকিৎসক গণের কর্মকুশলতায় আসন্ন রোগ যাতনা হইতে নিস্কৃতি লাভ করার পর আমার মনে হইল শ্রীহট্ট শহর সন্নিকটবর্তী, অধিকন্ত তথায় শাহজালাল সাহেবর পবিত্র মাজার ও বিদ্যমান, উহা দর্শন করিযা যাইতে হইবে। এই ইচ্ছায় প্রনোদিত হইয়া সর্ব প্রকার উৎকর্ষের কেন্দ্রস্থল শ্রীহট্ট শহরে আগমন করিলাম। এখানে পবিত্র মাজার সন্দর্শনে খোদা তালার প্রীতি বন্দনা করা হইলে আমি আমার রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত পশ্চিম দিকে যাত্রা করিব। কিন্তু আমার মনে হলে প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের দেশে অনাহুতভাবে প্রবেশ করিয়াছি। বিশেষতঃ তাহারা ইসলামের সেবক ও আমাদের সহধর্মী। তাহাদের ধর্ম প্রাণতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া পত্র দ্বারা তাঁহা দিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাহাদের সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। আপনার মত মাননীয় ব্যক্তিকে ও আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনিও আমার সহিত দেখা করিলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিব। এই কার্য আপনার অভিজ্ঞজাত্য ও শিষ্টাচারের বিশষ্ট পরিচয় প্রদান করিবে। তারিখ ২৮ রজব ১২৬৫ হিঃ।"

যুবরাজ খাদিম কর্তৃক বহু আড়ম্বরের সহিত সংবর্ধিত হয়ে রাজকীয় জাকজমকে দরগা জিয়ারত করেছিলেন এবং গম্বুজে একটি জলছা (দরবার) আহবান করে খাদিম দিগের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন।

(গ) দরগার প্রতি সম্মান প্রদশনের আরেকটি প্রথা এই ছিল যে, নবাব বাদশাহ বা রাজকর্মচারীদের মধ্যে যিনিই এখানে আসতেন তিনি নানা প্রকার দালান ইত্যাদি নির্মাণ করে যেতেন।

এরূপ দালান যে কত এবং কে কোন খানা নির্মাণ করেছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুরুহ। অধিকাংশ সময়ই পুরাতন দালান বিনষ্ট করিয়া নূতন ভাবে তৈরী করা হইত। এইজন্য বাঙ্গালার রাজা বরবক শাহের পুত্র ইউসুফ শাহের (১৪০৭-৭৪ ঈ.) পূর্ব পর্যন্ত কোন দালানের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

(ঘ) দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তৃতীয় প্রথা ছিল, খাদিম গণের ভরন পোষণের জন্য জায়গীর প্রদান করা। লঙ্গরখানায় অর্থ সাহায্য করা ও দরগায় আলোর ব্যবস্থা করা। এই

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে কত জমি খাদমেগনকে জায়গীর স্বরূপ দেওয়া হয়েছে তা নির্ধারণ করা একরূপ অসাধ্য। কারণ দু'টি ছাড়া সকল খাদিম পরিবারই বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন যুগে নওয়াবগন জায়গীর ছাড়াও দরগাহ্ আলোকিত করার জন্য তাদেরকে ১২ কাহন ১৪ পন ১০ গন্ডা ভাতা ও মঞ্জুর করতেন এবং উরুস ও লাকড়ি তোড়া ও শবে বরাতের জন্য ৩৫০ কাহন কড়ি প্রদান করা হত। উক্ত টাকা চনুতারী কোতয়ালী বা মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স স্বরূপ বন্দর মহল হইতে আদায় করা হত। তদানুসার নওযাব আসাদুল্লাহ কায়েম জঙ্গ বাহাদুর উল্লেখিত দানগুলি ২৯, ৩০, ৩১ নং সনদের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়াছিলেন। খাদিমগণ এইগলো ১৮৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত ভোগ তছরুফ করে আসছিলেন। কিন্তু কালক্রমে খাদিমগন ইহা হতে বঞ্চিত হন এবং গভর্নমেন্টের নিকট হতে মোতাওয়াল্লী রাজনৈতিক পেনশন স্বরূপ ৯৩/২ পাই মাসিক বৃত্তি পেতে লাগলেন।

(ঙ) ১৯০৯ ঈসায়ী পূর্ববঙ্গ ও আসাম গর্ভনমেন্ট হযরত শাহজালাল (রহ.) দরগাহকে সংরক্ষিত মনুমেন্ট বলে নির্দেশ দেন। হযরতের সম্মানার্থে কশবা (শহর) শ্রীহট্টের জন্য কোন খাজনা ধার্য্য করা হয়নি। আজও কসবার সব ভূমি নিস্কাররূপে ভোগ করা হচ্ছে।[২৪]

১২. লঙ্গরখানা ও ডেকচিঃ

দরগার আভ্যন্তরীন এলাকার উত্তর পাশে একটি বৃহৎ লঙ্গরখানা ছিল। এটা জিয়ারতকারী এবং সহায়হীনদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ভূমিকম্পে এই বিরাট লঙ্গরখানা ধ্বংস হইয়া যায়। পরে উক্ত স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। লঙ্গখানার পাশেই একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা রয়েছে। এতে দুটি বৃহৎ ডেকচি আছে। একটিতে একত্রে ৭মন চাল ও ৭মন গোশত একসঙ্গে রাঁধা যায়।

ভালোভাবে থাকালে দেখা যায় ডেকচির কিনারে ফার্সিতে কিছু লেখা আছে। যার বাংলা অনুবাদ হল- "ইয়ার মুহাম্মদের পুত্র মোহাম্মদ জাফরের পুত্র শায়খ আবু ছায়েদ কর্তৃক নির্মিত এ ডেক ১১০৬ হিজরী সনের রমজান (১৬৯৫ ঈসায়ী) মুরাদ বক্স কর্তৃক দরগাহের জন্য প্রেরিত হল। হযরতের কসম এ ডেগ মাজারের বাইরে নেয়া কখনও সংগত হবেনা। এর ওজন ৫মন ৩সের ২ পোয়া।"

১৩. গজার মাছঃ

মাজারের দক্ষিণ পূর্ব কোণে স্বচ্ছ পানির একটি পুকুর ছিল। এই পুকুরে বহুসংখ্যক গজার মাছ দেখা যেত। মাজার জিয়ারতকারীদের ডাকে তারা সাড়া দেয়। ছোট ছোট মাছ, মুড়ি, খই, ইত্যাদি খাওয়ার জন্য দৌড়ে আসে। কথিত আছে যে, এই মাছগুলো হযরত শাহজালঅর (রহ.)'র অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পুরানো পুকুরটি ভরাট করে উত্তরদিকে আর একটি নূতন পুকুর খনন করা হয়েছে এবং মাছগুলো তাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

---

২৪. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত ষাটের দশকে গজার মাছের পুকুরটি আজকের স্থানে নিয়ে আসা হয়। অনেকদিন পর ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে পুকুরটি আবার খনন করা হয়। এ সময় পুকুরের গজার মাছগুলোকে এ পুকুর থেকে সরিয়ে ঝরনার সামনে একটি ছোট্ট পুকুরে নিয়ে যাওয়ার হয়। পরে পুকুরের খনন কাজ শেষ হলে আবার গজার মাছগুলোকে ছোট পকুর থেকে এনে বড় পুকরে ছাড়া হয়।

কিন্তু দুঃখজনক ভাবে ২০০৩ ঈ. ৪টা ডিসেম্বর থেকে মাত্র ৩/৪ দিনে পুকুরের সাড়ে ৭শর ও বেশি মাছ মরে পুরো পুকুরটি গজার মাছ শূন্য হয়ে যায। মাজার কর্তৃপক্ষ বলেছেন পুকরে বিষ ফেলে মাছ গুলো মারা হয়েছে, আবার অনেকে বলেছেন উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মাছগুলো মরেছে। তবে পরিশেষে মৎস বিভাগ বিষ প্রয়োগে মাছের মৃত্যু হয়েছে বলে রিপোর্ট প্রদান করে। মরা মাছগুলোকে মসজিদের পশ্চিম দিকের গোরস্থানে পুতে ফেলা হয়। অনেকে মনে করতেন দরগাহর পুকুরের গজার মাছগুলো মরে গেলে কাফন পরিয়ে জানাজা পড়ে দাফন করা হতো। আসলে তা ঠিক নয়। এসব মাছ মরে গেলে জানাজাও পড়া হয়না, কাপনও পরানো হয়না। অন্যান্য মৃত প্রাণীর মতো মাটিতে পুতে রাখা হয়। পুকুরটি গজার মাছ শূন্য হওয়ার পর ১১ জানু/ ২০০৪ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর আর এক সাথী হযরত শাহ মোস্ত ফার মৌলভী বাজারস্থ মাজার সংলগ্ন পুকুর থেকে কিছু মাছ এনে পুকুরে ছাড়া হয়।

<u>১৪. মিনারঃ</u>

দরগা মসজিদের দক্ষিণ দিকে একটি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। ১৯৭১ সালে মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য এর নির্মাণ কাজ কিছুদিন বন্ধ থাকে পরে এটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

<u>১৫. দরগাহ মাদরাসাঃ</u>

দরগা-ই-শাহজালাল (রহ.) মসজিদের পূর্ব দিকে মাদরাসায়ে কাসিমূল উলুম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট এর অবস্থান। এটি ১৯৬১ সালে নির্মিত হয়। বর্তমানে এর ছাত্র সংখ্যা ছয় শতাধিক। এ কওমী মাদরাসাটি আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম সম্পূর্ণ বেসরকারী শিক্ষা বোর্ডের অধনি পরিচালিত হচ্ছে। এখানে হিফজুল কুরআন, মক্তব এবং জামাত বিভাগ টাইটেল (দাওরায়ে হাদীস) পর্যন্ত ক্লাসে অধ্যয়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

<u>১৬. পোষ্ট অফিস ঃ</u>

মাদরাসার উত্তর দিকে ছোট্ট একটি রুমে দরগাহ পোষ্ট অফিস। এটি সরকারী সময় সূচী অনুযায়ী খোলা বন্ধ হয়।

<u>১৭. জালালী কবুতরঃ</u>

মুসাফির খানার পশ্চিমে একটি ছোট্ট চত্বরে প্রায়ই দেখা যায় ধান ছিটানো রয়েছে। এর পাশেই সুরমা রংয়ের এক ধরণের কবুতর মনের আনন্দে ধান খাচ্ছে। এ ধরণের হাজার হাজার কবুতর দেখা যায় ঐতিহ্যবাহী কীনব্রীজ, রেলওয়ে ষ্টেশন, এবং শহরের আনাচে কানাচে এগুলো জালালী কবুতর নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ব্যবহৃত কয়েকটি স্মৃতিচিহ্নঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজারে তাঁর কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষিত। যেমন তিনি পীরানে পীর ছিলেন তেমনি বীর মুজাহিদ ও ছিলেন। এগুলোর মধ্যে তার ব্যবহৃত তরবারী জুলফিকার, হরিন চর্মের জায়নামাজ, তায়াম্মুম পাথর, পাদুকা, খাবার থালা, দুটি পিথলের কাপ ইত্যাদি। বিভিন্ন রোগে বিশেষত যাদু টোনা বা অলৌকিক ঘটনা সংক্রান্ত রোগে ভক্তগন আজও জুলফিকার তরবারী ধৌত পানি পান করে থাকেন। কথিত আছে যে, হরিন, চর্মের জায়নামাজে উপবেশন করে শাহজালাল (রহ.) নদী অতিক্রম করেন। কুপ সংলগ্ন তায়াম্মুম পাথরটিতে যে হাতের চাপ দেখা যায়, তা হযরত শাহজালাল (রহ.) হাতের আঙ্গুলের দাগ বলে লোকের বিশ্বাস। [২৫]

তলোয়াড়, খড়ম, প্লেট, বাটি দর্শকদর দেখার ব্যবস্থা আছে। দরগার দক্ষিণ দিকে দরগা মাদরাসার দু'বিল্ডিং এর মধ্য দিয়ে একটি প্রবেশ পথ গিয়ে বাঁ দিকের প্রথম বাড়িতে জনাব মুফতি নজমুদ্দীন সাহেবের এই বাড়ীতেই হযরত শাহজালাল (রহ.) ব্যবহৃত তলোওয়ার ও খড়ম সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্লেট ও বাটি সংরক্ষিত আছে, দরগাহ শরীফের মোতাওয়াল্লীর বাড়ীতে। এখানে দর্শকরা এসব সামগ্রী দেখতে পারেন। উরুসের সময় এগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯. গোরস্থানঃ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজারের পশ্চিম ও উত্তর দিকে রয়েছে। গোরস্থান। কয়েক হাজার পুরুষ ও মহিলাকে দাফন করা হয়েছে এ গোরস্থানে। তবে মাজার কর্তৃপক্ষ কোন ধরণের রেজিষ্টার সংরক্ষণ না করায় কতজনকে এখানে দাফন করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান জানা যায়নি। অনেক দেশ বরেন্য উলামায়ে কেরাম, জাতীয় পর্যায়ে জ্ঞানী গুণী জনকে এখানে সমাহিত করা হয়। যাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় ঢাকার বিশেষ স্থানে দাফন করার কথা ছিলো জীবনের শেষ ইচ্ছে হিসেবে তাঁরা দাফনের জন্য শাহজালাল (রহ.) মাজার সংলগ্ন গোরস্থানকেই বেছে নিয়েছেন। এই গোরস্থানে ঘুমিয়ে আছেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম.এ.জি ওসমানী, জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার হুমায়ন রশীদ চৌধুরী [২৬] সহ যুগ যুগ ধরে অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় মহান ব্যক্তিবর্গ। উপমহাদেশের অন্যান্য গুণী আউলিয়াদের মাজারের ন্যায় শাহজালাল (রহ.) এর মাজারের উপর কোন অট্টালিকা নির্মিত হয়নি। সুর্য রশ্মি এবং বৃষ্টি ধারায় মাজারটি প্রতিনিয়ত বিধৌত হয়, তবে এর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। তাঁর মাজার শরীফ সর্ব প্রকার বাহুল্য বর্জিত। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফী দরবেশদের মাজারের ন্যায় তার মাজারে কোন প্রকার জাকজমক এবং আড়ম্বর নেই। মহিলা ও ছোট মেয়েদের উপরে তথা মাজারে যাওয়ার কোন অনুমতি নেই। এ সমস্ত হযরত শাহজালাল (রহ.) শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ হওয়ার এবং অলৌকিকতার বাস্তব প্রমাণ ছাড়া আর কি হতে পারে?

---

২৫. হযরত শাহজালাল, পৃ- ৮৩

২৬. আল ইসলাহ হযরত শাহজালাল (রহ.) সংখ্যা, সিলেট কেমুসাস (জানু-মে ২০০৪) পৃ- ৫৭-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

দরগাহ শরীফ পরিচর্যার জন্য খাদিম প্রথা

উপমহাদেশের ওলী দরবেশদের দরগাহ শরীফ পরিচর্যার জন্য খাদিম প্রথা প্রচলিত আছে। খাদিমগণ মাজারের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, আলোক সজ্জা, অট্টালিকা নির্মাণ ইত্যাদির তত্তাবধান করে থাকেন। তারা মাজার যিয়ারত কারীদের দেখা শুণা করেন, পীর দরবেশের কল্পিত অলৌকিক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়ে তাদেরকে ভীত ও বিমুগ্ধ করেন। মহান আল্লাহ তালার নিকট তাঁদের ওয়াসিলা নিয়ে দোয়া করেন, তাঁর রহমত কামনা করেন। এতে করে জিয়ারত কারীরা উপকৃত হয়। আল্লাহর ওয়াস্তে বিভিন্ন নজর নিয়াজ ইত্যাদি তারা মাজারে দান করেন। এ সম্পদ ই খাদিমদের অনেকের প্রধান উপজীবিকা।

হযরত শাহজালালা (রহ.) এর মাজারে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ্য লোকের সমাগম হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে আগমন করে থাকেন। দরগা শরীফের বেসরকারী আয়ের পরিমাণ বহু লক্ষ টাকা অনুমিত হয়। মুতাওয়াল্লীর সরকারী ভাতা তৎকালীন এক সনদ বলে ন' টাকা। দরগাই শাহজালাল (রহ.) একশতের উপরও খাদিম রয়েছেন।

চিরকুমার হযরত শাহজালাল (রহ.) কোন বংশধর ছিলনা অথচ প্রথম থেকেই মাজারের ছিল প্রচুর আয়। স্বাভাবিক ভাবে মাজারের খাদিম হওয়ার জন্য অনেকেরই ছিল গভীর আগ্রহ এবং উৎসাহ। শাহজালাল (রহ.) এর অনুসঙ্গীদের বংশধরদের দাবী ছিল অগ্রগন্য। তাদের মধ্যে মাজারের খাদিম হওয়ার জন্য চলত তীব্র প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ফলে প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি সনদ। যারা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট করে সনদ পেত তারাই খাদিমের লোভনীয় মহান দাযিত্ব থেকে অন্য দাবিদারকে অব্যাহতি দিতে পারত।[২৭]

দরগার খাদিম পরিবার হযরত শাহজালাল (রহ.) অনুচরবৃন্দের বংশধর। তাঁহারা শ্রীহট্টের তদানীন্তন রেসিডেন্ট মি. লিন্ডসের মতে অমিত শক্তিশালী ও প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শুধু তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য তৎকালে দরগাহ দর্শন করে এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। খাদিমদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে 'সরে কওম' বলা হত। প্রথমতঃ খাদিমগণের ভোটে ও নবাবের অনুমোদনের পরে উত্তরাধিকারী সূত্রে তারা সরে কওম নিযুক্ত হতেন। খাদিমগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও ঢাকার নাজিম অনুমোদিত ব্যক্তিদিগকেই দিল্লীর সম্রাট অথবা বাঙ্গালার শাসনকর্তা সনদপ্রদান করতেন। তিনি দরগার যাবতীয় উৎসবাদীতে অধিনারকত্ব করতেন এবং তারই তত্ত্বাবধানে দরগার সকল প্রকার দান খয়রাত একত্রিত হয়ে মাসান্তে খাদিম দিগের যার যার অংশ অনুযায়ী বিতরন হত। খাদিমগনের তদারকের ভার তার উপর ছিল এবং কোন বিশৃঙ্খলা অথবা কর্তব্যচ্যুতি দেখতে পেলে তা যথারীতি মাননীয় শাসন কর্তার গোচরিভূত করে প্রতিকার প্রার্থনা করতেন।[২৮]

---

২৭. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী, পৃ- ১৬২।

২৮. শ্রীহট্ট জ্যোতি, পৃ- ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

নবাবী আমলে খাদিমদের ভরন পোষণের জন্য জায়গীর, লঙ্গরখানার জন্য অর্থ সাহায্য ও দরগায় আলোর ব্যবস্থা করা হত।

খাদিমদের ভরন পোষন ও দরগাহ আলোকিত করার জন্য প্রত্যহ ১২ কাহন ১৪ পন ১০ গন্ডা ভাতা দেওয়া হত, উরস, শবে বরাত, ও লাকড়িতোড়া উৎসবের জন্য ৩৫ কাহন প্রদান করা হত। উক্ত বৃত্তি বাবদ রিয়াসাত পরগনার চবডুয়া কোতোয়ালী (মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স) ও মহল্লাকন্দর বাজারের আর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই বৃত্তি সমূহ ১৮৪১ ঈসায়ী পর্যন্ত দেওয়া হত। তার পর এটা বন্ধ করে খাদিমদের মাসিক ৯৩ টাকা ১ আনা ২ পাই বৃত্তি দেওয়া হয়। বর্তমান সরে কউম পদটি বংশানুক্রমিক। শাহজালালের অব্যাহতি পরে এই পদে খাদিমদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হত। এই মনোনয়ন অধিপতি কর্তৃক অনুমোদিত হলে কার্যকরী হত। প্রথমে সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালারের বংশ ধরেরা পর্যায়ক্রমে সরে কওম নিযুক্ত হতেন। তৎপর শ্রীহট্টের নবাবের নিকট তৎকালীন সরে কউমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় নবাব নিজে ছদ্মবেশে চৌকিদীঘি মহল্লায় সরে কউম বাড়ী গিয়ে তাঁকে আমোদ আহলাদে লিপ্ত থাকতে দেখেন। নবাব তখন সরে কউম কে পদচ্যুত করে তৎকালীন খাদিমদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্ম প্রাণ শেখপীর বখশ কে সরে কউম নিযুক্ত করেন। তিনিই বর্তমান সরে কউম পরিবারের পূর্ব পুরুষ ও হযরতের সঙ্গী হাজী ইউসুফের বংশধর।

সরে কউমের কাজ সুচারুরুপে তত্ত্বাবধানের জন্য শাহজালালের সময়ে খাদিমদের আটটি চৌকিতে ভাগ করা হয় প্রত্যেক চৌকি আবার পচান্তর অংশে বিভক্ত করা হয়। এরূপে দরগাহর খেদমতকে ছয়শত ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক চৌকির সরদার শ্রীহট্টের ফৌজদারের কাছে দরগার উপযুক্ত তত্তবাবধানের জন্য দায়ী থাকতেন ও তাদের নামে দরগার খাদিমদের সনদ প্রদানকরা হত।

এক এক চৌকির সরদার খাদিম আটদিন দরগার তত্ত্বাবধান করতেন। প্রত্যেক আটদিন অন্তর দরগার খাদিমদের পরিবর্তন করা হত। বর্তমান মুফতি বংশের পূর্ব পুরুষ মুফতি সাংদাইম ও সরে কউম মসউদের নামে প্রথম সনদ প্রদত্ত হয়েছিল।[২৯]

মুফতি মোহাম্মদ দায়িন এবং সরে কউম মোহাম্মদ মাসউদের বংশধরেরা তাঁদের পূর্বপুরুষের দ্বারা প্রাপ্ত সনদ যত্ন সহকারে রক্ষা করেছেন। ১০ই রবিউস সানী ১০৭৪ হিঃ (১৬৭৩ঈ.) প্রথম সরে কউম পীর বক্সসের পুত্র আহমদ সরে কউম যে সনদ পেয়েছিলেন তা আজও যত্ন সহকারে রক্ষিত আছে। ১৭৬৪ ঈসায়ী ফৌজদার মোহাম্মদ আলী খান কায়েম জঙ্গ মুফতি পরিবারে তৎকালীন প্রধানকে ৮ হাল জমি এবং 'জনাবদার' খেতাব দান করেন। শোনা যায় এই পরিবারে তত্ত্বাবধানে সম্রাট, সুলতান এবং নাজিম প্রদত্ত কয়েকটি সনদ আছে।

সিলেটের ডেপুটি কমিশনার Lokman Johnson সাহেব (1878-1885 খ্রীঃ) মুফতি পরিবারকে প্রদত্ত দুটি সনদের উপর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

---

২৯. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৫৮, ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

২৮৫ নং সনদটি মাদরাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য মুফতি মোহাম্মদ আসিমকে অর্পন করেন। ২৮৪ নং সনদে ভাতা নির্দিষ্ট হয়েছিল ৮৫ টাকা আর ২৮৫ নং সনদে উহা ২৯৩ টাকায় বর্ধিত হয।

মুফতি মোহাম্মদ আসিমের পুত্র মুফতি মোহাম্মদ ইয়াহইয়া রহিম পিতার সরে কওম পদে ইস্ত ফা দেওয়ার পর সনদ বলে পিতার স্থলে অভিষিক্ত হন। মুফতি মোহাম্মদ হাসানের তৃতীয় পুত্র মুফতি মোহাম্মদ কাজিম সনদবলে মাজারের সুপরিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। ফৌজদারের কাছ থেকে নিস্কর ভূমি লাভ করেন।

মুফতি মাদরাসা পরিচালনার জন্য ভারত সম্রাট শায়খ মোঃ কাজিমকে ৩২৫ হাল নিস্কর ভূমি দান করেন। সিলেটের ফৌজদার শমসের খান কর্তৃক পরবর্তী সময়ে এই সনদ পুণরায় কার্যকরী করা হয়।[৩০]

খাদিমগন ছাড়া ও দরগার সাধারণ কার্যের জন্য আরো কতিপয় ভৃত্য ছিল। তারা মাজারের আয় থেকে (রুজিনা) দৈনিক ভাতা পেত। ভৃত্য গনের কাজের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য। আবদার (জলের তত্ত্বাবধায়ক) কাওয়াল (গায়ক) যিনি নওয়াজ (বাদক), ঘড়িয়াল (ঘন্টা বাদক) নাগরচি (ঢাকি) ঝাড়ুদার (মালি) রাজ শবনার (মেথর) পীর বকসের অধস্তন পুরুষগন বর্তমানে সরে কওম পদে বিভুষিত আছেন। তারা নিজেদের হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সংগী হাজী ইউসুফের বংশধর বলে দাবী করেন।

৩০. হযরত শাহজালাল (রহ.) কুনিয়াতী (রহ.), পৃ- ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সরে কউম পরিবারের বংশ তালিকা

হাজী ইউসুফ
↓
খাজা ফয়েজ উল্লাহ
↓
মালিক নিজামুদ্দীন
↓
শেখ মোহাম্মদ
↓
মালিক আহমদ
↓
পীর বখস (১ম সরে কওম)
↓
আহমদ সরে কউম
↓
সুফী

↓--------------------------------↓

নুর উদ্দিন — হুসাম উদ্দীন
↓ — ↓
আবুল ফজল — শেখুল মাশাইখ
↓

↓--------------------------------↓

আবুল হাসান — আবুল আহসান
↓
আবুল ফাত্তাহ
↓

আবু নছর — আবু নাসের
↓

আবুল আইয়াছ মোহাম্মদ আহমদ — আবু তুরাব আব্দুল ওহাব
↓

আবু ছাদ আব্দুল হাফিজ — আব্দুল গফুর
↓

এ.জেড আব্দুল্লাহ — এ.এ. উবায়েদ উল্লাহ — এ.এ. এনায়েত উল্লাহ
↓
ইউসুফ আমানুল্লাহ
(বর্তমান মোতাওয়াল্লী) ৩১

৩১. শ্রীহট্ট ইসলাম জ্যোতি, পৃ- ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলাম প্রচারে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তিনশত ষাট আউলিয়া

হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন শ্রীহট্টে আসেন তখন শাখা বরাক ও কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণকাসস্থ ভূভাগ তরফ, ইটা, পঞ্চখন্ড ও প্রতাপ গড়ের সমস্ত নৃপতিদের অধীনে ছিল। এই সকল নৃপতি ত্রিপুরার মহারাজার অধীনস্থ ছিলেন তজ্জন্য এই সকল অঞ্চলে অধিক সংখ্যক দরবেশ গমন করেন নাই। সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ (মহকুমার) জেলার পশ্চিম ভাগ তখনও জলের নীচে ছিল। কাজেই ঐ সকল অঞ্চলে কোন দরবেশ যান নাই। জৈন্তা পরগনা তখন এক স্বাধীন হিন্দু রাজার অধীনে ছিল। (১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত জৈন্তার রাজারা স্বাধীন ছিলেন)তজ্জন্য জৈন্তা পরগনায় হজরতের সঙ্গী কোন দরবেশ বসতি স্থাপন করেন নাই।[৩২]
আত্ম সংযম, ত্যাগ তিতীক্ষা, নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায় (মুজাহাদা) ফলে সুফিগন কেরাম তথা ওলী আউলিয়াগন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। যারা আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মুজাহাদা তথা চরম পর্যায়ে চেষ্টা সাধনা করে থাকে, আমি তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করে থাকি। পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের আলোকে আউলিয়াগন ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি তারা আধ্যাত্মিকতার চরম উৎকর্ষ সাধনায় সচেষ্ট থাকেন। তদুপরি জাতি দর্ম নির্বিশেষে সকল মানব তথা সর্বজীবের প্রতি তাদের মায়া মমতা, দরদ ভালবাসা তাদেরকে সাধারণমানুষের নিকট আকর্ষনীয় করে তুলে। প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বশীল অনুপম চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী দরদ প্রবণ প্রাণের নিকট সংসারের অনাসাক্ত ধর্ম প্রবণ লোকজন অনাহুতভাবেই ভিড় জমান। তাদের অনেকেই নিজের বাড়ীঘর আত্মীয় স্বজন ধন সম্পদের মোহ ত্যাগ করে মহান আওলিয়াগণের সান্নিধ্য থেকে আল্লাহর আরাধনায় রত থাকার মধ্যেই জীবনের স্বার্থকতা খুজে পান।

শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (রহ.) সহ তিনশত ষাট আউলিয়ার অধিকাংশ আউলিয়ায়ে কেরাম দেহ মোবারক ধারণ করেছে ঐতিহাসিক সিলেটের মাটি। এখানের মাটির স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের সাথে মুর্শিদ প্রদত্ত আরবের মাটির মিল খুজে পেয়ে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন মহান দরবেশ শাহজালাল (রহ.)। এ কারণেই সিলেটকে বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়।[৩৩]

---

৩২. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ১৮
৩৩. সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ- ৬

Dhaka University Institutional Repository

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ওলীদের অন্যতম। তিনি বাংলা ও আসাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আগত আউলিয়া বাহিনীর পথিকৃত বা পূর্বসুরী। এ কারণে হযরত শাহজালাল (রহ.) কে এদেশের আউলিয়াকুল শিরমনি হিসেবে ও মর্যাদা প্রদান করা হয়। তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল একদল মর্দে মুমিন জিন্দাদীল মুজাহিদ বাহিনী। যারা জিন্দেগী ভর অফুরন্ত ত্যাগ ও মেহনতের মাধ্যমে বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের শাশ্বত বাণী ও তাওহীদ এবং রিসরালাতের সুমহান পয়গাম পৌঁছে দেয়ার ফলে বাংলাদেশ একটি সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম রাষ্ট্র। তাছাড়া দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশহিসেবেও ইসলামী দুনিয়ায় রয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থান।

এদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রয়েছে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীয় ওলী দরবেশ দের অশেষ অবদান।

হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন মক্কা শরীফ থেকে মুর্শিদের নির্দেশে হিন্দুস্তানের দিকে ইসলাম প্রচারে রওয়ানা হন তখন তাঁর সাথী ছিলেন মাত্র বার জন। পরে আউলিয়াগণের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশ বাট জন। এই তিনশত বাট আউলিয়ার সকলের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা সে সব বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে ও অসঙ্গত রয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ গুলজার আবরার (১৬১২-১৬১৩) পরবর্তী গ্রন্থ সুহেল-ই-ইয়ামন (১৮৬০ঈ.) লেখক মুন্সীফ নাসির উদ্দীন হায়দার। এ দুটি গ্রন্থদ্বয়ে আউলিয়াদের সংখ্যা সমান নয়। এছাড়া কিংবদন্তী অনুসারে যারা অনেক ওলী-আউলিয়ার বংশধর বলে পরিচিত হয়ে আসেছন তাদের অনেকের বংশক্রমও মিল হয় না। হযরত শাহজালাল (রহ.) তার সঙ্গী ওলী আল্লাহ গন ১৩০৩ ঈসায়ী সিলেটের রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজ্য জয় করেন। সেই সময় থেকে ২০০৩ পর্যন্ত বিগত কালের ব্যবধান প্রায় সাতশ বছর। মনিষী ইবনে খালদুনের বর্নিত বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসারে গণনা করলে সাতশ বছরে তাঁদের বংশধরের মধ্যে অন্তত পক্ষে ত্রিশ পুরুষ হওয়া প্রয়োজন। অধিক সখ্যক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ত্রিশ পুরুষ অনেক আউলিয়াদের বংশধরদের সাজারাতে বা বংশ বৃক্ষে নেই। গুলজারই আবরারে আউলিয়াদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৩১৩। আর সুহায়ল-ই-ইয়ামন গ্রন্থ ২৪৬ জনের উল্লেখ রয়েছে।

সিলেট জেলায় জনশ্রুতি রয়েছে যে, শাহজালাল (রহ.) ৩৬০ জন আউলিয়া নিয়ে সিলেটে আসেন। এই ৩৬০ জনের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়া গেলে ও প্রায় সাত শতাধিক বছর থেকে লোক মুখে প্রচারিত তথ্য ও জনশ্রুতি যেন প্রমাণ করছে ৩৬০ জনের কথা।

সেহেল-ই-ইয়ামন গ্রন্থের আলোকে ২৪৬ জন আউলিয়ার বর্ণনা আরবী বর্ণমালা ক্রমানুসারে লেখা হয়েছে।

উল্লেখ্য হযরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) এর প্রকৃত ইতিকথা ইতিহাস বা জীবন চরিত কিভাবে বর্নিত নেই। অনেক গবেষণা পর্যালোচনা করে মোগল আমলের শেষের দিকে দু'টি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম কিতাব রাওদ্বাতুস সালিহিন ১১২৪ হিজরী (১৭১১ ঈ.) দিল্লীর সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে লিখিত হয়েছিল। এর লেখক হযরতের সঙ্গী হামিদুদ্দীন নার্নুলির বংশধর ছিলেন। দ্বিতীয় কিতাব ১১৩৪ হিঃ (১৭২১ ঈ.) দরগাহ শরীফের খাদিম মঈন উদ্দীন। এই দুই কিতাবের সার সংক্ষেপ ত্রিপুরা জেলার বাসিন্দা মুন্সীফ নাসির উদ্দীন হায়দার ১৮৬০ ঈসায়ী সিলেট অবস্থাকালীন সময়ে লিখে যান। বর্ণিত দুটো কিতাব বিলুপ্ত অনেক খোজা খোজির পরও পাওয়া যায় নাই।

মুন্সীফ নাসির উদ্দীন হায়দার রচিত 'সোহাইল-ই-ইয়ামন' প্রধানত এই গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্তী জীবনী সকল লিখিত হয়েছে।

সুহাইল-ই-ইয়ামন গ্রন্থাকার বলেন, এখানে ৩৬০ আউলিয়ার নাম লিখিছি যা রাওদ্বাতুস সালিহিনের তাহকিক ও তথ্যানুযায়ী হবে। এর পর যখন হযরত শাহজালাল (রহ.) জেহাদের জন্য বের হয়ে গেলেন পথিমধ্যে বহু নেক আমল ওলী সুফি সাধক ব্যক্তিগণ তাঁর সাথে যোগ দিলেন। তাঁরা নিজের বাড়ীঘর ত্যাগ করে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর খিদমতে পৌছলেন এবং তার কাছে মুরিদ হয়ে সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালারের লসকরে শামিল হয়ে গেলেন। সৈয়দনাসির উদ্দিন সিপাহসালার তাঁদের বুজর্গী ও তাকওয়ার জন্য তাঁর লশকরের মধ্যে অন্য দৃষ্টিতে দেখতেন। যদিও এই বুজুর্গগণের নাম লেখকদের হাতে বহু উল্টা পাল্টা হয়েছে এবং পরিপূর্ণভাবে লেখা সম্ভবও নয়।[৩৪] তবুও আংশিক তালিকা নামের আদ্য আরবী বর্ণমালা অনুসারে পেশ করা হল।

তালিকা নং- ০১

হরফুল আলিফ ঃ ১। হাজী আহমদ ২। সৈয়দ আহমদ কবির ৩। হাজী আহমদ ছানী ৪। সৈয়দ আহমদ ৫। সৈয়দ আজিয়াল ৬। সৈয়দ আবুল কাব্বল ৭। শায়খ আমানুল্লাহ ৮। শায়খ আহমদ ৯। কাদ্বী আমীন উদ্দীন ১০। মোঃ আয়উব ইমাম ১১। খাজা ইকবাল ১২। খাজা আদিনা ১৩। খাজা আমির উদ্দীন ১৪। খাজা এখতিয়ার ১৫। ইমাম উদ্দীন ১৬। ইসমাইল মরী ১৭। আহমদ আব্বাসী ১৮। আবুল হাসান ১৯। আবুল খায়ের ২০। আবু সাইদ ২১। আবুল আরিব্ব ২২। আদম খাকি ২৩। শায়খ ইলিয়াছ ২৪। সৈয়দ আমীর ২৫। সৈয়দ আহমদ ছানী ২৬। সৈয়দ আবু বকর ২৭। সৈয়দ আবু আব্বাস ২৮। সৈয়দ আবু বকর ছানী ২৯। সৈয়দ আহমদ নিশান বরদার।

হারফুল বা ঃ

৩০। সৈয়দ বদর উদ্দীন ৩১। সৈয়দ বুজুর্গ ৩২। সৈয়দ বায়েজীদ ৩৩। সৈয়দ বাবু ৩৪। সৈয়দ বাদার ৩৫। শায়খ বাজ ৩৬। শায়খ বাহা উদ্দীন ৩৭। বদর মুলুক ৩৮। খাজা বাহা উদ্দীন ৩৯। খাজা বুরহান উদ্দীন কাতাল ৪০। বুরহান উদ্দীন বুরহান ৪১। বাহার আসকরী।

---

৩৪. সুহেলে এমন বা ইয়ামনের নক্ষত্র (জালালী ইতিহাস) মূল নাছির উদ্দিন হায়দার মৌলভী সৈয়দ, অনুদিত, মাওঃ মোঃ আব্দুল হাফিজ (সিলেট, মোবাইল পাঠাগার, দরগাহ মহল্লা, ২০০১, ১সং) পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

হরফ আবনাউল ফার্সী ঃ

৪২। পীর ইয়ামনী ৪৩। পীরে প্রিতি জাহান ৪৪। পীরে মুলুক ৪৫। খাজা পিয়ার।

হারফুততাঃ

৪৬। সৈয়দ শাহ্ তাজ উদ্দীন ৪৭। কাজী তাজ উদ্দীন ৪৮। তাজে মুল্ক।

হরফুল জিমঃ

৪৯। সৈয়দ জালাল উদ্দীন ৫০। সৈয়দ জামিল ৫১। সৈয়দ জওহর ৫২। সৈয়দ জাহাঙ্গীর ৫৩। শায়খ জামাল ৫৪। শায়খ জগাই ৫৫। মাখদুম জাফর গানভী ৫৬। কাজী জাহান ৫৭। হাজী জমশর ৫৮। জালাল উদ্দিন ৫৯। জুনাইদ গুজরাতি।

হারফুল জিম ফারসী ঃ ৬০। চাশনী পীর

হারফুল হাঃ

৬১। সৈয়দ হামজা ৬২। সৈয়দ হালিম উদ্দীন নারনুলী ৬৩। শায়খ হোসাইন ৬৪। মাখদুম হাবিব ৬৫। হুজ্জাতে মুল্ক ৬৬। হোসাইন শহীদ ৬৭. হাবিব গাজী ৬৮। হুসাম উদ্দীন বিহারী ৬৯. হাসান সুফী।

হারফুল খাঃ

৭০। সৈয়দ খলিলুল্লাহ ৭১। সৈয়দ খলিল ৭২। হাজি খলিল ৭৩। খলিশ দেওয়ানা ৭৪। হাজী খিজির ৭৫। শেখ খিজির ৭৬। খাসদবির।

হারফুদ্দাল ঃ

৭৭। সৈয়দ দৌলত ৭৮। শায়খদাউদ কুরাইশী ৭৯। দেলাওর খতিব ৮০। দাওর বখতে খতিব ৮১। দুদ মুলক ৮২। খাজা দাউদ ৮৩। দৌলত শহীদ ৮৪। দৌলত গাজী ৮৫। দৌলত মুনীরি ৮৬। দিয়ার পীর ৮৭। বাবু দৌলত।

হরফুজ্জালঃ ৮৮। জাকারিয়া হাফিজ ৮৯। জাকারিয়া আরবী

হারফুর রাঃ ৯০। সৈয়দ রুকনুদ্দীন ৯১। মাখদুম রহিমুদ্দীন ৯২। রুকন উদ্দীন আনসারী।

হারফুজ জাঃ ৯৩। জয়নুদ্দীন আব্বাসী ৯৪। জয়নুদ্দীন জাকারিয়া

হারফুস সীনঃ

৯৫। সুলতান সিকান্দর গাজী ৯৬। সিকান্দর মোহাম্মদ ৯৭। সৈয়দ সাইফুদ্দীন ৯৮। শায়খ সেলিম ৯৯। শায়খ সিরাজুদ্দীন ১০০। শায়খ সিকান্দর ১০১। খাজা সিরাজ ১০২। খাজা সেলিম ১০৩। সিকান্দর তলব বাজ ১০৪। শায়খ সোনা ১০৫। শায়খ সাধু ১০৬। সোনা গাজী।

হারফু শীনঃ ১০৭। শায়খ শরফ উদ্দীন ১০৮। কাজী শাহ্ দেওয়ান ১০৯। ইমাম শুকরুল্লাহ ১১০। হাজী শরীফ ১১১। শাহ শামসুদ্দীন মোহাম্মদ বিহারী ১১২। শিহাব উদ্দিন ১১৩। শরীফ আজমিরী ১১৪। শাহবাজ আনসারী ১১৫। শায়খ শামস

Dhaka University Institutional Repository

হারফুস সোয়ালঃ

১১৬। সালেহ মুলক ১১৭। খাজা সুফিয়ানা ১১৮। শায়খ সাদরু।

হারফু দুয়াদঃ ১১৯। সৈয়দ জিয়া উদ্দীন মোহাম্মদ ১২০। শেখ জিয়া উল্লাহ

হরফুত ত্বোয়াঃ ১২১। শায়খ তাহির ১২২। খাজা তৈয়িব সিলান।

হারফুল আইনঃ ১২৩। সৈয়দ আব্দুল জলিল ১২৪। সৈয়দ আব্দুল করিম ১২৫। সৈয়দ ইসা ১২৬। সৈয়দ উমর সামরকান্দি ১২৭। সৈয়দ আবদুল মুয়ালী ১২৮। শায়খ আলী ইয়ামনী ১২৯। শাহজাদা আলী ইয়ামনী ১৩০। শাহজাদা আলী ইয়ামনী ১৩১। শায়খ আব্দুল আজিজ ১৩২। শায়খ উসমান ১৩৩। সৈয়দ ইসা ১৩৪। আব্দুল মালিক ১৩৫। শায়খ ঈসা ১৩৬। শায়খ আলাউদ্দীন ১৩৭। শায়খ আব্দুল্লাহ ১৩৮। শায়খ আব্দুল করিম ১৩৯। শায়খ আব্দুশ শুকুর ১৪০। খাজা আজিজ চিশতী ১৪১। আরিফ মুলতানী ১৪২। সৈয়দ আলম ১৪৩। সৈয়দ আজিজ ১৪৪। আবদুর রহীম ১৪৫। আতা উল্লাহ হাফিজ ১৪৬। আব্দুল্লাহ ১৪৭। আবদুল হালিম ১৪৮। আরিজ আসকরী ১৪৯। খাজা আলী ১৫০। শায়খ ওমর ১৫১। উসমান উদ্দীন ১৫২। শায়খ ওমর দরয়ায়ী ১৫৩। হাজী ওমর চিশতি ১৫৪। হাজী ওসমান দাওরী ১৫৫। খাজা ওমর জাহানী ১৫৬। শায়খ আলী ইয়ামনী ১৫৭। শেখ আব্দুল মুজালী ১৫৮। কাজী ওমর ১৫৯। খাজা আদ ১৬০। খাজা ঈসা চিশতি ১৬১। ওমর চিশতি ১৬২। খাজা আলী।

হারফুল গাইনঃ ১৬৩. শায়খ গরীব ১৬৪। গাজী মুলক ১৬৫। হাজী গাজী ১৬৬। গনি মোহাম্মদ ১৬৭। গরীব খাকি।

হারফুলফাঃ ১৬৮। সৈয়দ ফকর উদ্দীন ১৬৯। সৈয়দ ফরিদ ১৭০। শায়খ ফরিদ আনসারী ১৭১। শায়খ ফয়জুদ্দীন ১৭২। শায়খ ফরিদ রোশন চেরাগ ১৭৩। হাফিজ কায়সার ১৭৪। ফতেহ গাজী ১৭৫। ফিরোজ আতারী ১৭৬। হাজী ফয়জুল্লাহ ১৭৭। কাজী ফখর উদ্দীন ১৭৮। কাজী ফিরুজ।

হারফুল ক্বাফঃ ১৭৯। সৈয়দ কুতুবুদ্দীন ১৮০। শায়খ কুতুবুদ্দীন ১৮১। মৌলানা কিয়াস উদ্দিন ১৮২। সৈয়দ কাসিম দক্ষিণী ১৮৩। হাজী কাসিম ১৮৪। কুতবে আলম ১৮৫। পীর সৈয়দ কাসিম।

হারফুল কাফঃ ১৮৬। সৈয়দ কবির ১৮৭। সৈয়দ কালু ১৮৮। কামাল উদ্দীন ১৮৯। করিম দাদ রুমী ১৯০। কামাল ইয়ামনী ১৯১। কালা মিয়া ১৯২। হযরত কাহাত্তা কাহনাউজ্ঞা জাহাল কাট।

হারফুল লামঃ ১৯৩। হাজী লতিফ

Dhaka University Institutional Repository

হারফুল মিমঃ ১৯৪। সৈয়দ মোহাম্মদ জাহান ১৯৫। সৈয়দ মুনঈম ১৯৬। সৈযদ মোহাম্মদ গাজনভী ১৯৭। সৈয়দ মোহাম্মদ নুর ১৯৮। সৈয়দ মোহাম্মদ রওশন ১৯৯। সৈয়দ মওদুদ ২০০। সৈয়দ মোস্তফা ২০১। সৈয়দ মোহাম্মদ ২০২। সুলতান শাহ শায়খ মুসা ২০৩। শায়খ মোহাম্মদ কুবারী ২০৪। শায়খ মোহাম্মদ আনসারী ২০৫। মুখতার শহীদ ২০৬। শায়খ মুহি উদ্দিন ২০৭। মাসউদে মুলক ২০৮। খাজা মানিক ২০৯। হাজী মাহমুদ ২১০। হযরত মহিব্বে আলী ২১১। মুখতার শহীদ ২১২। মোহাম্মদ লতিফ ২৩১। মোহাম্মদ শাহবাল ২১৪। মোহাম্মদ ত্বাকী ২১৫। মোহাম্মদ নাকী ২১৬। মোহাম্মদ সুজাআ ২১৭। মেহাম্মদ সালাহ ২১৮। মারিক মোহাম্মদ ২১৯। হাফিজ মোহাম্মদ ২২০। মজাফর বিহারী ২২১। মোহাম্মদ সালাহদার মারুফ সালাহদার ২২২। মোহাম্মদ জুনাইদী ২২৩। শায়খ মোঃ দানা ২২৪। মোহাম্মদ আমিন ২২৫। মোঃ ইয়াসীন ২২৬। হাজী মোহাম্মদ দরিয়া ২২৭। হাজী মোহাম্মদ জকারিয়া ২২৮। মোহাম্মদ আশিক।

হারফুন নুনঃ ২২৯। সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহ শালার ২৩০। সৈয়দ নাসরুল্লাহ্ ২৩১। সৈয়দ নুসরাত ২৩২। শেখ নিয়ামত উল্লাহ ২৩৩। মাখদুম নিজাম উদ্দীন উছমানী ২৩৪। নুরে মুলুক ২৩৫। খাজা নাসির উদ্দীন ২৩৬। নিজাম উদ্দীন বাগদাদী ২৩৭। নুরুল্লাহ ২৩৮। নুরুল হুদা।

হারফুল ওয়াওঃ ২৩৯। খাজা ওয়াজহুদ্দিন

হরফুল হাঃ ২৪০ ।হযরত উল্লাহ খতিব ২৪১। হুসাম উদ্দিন ২৪২। হাশিম চিশতি।

হরফুন ইয়াঃ ২৪৩। হাজী ইউসুফ ২৪৪। সৈয়দ ইউসুফ ২৪৫। সৈয়দ ইয়াকুব ২৪৬। ইয়াহহিয়া কারী (আর পাওয়া যায় নাই)

সুহাইল -ই- ইয়ামন গ্রন্থাকার বলেনঃ এদেশের বহু আশরাফ ব্যক্তিগন এই ৩৬০ আউলিয়ার দিকে নিজ নছব নামা মিলিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন। আর তা কেনইবা হবেনা? যেহেতু হযরত শাহ জালাল (রহ.) এমনিতে দ্বীন এবং ইসলামের বীজ বপন করেছেন এবং তাঁরই অনুসারীগণ যারা হিম্মতের পাহাড় ছিলেন, তাদের প্রচেষ্টায় এবং যথাযথ ভূমিকাতেই ইসলামের বীজ সুফলা ও সুজলা হয়ে ডাল, পাতা, শাখা, প্রশাখা মেলেছে, হযরত শাহজালাল (রহ.) দ্বীনের চশমা এদেশে জারি করে গিয়েছেন এবং এ চশমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সকল আতরাফে (দিক বিদিক) সমুদ্ররে ছয়লাবের মতে জারি করে গিয়েছেন।[৩৫]

উল্লেখ্য, কেউ কেউ ৩৬০ আউলিয়ার বংশধর নন অথচ নিজেকে ৩৬০ আউলিয়ার বংশধর বলে দাবী করেন। এমনকি কৃত্রিম কবর আবিষ্কার করে উহা 'তিনশত ষাট আউলিয়ার একজন' বলে মাজার বানিয়ে প্রতারণারও কোন কোন তথ্য বিশ্বস্থ সূত্রে পাওয়া গিয়েছে। এসব কৃত্রিমতা ও প্রতারণা থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

৩৫. সুহেল-ই-ইয়ামন বা ইয়ামনের নক্ষত্র (জালালী ইতিহাস), পৃ- ২১-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সুহেল-ই-ইয়ামন গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করে মুফতি আজহার উদ্দীন আহমদ সিদ্দীকি স্বীয় গ্রন্থে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ২৫২জন সঙ্গী আউলিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। নীচে তাঁদের তালিকা দেওয়া হলঃ

১। আহমদ হাজী
২। আহমদ হাজী (২য়)
৩। আহমদ আব্বাসি
৪। আবুল হাসান
৫। আবুল খয়ের
৬। আবু সাঈদ
৭। আব্দুর রহীম
৯। আদম খাকী
১০। আহমদ নিশান বরদার
১১। আলী ইয়ামনী
১২। আব্দুল মালিক
১৩। আব্দুশ শুকুর
১৪। আরিফ মুলতানী
১৫। আব্দুর রহীম
১৬। আতা উল্লাহ হাফিজ
১৭। আব্দুল্লাহ
১৮। আব্দুল হেকিম
১৯। আরিজ আসকরী
২০। আলী এমনি
২১। আলিম সৈয়দ
২২। আজিজ সৈয়দ
২৩। আব্দুল জলিল সৈয়দ
২৪। আজিয়াল সৈয়দ
২৫। আহমদ কবির সৈয়দ
২৬। আবু সৈয়দ
২৭। আবুল আব্বাস সৈয়দ
২৮। আবু বকর সৈয়দ
২৯। আবুল ফজল শেখ
৩০। আহমদ সৈয়দ
৩১। আহমদ শেখ
৩২। একবাল খাজা
৩৩। আদিনা খাজা
৩৪। আমান উল্লাহ শেখ
৩৫। আমির উদ্দিন খাজা
৩৬। এখতিয়ারী খাজা
৩৭। আজিজ চিশতি খাজা
৩৮। আলী খাজা
৩৯। আদ খাজা
৪০। আলী খাজা (২)
৪১। আলী শাহজাদা
৪২। আব্দুল আজিজ শেখ
৪৩। আলা উদ্দীন শেখ
৪৪। আব্দুল্লাহ শেখ
৪৫। আব্দুল করিম শেখ
৪৬। আব্দুল করিম সৈয়দ
৪৭। আব্দুল মুয়ালী শেখ
৪৮। আব্দুল মুয়ানী শেখ
৪৯। আজিজ সৈয়দ
৫০। আমির সৈয়দ
৫১। আহমদ সৈয়দ ছানী
৫২। বুরহান উদ্দীন বুরহান
৫৩। বুরহান উদ্দিন খাজ কাগল
৫৪। বদর মালিক
৫৫। বাহার আস্করী

Dhaka University Institutional Repository

৫৬। বাবু দৌলত

৫৭। বদর সৈয়দ

৫৮। বদর উদ্দিন সৈয়দ

৫৯। বুজুর্গ সৈয়দ

৬০। বাজিদ সৈয়দ

৬১। বাবু সৈয়দ

৬২। বাজ শেখ

৬৩। বাহা উদ্দিন শেখ

৬৪। দাউদ খাজা

৬৫। দিলাওয়ার খতিব

৬৬। দাওর বখশ খতিব

৬৭। দাউদ মালিক

৬৮। দৌলত শহীদ

৬৯। দৌলত গাজী

৭০। দৌলত মুনির

৭১। দরিয়াপীর

৭২। দাউদ কোরেশী

৭৩। দৌলত সৈয়দ

৭৪। ফরিদ আনসারী শেখ

৭৫। ফয়েজ উদ্দীন শেখ

৭৬। ফরিদ শেখ রওশন চেরাগ

৭৭। ফসিহ হাফিজ

৭৮। ফতেহ গণী

৭৯। ফিরুজ আতাই

৮০। ফখর উদ্দীন সৈয়দ

৮১। ফরিদ সৈয়দ

৮২। ফয়েজ উল্লাহ কাজী

৮৩। ফখর উদ্দীন কাজী

৮৪। ফিরোজ কাজী

৮৫। গয়বী পীর

৮৬। গাজী মালিক

৮৭। গনি মামদ

৮৮। গরীব খাকি

৮৯। গাজী হাজী

৯০। গরীব শেখ

৯১। হায়াত উল্লাহ খতিব

৯২। হাবিব গাজী

৯৩। হোসেন শহীদ

৯৪। হুজ্জাত মালিক

৯৫। হুসাম উদ্দীন বিহারী

৯৬। হুসাম উদ্দীন

৯৭। হাশিম চিশতি

৯৮। হাসান সুফী

৯৯। হযরত খাজা ঝকমক

১০০। হাজী মুহিব আলী

১০১। হাফিজ মামদ

১০২। হেলিম উদ্দিন শেখ

১০৩। হোসেন শেখ

১০৪। হামজা সৈয়দ

১০৫। ঈসা চিশতি খাজাত

১০৬। ইলিয়াছ শেখ

১০৭। ইমাম উদ্দীন

১০৮। ইমাম শুকুর উল্লাহ

১০৯। ঈসা সৈয়দ ছানী

১১০। ঈসা সৈয়দ

১১১। ইসমাইল উমরি

১১২। ঈসা শেখ

১১৩। জাহাঙ্গীর সৈয়দ

১১৪। জওহর সৈয়দ

১১৫। জামিল সৈয়দ

১১৬। জালাল উদ্দিন সৈয়দ

১১৭। জামান শেখ

১১৮। জাগাই শেখ

১১৯। জাহান কাজী

১২০। জুনায়েদ জজরাট

১২১। জমশের হাজী

Dhaka University Institutional Repository

১২২। জালাল উদ্দীন
১২৩। জামাল উদ্দীন
১২৪। করিমদাদ রুমি
১২৫। কামাল ইয়ামনী
১২৬। জালাম মিয়া
১২৭। খিজির হাজি
১২৮। খলিল বাজী
১২৯। শমিম হাজী
১৩০। করিম উদ্দিন মৌলানা
১৩১। খাজা ওমর জাহান শেখ
১৩২। কুতুবুদ্দীন শেখ
১৩৩। কুতবুল আলম শেখ
১৩৪। কালু শেখ
১৩৫। কুতুবুদ্দীন সৈয়দ
১৩৬। কাসিম সৈয়দ দক্ষিণী
১৩৭। কাসিম সৈয়দ পীর
১৩৮। কবির সৈয়দ
১৩৯। খলিল উল্লাহ সৈয়দ
১৪০। খলিল সৈয়দ
১৪১। খিজির সৈয়দ
১৪২। খিজির হাজী
১৪৩। খাসদরিব
১৪৪। খাজা মল্লিক
১৪৫। খলিল দেওয়ান
১৪৬। কামাল উদ্দীন
১৪৭। লতিফ হাজী
১৪৮। মুহাম্মদ আইয়ুব ইমাম
১৪৯। মুহাম্মদ জাহান সৈয়দ
১৫০। মুহাম্মদ নুর সৈয়দ
১৫২। মুনিম সৈয়দ
১৫৩। মানিক সৈয়দ
১৫৪। মুহাম্মদ রওশন সৈয়দ
১৫৫। মওদুদ সৈয়দ
১৫৬। মুস্তফা সৈয়দ
১৫৭। মুহাম্মদ সৈয়দ
১৫৮। মুহাম্মদ দানা শেখ
১৫৯। মুহী উদ্দিন শেখ
১৬০। মুহাম্মদ আনসারী শেখ
১৬১। মুহাম্মদ কিবারী শেখ
১৬২। মুসা শেখ
১৬৩। মারুফ সালাহদার
১৬৪। মুহাম্মদ সালাহদার
১৬৫। মুজাফফর বিহারী
১৬৬। মালিক মুহাম্মদ
১৬৭। মুহাম্মদ সালহ
১৬৮। মুহাম্মদ সুজা
১৬৯। মুহাম্মদ নাকি
১৭০। মুহাম্মদ দরিয়া হাজী
১৭১। মুহাম্মদ জাকারিয়া হাজী
১৭২। মুহাম্ম হাজী
১৭৩। মুহাম্মদ আমীন
১৭৪। মাসুদ মালিক
১৭৫। মুকতার শহীদ
১৭৬। মুহাম্মদ তকী
১৭৭। মুহাম্মদ লতিফ
১৭৮। মুহাম্মদ শাহবাজ
১৭৯। মাহখদুম জাফর গজনভী
১৮০। মাখদুম হাবিব
১৮১। মাখদুম রহীম উদ্দিন
১৮২। মাখদুম নিজাম উদ্দিন ওসমানী
১৮৩। মুহাম্মদ আশিক
১৮৪। মুহাম্মদ ইয়াসীন
১৮৫। মুহাম্মদ জুনাইদ
১৮৬। পীর মালিক
১৮৭। মুহাম্মদ সৈয়দ
১৮৮। নুর মালিক

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯। নিজাম উদ্দীন বাগদাদী
১৯০। নিজাম উদ্দীন কিরমানী
১৯১। নুর উল্লাহ
১৯২। নুরুল হুদা
১৯৩। শেখ নছরত
১৯৪। নসর উল্লাহ সৈয়দ
১৯৫। নাসির উদ্দীন সৈয়দ সিপাহসালার
১৯৬। নাসির উদ্দীন খাজা
১৯৭। নিয়ামত উল্লাহ শেখ
১৯৮। ওয়াজিহ উদ্দীন খাজা
১৯৯। ওসমান দাওরী হাজী
২০০। ওসমান শেখ
২০১। ওমর শেখ
২০৩। ওমর দরিয়াই
২০৪। ওমর জাহান খাজা
২০৫। ওমর সমর কান্দি সৈয়দ
২০৬। ওসমান উদ্দীন
২০৭। ওমর কাজী
২০৮। ওমর চিশতি খাজা
২০৯। পিয়ার খাজা
২১০। পর্বত জাহান পীর
২১১। পীর সৈয়দ কাসিম
২১২। রুকন উদ্দীন সৈয়দ
২১৩। রুকন উদ্দীন আনসারী
২১৪। শাহ তাজ উদ্দীন সৈয়দ
২১৫। সৈয়দ উদ্দীন সৈয়দ
২১৬। সুলতান সিকন্দর কাজী
২১৭। সিরাজ খাজা
২১৮। সেলিম খাজা
২১৯। সলিম শেখ
২২০। সুফিআন খাজা
২২১। সালেহ মালিক
২২২। শাহ দেওয়ান কাজী
২২৩। সিকন্দর মাহমুদ
২২৪। সিকন্দর শেখ
২২৫। সিরাজ উদ্দিন শেখ
২২৬। সিকন্দর তবলবাজ
২২৭। সাধু শেখ
২২৮। মারুফ উদ্দিন শেখ
২২৯। সুনাগাজী
২৩০। সুনা শেখ
২৩১। শাহ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ বিহারী
২৩২। শাহাবুদ্দীন
২৩৩। শরীফ আজমিরী
২৩৪। শরীফ হাজী
২৩৫। শাহবাজ আনসারী
২৩৬। শেখ শামস
২৩৭। সালেহ মালিক
২৩৮। সদর শেখ
২৩৯। সুলতান শাহ
২৪০। তৈয়ব সিলানী
২৪১। তাজ উদ্দিন কাজী
২৪২। তাহির শেখ
২৪৩। তাজ মালিক
২৪৪। জিয়া উদ্দীন সৈয়দ
২৪৫। শাহ জিয়া উদ্দীন
২৪৬। জৈব গাজী
২৪৭। জাকারিয়া হাফিজ
২৪৮। জাকারিয়া আরবী
২৪৯। জৈন উদ্দীন আব্বাসী
২৫০। জৈন উদ্দীন জাকারিয়া
২৫১। জাকি শেখ
২৫২। জিয়া উল্লাহ শেখ। [৩৬]

বিঃদ্রঃ এই সকল নামের মধ্যে গায়েবী পীর, দরিয়া পীর, হযরত শাহ খকমত, কালা মিয়া, কালু শেখ মানিক সৈয়দ, পর্বত জাহান পীর, পিয়ার খাজা, সাধু শেখ, সুনা গাজী, সুনা শেখ ইত্যাদি বোধ হয় ওলীদের প্রকৃত নাম নয় তাদের লোক প্রচলিত নাম।

৩৬. শ্রীহট্ট ইসলাম জ্যোতি, পৃ- ৫৭-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

তালিকা নং- ৩

(Hazrat Shah Jalal and other Muslim Missionaries)

1. Nasir Uddin Sepohasalar 2. Shalikh Ali Shahzada 3. Hzi Yusuf Sahid 4. Daud Quraishi 5. Sadique Pir 6. ChhotePir 7. Kamaluddin 8. Shah poran 9. Holi Khalil 10. Shah Bod 11. Khawaga Azina 12. Khwaza Kheter Khasdabir 13. Syed Abu Jurab 14. Shah Isan Ali 15. Mudhusyed 16. Syed pir Abu Bakar 17. Makhdum Rahim Ali 18. Khijir Sufi 19. Bagdar Ali 20. Shah Shundar 21. Shah Madan 22. Garam Dewan 23. Dada Pir 24. Syed Umar Samar Kandi 25. Syed Abu Bakar 26. Syed Shah Jaguddin 27. Hazi Ghazi 28. Fateh Gazi 29. Mukhtar Shaheed 30. Shah Etim 31. Syed Ziauddin 32. Shah Shams uddin Bihari 33. Hazrat Shah Sekandar Muhammed 34. Hazrat Sultan Sikandar Ghazi 35. Bo Abu Daulat 36. Daria pir 37. Huussain Shahed 38. Sheikh Halim Uddin 39. Qazi Jalal Uddin 40. Zqzi Goila Shhib. 41. Zinda pir 42. Shah Kaloo. 43. Deulan Fatima 44. Karam Muhammad 45. Sheikh Madhu Shudhan 46. Hafiz Muhammad 48. Khaufa lai 48. Sheikh Abdullah. 49. Hafiz Jamil 50. Sheikh Zauddin 51. Lal Pir 52. Shah Rafiuddin 53. Syed Mahbbat 54. Sah Malum 55. Shah Drung 56. Shah Kamal 57. Shah Chand 58. Shah Saduruddin 59. Syed Nasir Ullah. 60. Syed Muhammad Sultan Shah. 61. Syed Shah Musstafa 62. Syed Mauded 63. Syed Muhammad Roushan 64. Syed Jalil Yusuf 65. Syed Yakub 66. Syed Mushammed Noor 67. Hazrat Syed Muhammad Gaznabi 68. Hazrat Muhammad Johan. 69. Hazrat Syed Kabir 70 Hazatsyed pir kari 71. Hazrat Syed Hazi Kusim Dokshini 72. Hazrat Syed Fari Shah 73. Hazrat Syed Badar Uddin 74. Hazrat Syed Qutubuddin 75. Hazrat Syed Abu Jafar Sani 76. Hazrat Syed Abbas. 77. Hazrat Syed Muhammad (noor 78. Hazrat Syed Fakhruddin 79. Hazrat Syed alim 80. Hazrat Syed Isa. 81. Hazrat Syed Abdul Karim 82. Hazrat Syed

Dhaka University Institutional Repository

Abdul Jalil 83. Hazrat Syed Zia uddin 84. Hazrat Syed Sfiuddin 85. Hazrat Syed Ruknuddin 86. Hazrat Syed Ahmad Kubir 87. Hazrat Syed Amir 88. Hazrat Syed Daulat 89. Hazrat Syed Hamza 90. Hazrat Syed Sauhar (Jawahar) 91. Hazrat Syed abdul Jalil 92. Hazrat Syed Jalaluddin 93. Hazrat Syed adar 94. Hazrat Syed Bo-Abu 95. Hazrat Syed Khalil 96. Hazrat Syed Khalil Ullah 97. Hazratt Syed Bazid 98. Hazrat Syed Bajrag 99. Hazrat Syed Ojiran 100. Hazrat Syed Ahmed Sani 101. Hazrat Hazi Ahmad Kabir 103. Hazrat Hasim Chisti 103. Hazrat Husham Uddin 104. Hazrat hailotullah Khalit 105. Hazrat Khawaja Ozibuddi 106. Hazrat Sheikh Nurul Hada 107. Hazrat Noorullah 108. Hazrat Nizamuddin Yameni 109. Nazimuddin Bagdadi 110. Hazrat Khuaja Narifuddin 111. Hazrat Noor Malek. 112. Hazrat Mukdum Niramuddin Usmani 113. Hazrat Sheikh Naimatullah 114. Hazrat Sheikh Muhammad Ashique 115. Hazrat Hazi Muhamma Zakaria 116.Hazrat Hazi Muhammad Drya 117. Hazrat Muhammad Yasin. 118. Hazrat Shah Amin 119. Hazrat Sheikh Muhammad Dana 120. Hazrat Muhammad Junaidi 121. Hazrat Maruf Seladar 122. Hazrat Muhammad Seladar 123 Muhammad Saleh 124. Hazrat Muzaffar Bihari 125. Hazrat Malek Muhammad 126. Hazrat Ataullah Nafiz 127. Hazrat Sheikh abdul Hakim 128. Hazrat Ariz Asgari 12. Hazrat Khwaya Ashari 130. Hazrat Sheikh umar Makki 131. Hazrat Usman Uddin Kakri 132. Hazrat Sheikh Umar Darbari 133. Hazrat Haji Umar chisti 134. Hazrat Haj Usman Dattari 135. Hazrat Khwaja Umar Jahan 136. Hazrat Sheikh Ali Yamini 137. Hazrat Sheikh abdul Ali 38. Hazrat Kazi Umar 139. Hazrat Khwaja Aad 140. Hazrat Khwaja Isa Chisti 141. Hazrat Khwaja Umar Chisti 142.Hazrat Digar Khwaja Ali 143. Hazrat Sheikh Jadh Garib 144. Hazrat Gazi Malek 145. Hazrat Gani Gorid Khaki 146. Hazrat Sheikah Farid Ansari 147. Hazrat Shaikh Faizuddin 148. Hazrat Farid Rousan Cherag 149. Hazrat Hafiz Fosi 150. Hazrat Hafiz

Dhaka University Institutional Repository

Firuze 151. Hazrat Kazi Faizullah 152. Hazat Kari Fakhruddin 153. Hazrat Kazi Jajuddin Quraishi 154. Hazrat Sheikh Qutub Uddin 155. Hazrat Maulana Keramuddin 156. Hazrat Hazi Qusim 157. Hazrat Kutub Alam 158. aHazrat Sheikh Kaloo Kolasha 159. Hazrat Shaikh Karimdad Roomi 160. Hazrat Mamluddin Yamani 161. Hazrat Kalu Miah 162. Hazrat Khanda Jhokmok 163. Hazrat Hazi Latif 164. Hazrat Sheikh Musa 165. Hazrat Muhammad Kebari 166. Hazrat Muhammad Ansari 167.Hazrat Sheikh Mahiuddin 168. Hazrat Masud Malek. 169. Hazrat Khuaja Malek 170. Hazrat Hazi Mahmud 171. Hazrat Moheb Ali 172. Hazrat Muhammad Sahib 173. Hazrat Muhammad Shahabal 174. Hazrat Muhammad Jaqui 175. Hazrat Muhammad Shaja 176. Hazrat Sheikh Abdur Rahim 177. Hazrat Arif Multani 178. Hazrat Abdul Karim 181. Hazrat Abdullah Miskin 182. Hazrat Sheikh Alauddin 183. Hazrat Syed Isa 184. Hazrat Abdul Malek 185. Hazrat Sheikh Usman 186. Hazrat Sheikh abdul Aziz 187. Hazrat Sani Ali Yamani 188. Hazrat Khwaja tayyab Sailani 189. Hazrat Shaikh Jahe. 190. Hazrat Sheikh Ziaullah 191. Hazrat Shaikh Sadar 192. Hazrat Khwaja Safians 193. Hazrat Saleh Malek 194. Hazrat Shikh Shams 195. Hazrat Shahabaj Ansari 196. Sharif Ajmiri 197.Hazrat Sehabuddin 198. Hazrat Hazi Shamrik 199. Hazrat Imam Sukur Ullah 200. Hazrat Kazi Shah Dewan 201. Hazrat Sheikh Sharfuddin 202. Hazrat Sheikh Saboo. 203. Hazrat Sehab Uddin 204. Hazrat Sikandar jobolbag. 205. Hazrat Khwaja Salim 206. Hazrat Khwaja Siraj 207. Hazrat Sheikh Sikandar 208. Hazrat Sirajuddin 209. Hazrat SalimShah 220. HazratShaikh Jainuddin 211. Hazrat Jainuddin Abbasi 212. HazratRusamuddin Ansari 213. Hazrat Mokhdum Rahimuddin 214. Hazrat Zakaria Arabi 215. Hazrat Daulutniri 316. Hazrat Daulat Gazi 217. Hzrat Daulat Shaheed 218. Hazrat Khwaja Daud 219. Dad Malik 120. Dawar Baksh Khatib 221. Hazrat Delwar Khatib 223. Hazrat Khalil

Dhaka University Institutional Repository

Dewan 224. Hazrat Husain Sufi 225. Hazrat Hishamuddin Bihari 226. Hazrat Habib Gazi 227. Hazrat Harai Malik 228. Hazrat Mokhdum Habib 229. Hazrat Sheikh Hussain 230. Hazrat Helimuddin Narnoori 231. Hazrat Juneth Guzrati 232. Hazrat Hzi Jamshed 233. HazratKazi Jehan 234. Hazrat Mokdum Jafor Gaznabi 235. Hazrat Shaikh Jamal. 236. Hazrat Taj Male 237. Hazrat Khwaja Pyar 238. Hazrat Bahar Askori 239. Hazrat Burhandudin Burhana 240. Hazrat Khwaja Burhanuddin Ketani 241. Hazrat Khwaja Baharuddin 242. Hazrat Badar Malek 243. Hazrat Sheikh Bahar Uddin 244. Hazrat Shikh Bar. 245. Hazrat Ahmed Nishan bardar 246. Hazrat Sheikh Ilias. 247. Hazrat Adam Khaki 248. Hazrat Abdul Aziz 249. Hazrat Abu Syeed 250. Hazrat Abul Khair 251. Hazrat Abul Hussain 252. Hazrat Ahmed Abbasi 253. Hazrat Jamail Umri 254. Hazrat Imamuddin 255. Hazrat Kawaja Bakhtiar 256. Hazrat Kauja Amir Uddin 257. Hazrat Khwaja Iqbal 258. Hazrat Muhammad Ayub Imam. 259. Hazrat Kazi Amiruddin 260. Hazrat Sheikh Ahmed 261.Hzrat Sheikh aman Ullah 262. Hazrat Abdul Fazal 263. Hazrat Digar Hazri Ahmed. 264. Hazrat Syed Jahangir 265. Hazrat Syed Isa 266. Hazrat Abdul Ali 267. Hazrat Quari Yahya 268. Hazrat Hazi Muhammad Bihari 269. Hazrat Hafez Abdullah. 270. Hazrat Syed Iqbal 271. Hazrat Syed Abul Abbas 272. Hazrat Muhammad Amin 273. Hazrat Khwaja Baha Uddin 274. Hazrat Pir Gazni 275. Hazrat Purbat Jehan 276. Hazrat Jalal Uddin 277. Hazrat Jamil 278. Hazrat Hamiduddin Nurani 279. Hazrat Daulat Gazi 280. Hazrat Saikandar Muhammad 281. Hazrat Sheikh Sadha 282. Hazrat Sana Gazi 283. Hazrat Zia Uddin Muhammad 284. Hazrat Sheikh Ziauddin 285. Hazrat Syed abdul Kari 286. Hazrat Syed Abdul Muali 287. Hazrat Isa Sani 288. Hazrat Syed Aziaz. 289. Hazrat Syed Alim 290. Hazrat Karim Daori 291. Hazrat Ali Yamini 292. Hazrat Gani Ahmed 293. Hazrat Karim Daori 294. Hazrat Syed

Dhaka University Institutional Repository

Monaim 295. Hazrat Muhammad Sohial 296. Hazrat Muhammad Toqui 297. Hazrat Chasni Pir 298. Hazrat Sheikh Jokhai 299. Hazrat Shahnoor Mahjin 300. Hazrat Tayyab Salami 301. Hazrat Syed Lal 302. Hazrat Syed Jahangir 303. Hazrat Shah Sanjor 304. Hazrat Golam Hazrat 305. Hazrat Amin 306. Hazrat Shah Arfin 307. Hazrat Syed Shan 308. Hazrat Syed Shah Akbar 309. Hazrat Shaikh Shah Fani 310. Hazrat Shah Shamsuddi Bihari 312. Hazrat Pir Malik 313. Hazrat Mokhdum Shah Hamid Furooki 315. Hazrat Sultan Shah Sikandar Gazi 315. Hazrat Haji Sharif. 316. Hazrat Shahabuddin 317. Hazrat Sha Gaus Ali 318. Hazrat Muhammad 319. Hazrat Noqui Babu Daulat 320. Hazrat Shah Mirar Pir 321. Hazrat Muhammad Zakaria 322. Hazrat Bonde Shah Daud. 323. Hazrat Shah Khudaund. 324.Hazrat Shah Sarif 325. Hazrat Shah Israil 326. Hazrat Shah Ehdil Gazi 327. Hazrat Dulavi bibi (wife of Syed Shah solman 328. Hazrat Syed Muhammad 329. Hazrat Syed Muhammad Wateir 330. Hazrat Babo Ainuddin 331. Hazrat Shah Gulab 332. Hazrat Shah Kholta 333. Hazrat Shah Karamali 334. Hazrat Shah Hilal 335. Hazrat Shah Gazi Miri 336. Syed ahmed Shalid (Awlad Barapir) 337. Hazrat Rasti Shah 338.Hazrat Syed Jafar 339.Hazrat Syed Abdul Gafur 340. Hazrat Syed Ibrahim 341. Hazrat Syed Ismail 342. Hazrat Syed Ishaque. 343. Hazrat Moulavi Rouson Ali 344. Hazrat Golam Murtuza 345. Hazrat Shah Akram Ali 346. Hazrat Shah Ambia 347. Hazrat Shah Haroon. 348. Hazrat Shah Enayet 349. Hazrat Miasahid Bagdadi 350. Hazrat Hani Sumaruddin Naksh Land. 351. Hazrat Sofi Shah Noor. 352. Hazrat Moulana Moklisur Rahman 353. Hazrat Syed Mirala Bagdadi 354. Hazrat Shah Bodi Mustan 355. Hazrat Hazi Ahmed. [৩৭]

---

৩৭. Sylhet District Gazetteer, Dhaka 1975, pp- 116-118

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীয় কয়েকজন আউলিয়ার মাজার পরিচিতি

সিলেট শহরে

- ❑ হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট বিভাগীয় শহরের দরগাহ মহল্লায়।
- ❑ হযরত শাহজাদা আলী ইয়ামনি (রহ.)
  মাজারঃ হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.) মাজারের পূর্ব পাশে
- ❑ হযরত হাজী দরিয়া (রহ.)
  মাজার ঃ হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.) মাজারেরএর দক্ষিণ দিকে
- ❑ হযরত ইউসুফ (রহ.)
  মাজারঃ হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.)এর মাজারের দক্ষিণ দিকে
- ❑ হযরত হাজী খলিল (রহ.)
  মাজার ঃ হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.) মাজারেরএর দক্ষিণ দিকে
- ❑ হযরত সৈয়দ আহমদ করিব (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের পাঠানটুলা মহল্লায়।
- ❑ সৈয়দ আহমদ নিশান বরদার (রহ.)
  মাজার ঃ সিলেট শহরে খাসদবির মহল্লা
- ❑ হযরত আরিফ সুলতানী (রহ.)
  মাজারঃসিলেট শহরের পুরান লেন মহল্লায়
- ❑ হযরত সৈয়দ আহমদ (রহ.) (দাদাপীর)
  মাজারঃ সিলেট শহরের রায়নগর মহল্লায় সিলেট তামাবিল সড়কের উত্তরপাশে
- ❑ হযরত খান্ড ঝকমক (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরে রায়নগর মহল্লায়
- ❑ হযরত কাজী ইলিয়াছ ওরফে কাজী গালা (রহ.)
  মাজারঃ কাজীটুলার কাদী দিঘির পূর্ব উত্তর কোনে।
- ❑ হযরত সৈয়দ হামজা (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের ঝর্ণারপার মহল্লায় টিলার উপরে।
- ❑ হযরত সৈয়দ উমর সমর কান্দি (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের নাইওরপুর মহল্লায়

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত শায়খ শাহ সঞ্জর (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের বারুতখানা মহল্লায়
- হযরত শায়খ শাহ খিজির (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের বারুতখানা মহল্লায়।
- হযরত শায়খ হাজী গাজী (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের শাহী ঈদগাহর পূর্বে
- হযরত শায়খ চাশনী পীর (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের গোয়াই পাড়া মহল্লায়
- হযরত শাহ মীর (রহ.) মিরার পীর
  মাজারঃ সিলেট শহরের পূর্বশাহী ঈদগাহ মহল্লায়
- হযরত শাহ জাকাই (রহ.)
  মাজার ঃ সিলেট শহরের কাজীটুলা মহল্লায়
- হযরত সৈয়দ জিয়া উদ্দিন ও আরও চারজন
  মাজারঃ সিলেট শহরের জিন্দাবাজারের (পাচ পীরের মোকাম হিসেবে পরিচিত)
- হযরত শায়খ পীর (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের মজুমদারী মহল্লায়, আশরফ আলী সাহেবের বাড়ীর পশ্চিমের টিলায়।
- হযরত শেখ শাহ রওশন চেরাগ (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের আম্বরখানা হাউজিং এস্টেটের ভিতরে প্রবেশ পথে বাম দিকে (দর্শন দেউড়ী)
- হযরত খাজা নাসির উদ্দীন ওরফে শাহচট (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের সম্মুখে (কালী ঘাটে)
- হযরত শায়খ মানিক পীর (রহ.)
  মজারঃ সিলেট শহরের মানিকপীর টিলায়।
- হযরত মাখদুম হাবিব ওরফে শাহ মাখদুম (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের দপ্তরী পাড়া (রায়নগর) মহল্লায়
- হযরত শায়খ খিজির খাসদবীর (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের খাসদবীর মহল্লায়
- হযরত শায়খ মদন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের টিলাগড়ে
- হযরত শায়খ সৈয়দ হাতিম আলী (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের শিবগঞ্জ বাজারের পূর্বে সিলেট তামাবিল রোডের বামে)
- হযরত শায়খ গরম দেওয়ান (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের শেখ ঘাট মহল্লায় (লামাবাজরে)।

- ❑ হযরত গাজী বুরহান উদ্দিন (রহ.) তিনি সিলেটের আদিম মুসলমান
  মাজারঃ সিলেট শহরের টুলটিকর মহল্লায়।
- ❑ হযরত সৈয়দ আলা উদ্দিন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের কুইঘাট মহল্লায় (বর্তমান মাজারটি সুরমা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে)।
- ❑ হযরত শায়খ মধুসুধন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের রিকাবী বাজার মহল্লায়।
- ❑ হযরত শায়খ মধু শহীদ (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের মধু-শহীদ (কাজলশাহ) মহল্লায় হযরত শায়খ দেওয়ান ফতেহ মুহাম্মদ (রহ.)
- ❑ হযরত শায়খ দেওয়ান ফতেহ মুহাম্মদ (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের জিন্দাবাজার (কাজী ইলিয়াছ) মহল্লায়
- ❑ হযরত সৈয়দ লাল (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের কুয়ারপার মহল্লায়
- ❑ হযরত গোলাম আমীন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের জল্লারপার মহল্লায়
- ❑ হযরত শাহ আবু তুরাব (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের জেল রোডে
- ❑ হযরত শায়খ লাল (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের সওদাগরটুলা মহল্লায়-
- ❑ হযরত শায়খ চান (রহ.)
  মাজার সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ভার্থখলা মহল্লায়
- ❑ হযরত মুক্তার শহীদ (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের মুক্তারখা কিরমানী মহল্লায় (মীরে বাজার)।
- ❑ হযরত হাসান শহীদ (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের হাসান শহীদ মহল্লায়
- ❑ হযরত শায়খ চান গাজ (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট শহরের (নয়া সড়কে) শাহ চান গাজী মহল্লায়

সিলেট শহরের বাইরে

- ❑ হযরত সৈয়দ শাহ তাজ উদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলার আওরঙ্গ পুর (তাজপুর) গ্রামে

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত সৈয়দ শাহ্ আলাউদ্দিন ওরফে আলাউদ্দিন মিসকিন (রহ.)
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলায় গহরপুর পরগনার আল্লাপুরে।
- হযরত সৈয়দ আফজল (রহ.)
  মাজার ঃ বালাগঞ্জ উপজেলার গহরপুরের মীরের গাঁও
- হযরত খাজা আব্দুল আজিজ চিশতি (রহ.)
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলার নিজ গহরপুরে
- হযরত খাজা জওহর উদ্দিন ওরফে শাহ্ জওহর (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার জালালপুরের মোকাম দুয়ার মৌজায়।
- হযরত শাহ্ কামাল ইয়ামনী ওরফে শাহ্ পাহলোয়ান (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার জালালপুরের মোকাম দোয়ার মৌজায়।
- হযরত শায়খ জালাল ওরফে শাহ্ মিলন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদয় উপজেলার জালালপুরে।
- হযরত শাহজালাল উদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার জালালপুরের শেখ পাড়ায়।
- হযরত শাহ্ তকি উদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার জালালপুরের শেখপাড়ায়
- হযরত শাহ্ সুলতান (রহ.)
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলার সুলতান।
- হযরত হাফিজ আতা উল্লাহ (রহ.)
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলা মুক্তারপুর (টিলাপাড়ায়)
- হযরত শাহ্ কালা (রহ.)
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলার গহরপুরের সিওরখাল মৌজায়
- হযরত শাহ্ খন্দকার (রহ.)
  বালাগঞ্জ উপজেলার চান্ডিয়ার গ্রামে
- হযরত শাহ্ খাজা আদিনা (রহ.)
  মাজারঃ বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই মৌজায়।
- হযরত শাহ্ জাফর গজনভী (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার গোধারাইল পরগনা (মোহাম্মদপুর গ্রামে)
- হযরত শাহ্ মালুম (রহ.)
  মাজারঃ ফেঞ্চুগঞ্জ রেলস্টেশনের পূর্বে টিলার উপরে
- হযরত শাহ্ দাউদ কুরাইশী (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার দাউদপুর

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত শেখ ফরিদ আনসারী (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার লালাবাজারের নিকটে ফরিদপুর।
- হযরত বাবু দৌলত (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার ছনখাইড় পরগনার বাবু দৌলত (প্রকাশিত বিবিদইল গ্রামে)
- হযরত শাহ সোলায়মান করনী কুরাইশী
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলার করনসী গ্রামে
- হযরত শায়খ গাজী (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদরের উপজেলার গাজির পাড়া গ্রামে
- হযরত শাহ সিকন্দর
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার সিকন্দরপুর পরগনার পশ্চিম গাঁও
- হযরত শাহ সুন্দর (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার খাদিম পাড়া (দক্ষিণ গাছ পরগনা)
- হযরত শাহ গরীব বা শাহ গাবরু
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলার গাভুরটেকিতে
- হযরত নিজাম উদ্দীন ওসমানী (রহ.)
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলার দয়ামীরে
- হযরত হযরত মীরার পীর (রহ.)
  মাজারঃ কানাইঘাট উপজেলাই ডাইকের কুল।
- হযরত শাহ জালাল উদ্দিন
  মাজারঃ বালাগঞ্জ উপজেলার খুজগীপুর
- হযরত তৈয়ব সুলায়মান ওরফে তৈয়ব ছৈলানী
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার সিলাম
- হযরত শাহ নাজিম (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার নিজ জালালপুর
- হযরত শেখ রহিমুদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার বরায়া পরগনার বাকুট মৌজায়।
- হযরত সৈয়দ বাহা উদ্দিন
  মাজারঃ গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর (মোকাম বাজার)
- হযরত শাহ আলা উদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার মইয়াচর।
- হযরত শাহ কামাল উদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার মইয়ারচর

Dhaka University Institutional Repository

- সৈয়দ জালাল উদ্দিন (রহ.)
  মাজারঃ জকিগঞ্জ উপজেলার বারহাল ইউনিয়ন (সাহগলী) বাজার সংলগ্ন
- হযরত শাহ নাতোয়ান (রহ.)
  মাজারঃ কানাইঘাট উপজেরা নাতোয়ানপুর
- হযরত শাহ মাদার (রহ.)
  মাজারঃ কানাইঘাট উপজেলার মাদারপুর।
- হযরত শাহ মঈনুদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ সিলেট সদর উপজেলার জালালপুর (প্রকাশিত মোকামদোয়ার)

জেলা মৌলভী বাজার

- হযরত শাহ মোস্তফা বাগদাদী শের সোয়ার চাবুকমার (রহ.)
  মাজারঃ মৌলভী বাজার শহরে
- হযরত শাহ হিলাল (রহ.)
  মাজারঃ মৌলভী বাজারের হিলালপুর
- হযরত শাহ গরীব খাকি (রহ.)
  মাজারঃ বড়লেখার উপজেলার কাঁঠালতলী মৌজায়
- হযরত শাহ দরিয়া পীর (রহ.)
  মাজারঃ বড়লেখা উপজেলার চান্দপুর মৌজায়
- হযরত শাহ কামাল (রহ.)
  মাজারঃ মৌলভী বাজার উপজেলার চোয়াল্লিশ পরগনার কামালপুর
- হযরত শাহ দরঙ্গ (রহ.)
  মাজারঃ মৌলভী বাজার উপজেলার বেকামুরা গ্রামে
- হযরত শাহ ফরঙ্গ (রহ.)
  মাজারঃ মৌলভী বাজার উপজেলার বেকামুরা গ্রামে
- হযরত শাহী হাজী আহমদ ওরফে হাজী রাসুল (রহ.)
  মাজারঃ মৌলভী বাজার উপজেলার ঘোড়া খাল মৌজার হাজারী বাড়ীর পূর্ব উত্তরে
- হযরত সৈয়দ রুকন উদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ রাজনগর উপজেলার কদমহাটী গ্রামে
- হযরত শাহ কালা (রহ.)
  মাজারঃ কমলগঞ্জ উপজেলার মশসের নগর রেলস্টেশনের কাছে
- হযরত শাহ গারিব(রহ.)
  মাজারঃ কুলাউড়া উপজেলার মৌজা শরীফপুর

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত শাহ হোলিমুদ্দীন নারনুলী (রহ.)
  মাজারঃ কুলাউড়া উপজেলার মনু রেল স্টেশনের কাছে (মাজারটি নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়েছে)
- হযরত শাহ হেলিম উদ্দীন কুরায়শী (রহ.)
  মাজারঃ কুলাউড়া উপজেলার লংলা রেল ষ্টেশনের উত্তরে কানাই ও কাকুরা নদীর মধ্যবর্তী চৌধুরী বাজার।
- হযরত শাহ হামিদ ফারুকী (রহ.)
  মাজারঃ কুলাউড়া উপজেলার মনু রেল স্টেশনের কাছে কটার কোনা বাজারের উত্তরে।
- হযরত সৈয়দ আবু বকর (রহ.)
  মাজারঃ বড়লেখা উপজেলার পাথারিয়া পরগনার ছোটলেখা মৌজায়।
- হযরত শাহ ওয়ালী মাহমুদ (রহ.)
  মাজারঃ মৌলভী বাজার উপজেলার সিংকাপন মৌজায়।

জেলা ঃ সুনামগঞ্জ

- হযরত শাহ আরেফিন (রহ.)
  মাজারঃ সুনামগঞ্জের লাউড় পাহাড়ের পাদদেশে। তিনি তরফ বিজয়ে অংশগ্রহন করেছিলেন।
- হযরত শাহ গায়েবী পীর (রহ.)
  মাজারঃ হযরত শাহ আরিফিনের মাজারের কাছে।
- হযরত শাহ কামাল (রহ.)
  মাজারঃ জগন্নাথপুর উপজেলার শাহার পাড়ার তিলক মৌজায়
- হযরত সৈয়দ শামসুদ্দিন (রহ.)
  মাজারঃ জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামে
- হযরত শায়খ কালু ওরপে কালু শাহ (রহ.)
  মাজারঃ জগন্নাথপুর উপজেলার আতুয়াজন পরগনার দাওরাই গ্রামে।
- হযরত খাজা ছলিম (রহ.)
  মৌজাঃ ছাতক উপজেলার চাপাইর গ্রামে
- হযরত সৈয়দ ইউসুফ (রহ.)
  মাজারঃ ছাতক উপজেলার সৈদের গাঁও
- হযতর শাহ শামসুদ্দীন বিহারী (রহ.)
  মাজারঃ জগন্নাথপুর উপজেরার আটঘর গ্রামে

জেলাঃ হবিগঞ্জ

- হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার বাগদাদী (রহ.)
  মাজারঃ চুনারুঘাট উপজেলার মুড়ার বন্দ দরগা শরীফে

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত শাহ মজলিস আমীন (রহ.)
  মাজারঃ হবিগঞ্জ সদর উপজেলার উচাইল গ্রাম।
- হযরত শাহ গাজী (রহ.)
  মাজারঃ চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর। খোয়াই নদীর ভাঙ্গনে মাজারটি বিলীন হয়েছে।
- হযরত শাহ সোলায়মান ফতেহ গাজী বাগদাদী (রহ.)
  মাজারঃ হবিগঞ্জ সদর উপজেরার শাহানী বাজার রেল ষ্টেশনের পশ্চিমে। মাজারের পূর্বদিকে রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে তার দুই ভাগ্না ও হযরত শাহনুর (রহ.) নামে একজন ওলীর মাজার রযেছে।
- হযরত শাহ শহীদ (রহ.)
  মাজারঃ লস্করপুর, হবিগঞ্জ সদর উপজেলা
- হযরত শাহ তাজ উদ্দিন কুরায়শী
  মাজারঃ চৌকি (ধুলচাতল) নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ
- হযরত সৈয়দ ছয়েফ মিন্নত উদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ লস্করপুর, হবিগঞ্জ সদর উপজেলা
- হযরত শাহ সদর উদ্দীন(রহ.)
  মাজারঃ পিটুয়া (সদরাবাদ) নবিগঞ্জ হবিগঞ্জ। তার নামে সদরাবাদ নামকরণ করা হয়েছে।
- হযরত শাহ মাহমুদ (রহ.)
  মাজারঃ লস্করপুর হবিগঞ্জ সদর উপজেলা।

অন্যান্য স্থানে

- হযরত শাহ জিয়াউদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ ভারতের করিমগঞ্জ মহকুমার বদরপুর থানার দেওয়াইল পরগনার কুন্দাশীল মৌজায়।
- হযরত শাহ আদম খাকী (রহ.)
  মাজারঃ ভারতের বদরপুর রেল স্টেশনের নিকটে। মাজারটি বরাক নদীর ভাঙ্গনে বিলীন হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল উদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ ভারতের কাছাড় জেলার মনুভুবন মৌজায়।
- হযরত সৈয়দ আহমদ গেছু দরাজ (রহ.) কল্লা শহীদ গেছু অর্থ চুল দরাজ অর্থ বড়। তার মাথার লম্বা বাবড়ী চুল ছিল। এজন্য তাঁকে গেছু দরাজ বলা হয়।
  মাজারঃ তরফের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। দেহলস্কর পুরের নিকট কোর্ট আন্দর নামক স্থানে দাফন করা হয়। কল্লা দাফন করা হয় ব্রাম্মন বাড়ীয়া জেলায় আখাউড়া উপজেলার (রেলওয়ে জংশনের) উত্তরে খড়মপুর নামক স্থানে।

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত শাহ সুলতান কমর উদ্দীন (রহ.)
  মাজারঃ মদনপুর, নেত্রকোণা।
- হযরত শাহ বদর (রহ.)
  মাজারঃ বদরপুর করিমগঞ্জ ভারত
- হযরত শাহ রুকন উদ্দীন আনসারী (রহ.)
  মাজারঃ সরাইল, শাহজাদপুর, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া
- হযরত শাহ বদর (রহ.)
  মাজারঃ চট্টগ্রাম
- হযরত শাহ জামাল ও শাহ কামাল(রহ.)
  মাজারঃ কুমিললা জেলা সদরের আট মাইল উত্তরে উটখাড়া গ্রামে। সফরকালে তাঁদের উট এখানে দাড়িয়েযায়। এ কারণে উক্ত স্থানের নাম উট খাড়া।
- হযরত সৈযদ আব্বাস (রহ.) ওরফে পীর গোরাচাঁদ
  মাজারঃ ভারতের পশ্চিম বাংলায় ২৪ পরগনা জেলার বশির হাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে। ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ বংশের অধঃস্তন পুরুষ।
- হযরত শাহ জামাল (রহ.)
  মাজারঃ জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার দুরসুট বাজারে।
- শাহ ইরানী (রহ.)
  মাজারঃ হাবিশপুর, জেলার নরসিংদী।

উল্লেখ্য মাজার পরিচিতি নির্ভুল অথবা চুড়ান্ত বলে দাবী করার অবকাশ নেই। এর বাইরেও বাংলাদেশের এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী আউলিয়াগণ ইসলাম প্রচারে গিয়েছেন বলে যেহেতু প্রমাণ রয়েছে তাই এ বিষয়ে আরো গবেষণার অবকাশ আছে বলে মনে করি।[৩৮]

৩৮ * আল ইসলাহ জানুয়ারী-মে ২০০৪, পৃ ৩৪- ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

তালিকা নং- ৪

আউলিয়াগণের নাম

১। খাজা অজীহ্ উদ্দীন
২। সৈয়দ আজিজ
৩। আজিজ চিশতী
৪। খাজা আজিজ চিশতি
৫। কাজী আজীম উদ্দিন
৬। সৈয়দ আজীরান
৭। হাফিজ আতা উল্লাহ
৮। আদম খাকী
৯। শেখ আমান উল্লাহ
১০। সৈয়দ আমীর
১১। খাজা আমির উদ্দীন
১২। আজিজ আশকরী
১৩। আরিফ মুলতানী
১৪। আরিফ ইয়ামনী
১৫। সৈয়দ আলিম
১৬। খাজা আলী
১৭। শেখ আলী ইয়ামনী
১৮। আলী ইয়ামনী (২য়)
১৯। খাজা আদ
২০। আলা উদ্দীন
২১। সৈয়দ আহমদ কবির
২২। সৈয়দ আহমদ
২৩। সৈয়দ আহমদ ২য়
২৪। আহমদ আব্বাসী
২৫। আহমদ নিশান বরদার
২৬। শেখ আহমদ
২৭। শেখ আসকর
২৮। খাজা আদিনা
২৯। কাজী আলিম উদ্দীন
৩০। সৈয়দ আব্বাস
৩১। সৈয়দ আবু
৩২। আবু তুরাব
৩৩। সৈয়দ আবু বকর
৩৪। আবুল হাসান
৩৫। আবুল খায়ের
৩৬। আবুল আরিদ
৩৭। শেখ আবুল ফজল
৩৮। আবু বকর ২য়
৩৯। আব্দুল আজিজ
৪০। শেখ আব্দুল আলী
৪১। আব্দুল জলিল
৪২। শেখ আব্দুল করম
৪৩। সৈয়দ আব্দুল করিম
৪৪। আব্দুল মালিক
৪৫। আব্দুশ শুকুর
৪৬। আব্দুল হেকিম
৪৭। শেখ আব্দুল্লাহ
৪৮। আব্দুর রহীম
৪৯। আব্দুল আলী
৫০। সৈয়দ আজিয়াল
৫১। শেখ আসমর
৫২। আহমদ
৫৩। সৈয়দ ইউসুফ
৫৪। সৈয়দ ইয়াকুব
৫৫। শেখ ইলিয়াছ
৫৬। ইসমাইল উমরী
৫৭। খাজা ঈসা
৫৮। শেখ ঈসা

Dhaka University Institutional Repository

৫৯। সৈয়দ ঈসা

৬০। ইমাম শুকর উল্লাহ

৬১। ঈসা চিশতি

৬২। ইমাম উদ্দীন

৬৩। এতিম শাহ

৬৪। কারী এহিয়া

৬৫। খাজা ইকবাল

৬৬। খাজা ইখতিয়ার

৬৭। শেখ ওমর

৬৮। কাজী ওমর।

৬৯। খাজা ওমর চিশতি

৭০। ওমর দরিয়া

৭১। শেখ খাজা ওমর জাহানা

৭২। সৈয়দ ওমর সমরকান্দী

৭৩। ওসমান উদ্দীন

৭৪। শেখ ওসমান

৭৫। সৈয়দ ওসমান

৭৬। ওসমান উদ্দীন ২য়

৭৭। সৈয়দ কবির

৭৮। করীমদাদ রুমী

৭৯। কামাল ইয়ামনী

৮০। কামাল উদ্দীন

৮১। কালা মিয়া

৮২। শেখ কুতুব উদ্দীন

৮৩। শেখ কালু

৮৪। সৈয়দ কুতুব উদ্দীন

৮৫। সৈয়দ কাসিম

৮৬। কুতুব আলম

৮৭। কাসিম দক্ষিনী

৮৮। মাওলানা কিরাম উদ্দীন

৮৯। সৈয়দ খলিলুল্লাহ

৯০। দেওয়ানা খলিল

৯১। শেখ খিজির (খাসদবীর)

৯২। শেখ খিজির

৯৩। গারীব খাকী

৯৪। শেখ গরীব

৯৫। হাজী গাজী

৯৬। গাজী মুলুক

৯৭। গনি মোহাম্মদ

৯৮। গয়বী পীর

৯৯। গোলাম

১০০। চাবনী পীর

১০১। শাহ চাঁদ

১০২। শাহ চট

১০৩। সৈয়দ জাহান

১০৪। সৈয়দ জওয়াহির

১০৫। জাকারিয়া আরবী

১০৬। শেখ জকাই

১০৭। জয়েন উদ্দীন

১০৮। জয়েন উদ্দীন আব্বাসী

১০৯। কাজী জালাল উদ্দীন

১১০। সৈয়দ জলিল

১১১। সৈয়দ জমিল

১১২। শেখ জামাল

১১৩। সৈয়দ জাহাঙ্গীর

১১৪। জিয়া উদ্দীন মোহাম্মদ

১১৫। জিয়া উল্লাহ

১১৬। জিন্দা পীর

১১৭। জুনেদ গুজরাতি

১১৮। কাজী জাহান

১১৯। শেখ জমিল

১২০। গাজী জয়েব

১২১। হাজী জমসের খতিব

১২২। শেখ জিয়া উদ্দীন

১২৩। হযরত খাজা ঝকমক

১২৪। সৈয়দ তাজ উদ্দীন কুরায়শী

Dhaka University Institutional Repository

১২৫। কাজী তাজ উদ্দীন কুরায়শী
১২৬। তাজমুলুক
১২৭। শেখ তাহির
১২৮। তিব সালীম
১২৯। খাজা তৈয়ব
১৩০। খাজা দাউদ
১৩১। দাউদ কোরেশী
১৩২। দাউদ মুলুক
১৩৩। দলেয়ার খতিব
১৩৪। দাদা পীর
১৩৫। হাজী দরিয়া
১৩৬। দাওর বখশ খতিব
১৩৭। দৌলত গনি
১৩৮। দৌলত গাজী
১৩৯। দৌলত মুনীরী
১৪০। সৈয়দ দৌলত
১৪১। সৈয়দ দৌলত ২য়
১৪২। সৈয়দ নাসির উদ্দীন
১৪৩। শেখ নসর
১৪৪। সৈয়দ নসর উল্লাহ
১৪৫। নুর মূলক
১৪৬। নুরুল্লাহ
১৪৭। নুরুল হুদা
১৪৮। নুর আলী
১৪৯। শেখ নছরত
১৫০। শেখ নিয়ামত উল্লাহ
১৫১। নিজাম উদ্দিন কিরমানী
১৫২। নিজাম উদ্দিন বোগদাদী
১৫৩। খাজা নাসির উদ্দীন
১৫৪। খাজা নাসির উদ্দীন ২য়
১৫৫। খাজা পীর
১৫৬। পীর আমিন
১৫৭। পীর মুলুক
১৫৮। পর্বতগান পীর
১৫৯। পূর্বোক্ত জিয়া উদ্দিন প্রমুখ
১৬০। ঐ
১৬১। ঐ
১৬২। ঐ
১৬৩। সৈয়দ ফখর উদ্দীন
১৬৪। কাজী ফয়জুল্লাহ
১৬৫। ফরিদ আনসারী
১৬৬। ফরিদ রওশন চেরাগ
১৬৭। সৈয়দফরীদ
১৬৮। ফতেহ গাজী
১৬৯। কাজী ফৈয়াজ উদ্দীন
১৭০। ফিরুজ আতারী
১৭১। দেওয়ান ফতেহ মোহাম্মদ
১৭২। কাজী ফিরোজ
১৭৩। কাজী ফরিদ উদ্দীন
১৭৪। হাফিজ ফসীহ
১৭৫। ফরু জয়েহ
১৭৬। ব আবু দৌলত
১৭৭। সৈয়দ বদর
১৭৮। সৈয়দ বদর উদ্দীন
১৭৯। শাহ বাগদার আলী শাহ
১৮০। সৈয়দ বাহা উদ্দিন
১৮১। সৈয়দ বাজ
১৮২। সৈয়দ বায়েজীদ
১৮৩। সৈয়দ বুজুর্গ
১৮৪। বদর মুলুক
১৮৫। বুরহান উদ্দীন বুরহান
১৮৬। বুরহান উদ্দীন আহমদ
১৮৭। বুরহাদন উদ্দিন কাপ্তান
১৮৮। খাজা বুরহান উদ্দীন
১৮৯। বাহার আশকরী
১৯০। খাজা বাহা উদ্দিন
১৯১। মাখদুম হাবীব
১৯২। মাখদুম রহিম উদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩। মাখদুম নিজাম উদ্দীন উসমানী
১৯৪। মাখদুম জাকীর গজনভী
১৯৫। মদসুদ্দীন
১৯৬। সৈয়দ মুনঈম
১৯৭। সৈয়দ মুখতার
১৯৮। মাসউদ মুলুক
১৯৯। সৈয়দ মুহাব্বাত
২০০। মহী উদ্দিন
২০১। মহীব আলী
২০২। মারূফ সেলাদার
২০৩। শেখ মুসা
২০৪। আব্দুল আলী
২০৫। মওদুদ
২০৬। মোজাফফর বিহারী
২০৭। সৈয়দ মোস্তফা
২০৮। মোহাম্মদ আনসারী
২০৯। মোহাম্মদ আইয়ুব ইয়ামন
২১০। মোহাম্মদ আমীন
২১১। মোহাম্মদ আশিক
২১২। মোহাম্মদ মালিক
২১৩। মোহাম্মদ ইয়ামনী
২১৪। শেখ মোহাম্মদ কিবরীয়া
২১৫। সৈয়দ মুহাম্মদ গজনভী
২১৬। মোহাম্মদ শহীয়াল
২১৭। মোহাম্মদ সালেহ
২১৮। শেখ মোহাম্মদ করম
২১৯। মোহাম্মদ সেলাহদার
২২০। মোহাম্মদ জানেদী
২২১। সৈয়দ মোহাম্মদ জান
২২২। মোহাম্মদ তকী
২২৩। শেখ মোহাম্মদ দানা
২২৪। মোহাম্মদ নুর
২২৫। সৈয়দ মোহাম্মদ রওশন
২২৬। মোহাম্মদ লতিফ
২২৭। মোহাম্মদ বিহারী
২২৮। মোহাম্মদ সাহাবানী
২২৯। মোহাম্মদ হাজী
২৩০। মোহাম্মদ সিকান্দর
২৩১। মোহাম্মদ শাহবাল
২৩২। মোহাম্মদ সোজা
২৩৩। মোহাম্মদ নকী
২৩৪। মোহাম্মদ কাবেরী
২৩৫। মোহাম্মদ দরিয়া
২৩৬। মোহাম্মদ আমিন
২৩৭। মোহাম্মদ সৈয়দ
২৩৮। মাখদুম সাহেব
২৩৯। সৈয়দ রুকনুদ্দীন
২৪০। রুকনুদ্দীন আনসারী
২৪১। শাহ কামাল
২৪২। কাজী শাহ দেওয়ান
২৪৩। শাহ নুর
২৪৪। শাহকালু
২৪৫। শাহপরান
২৪৬। শাহ মদন
২৪৭। শাহ ফরাঙ্গ
২৪৮। শাহ মালুম
২৪৯। শাহ রফী উদ্দীন
২৫০। শাহ শমস উদ্দীন
২৫১। শাহ সনজর
২৫২। শাহ সদর উদ্দীন
২৫৩। শাহ সিকন্দর
২৫৪। সুলতান শাহ সিকন্দর
২৫৫। শাহ সোন্দর
২৫৬। সৈয়দ সরেফ উদ্দীন
২৫৭। শেখ সমস
২৫৮। শেখ শরফ উদ্দীন
২৫৯। শরীফ আজমিরী
২৬০। শেখ সাহদা
২৬১। শেখ সাবু
২৬২। শেখ সলিম

Dhaka University Institutional Repository

২৬৩। শেখ সালেহ
২৬৪। শাহবাজ আনসারী
২৬৫। সিকান্দর তবলিয়াজ
২৬৬। শেখ সিরাজ উদ্দীন
২৬৭। সোনাগাজী
২৬৮। সোহাব উদ্দীন
২৬৯। সালেহ মালেক
২৭০। শেখ সদর
২৭১। সিকান্দর সলিম
২৭২। খাজা সলিম
২৭৩। খাজা সুফিয়ান
২৭৪। খাজা সিরাজ
২৭৫। সৈয়দ সিকন্দর
২৭৬। শাহ আরফিন
২৭৭। শাহ বদর
২৭৮। শাহ মাহমুদ
২৭৯। শাহ সুলতান
২৮০। শাহ সইদ
২৮১। লাল সাহেব
২৮২। সৈয়দ লালু
২৮৩। হযরত উল্লাহ
২৮৪। হাবীব গাজী
২৮৫। হাজী ইউসুফ
২৮৬। হাজী আহমদ
২৮৭। হাজী আহমদ (২য়)
২৮৮। হাজী খলিল
২৮৯। হাজী খিজির
২৯০। হাজী মোহাম্মদ
২৯১। হাজী মোহাম্মদ জাকারিয়া
২৯২। হাজী জমসেদ
২৯৩। হাজী মোহাম্মদ দরিয়া
২৯৪। হাজী মোহাম্মদ শরীফ
২৯৫। হাজী লতিফ
২৯৬। হাজী ওমর চিশতি
২৯৭। হাজী কাসিম
২৯৮। সৈয়দ হামজা
২৯৯। হাফিজ মোহাম্মদ
৩০০। হেলিম উদ্দীন নুর আলী
৩০১। হামীদ ফারুকী
৩০২। হায়দার গাজী
৩০৩। হাশিম চিশতি
৩০৪। হেলিম উদ্দীন বিহারী
৩০৫। শেখ হেলিমউদ্দীন
৩০৬। হাসান উদ্দীন বিহারী
৩০৭। হুজ্জত মালেক
৩০৮। হুমান উদ্দীন
৩০৯। সৈয়দ হোসেন
৩১০। শেখ হোসেন
৩১১। শেখ হোসেন (২য়)
৩১২। সুফী হোসেন
৩১৩। হিমান উদ্দীন
৩১৪। শাহবাগ দারদ আলী
৩১৫। শাহ দুধ মালিক
৩১৬। শাহ জামাল উদ্দিন
৩১৭। হাজী গাজী
৩১৮। গোলাম (২য়)
৩১৯। হাফিজ আলী
৩২০। কাজী গয়লা
৩২১। হাসান শহীদ
৩২২। শাহ পাতা। [৩৯]

বিঃদ্রঃ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ও হযরত শাহজালাল (রহ.) সংক্রান্ত অন্য পুস্তকাদি হইতে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে গৃহিত।

---

৩৯. হযরত শাহজালাল (রহ.) প্রাগুক্ত পৃ- ২৭১, ২৭৬। (মুহাম্মদ নুরুল হক সম্পাদিত)

Dhaka University Institutional Repository

৩৬০ আউলিয়ার কতিপয় পরিচিতি

প্রচলিত জনমত ও বিশ্বাস মতে যে সমস্ত দরবেশদিগকে শাহজালালের সঙ্গী বলে কথিত হয় তাঁরা মোটামুটি তিন পর্যায়ে বিভক্ত।

(১) যারা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সহযাত্রী হয়ে এদেশে আগমন করেছিলেন।

(২) যারা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবদ্দশায় এদেশে আগমন করেছিলেন।

(৩) প্রথমোক্ত দরবেশ গণের কোন কোন বংশধর যাহারা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর দরবেশগণকেও প্রবাদোক্ত মতে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গীয় দরবেশ বলে জনসাধারণ বিশ্বাস করেন। সুতরাং তাদের সঠিক বিবরণ অন্য কোন প্রামাণিক তত্ত্বের অভাবে সুহেল-ই-ইয়ামন-এর সাহায্য ছাড়া উপায় নেই।

শ্রীহট্ট শহরঃ

এই শহরে দরবেশগনের প্রধান কেন্দ্রস্থল দরগা মহল্লা, খাসদবীর এবং চৌকিদীঘি। কথিত আছে যে, হযরত শাহজালাল সর্ব প্রথম শ্রীহট্টে এসে চৌকিদিঘীতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। তথায় তিনি একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবংতাহা বাঙ্গালিয়া রাজা ইউশাহের রাজত্বকালে পূণঃ নির্মিত হয়েছিল। সেই মসজিদ সংলগ্ন ৮৮৪ হিঃ তারিখের একটি ফলক লিপি এখন ও দরগায় রক্ষিত আছে।

চৌকিদেখিতে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী কোন কোন দরবেশের সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। চৌকিদিঘি, পীর মহল্লা, খাসদবীর অধিবাসীগণের মধ্যে সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালারের বংশধরগণ শ্রেষ্ঠতার দাবী করতেন এবং তাদের মধ্য হতে দরগার সরে কওম বা প্রধান খাদিম নিযুক্ত হতেন।

কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালে নওয়াব ইস্পন্দিয়া খান কর্তৃক তাঁরা পদচ্যুত হন এবং কাল ক্রমে পদসম্মান হারিয়ে জিলার বিভিন্নাংশে চলে যান। তাদের বংশধর এখনও গহরপুর পরগনা বানিচঙ্গ ও ত্রিপুরায় ধর্ম নগরে বসবাস করছেন। পীর মহল্লাহ এবং খাসদবীর প্রভৃতি স্থানের অন্যান্য অধিবাসীগণ ব্যবসায়ী ধর্মযাজকরূপে পরিগণিত হওয়ায় তাদিগকে মুল্লা বা পীর বলে অভিহিত হত। পূর্বকালে ঐ তিনটি মহল্লায় ঘনবসতি ছিল এবং জনাকীর্ণ ও শহরের বিশিষ্ট অংশ বলিয়া পরিগণিত হত। কিন্তু গত ১০০ বৎসরের মধ্যে ঐ মহল্লা জনশূন্য হয়ে গেছে এবং তাদের অধিবাসীগণ, জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করছেন।

দরগাহ মহল্লাহ খাদিমগন কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। ইহার মধ্যে আটটি পরিবার বাংলার তৎকালীন সুবেদারের নিকট হতে সনদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বর্তমান সরেকওম ও মুফতি পরিবার ছাড়া আর সকল পরিবারই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ঝরনার পারের অন্য আর একটি সৈয়দপরিবার আউলিয়া বিশিষ্ট ও সম্মানিত ছিলেন। তাহারা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী সৈয়দ হামজার বংশধর বলে দাবী করেন। ঐ পরিবারে শাহজালাল ও শাহজাদা নামীয় দুইজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ইহাদের পরবর্তীগণ প্রধানতঃ শিক্ষার অভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পুরুষের সুনাম ও খ্যাতি রক্ষা করতে পারেন নাই। তাঁদের কেহ কেহ শ্রীহট্ট শহরে, ময়মনসিংহ জেলার সিকন্দর নগরে বসবাস করছেন। এতদ্ব্যতীত হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গীয় আউলিয়া কেউ কেউ শ্রীহট্ট শহরে বিদ্যমান আছেন। তন্মধ্যে নাইওরপুলের সৈমদ উমর সমরকান্দি আরবীর বংশধরগণকে এখনও শ্রীহট্ট শহরে বাস করতে দেখা যায়।সৈয়দ উমর সমকান্দির দুই পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে একজন অপূএক মারা যান। দ্বিতীয় ব্যক্তির বংশধরগন এখনও গহরপুর পরগনর উসমানপুর গ্রামে বাস করছেন। [৪০]

(১) হযরত শাহ পরান (রহ.)

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর এর নামের পরেই যাঁর নাম স্মরণ করা হয়, তিনি হলেন হযরত শাহ পরান (রহ.)। ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম। তিনি সুহরাওয়ার্দীয়া ও জালালিয়া তারিকার প্রখ্যাত দরবেশ। কথিত আছে যে, তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ভাগিনা এবং তাঁর জন্ম ইয়ামনে। তিনি শাহজালাল (রহ.) এর সাথে সিলেট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন (১৩০৩ খ্রিঃ) এবং সিলেটের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হন। সিলেট শহর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দুরে দক্ষিণ গাছ পরগনায় খাদিম নগরে খানকা স্থাপন করে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করেন।

সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় শাহপরানের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অদ্যাবধি তার মাজার জিয়ারতের জন্য প্রতিদিন বহুলোক সমাগত হয়। রবিউল আউয়াল মাসের ৪, ৫, ৬ তারিখ তাঁর ওরস হয়। তাঁর মাজারটি উচু টিলার উপর ইট দিয়ে বাঁধানো ও দেয়াল ঘেরা অবস্থায় সযত্নে রক্ষিত আছে। মাজারের সঙ্গে উত্তরদিকে একটি প্রাচীন গাছ আছে যার শাখা প্রশাখা সমগ্র মাজারের উপর বিস্তৃত। গাছটির নাম 'আশা গাছ'। গাছের পাতা থেকে বুঝা যায় যে, গাছটি ডুমর, আম ও অপর কোন জাতের গাছের সমম্বয়ে গঠিত। মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য ভক্তি ভরে ডুমুরের বীজ খায়। আম ও অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তবারক হিসাবে খাওয়া হয়। প্রাচীরের পাশেই রয়েছে একটি প্রাচীন মসজিদ। ১৯৮৯-৯১ সালে মসজিদটি আধুনিকায়ন করা হয়েছে। প্রায় ১,৫০০ জন মুসল্লি এখানেএকত্রে নামাজ আদায় করতে পারেন। [৪১]

তাঁর মুর্শিদ ও মামা হযরত শাহজালাল (রহ.)'র বদৌলতে কামালিয়াতের উচ্চ স্থান লাভ করেন। তাঁর ইঙ্গিত মতই তিনি দক্ষিণ গাছে অবস্থান করেন ও তালিম তারবিয়াত সহ দ্বীনের অন্যান্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। মুসলিম আমলের সনদে এই মাযারের খাদিমদের নামেভূমি বরাদ্দের প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে একটি শিলালিপি আছে। কত শত শত লোক এখানে এসে ফয়েজ বরকত হাছিল করছেন।সুফী সাধকের জন্য ইহাও একটি আকর্ষনীয় স্থান। দক্ষিণ গাছের চৌধুরীগণ এই পীরের খাদিম বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। এখনও তাহার কবুতরী কারামতের কথা লোক মুখে শুনা যায়।

৪০. শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি পৃ- ৪৮, ৪৯।
৪১. বাংলা পিডিয়া, খন্ড-৯, পৃ- ৩১৪।

Dhaka University Institutional Repository

(২) হযরত শায়খ আলী (রহ.)

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অতি প্রিয় ছিলেন শায়খ আলী (রহ.)। তিনি ইয়ামনের রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর পবিত্র মাযার হযরতের পবিত্রতম মাজারের পূর্ব দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। ইনিও মুজাররদ (অনূঢ়) ছিলেন। রাজ্য সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে পরবর্তীকালে যে সব দরবেশ কামালিয়াত হাছিল করেন, ইয়ামনের রাজপুত্র তাদের অন্যতম। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর আদেশে প্রাথমিকভাবে রাজ্য শাসন করতে রাযী হয়েছিলেন। কিন্তু পরে পথিমধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর কাফিলায় সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভ করেন। এইবার হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। আদর্শের ডাক ও দ্বীনের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভূমিও প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সিংহাসন পরিত্যাগ করে তিনি আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.) সঙ্গে আগত ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন শায়খ আলী।[৪২] তিনি একজন ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তিত্ব। ইবনুল বতুতার সফরনামায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য স্যার যদুনাথ সরকার তাঁহার History of Bengal নামক গ্রন্থে লিখেছেন- These saints surrounded by a horde of less scrupulous flowers used to enter the territory of the Hindu Rajas as squatters on some pretext or other. A.T. Dev এর অভিধানে Squeatters এর বাংলা প্রতিশব্দ লেখা হয়েছে জবরদখলকারী, শাহজাদা শায়খ আলী (রহ.) এর জীবনীই যাদুনাথ সরকারের উপরোক্ত উক্তিটুকু ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে যথেষ্ট।[৪৩]

(৩) শাহ সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার (১৩শ শতক) আউলিয়া ও ইসলাম প্রচারক। ইরাকের বাগদাদে তার জন্ম। তিনিতাঁর আত্মীয় সৈয়দ মওসুফ নামক ব্যক্তির অসদ্ব্যবহারের বিরক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। দরবেশ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল ও লোকে বলত যে প্রবল বায়ু বেগেও তাঁর তাবুর দ্বীপ নির্বাপিত হত না।

হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় (১২৫৮ সকল) ভাগ্যন্বেষনে বের হয়ে তিনি দিল্লী আগমন করেন বলে বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ রয়েছে। এরপরে সিলেট অভিযানে তিনি সেনাপতি সিকন্দর খান ও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী হন।

সুহরাওয়ার্দীয়া ত্বরিকার অনুসারী সৈয়দ নাসির উদ্দীনের কারামত সম্পর্কে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। যুদ্ধে পরাজিত রাজা গৌর গৌবিন্দের কথিত জাদুর ধনুকে তিনি জ্যা সংযোজন করেন। তিনি শাহজালালের নির্দেশে বারোজন আউলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে তরফের রাজা আচাক নারায়নকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন হবিগঞ্জের মুড়ারবন্দ (তরফে) তাঁর মাজার আছে।[৪৪]

---

৪২. বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগন, ওবায়দুল হক, (ফেনী হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৯) পৃ ১১৭-১৮

৪৩. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস পৃ- ১৪

৪৪. বাংলা পিডিয়া খ-৯, পৃ- ৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্ট বিজয়ে পর হযরত শাহজালালের আদেশেতিনি সপ্ত গ্রামে ফিরে যান। তাঁর সমাধি সপ্তগ্রামে অবস্থিত ও সিকান্দর গাজীর সমাধির সংলগ্ন বলে সৈয়দ মুর্তাজা আলী সাহেব উল্লেখ করেন।

অনেকের মতে তিনি তরফ বিজয়ের পর সিলেট পরিত্যাগ করেন। খুব সম্ভব শাহজালাল (রহ.)'র জীবদ্দশায় পাণ্ডুয়ায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে। কথিত আছে যে, একরাত্রে স্বপ্নে তিনি নিজেকে আল্লাহর পবিত্র নাম সমূহ তিলাওয়াত করতে দেখেন এবং দৈবশক্তিবলে অনুভব করেন যে, মৃত্যু সমাগত। তিনি বন্ধুদের আহবান করেন এবং অনুরোধ করেন যেন জানাযা পাঠের পর কিছু সময়ের জন্য তাদের দৃষ্টি লাশ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন। তদনুসারে তাঁরা জানাযার পর অল্পক্ষণের জন্য অন্য দিকে তাকান। অতঃপর শবাধারে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, মৃত্যের চৌকিটি খালি এবং তাতে কোন মৃতদেহ নেই। বন্ধুরা পরিত্যাক্ত চৌকিটি আদিনা মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাহিত করেন। তখন থেকে ঐ এলাকার নাম হয় চৌকিদেখি।

শাহজালাল (রহ.) এর পবিত্র মাজারের প্রধান খাদিমের উপাধি সরে কওম। সিলেট জেলার শাহজালাল (রহ.) এর মাজারের খাদিমগন শরীফ এবং খান্দানী বলে জনগণের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন। বহু যুগ পর্যন্ত সিপাহ সালার নাসির উদ্দীনের বংশধরেরাই সরে কওম পদ অলংকৃত করেন। সেনাপতি নাসির উদ্দীনের দৌহিত্র ইব্রাহিমকে দিল্লীর সম্রাট 'মালিকুল উলামা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইব্রাহিমের অধঃস্তন পুরুষ শাহ ইস্রাইল ফার্সী ভাষায় 'মায়দানুল ফাওয়াইদ' নামে এক কিতাব (৯৪১ হি.) রচনা করেন।৪৫

সৈয়দ নাসির উদ্দিন কর্তৃক তরফ বিজয় সম্পর্কে দুটো অভিমত রয়েছে। এক দলের অভিমত হচ্ছে তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে আসেন, তিনি পৃথক অভিযানের নেতা হিসাবে তরফ রাজ্য জয় করেন। এমত সম্পর্কে সৈয়দ নাসির উদ্দীনের বংশ ধরগন অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ করেন।

এ সম্বন্ধে এখনো চুড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ঘটনা পরম্পরায় ইতিহাসের আলোচনা করলে বুঝা যায় এমতবাদ সত্য নয়। কারণ সৈয়দ নাসির উদ্দিন একা তরফ রাজ্য আক্রমন করেননি। তার সঙ্গে হযরত শাহজালাল (রহ.)এর সঙ্গে আগত অপর এগারজন আউলিয়া ছিলেন। ওদের সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি রয়েছে তাতে বুঝাযায় তাঁরা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর একান্তঅনুগত ছিলেন এবং তাঁর আদেশ ব্যতিত কোন কাজ করেননি। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা হযরত শাহজালাল (রহ.)'র নির্দেশক্রমেই সৈয়দ নাসির উদ্দীনের সাথে যোগদান করেছিলেন। তারপর পরবর্তীকালে এঁরা আবার সিলেটের বিভিন্ন স্থানে আস্তানা স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। তারা যদি সৈয়দ নাসির উদ্দীনের অনুসারী হবেন তাহলে হবিগঞ্জের সুনামগঞ্জের বা করিমগঞ্জের অন্যান্য স্থানে আস্তানা স্থাপন করবেন কেন? তাঁদের পক্ষে তরফে বাসস্থান নির্মাণ করা স্বাভাবিক ছিল।

---

৪৫. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.),পৃ- ২০৩, ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ নাসির উদ্দীনের বংশধরদের মধ্যে তরফের সৈয়দরা জানাজা স্থল থেকে সৈয়দ নাসরি উদ্দীনের লাশ গায়িব বা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্পর্ক বলেন যেহেতু তরফের প্রতি তার আসক্তি অধিকতর ছিল, এজন্য স্বেচ্ছায় সিলেটে সমাহিত হতে চাননি। এজন্য ইচ্ছা করেই আল্লাহর তরফ থেকে মদদ লাভ করে গায়েব হয়ে গেছেন। সে যাই হউক তার বংশ ধরেরা সিলেট তথা সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে এখনও রয়েছেন। তন্মধ্যে তরফের নরপতি, দাউদ নগর, লস্করপুর ও সুলতানশীর সৈয়দ সাহেবগন মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত।

চৌকিদেখিতে অবস্থিত সৈয়দ নাসির উদ্দীনের অধঃস্তন সৈয়দ আহমদ সম্বন্ধে স্থানীয় মহলে একটা কিংবদন্তী এখনও প্রচলিত রয়েছে। তারই বংশধর সৈয়দ আহমদ নামক একব্যক্তি ইলিম বা জ্ঞানের প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন। অপরদিকে তার পুত্র সৈয়দ আলী সব সময় খেলাধুলায় লিপ্ত ছিলেন। এজন্য একদা তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ অবস্থায় তার ছেলেকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে পা বাঁধা অবস্থায় এক প্রকোষ্ঠে আটকে রাখেন। কথিত আছে হযরত রাসুলে আকরাম (সা.) তাঁর এ বংশধরের করুন অবস্থা দর্শণে বিচলিত হন এবং স্বপ্নে তাকে দর্শন দান করেন ও শৃঙ্খল মুক্ত করেন। এসময় হযরত রাসুল ই আকরাম (সা.) তার মুখ নিঃসৃত লালা সৈয়দ শাহ আলীর মুখে স্থাপন করেন। তার ফলে তার জবান খুলে যায়। এবং তিনি অনর্গল কুরআন উল কারিমের সুরাগুলো আবৃত্তি করতে থাকেন। পুত্রকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে সৈয়দ আহমদের আর বিস্ময়ের অবধি থাকেনি। তিনি তার বাচনিক সমস্থ ঘটনা জানতে পেরে পুত্রের মুখে প্রদত্ত হযরত রাসুলে আকরাম (সা.) এর মুখ নিঃসৃত লাল সম্মান সহকারে একটা কুয়া খনন করে তার ভিতরে ফেলে দেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে কুপ থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি ফোয়ারার মত প্রবাহিত হয়। প্রবাদ রয়েছে যে, এক অপবিত্র ব্যক্তি কুপে অবতরণ করে স্নান করার ফলে এ কুপের পানিতার পূর্ব শক্তি হারিয়ে ফেলে। তা না হলে পূর্বে এ কুপের পানি খাওয়ার ফলে যে কোন ব্যক্তির মেধাশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেত।[৪৬]

৪. সৈয়দ ওমর সমরকন্দীঃ

সৈয়দ ওমর সমরকান্দী ইরান থেকে হযরত শাহজালাল (রহ.)এর সঙ্গী হন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর কান্দে তাঁর আদি নিবাস ছিল। সিলেট শহরের ধোপাদিঘীর পূর্ব পারে ওমর সমরকন্দী পাড়ায় তার মাজার আছে। এ মহল্লায় তাঁর বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও বাস করছেন। সৈয়দ ফুল নামে তাঁর এক বংশধর আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উঁচে পর্যায়ে আরোহন করিয়েছেলেন। আতুয়াজান পরগনার অন্তর্গত সৈয়দপুর গ্রামে তিনি আস্তানা স্থাপন করেন। জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত সৈয়দপুরে এবং বালাগঞ্জ থানার গহরপুরের অন্তর্গত তাহিরপুর মৌযায় তাঁর বংশধরদের কেউ কেউ এখনও বাস করছেন। তার বংশে সৈয়দ ইমদাদ আলী ও তাঁরই সুযোগ্য পুত্র মাওলানা সৈয়দ আবদুল খালিক খ্যাতি অর্জন করেন।[৪৭]

---

৪৬. সিলেট ইসলাম, পৃ- ৫১-৫২

৪৭. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ২২

Dhaka University Institutional Repository

(৫) শায়খ বুরহান উদ্দীনঃ

মুসলমানদের সিলেট বিজয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তাঁর শিশুপুত্রের আকিকা উপলক্ষ্যে গরু জবাইকে কেন্দ্র করে সিলেটের রাজা গৌড়গোবিন্দের সঙ্গে তার বিরোধ হয়। রাজার আদেশে শিশুটিকে হত্যা করা হলে তিনি তৎকালীন বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের নিকট এ অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সিকান্দর খান ও নাসির উদ্দীন সিপাসালারের নেতৃত্বে সুলতান প্রেরিত সৈন্য বাহিনীর পথ প্রদর্শক ছিলেন বুরহান উদ্দীন।

এরই অনুনয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটে আসেন। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিলেট মুসলিম অধিকারে আসে। পরবর্তী জীবনে বুরহান উদ্দীন ওলীয়ে কামিল হন। সিলেট শহরের টুলটিকর মহল্লায় কুইঘাটে (সাহেব বাজারের নিকটে) তাঁর মাজার রয়েছে।[৪৮]

(৬) শায়খ করম মুহাম্মদঃ

তিনি মক্কাশরীফের কুরাইশ বংশের শেখ বাহা উদ্দিন ফারুকীর পুত্র। তাঁর নামানুসারে শেখ পাড়া মহল্লার নাম হয়েছে। ঐ মহল্লার শেখগন তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন। হযরত শাহজালাল যে স্থান দিয়ে সুরমা নদী অতিক্রম করেন ঐ স্থান শেখ ঘাট নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে তথায় একটা পাকা ঘাট বাঁধান হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে সেটি বিনষ্ট হয়। যখন নবাব একরাম উল্লাহ খান (১৭০৮-১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) শ্রীহট্টের ফৌজদার তখন শায়খ করম মুহাম্মদের বংশে ফয়েজ উল্লাহ নামে এক ধর্মপ্রাণ পুরুষ জীবিত ছিলেন। নবাব একরাম উল্লাহ তাঁকে পীর রূপে সম্মান করতেন ও বখশী উপাধি দেন। বখশীকে প্রত্যেহ ফৌজদারের দরবারে উপস্থিত থাকতে হত। একদা ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণের জমিদার বর্গ রাজস্ব বাকীর দায়ে ধৃত হয়ে শ্রীহট্টে নীত ও উৎপীড়িত হন। এই অত্যাচার দর্শনে মনঃ পীড়া পেয়ে বখশী ফয়েজ উল্লাহ পরের দিন দরবারে অনুপস্থিত হন। নবাব এই সংবাদ জানতে পেরে লজ্জিত হন ও জমিদার দিগকে অব্যাহতি দেন।

জমিদারেরা এই উপকারী দরবেশকে দেশে নিয়ে যান। ফয়েজ উল্লা ভাদেশ্বরে উপস্থিত হয়ে সে স্থানের সৌন্দর্যে মোহিত হন ও তথায় বাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবাব ফয়েজ উল্লাকে প্রায় একহাল ভূমি লাখেরাজ দেন। ঐ স্থান শেখ পাড়া নামে পরিচিত হয়। তাঁর বংশধরগন তথায় বাস করছেন।[৪৯]

(৭) শাহ খাজা আদিনাঃ

শাহ খাজা আদিনা খাসদবির মহল্লার উত্তরে একশো বিশ গম্বুজ বিশিষ্ট আদিনা মসজিদের ভগ্নবশেষের নিকট সমাহিত হয়েছেন বলে জনশ্রুতি আছে। কথিত আছে যে, উক্ত মসজিদ শ্রীহট্টে আমিল ইসপিনদিয়া খান কর্তৃক ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বিনষ্ট হয়। কোন এক ঈদুল আজহার জামাতের সময় নওয়াব ইসপিনদিয়া খানের জন্য অপেক্ষা করা হয়নি। ইসপিনদিয়া খান এতে অপমানিত বোধ করেন এবং বৃহৎ মসজিদটি বিনষ্ট করার আদেশ দেন। পরে অনুতপ্ত নওয়াব

---

৪৮. বাংলা পিডিয়া খ-৭, : পৃ- ১৫৯।

৪৯. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ২৩

Dhaka University Institutional Repository

আর একটি মসজিদ তৈরী করে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি তার সহায় হননি। মসজিদ সম্পন্ন হওয়ার আগেই তার পরকালের ডাক এস যায়। অসম্পূর্ণমসজিদের ভগ্নাবশেষ কয়েক বছর আগেও বিদ্যমান ছিল। এ মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সৈয়দ জালাল কর্তৃক উহা (১৬৬৪ ঈ.) নির্মিত হয়েছিল। ঐ সময় ইসপিনদিয়ারগন সিলেটের শাসনকর্তা ছিলেন। এ ভগ্নাবশেষকে সংস্কার করে মরহুম সৈয়দ আব্দুল মজিদ খান বাহাদুর (সি.আই) আব্দুল মজিদ ইন্সটিটিউট গড়ে তুলে ছিলেন। তা এখন সুলেমান হলের বিশাল আয়তনের মধ্যে বিলুপ্ত।

(৮) হাজী ইউসুফঃ

হাজী ইউসুফ আবর দেশ থেকে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাথে আগমন করেন। কারো কারো মতে হাজী ইউসুফ তার ভাগিনেয়। কথিত আছে যে, সিকন্দর গাজী কর্তৃক প্রেরিত এক পরমা সুন্দরী রমনীকে শাহজালাল (রহ.) এর নির্দেশে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। শাহজালাল (রহ.) এর দক্ষিণস্থ দ্বিতীয় বেষ্টনীতে হাজী ইউসুফের মাজার অবস্থিত। নওয়াব ইসফিন্দিয়া খান তাঁর এক বংশধরকে সরে কওম নিযুক্ত করেন।[৫০]

৯। বুরহান উদ্দীন কাত্তাল

বুরহান উদ্দিন কাত্তাল আরবদেশ থেকে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে আগমন করেন। তিনি খুব সম্ভব প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম শাহজালাল উদ্দীন ও পৌত্রেরনাম শাহ কামাল উদ্দীন। শাহ কামাল উদ্দীনের মাজার আতুয়াজান পরগনার অন্তর্গত তিলক শাহার পাড়া গ্রামে অবস্থিত। এই বংশের হাসান মুহাম্মদ সম্রাট আওরঙ্গ জেবের রাজত্বকালে শ্রীহট্টের মুফতি পদ প্রাপ্ত হন। আদালতে মুসলমানি আইন সংক্রান্ত জটিল বিষয় উপস্থিত হলে মুফতিগন মিমাংসা করতেন। মুসলমানদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও তাদের দৃষ্টি রাখতে হত। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মুফতি পদ উঠে যায়। দিল্লির বাহাদুর শাহের পুত্র ফিরুজ শাহ যখন শাহজালালের দরগা জিয়ারত করতে আসেন তখন এই বংশীয় নজম উদ্দীন মুহাম্মদের কাছে চিঠি লেখেন। মুফতি বংশীয়গণ শ্রীহট্টের বিভিন্ন ফৌজদার হতে মদদ, মা'স ও জায়গীর লাভ করতেন। দরগাহ মহল্লার মুফতিগন হযরত বুরহান উদ্দিন কাত্তালের বংশধর। এই পরিবার ও সিলেটের সম্মানিত পরিবার। এই বংশীয় মুফতি আহজার উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী শ্রীহট্টে ইসলামজ্যোতি ও Shah Jalal and his Khadims লিখে খ্যাতি লাভ করেন।[৫১]

---

৫০. সিলেটে ইসলাম, পৃ- ৫৫-৫৬

৫১. হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ-২৯০

Dhaka University Institutional Repository

১০। হাফিজ মুহাম্মদ জাকারিয়া কোরেশীঃ

দরগা মহল্লা নিবাসী হাজী গিয়াস উদ্দিন ও হেকিম দলিল উদ্দীন তার বংশধর বলে দাবী করেন। জাকারিয়া কুরাইশী সাহাবী ওয়াকিল কুরাইশির বংশধর ছিলেন। এই বংশীয় লোকেরা শ্রীহট্টের মুফতি ও কাজীপদ লাভ করেছিলেন। এঁদের পরে বর্তমান মুফতি বংশীয়রা মুফতি পদ লাভ করেন। জাকারিয়া কুরাইশীর মাজার কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ তীরে পিটুয়া মৌজায় ছিল। উহা আরবী মাজার নামে পরিচিত ছিল। এঁর বংশধরেরা শ্রীহট্ট শহরের মোক্তারখাঁ কিরমানী মহল্লায় (বর্তমান রায় নগরে) বাস করতেন।

এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পরে যারা সিলেটের শাসন কর্তা নিযুক্ত হয়ে আসতেন তাঁরা সর্ব প্রথম হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজারে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং এ মুফতি পরিবারের তৎকালীন প্রধান ব্যাক্তি তাঁর মাথায় পাগড়ী বেঁধে দিতেন। প্রায় শতাব্দী কাল পর্যন্ত এ রেওয়াজ চালু ছিল। এ বংশের মুফতি নূর উদ্দীন ১৮৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে দরগা মহল্লার একটি ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন। এ স্কুলের ব্যয় ভার বহন করার ফলে তিনি তাঁর সমস্থ সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেন। তিনি ডিপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর অত্যন্ত কষ্টে তাকে জীবন যাপন করতে হয়। তারই প্রতিষ্ঠিক স্কুল পরবর্তীতে বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ শিক্ষাবিদদের প্রচেষ্টায় ১৮৮০ সালের জানুয়ারী মাসে ন্যাশনাল হাই স্কুলে পরিনত করা হয়। এ মুফতি পরিবারের মরহুম মুহাম্মদ আহমদ একজন খ্যাতনামা দরবেশ ও আলিম ছিলেন। দ্বীনের খিদমতে নিবেদিত প্রাণ পুরুষ ছিলেন। প্রবাদ রয়েছে তার ইন্তেকালের পরে তাঁর লাশের উপর ছায়া বিস্তারের জন্য একদল চড়ুই পাখি তাঁর আবাসস্থল থেকে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগা পর্যন্ত তাঁর লাশের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল।

১১। সাইয়্যিদ জিয়া উদ্দিনঃ

অপর চারজন কামিল দরবেশ সহ সাইয়্যিদ জিয়া উদ্দীন পুরানলেনে (জিন্দাবাজার) অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন। যেহেতু পাঁচজন সুফী দরবেশ একই স্থানে সমাহিত আছেন, তাই এই স্থানটিকে পীর আতুয়াজন ও বলা হয়। বাংলা আসামের একাধিক স্থানে পাঁচ পীরের মোকাম আছে। মেদেনীপুর, সোনারগাঁও, বর্ধমান এবং সিলেট জেলায় গাবুরটেকিতে পাঁচ পীরের মোকাম দেখা যায়। জনগন পাঁচ পীরের উদ্দেশ্যে শিরনী মানত করে। এই পাঁচজন পীর কে কে ছিলেন, তা সঠিক জানা যায় না।

১২। খাজা নাসির উদ্দীন ওরফে শাহচটঃ

জনশ্রুতি রয়েছে যে, খাজা নাসির উদ্দীন হযরত শাহজালাল (রহ.) এর আদেশে সিলেটে সর্বপ্রথম আযান দেন। তিনি জীবনে কখনও আসরের নামাজ কাযা করেননি। কথিত আছে তাঁরই আজানের চটে রাজা গৌড় গোবিন্দের সাত তালা প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়েছিল। তাঁকে সবাই শাহটচট বলে ডাকত।[৫২]

---

৫২. শ্রীহট্ট জ্যোতি, পৃ- ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

জনশ্রুতি রয়েছে তার দীপ্ত কণ্ঠস্বরের আওয়াজে মনারায়ের প্রাসাদ ধ্বংস হয়। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মত মুজাররদ (অকৃতদার) ছিলেন। সিলেট সরকারী হাইস্কুলের সন্নিহিত পাকা মসজিদের পার্শ্বে তিনি সমাহিত রয়েছেন। জন সমাজে তিনি শাহচট নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই জন্য পূর্বোক্ত মসজিদকে ও শাহচটের মসজিদ বলা হয়। [৫৩]

দরবেশের আজানের মধ্যে কত বড় মহান শক্তি রয়েছে। ৩৬০ আউলিয়ার প্রত্যেকই এভাবে আমাদের জন্য আদর্শ। এসব আদর্শবাদী মহাপুরুষদের পদ ধুলি লাভ করে সিলেটের মাটি ধন্য ও আধ্যাত্মিক রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্টিত।

১৩। হযরত নুরুল্লাহ ওরফে শাহনুরঃ

হযরত নুরুল্লাহ ও শাহজালাল (রহ.) এর অধিকাংশ শিষ্যেই অবিবাহিত জীবন যাপন করেন। তিনি প্রত্যেকটি মানুষের কানে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়াকেই জীবনের ব্রত মনেকরতেন। তিনি বলতে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে না শিখলে অধর্ম দেখা দিতে বাধ্য। পারস্পরিক মর্যাদার ভেতর দিয়েই শান্তি আসে। এজন্যই এক আল্লাহর অধীনে সর্ব মানবের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দেয়ার নাম ইসলাম। এই মহাত্মা শেষ বয়স পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করে ওফাত প্রাপ্ত হন।[৫৪]

বন্দর বাজার মাড়োয়ারী পট্টির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তদীয় পবিত্র মাজার অবস্থিত। কারো কারো মতে তাঁরই আজানের ধ্বনিতে মনারায়ের প্রাসাদ ধ্বংশ হয়। আর এই শাহনুরই শাহচট নামে পরিচিত ছিলেন। স্থানীয় চৌধুরীগণ তাঁর বংশধর।[৫৫] তবে শাহচট (রহ.) এর মাজার যেহেতু সরকারী হাই স্কুলের সন্নিকটে তাই তিনি ভিন্ন দরবেশ বলে মনে হয়।

১৪। শারখ চাবনী পীরঃ

শারখ চাষণী পীরের আসল নাম জানা যায় নাই। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মুর্শিদ ও মামা সৈয়দ আহমদ কবির কর্তৃক প্রদত্ত একমুষ্টি মাটি দিয়ে নিদের্শ দিয়েছিলেন যে দেশের মাটির বর্ণ, স্বাদ ওগন্ধ এরূপ তিনি যেন সেই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এজন্য হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে সঙ্গে এনেছিলেন। তিনিই সিলেটের মাটি পরীক্ষা করে দেখেন যে পবিত্র মক্কার মাটির সঙ্গে রয়েছে হুবহু মিল। অন্যভাবে তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের পর জিহবা দিয়ে সিলেটের মাটি পরীক্ষা করে সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) প্রদত্ত মাটির সঙ্গে তার হুবহু মিল রয়েছে বলে ঘোষণা করেন। এজন্য হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটের মাটিই তার আবাসস্থল বলে ঘোষণা করেন।

তিনি মৃত্তিকা বিদ্যায় পরদর্শী (Soil Science) একজন উচ্চ শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। মক্কাশরীফ থেকেই তিনি শাহজালাল (রহ.) সঙ্গে আসেন। তিনি মাটি জিহবার সাহায্যে পরীক্ষা করতেন বলে তাঁর নাম পড়ে যায় চাবনী পীর। তিনি উচুস্তরের একজন ওলী ছিলেন। শাহজালাল (রহ.) এর অধিকাংশ শিষ্যের মত তিনি ছিলেন মুজাররদ বা অবিবাহিত। সিলেট শহরের উত্তরদিকে গোয়াইপাড়ায় একটি টিলার উপর তাঁর পবিত্র মাজার অবস্থিত।[৫৬]

---

৫৩. সিলেটে ইসলাম পৃ- ৫৮ ৫৪. শ্রীহট্ট জ্যোতি, পৃ- ১৪৫
৫৫. সিলেট ইসলাম, পৃ- ৫৯ ৫৬. শ্রীহট্টে জ্যোতি, পৃ- ১৪৩, ও সিলেটের ইসলাম পৃ- ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১৫। আল্লামা সৈয়দ বদরুদ্দীন উরফে শাহ বদরঃ

(১৪শ শতক) সুফি, মুজাহিদ ও ইসলাম প্রচারক। তিনি শাহ বদর, বদর আউলিয়া ও বদর পীর নামে জনপ্রিয়। শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রায় সকল বৃত্তান্তেই বদরশাহ কর্তৃক চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার এবং তাঁর মাজার থাকার কথা বর্ণনা হয়েছ। অতঃপর বদর শাহ চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে জীন পীরদের আড্ডা ছিল বলে কথিত আছে। তাদের উৎপাতে জন জীবন ছিল অতিষ্ট। বদর শাহ প্রদীপ বা চটিতে আলো জ্বালিয়ে চট্টগ্রাম থেকে তাদেরকে বিতারিভূত করেন। এই চাটি থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি দাবি করা হয়।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহরে সেনাপতি (কদল খান গাজী) ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। বদর শাহ, হাজী খলিল প্রমুখ দরবেশ এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন। চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে বদর শাহের অবদান ই সবার্ধিক। তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত বদরটিলা হাটাজারী উপজেলা, বদরখানি, চকরিয়া উপজেলা, বদরকুয়া কক্সবাজার ও বদর মোকাম (আরাকানের আকিয়াব) এখনও প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়।

মধ্য যুগের কবি দৌলত উজির বাহরাম খা, মোহাম্মদ খা ও মুহাম্মদ মুকিম তাদের কাব্যে চট্টগ্রামের পীর বদর শাহের কথা উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ শতকের ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দীন তালিব ফতীয়াই ইবরিয়া গ্রন্থে চট্টগ্রামে বদরের আস্তান ও কবরের কথা উল্লেখ করেছেন।

চট্টগ্রাম শহরের বদরপট্টীতে তার মাজার আছে।এটি সুলতান আমলে নির্মিত বলে বিশষজ্ঞদের ধারণা । প্রত্যেক বছর ২৯ রমজান তার মাজারে ওরস পালিত হয়। চট্টগ্রাম ও পাশ্ববর্তী এলাকায় বদর পীরের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বিপদে আপদেনদী পারাপারে এমনকি খেলা ধুলায় সাফল্য কামনায় ও লোক বদরপীরকে স্মরণ করে। বাংলার প্রায় সর্বত্র নৌকার মাঝিরা 'বদর' বলে নদী পাড়ি দেয়। তিনি নদীর অভিবক বলে লোকের বিশ্বাস আছে।[৫৭]

তিনি তরফ বিজয়ে সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দীনের সংগী ছিলেন পরবর্তীকালে তিনি করিমগঞ্জ মহকুমায় ইসলাম প্রচার করেন। করিমগঞ্জ মহকুমার বদরপুর রেল ষ্টেশনের নিকটে তার মাজার অবস্থিত। তাঁর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম বদরপুর হয়েছে। এক সময় বদরপুরের নিকটবর্তী বরাক নদী বাকে নৌকা চলাচল বিশেষ দুরীহ ছিল। এ মোর ঘুরতে যেয়ে অনেক নৌকাই নিমজ্জিত হয়। এজন্য বদরপুরের মোড়ে পৌছে নৌকার মাঝিগন শায়খ বদরের নাম স্মরণ করে নানাবিধ মানত করত। এতে তারা ফল লাভ করতো বলে পূর্ব বাংলার সব মাঝি মাল্লারাই তাদের অনুসরন করতে থাকে এবং শাহ বদরের নাম নেয়া মসিদের মধ্যে প্রথা হয়ে দাঁড়ায়।

---

৫৭. বাংলা পিডিয়া খন্ড-১, পৃ- ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত এই শাহ বদরই চট্টগ্রামের বিখ্যাত বদরপীর। চট্টগ্রামের ইতিহাসে জানা যায় যে, চট্টগ্রামের প্রথম মুসলিম বিজেতা কদল খান, গাজীর সঙ্গে বদর পীরের দেখা হয়েছিল। ঐ ঘটনা বাংলার সুলতান ফকর উদ্দীন মোবারক শাহের আমলে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। বদরপুরের শাহ বদরের ঐ সময়ে জীবিত আকয়ে সম্ভাবনা আছে কারণ তিনি শাহজালালের সমসাময়িক। আউলিয়ায়ে কোরামগণ ইসলাম প্রচারে দিক দিগন্তে ভ্রমন করেছেন আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অসম্ভব ও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। চট্টগ্রামেও আরাকানে অনেক স্থলে বদর মোকাম আছে। বিহারে ছোট্ট দরগায় সমাহিত পীর বদর উদ্দীন বদর আলম (মৃত ১৪৪০ খ্রিঃ) এর প্রায় এক শতাব্দী পরের লোক। কাজেই তার পক্ষে ফখর উদ্দীন মোবারক শাহের সময় চট্টগ্রামে আসার সম্ভবনা নাই।

অতএব, শায়খ বদরকে চট্টগ্রামের বদরশাহ এর সঙ্গে অভিন্ন ব্যক্তি হওয়ার পক্ষে ঐতিহাসিক ও প্রমানিক তথ্য জোরালো সমর্থন করে। যদিও এ ব্যাপারে এখন ও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।[৫৮]

১৬। জালালুদ্দীন (কাজী)ঃ

সুফি সাধক। তিনি হযরত শাহজালালের সাথে সিলেট অভিযানে অংশ নেন। ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম কাজী জালালুদ্দীন (রহ.)। সিলেট শহরে ইসলাম প্রচার করেন। সিলেট বিজয়ের পর তিনি সিলেটের কাজী (বিচারক) নিযুক্ত হন। বিদ্যানুরাগী হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল। সিলেটের কাজীটুলায় কাজী দিঘীর অদুরে একটি টিলার উপর তাঁর মাজার রয়েছে।[৫৯]

১৭। কাজী তাজ উদ্দীন ওরফে শাহ তাজ উদ্দীন কোরেশীঃ

তিনি চৌকি পরগনায় অবস্থান করেছিলেন। চৌকি পরগনা, দিনারপুর, কুরশা, বানিয়াচুঙ্গ এবং লংলার অনেক পরিবার তাঁহার বংশধর বলিয়া দাবী করেন। কুরশার খান বাহাদুর আজিজুর রহমান (ডেপুটি কমিশনার) এবং চাউতলিল খান বাহাদুর আলা উদ্দিন এই বংশের লোক।

১৩০৩ ঈসায়ী হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী হিসেবে তরফের রাজা আচাক নারায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। শাহজালাল (রহ.) ছিলেন সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অগ্রদূত। তাজ উদ্দীন কুরাইশী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.) এর বংশধর এবং তিনি ইয়ামনে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা কিয়াম উদ্দীন ছিলেন একজন সুফী দরবেশ।

সিলেট বিজয়ের পর তিনি প্রথমে কাজী এবং পরে 'দীওয়ান' পদে নিয়োগ লাভ করেন। অতঃপর তিনি দিনারপুর (প্রাচীন লাউড় অঞ্চল) সীমান্ত চৌকির প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সেখানে তিনি একটি 'খানকাহ' প্রতিষ্ঠা মসজিদ নির্মাণ ও পুকুর খনন করেন। হবিগঞ্জের বিভিন্ন অংশে তিনি ইসলাম প্রচারে অংশ নেন। তিনি একজন আলিম ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সুফী সাধক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি ধূল চাভলে মৃত্যুর বরণ করেন। সেখানেই তাঁর মাজার রয়েছে।[৬০]

---

৫৮. সিলেটে ইসলাম, পৃ- ৮৬
৫৯. বাংলা পিডিয়া, ৪খ, পৃ- ৩৩
৬০. বাংলা পিডিয়া, খন্ড-৪, পৃ- ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। পীর ইয়েমেনঃ

পীর ইয়েমানি একজন প্রখ্যাত দরবেশ। পীর ইয়েমেনি হিসিনে সমধিক পরিচিত। এই দরবেশের প্রকৃত নাম জানা যায়নি। তিনি, হযরত শেখ মালেক চতুর্দশ শতাব্দীতে ইয়েমেন থেকে দিল্লী হয়ে বাংলায় আসেন। দিল্লি হতে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে হযরত শাহজালাল মুজাররদে (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাথে সিলেট বিজয়ের অংশ গ্রহণ করেন। সিলেট বিজয়ের পর শাহজালাল (রহ.) তাঁকে ইসলাম প্রচারের জন্য ঢাকায় পাঠান। তিনি তার শিষ্য শাহ বলখীকে নিয়ে বর্তমান সচিবালয়ের নিকটস্থ স্থানে একটি খানকাহ স্থাপন করেন। ইসলাম প্রচারে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। পীর ইয়ামনীর মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তার কবরের উপর একটি সমধিসৌধ এবং এর নিকটে নির্মিত হয়েছে দুটি ইমারত ওসমানী উদ্যানের পূর্ব কোনে অবস্থিত।[৬১]

সাইয়্যেদ আহমদ গেছুদরাজ (শাহপীর) ঃ

সাইয়্যেদ আহমদ গেছুদরাজ সিপাহ সালার নাসির উদ্দীনের সাথে তরফ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। প্রবল বিক্রমে সাথে তরফ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। তাহার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়। মস্তকহীন দেহ সিলেটে নিয়ে আসা হয় এবং শাহজালাল (রহ.) এর নিদের্শে তার আস্তান থেকে অর্ধ মাইল দুরে লুতের মাজার নামক স্থানেসমাহিত করা হয়। অনেকের মতে শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) গেছু দরাজের মাতুল ছিলেন তিনি তাকে ত্রিপুরা জেলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠাবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন।

গেছু দরাজের বিচ্ছিন্ন মস্তক তিতাস নদীতে ভাসতে ভাসতে আখাউড়ার নিকটে খড়মপুরে এসে উপস্থিত হয়। চৈতন দাস নামক এক জেলে মস্তকটি প্রাপ্ত হন। পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন। যত্ন সহকারে তিনি মস্তকটি খড়মপুরে সমাহিত করেন। চৈতন দাশের বংশধরেরা খড়মপুরের গেছু দরাজের মাজারের খাদিম। বাংলার সুলতান ৫২ দ্রোনি জমি দরগার হিফাজতের জন্য দান করেন। ত্রিপুরার মহারাজার বিরূদ্ধে স্বত্ব সম্পর্কিত এক মামলায় ত্রিপুরার মহারাজার বিরুদ্ধে স্বত্ব সম্পর্কিত এক মামলায় দরগার খাদিমরা উক্ত দানপত্র আদালতে হাজির করেন।

প্রতি বছর ২৭ শ্রাবন থেকে ১লা ভাদ্র পর্যন্ত খড়মপুর মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। সাইয়্যিদ আহমদ গেছু দরাজ কল্লা শহীদ নামে বেশী পরিচিত।[৬২]

১৯। শাহ সৈয়দ আহমদ কল্লা শহীদ (১৩শ-১৪শ শতক)ঃ

সুফি, মুজাহিদ ইসলাম প্রচার। তিনি শাহপীর গেছুদরাজ নামে ও প্রসিদ্ধ। তার মাথার চুল কল্লা পর্যন্ত লম্বা ছিল বলে তাকে গেছুদরাজ বলা হতো। হযরত শাহজালাল (রহ.) সঙ্গে তিনি সিলেট অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সিলেটের পাশ্বর্তী কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে -

---

৬২. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.), পৃ- ২১৬, ২১৭। ৬১. প্রাগুক্ত - পৃ ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচার কালে শত্রু কর্তৃক তিনি শহীদ হন। তিতাস নদীতে তার খন্ডিত মরদেহ ভক্তরা তার এই মস্তক আখাউড়ার নিকটবর্তী খড়মপুরে দাফন করে। বাংলার সুলতান তার মাজারের হেফাজতের জন্য ৫২ দ্রোন জমি দান করেন। মাজারের পার্শ্বে মসজিদ, মুসাফির খানা ও মাদরাসা আছে। নোয়াখালীর মর্সাদি রেলষ্টেশনের নিকটবর্তী এক দিঘীর পার্শ্বে তার আরেকটি আস্তান আছে। প্রতি বছর ২৭ শ্রাবন থেকে ১লা ভাদ্র পর্যন্ত শাহ পীর কল্লা শহীদের ওরস মোবারক পালিত হয়।[৬৩]

২০। মানিক পীর ও ছোট পীরঃ

তিনি হযরত শাহজালাল (র.) ও শাহজাদা আলীর মত আজীবন অকৃতদার ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী এখনও বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত। তাঁর উদ্দেশ্যে এবং তার মনতুষ্টির জন্য এখনও বাংলাদেশের অশিক্ষিত জন সমাজে নানাবিধ মানত করা হয়। বিশেষতঃ বিপদে আপদে তার নাম স্মরণ করে নান লোক উদ্ধার পেয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তাঁর মাযার সিলেটের যে টিলায় অবস্থিত তা মানিক পীরের টিলা নামে পরিচিত। এখানে তার সঙ্গীয় ছোট পীরের ও মাজার রয়েছে।

২১। হাজী দরিয়া ও হাজী খলিলঃ

হাজী দরিয়া আরব দেশ থেকে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অনুগামী হয়েছিলেন। তাঁর মাজারের দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় আবেষ্টনীতে হাজী ইউসুফের মাজারের পার্শ্বেই হাজী দরিয়ার মাজার। তিনি খুব সম্ভত চির কুমার ছিলেন।

হাজী খলিল তিনি ও আরবদেশ থেকে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গি হন। তাঁর বংশধর সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায় না। সম্ভবত তিনি হাজী দরিয়া, হাজী খলিল এবং শাহজাদা শায়খ আলীর ন্যায় অকৃতদার ছিলেন। এই চারজনেই শাহজালাল (রহ.) এর মাজারের অতি সন্নিকটে সমাহিত হয়েছেন। হাজী দরিয়ার ঠিক পশ্চিম দিকের মাজারটি হাজী খলিলের মাজার।[৬৪]

২২। সৈয়দ আলা উদ্দিন ঃ

ইনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তাজ উদ্দীন, বাহা উদ্দীন, রুকন উদ্দীন ও শামস উদ্দিন নামে তার চার পুত্র ছিলেন। তাজ উদ্দীন আওরঙ্গপুর পরগনায় গহরপুর গ্রামে চলে যান। উক্ত পরগনায় তার মাজার বর্তমান আছে। বাহা উদ্দিন আওরঙ্গপুরের নিকটবর্তী সৈয়দপুরে কিছু দিন বাস করে ভাদেশ্বর চলে যান ও তথায় মৃত্যু কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তাঁকে ভাদেশ্বরই সমাহিত করা হয়। সৈয়দ শামস উদ্দীনের বংশধরগন সৈয়দপুরে অবস্থান করেন। আওরঙ্গপুর পরগনার সৈয়দগণ শাহ তাজ উদ্দীনের বংশধর। রুকন উদ্দীন মৌলভী বাজার চলে যান।

২৩। শাহ আলা উদ্দিনঃ

বালাগঞ্জ থানার গহরপুর পরগনার আলাপুর গ্রামে অবস্থান করেন। এই বংশে শাহ আলী নামে এক বিখ্যাত দরবেশের জন্ম হয়। এখনও আলাপুরে তাঁর মাজার দেখতে পাওয়া যায়। তিনি আহমদ চরমপুষ বাগদাদী নামে এক দরবেশের সহিত তার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। আহমদ চরমপুর বিহারের আম্বাইর নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি বিখ্যাত দরবেশ ও কবি ছিলেন ১৩৬৪ খ্রিষ্টব্দে তাঁর ওফাত হয়। তিনি বিহারের বিখ্যাত দরবেশ শরফুদ্দীন সম্পর্কিত ভ্রাতা ছিলেন। শাহ আলা উদ্দীনের বংশধর গন এখনও আলাপুরে বাস করছেন।[৬৫]

---

৬৩. বাংলা পিডিয়া, খন্ড-৯, পৃ- ৩২০

৬৪. হযরত শাহজালাল কুনিয়াজী ৯রহ.) পৃ- ২০৮ ৬৫. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

২৪। শেখ গরীব

তিনি বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন ও গরীব আফগানী নামেও খ্যাত। তিনি উচ্চ শিক্ষা ও ধর্ম জ্ঞান লাভ করে শেখ উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত শাহজালালের সঙ্গে দিল্লী নগরীতে তাঁর মোলাকাত হয়। তিনি হযরতের মুরিদ হয়ে তার অনুগামী হন। শ্রীহট্ট পৌছার পর তাঁর পীরের আদেশে তিনি বালাগঞ্জ থানার বানাইয়া হাওরের দক্ষিণ পূর্ব পারে গাবুর টেকিতে হুজরা নির্মাণ করেন। তার সঙ্গে তাঁর চারজন সঙ্গী আউলিয়া ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন।

শেখ গাবরু ও তার শিষ্যদের মাজার পাঁচ পীরের মোকাম নামে পরিচিত। গাবুরটেকি নৌকা তৈয়ারীর কারখানার জন্য বিখ্যাত ছিল। কলিকাতা প্রবাসী বিখ্যাত আঁরিম হাফিজ হাতিম এই বংশে জন্মগ্রহন করেন। তিনি কলুটুলা মসজিদের স্বনামধন্য ইমা ছিলেন। শ্রীহট্টের দানবীর বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতি মৌলভী আব্দুল করিম (বি-এ) (ইন্সপেক্টর অব স্কুলস) হাফিজ হাতিম সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুপরিচিত সমাজ নেতা মুহাম্মদ মোর্তাজা চৌধুরী এ বংশের লোক ছিলেন।

২৫। জালালুদ্দীন ওরফে শাহজালালঃ

বালাগঞ্জ থানার কুরুয়া পরগনার খুজগীপুর মৌজায় তার মাজার রয়েছে। তার বংশধরের ঐ মৌজায় বাস করছেন। কথিত আছে যে তিনি জনৈক ব্রাম্মনের খঞ্জকন্যাকে আরোগ্য করে বিবাহ করেছিলেন।

২৬। মাখদুম রহিম উদ্দিন ও শাহ কামাল ইয়ামনী ওরফে শাহ পাহলোয়ানঃ

নিজ জালালপুরে তাঁর মাজার রয়েছে। কথিত আছে, তিনি উক্ত গ্রামে তাঁর আসা (হাতের লাঠি) স্থাপনকরেন ও ঐ স্থানে একটি বটবৃক্ষের উদ্ভব হয়। জালালপুরের দরগার ফকিরগণ এই বট গাছের পাতা সংগ্রহ পূর্বক স্থানে স্থানে গমন করে তা বিতরণ করতেন। ওলীর হস্তে রোপিত বৃক্ষের পাতা সাদরে গৃহীত হত। তথাকার চৌধুরীগণ তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন। সিলেট সদর উপজেলার জালালপুরের মোকাম দুয়ার মৌজায় তাঁর মাজার রয়েছে।

হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী (রহ.) অন্যতম সফরসঙ্গী হযরত শাহ কামাল (রহ.) যিনি সিলেটের জালালপুরে সমাহিত হন তাঁরই বংশধর হচ্ছেন আল্লামা ফুলতলী পীর ছাহেব কিবলাহ (১৯১৩-২০০৮ঈ.) ৩৬০ আউলিয়ার অধঃস্তন পুরুষ হিসেবে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি। সিলেট জেলাধীন জকিগঞ্জ উপজেলার ফুলতলী গ্রামে এক ধর্মপ্রাণ সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯১৩ সালে মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মুফতি আব্দুল মজিদ নকসবন্দী মুজাদ্দেদী তদনীন্তন আসামের একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। বহু জটিল বিষয়ে তিনি লিখিত ফতোয়া দিতেন। সে হিসেবে তিনি একজন খ্যাতনামা মুফতি ছিলেন। তিনি সারা জীবন মাদরাসা শিক্ষাদান করেন এবং প্রথম শ্রেণীর একজন উস্তাদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। মাওলানা ফুলতলীর নানা বাদে দেওরাইল পরগনার ১নং বাহাদুরখাঁ তালুকের স্বনামধন্য ব্যক্তি আহসান রাজা চৌধুরী। তিনির উর্ধ্বতন বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল মজিদ বিন মোহাম্মদ হিরন বিন মোহাম্মদ দানেশ বিন মোহাম্মদ শাহ আলা বখস (রহ.) হযরত শাহ কামাল (রহ.) এর বংশধর।[৬৬] পূর্বেই বলা হয়েছে শাহ কামাল (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.) সহচরগণের একজন যিনি জালালপুরে মোকাম দুয়ার মৌজায় সমাহিত আছেন।

মাওলানা ফুলতলী প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে ফুলতলী মাদরাসায় সম্পন্ন করে রাঙ্গাউটি মাদরাসা ও পরে বদরপুর মাদরাসায় সিনিয়র কোর্স শেষ করার পর হিন্দুস্তানের রামপুর আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। আলিয়া মাদরাসার ফনুনাত শেষ করে হাদিস পড়ার জন্য মাতলাউল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন ও ১৩৫৫ হি. সনে সনদ লাভ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হযরত খলিলুল্লাহ রামপুরী ও হযরত মাওলানা ওয়াজিহ উদ্দিন রামপুরী (রহ.) তাঁর হাদিসের উস্তাদ। এছাড়াও তিনি ইলমে তাফসীর ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন।

রামপুর যাওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর শ্বশুর ও উস্তাদ মাওলানা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (রহ.) এর নিকট হতে পাঁচ ত্বরীকার খেলাফত লাভ করেন ১৩৩৯ বাংলায়। তাঁর ত্বরিকতের শাজরাহ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

রামপুর অবস্থানকালে তাঁর মুর্শিদের অনুমতিক্রমে মাওলানা গোলাম মহী উদ্দীন (রহ.)-এর নিকট বাইয়াত হন এবং চিশতিয়া নেজামিয়ার খেলাফত লাভ করেন। উল্লেখ্য তিনি উপমহাদেশে শায়খুল কুররা আহমদ হেজাজী (রহ.) এর একমাত্র ছাত্র ছিলেন। তিন ছিলছিলায় তাঁর কেরাতের সনদ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে।

বদরপুর আলিয়া মাদরাসায় প্রথম মুহাদ্দিস হিসেবে ১৯৪৪ ইং হতে ১৯৫০ইং পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৩ ঈ. হতে ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ী আলিয়া মাদরাসায় ভাইস প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিছ হিসেবে অধ্যাপনা কালীন সময়েও ইলমে ক্বেরাতের পাঁচ বছর ব্যাপী খেদমত করেন। আম হেদায়াতের জন্য তিনি মৃত্যু অবধি দেশ-দেশান্তরে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ব্যস্ত থাকেন।

অতঃপর সৎপুর কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জের ইছামতি কামিল মাদরাসায় বুখারী শরীফের অধ্যাপনা করতেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত 'বাদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসায়' সপ্তাহে দু'দিন শনিবার ও রবিবার বুখারী শরীফের দরস দিতেন।

১৯৪০ সালে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাষ্ট নামে সর্ব প্রথম বোর্ড গঠন করেন। প্রত্যেক রামাদ্বান মাসে ইহার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। দেশে বিদেশেও উক্ত ট্রাষ্টের অনেক শাখা রয়েছে। তিনি একজন সফল সংগঠক, ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি যে দেশ ও জাতির খেদমতে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তার উপর ব্যাপক গবেষণা করে ব্রিটেনস্থ 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এডওয়ার্ড' (বি.এন.এস.এ) ১৯৯৯ ঈ. তাঁকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মনোনীত করে 'শামছুল উলামা' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে হীরা খচিত একটি ক্রেষ্ট প্রদান করে।

---

৬৬. জালালাবাদের কথা পৃ- ৩৮৩, ৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় ও জাতীয় যে কোন সংকট মুহূর্তে তিনি সিংহ পুরুষের ভূমিকা পালন করতেন। জীবন সায়াহ্নে মাদরাসা শিক্ষার এতিহ্য ও স্বাতন্ত্রবোধ রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর পূর্বসুরীদের ন্যায় 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে ঢাকা অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট সাত পুত্রের মধ্যে সবাই মুহাদ্দিস, হাফিজ, মুফতি সহ উচ্চতর ডিগ্রীধারী ও দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত।

ইন্তেকাল ঃ রাহবারে দ্বীন, মুর্শিদে বরহক, শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী পীর ছাহেব কিবলা ফুলতলী (রহ.) বিগত ২০০৮ ঈসায়ীর ১৬ই জানুয়ারী ইন্তেকাল করে দিদারে এলাহীতে চলে যান। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর বড় ছাহেবজাদা আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী (বর্তমান স্থলাভিষিক্ত পীর ছাহেব) তাঁর নামাজে জানাযার ইমামতি করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

২৭। মাখদুম জাফর গজনভীঃ

তিনি গজনভীর অধিবাসী ছিলেন। গোদারাইল পরগনার মুহাম্মদপুরে তাঁর মাজার আছে। তার বংশধরদের একজন জৈন্তা পরগনার অনেক লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিকরেন, তিনি অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে জৈন্তার রাজার ভাগিনীকে বিবাহ করেন।

২৮। শাহ সুলতানঃ

তিনি বালাগঞ্জ থানার গহরপুর পরগনার সুলতান পুরে অবস্থান করতেন। সুলতানপুরের চৌধুরী পরিবার তাঁর বংশধর। খান বাহাদুর দেওয়ান আব্দুর রহিম চৌধুরী। মরহুম শাহ সুলতানের দৌহিত্রের বংশধর ছিলেন। দেওয়ান আব্দুর রহীম চৌধুরীর দেওয়ান আব্দুর রব পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন।[৬৭]

২৯। শায়খ ফতেহ মোহাম্মদ দেওয়ানঃ

তিনি ছিলেন মক্কা শরীফের শায়খ বুরহান উদ্দীন ফারুকী কোরেশীর পুত্র এ শয়াখ করম মুহাম্মদের ভাই। শেখ পাড়া মহল্লায় তার মাজার অবস্থিত।

৩০। শায়খ হাজী গাজীঃ

কসবে সিলেটের ঈদগাহ ময়দানের পূর্বে হাজী গাজীর মাজার অবস্থিত। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তাঁকে এখন ও মাঝে মাঝে দেখা যায়। তবে তার বংশধরদের সম্বন্ধে কোন কিছুই জানা যায় না।

৩০। সৈয়দ হামজাঃ সৈয়দ হামজার বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ ময়মনসিংহ জেলার সিকন্দর নগরে গমন করেন। ঝরনার পারের সৈয়দ পরিবার তাঁর বংশধর। তাঁর বংশেরই এক উত্তর পুরুষের সৈয়দ লালের জন্ম। তিনি একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিরেন। মৌলভী বাজারে বাস করতেন।

---

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১

Dhaka University Institutional Repository

৩২। জাকারিয়া আরবী ও জাকারিয়া কুরাইশিঃ

উভয়েই এক ব্যক্তি এ দু'টো নামই একজনের বলে মনে হয়। দরগাহ মহল্লার হাজী গিয়াস উদ্দিন এবং হাকিম দলিল উদ্দীন তাঁর বংশধর। কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ তীরে পিটুয়া মৌজায় তার মাজার অবস্থিত।

৩৩। শায়খ সুলাইমান করনী কুরাইশীঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গীর আউলিয়াদের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর ওলী আল্লাহ ছিলেন। এজন্য সিলেট সদর তথা সমগ্র জেলায় তাঁর বংশধরদের বিশেষ সম্মান ছিল। তাঁর বংশধরগণ মুতিয়ার গাঁও নিজ করনসীতে বাস করতেন। তাদের মধ্যে মুতিয়ার গাও শাখার আব্দুর আহাদ চৌধুরী খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি সিলেট জেলা বারের একজন খ্যাতনামা সদস্য ছিলেন এবং বেশ কিছু দিন সিলেটের সরকারী উকিল ও ছিলেন।

৩৪। হযরত আবু তুরাবঃ

তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে সিলেট এসেছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)এর নির্দেশে তিনিই দিল্লীর শাহী জিন মহলের তালা খুলে জিনদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সিলেট শহরে ইসলাম প্রচার করেন। সেখানেই সিলেট বন্দর বাজারের দক্ষিণ দিকে সিলেট জেলার কাছে তার মাজার অবস্থিত। তাঁর মাজারের পার্শ্বে একটা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

৩৫। শায়খ নিজামুদ্দীন ওসমানীঃ

শায়খ নিজামুদ্দীন ওসমানী বালাগঞ্জের দয়ামীরের বসতি স্থাপন করেন। দয়ামীরে তাঁর বংশধরগন এখনও আছেন। তার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক মরহুম জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী এবং সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এম.আর ওসমানী সকলের কাছেই পরিচিত।

৩৬। শায়খ পাতাঃ

সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাদেশ্বরে শায়খ পাতার মাযার বিদ্যমান রয়েছে। তার মাজার সংলগ্ন অপর দুটো মাজারের মধ্যে শায়খ গনি মাহমুদের মাজার বলে অনেকের ধারণা। শায়খ পাতা সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী এখনও প্রচলিত রয়েছে। তিনি সর্ব সাধারণ থেকে দুরে সরে থাকতে ভাল বাসতেন।

৩৭। বু আলী দওলতঃ

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অনুসঙ্গী এ দরবেশের মাজার সদর থানার ছনখাইর পরগনায় অবস্থিত। এজন্য স্থানের নাম বু আলী দওলত রাখা হয়েছিল। কালে তা পরিবর্তিত হয়ে বিবিদইলে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। শাহ আলা উদ্দীন ও কামাল উদ্দিনঃ

এরা শ্রীহট্ট শহরের পাচ মাইল পশ্চিমে মইয়ার চরে অবস্থান করেন ও আলাদী শাহ ও কাঙ্গালী শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। মইয়ারচর তখণ সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে নদী ঐ স্থান থেকে এক মাইল দূরে সরে গেছে। শাহ কামাল উদ্দিন একজন স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মহিলাকে (যিনি সর্ব সাধারণের কাছে মই) বিবাহ করেন।

উভয় দরবেশের বংশধরেরা এই অঞ্চলে বসবাস করছেন। শাহ কামাল উদ্দীন রত্না নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। ঐ স্থান প্রথমে শাহ পাড়া ও পরে শাহার পাড়া নামে পরিচিত হয়। জালাল উদ্দীন, মোয়াজ্জেম উদ্দীন ও জামাল উদ্দিন তাঁর তিনপুত্র ছিলেন। তাঁদের দুইজনের বংধরগন জীবিত আছেন।[৬৮]

৩৯। সৈয়দ তাজ উদ্দীনঃ

তাঁর মাজার আওরঙ্গপুরে অবস্থিত। এবংশেই সৈয়দ হাসন রেজার জন্ম। তিনি ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের সূচনায় তাদের সঙ্গে নানা খন্ড যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনা দলকে বার বার প্রতিহত করেছিলেন। অবশেষে তৎকালীন কোম্পানী সরকারের সিলেটের ফৌজদার বাধ্য হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য প্রেরণ করে তাকে অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তাঁর কবর আওরঙ্গপুর পরগনার গজিঝা মৌজায় অবস্থিত। এবংশেই জন্মগ্রহণ করেন সৈয়দ আফরোজ বখত ও সৈয়দ ইয়াওর বখত। এদের প্রতাপে এক সময় সে অঞ্চলের লোকেরা সর্বদাই ভয়ে কম্পমান ছিল। এ উভয় সহোদর আবার সমাজ হিতৈষী ছিলেন। মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে উভয় ভাই প্রচুর দান করেছেন। এর মধ্যে স্কুল ও খারেজী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

৪০। হযরত শায়খ খিজির কুরাইশীঃ

তিনি আরবের ইয়ামন থেকে সিলেটে আসেন। তার মাযার পাঠান টোলায় অবস্থিত। এ বংশের কৃতি সন্তান মৌলভী আব্দুল করিম অবিভক্ত বাংলাদেশের (ইন্সপেক্টর অব স্কুলস- স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর ছিলেন। তারই আপন ভ্রাতা মরহুম আব্দুল হামিদ আসাম ও পূর্ব বঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন।

৪১। শায়খ সুলতানঃ

সিলেট শহরের নিকট জালালপুর ইউনিয়নের একি বড় চকস্থিত গ্রামের মসজিদের উত্তর পূর্ব পার্শ্বে শাহ সুলতানের মাজার অবস্থিত। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি ও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে আগত ৩৬০ আউলিযার অন্যতম। বহুদিন যাবত তার মাজারের কোন যত্ন নেয়া হয়নি। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে এ মসজিদে নামাজ আদায়কারী মুসল্লিরা দেখতে পেলেন দুটো বড়ো বাঘ সেখানে সেজদায় পড়ে থাকে। দুটো সাফ, দুটো কাক ও দুটো কবোতর ও সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা করত। এ সাপ বা কাক কারো কোন অনিষ্ট করেনি। কাকদের আহার দিলে তা গ্রহণ করে চলে যেতো। সাপেরা রাত দিন মসজিদ প্রাঙ্গনে পাহাড়া দিত, তবে কাউকে দংশন করত না। একবার মসজিদ প্রাঙ্গনের দেওয়াল গাঁথার জন্য মাটি খুড়া হলে মাটির নীচথেকে একটা গ্লাসের মধ্যে একখানা মানুষের হাত পাওয়া যায়।

---

৬৮. প্রাগুক্ত পৃ- ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় উলামার নির্দেশে তা আবার যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয়। এতে দরবেশের প্রতি স্থানীয় জনগণের শ্রদ্ধা আর বৃদ্ধি পায়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, শাহ্ সুলতান সাহেবের একজন পুত্র ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শাহ জঙ্গী। শাহজঙ্গীর পুত্র শাহনকী এবং তার তিনপুত্র শাহ লাল মুহাম্মদ, নাসির মুহাম্মদ ও মঞ্জুর মুহাম্মদ। তবে তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে কোথায় মিলিত হয়েছিলেন এবং কোথায় তার নিবাস ছিল, তা এখনও আবিস্কার করা যায়নি।

৪২। শায়খ চাম্পা ও শায়খ রাঙ্গাঃ

তাঁদের সম্বন্ধে কিংবদন্তী রয়েছে যে তারা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গেই আগমন করেছিলেন। শায়খ চাম্পা গোলাপগঞ্জ থানার ভাদেশ্বরের নিকটবর্তী কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত মীরগঞ্জের শেখপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচার করেন। তার নামানুসারেই সেখপুর মৌজার নামকরণ হয়েছে। তাঁর মাজার শেখপুর মৌজায় বিদ্যমান। তবে তা কুশিয়ারা নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

শায়খ রাঙ্গা ফেঞ্চুগঞ্জ থানার অন্তর্গত ঘিলাছড়াতে যেয়ে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেন। ঘিলাছড়াতে তাঁর মাজার রয়েছে। শায়খ চাম্পার নবম পুরুষে জন্ম নিয়েছে দুত মুহাম্মদের। তিনি মুঘলদের নিকট থেকে চৌধুরী খেতাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ভাদেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।১৯৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তার বংশের ৭টি তালুক বন্দোবস্ত করেন। এ বংশের মধ্যে খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন চৌধুরী প্রেসিডেন্ট মেজিস্ট্রেট ছিলেন। অপর শাখায় খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহমুদ মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা মাটিস্ট্রেট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে পুর্ববঙগ্ সরকারের ওয়কফ কমিশনার বোর্ড অব রেভন্যুর মেম্বার ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। এ বংশের লোকেরা প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষিত হয়ে আসাম ও বঙ্গদেশের সরকারী চাকুরীতে রত ছিলেন এবং এখনও রয়েছেন।[৬৯]

---

৬৯. সিলেটে ইসলাম, পৃ- ৬৫, ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. সিকান্দর খান গাজী (রহ.)ঃ

স্ট্যাপলটানের মতে তিনি বলবন রাজা বংশীয় সুলতান শামস উদ্দীন ফিরুজ শাহের ভাগিনেয় বাহার ইতিসাম সিকন্দর সানী। তাঁর সমাধি সপ্তগ্রামে অবস্থিত। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা তার সঙ্গে একমত নন। কাজেই সিকান্দর খান গাজীর সঠিক পরিচয় অজ্ঞাত।[৭০]

কথিত আছে তিনিই প্রথম সিলেট অভিযান করেন। গাজী সাহেবের নাম শেখ সিকান্দর। চৌদ্দ বৎসর যুদ্ধ করে তিনি লাউড় রাজ্য পর্যন্ত অধিকার করে (সিলেটের) গৌড় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলে গৌড়ের রাজা গোবিন্দ দিনার পুরের চৌকি নামক স্থানে আক্রমণ করেন এবং পরাজয়ের মুখে গোবিন্দ অগ্নিবান প্রয়োগ করতে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন। যুদ্ধের এই পদ্ধতির জন্য সিকান্দর গাজী পূর্ব হতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তাঁকে পশ্চাদপদ করে ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে এসে শিবির স্থাপন করতে হয়। সিকন্দর গাজী দূত মারফত খবর দিয়ে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে আরও সাহায্য প্রার্থী হয়ে সুলতানের নিকট আবেদন করলে সৈয়দ নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে এক বাহিনী তার সঙ্গে যোগদান করে। হযরত শাহজালাল (রহ.) ৩৬০ আউলিয়াসহ তার সঙ্গে মিলিত হন।

অতঃপর এই মিলিত বাহিনীর সহায়তায় গোবিন্দের রাজত্বের পতন হলে সিকান্দর গাজী সিলেটের প্রথম মুসিলম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।[৭১] নৌকাডুবির ফলে সুরমা নদীতে তাঁর সলিল সমাধি হয় বলে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। সিকন্দর খান গাজী (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.) সোহবতে থেকে ওলিয়ে কামিল এর পর্যায়ে গন্য হওয়ার শাহ সিকন্দর নামে অভিহিত হন।

ফিরোজ শাহ দেহলভীর ভাগিনেয় সেনাপতি সিকান্দর গাজীর মাজার হবিগঞ্জ জেলার পূর্ব অঞ্চলে বিশগাঁওয়ে (প্রকাশিত গাজীপুর) অবস্থিত বলে অনেকের ধারণা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণ মাজারটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে দেখে থাকে।

৪৪. শায়খ সিকান্দর ঃ

ছনখাইড় পরগনার অন্তর্গত লালাবাজারের নিকটবর্তী শাহ সিকান্দর গ্রামে তাঁর মাজার অবস্থিত। মাযারের সন্নিকটে তাঁর পুত্র শাহগাজী সমাহিত রয়েছে। তাঁর নামানুসারেই এ মৌজার নামকরণ করা হয়েছে।

---

৭০. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ২০।
৭১. হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ- ২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. শাহ সিকান্দরঃ

সিকান্দরপুর পরগণার পশ্চিম গাঁয়ে অবস্থিত। তাঁর সম্মানার্থে তিনটি গ্রাম নিয়ে তাঁরই নামানুসারে সিকন্দরপুর পরগণা। তাঁর বংশধরেরা এখনও উত্তর পশ্চিম গায়ে বাস করছেন। উক্ত গ্রামের চৌধুরী পরিবার তাঁর বংশদ্ভোত বলে দাবী করেন।

৪৬. শায়খ মালুম (শাহ মালুম)ঃ

ফেঞ্চুগঞ্জ রেল স্টেশনের পূর্ব দিকে টিলার উপর রয়েছে এই আউলিয়ার মাজার। ১৯১২-১৯১৫ঈ. এর মধ্যে সিলেট কুলাউড়া রেললাইন স্থাপন করা হয়।[৭২] এই সময়সীমার মধ্যেই ফেঞ্চুগঞ্জ রেলওয়ে ব্রীজ স্থাপিত হয়। এই রেলওয়ে ব্রীজটির ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন কাসিম আলী খান নামক একজন পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ার। কথিত আছে ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার সংলগ্ন কুশিয়ারা নদীর উপরে এই ব্রীজটি প্রথম দিকে টিকানো সম্ভব হতোনা। কাজ সমাপ্ত হবার পূর্বেই ভেঙ্গে পড়ত। বার বার ইঞ্জনিয়ার সাহেব বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় তিনির পীর ও মুর্শিদের দোয়া ও ইজাজত লাভের লক্ষ্যে তিনি বাগদাদ চলে যান। সেখানে পৌছার কিছু দিন পূর্বে তাঁর পীর ও মুর্শিদ ইন্তিকাল বরন করেন। তখন তারই সুযোগ্য সাহেবজাদা ওলীয়ে কামিল শায়খ সাইয়্যিদ তাজ মোহাম্মদ বোগদাদী (জ.১২৪৩ হি.) সাহেবকে নিয়ে যেতে তাঁর ভাই সকল তাঁকে পরামর্শ দিলেন। উল্লেখ্য তিনি বংশের দিক দিয়ে হযরত গাওছুল আজম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর মাতা উম্মুল খায়ের ফাতিমা বিনতে আবু আব্দুল্লাহ ছাওমায়ী আল হোসাইনীর (রহ.) এবং 'সাইয়্যিদুত ত্বায়িফা' জুনাইদে বোগদাদী (রহ.) এর অধঃস্তন পুরুষ। একজন কামিল বুযুর্গ ছিলেন আল্লামা শায়খ সাইয়্যিদ তাজ মোহাম্মদ বোগদাদী (রহ.)। তার পিতার নাম সাইয়্যিদ আবু আহমদ বোগদাদী (রহ.)। এই পরিবারের সবাই বড় পীর দস্তগীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর মাজার শরীফ সংলগ্ন শায়খ মহল্লায় বসবাস করে আসছেন ও খাদিম পরিবার হিসেবে খ্যাত। যাকে এখনও "বাবুশ শায়খ মহল্লাহ" বলা হয়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব শায়খ সাহবেক নিয়ে আসার পর তিনি ফেঞ্চুগঞ্জের রেল ষ্টেশন সংলগ্ন পূর্ব দিকের টিলায় অবস্থান নেন এবং ইস্তেখারা দ্বারা জবাব দেন এখানে শায়খুল মাশাইখ শাহজালাল (রহ.) এর একজন সঙ্গী একজন ওলী সমাহিত আছেন তাঁর নাম 'শায়খ মালুম'। তার সম্মানার্থে রেলওয়ে বিভাগ যদি একটি ষ্টেশন নির্মান ও মাজার শরীফ রক্ষণাবেক্ষণ করেন তবে ফেঞ্চুগঞ্জ রেলওয়ে ব্রীজটি অক্ষুন্ন থাকবে কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হবে না। তারই কথা মোতাবেক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব স্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেন শীঘ্রই ফেঞ্চুগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপন এবং মাজারটি পাকা করণ করা হয়। ফেঞ্চুগঞ্জ রেলওয়ে ব্রীজটির ও সিলেট-কুলাউড়া লাইনের কাজ সম্পন্ন হলেও কেউ ট্রেনে উঠার সাহস করেনি, পূর্বে ব্রীজটি বার বার ভেঙ্গে যাওয়ার আতঙ্কে। পরিশেষে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁকে নিয়ে সর্ব প্রথম সিলেট থেকে কুলাউড়া ট্রেনযোগে তিনবার যাতায়াত করেন সে অবধি আজ পর্যন্ত ব্রীজ ও সিলেট - কুলাউড়া রেল লাইনের কোন রূপ উল্লেখযোগ্য ক্ষতি বা এক্সিডেন্ট হয়নি। এই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কবর হযরত শাহজালাল (রহ.) দরগা শরীফে রয়েছে।

---

৭২. বাংলা পিডিয়া, ৯খ, পৃ- ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ সাইয়্যিদ তাজ মোহাম্মদ বোগদাদী (রহ.) ইসলাম প্রচার ও প্রসার এবং খিদমতে খলকের লক্ষ্যে বালাগঞ্জ উপজেলার মুসলিমাবাদ প্রকাশিত ভেকাপুর গ্রামে পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর থেকে অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুদাল আগুন দ্বারা জালিয়ে খুব বেশি লাল করতঃ তিনি দোয়া কালাম পড়ে ফুঁক দিয়ে হাত দ্বারা এতে সজোরে থাবা মারতেন (আঘাত করতেন)। আগুনের লেলিহান শক্তি তাঁর মাথার উপর দিয়ে চলে যেত কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁর হাতের একটুও লোম পর্যন্ত জ্বলত বা পুড়তনা। তারপর ঐ হাত দ্বারা দুরারোগ্য ব্যক্তিদের মাছেহ করে দিলে সাথে সাথে রোগী আরোগ্য লাভ করতেন। মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হতো। প্রত্যক্ষদর্শী অনেকে এসব ঘটনা আমার নিকটে বলেছেন। যার বাস্তব প্রমাণ এখনও লোকমুখে শোনা যায়। ফলে তিনি 'কুদালী পীর' বলে খ্যাতি লাভ করেন। পীর সাহেবের ইন্তেকালের ৪০দিন পর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সময় থেকে নিয়ে ফজরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত কবর থেকে জিকিরের আওয়াজ শুনা যেত বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত রয়েছে। এর প্রমাণও মওজুদ আছে। 'কাশফে কবর' এ তাঁর খুব বেশী সুখ্যাতি ছিল।

১২৪৪ বাংলার ভাদ্র মাসের ১২ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন। তার ওসিয়ত মোতাবেক স্থানীয় চেলারচক ময়দান টিলায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।তাঁর চার ছেলে (১) সৈয়দ চেরাগ বোগদাদী (মৃ.১৩৭৪ বাংলা) (২) পীরে কামিল মাওলানা হাজী সৈয়দ ইলিয়াছ বোগদাদী (মৃ. ১৯৯০ঈ.) (৩) সৈয়দ ছিফত আলী বোগদাদী (মৃ. ১৯৭৪) ও (৪) হাজী সৈয়দ ঈমানী বোগদাদী (মৃ. ২০০৩ঈ.) এ অভিসন্দর্ভ প্রণেতা সৈয়দ শহীদ আহমদ বোগদাদী মরহুম সৈয়দ ছিফত আলী বোগদাদীর কনিষ্ট পুত্র।

৪৭. শায়খ কামাল (শাহ কামাল)

শায়খ কামাল সুনামগঞ্জের আতুয়াজান পরগনায় ইসলাম প্রচার করেন। তিলক শাহার পাড়া গ্রামে তাঁর মাজার বর্তমান। তিনি মুফতিদের পূর্ব পুরুষ খাজা বুরহান উদ্দীন কাত্তালের (৫০) পৌত্র ও শায়খ জালালুদ্দীন (রহ.) পুত্র। শাহার পাড়ায় ও শ্রীহট্টে শহরের দরগা মহল্লায় তাঁর বংশধর আছেন। শাহ কামালের পাঁচ পুত্র ছিলেন। তাঁর অন্যতম পুত্র মাওলানা জিয়া উদ্দিন বিখ্যাত আলিম ছিলেন। তিনি দরগাহ মহল্লায় একটি মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান্যের সময় এ মাদরাসাটির অত্যন্ত সুখ্যাতি ছিল। এই মাদরাসার জন্য অনেক ভুমি জায়গীর ছিল। মাদরাসাটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।[৭৩]

৪৮. শায়খ আরিফিনঃ (শাহ-ই-আরফীন) ঃ

তরফ বিজয়ের সময় শায়খ আরিফীন সৈয়দ নাসির উদ্দীন লস্কর সিপাহ সালারের সঙ্গী ছিলেন। তরফ বিজয়ের পরে তিনি লাউড় পরগণায় গমণ করেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচারে নিবিষ্ট হন। সে অঞ্চলে তার প্রতি জনসাধারণের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন খাসিয়া পাহাড়রের মধ্যে তাঁর ব্যবহৃত জায়নামাজ, কুয়ো প্রভৃতি এখনও বর্তমান রয়েছে। সে কুয়োর সঙ্গে নাকি আব-ইজম-জামের যোগ ছিল। তিনি সেই জমজমের পানি দিয়ে ওজু করতেন। তাঁর মাজার লাউড় পাহাড়ে অবস্থিত।[৭৪]

৪৯. দাওর বখশ খতিবঃ

আতুয়াজান পরগনায় তিনি ইসলাম প্রচার করেন। দাওরাই গ্রামে তাঁর মাজার অবস্থিত। তিনি এক হিন্দু মহিলাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিয়ে করেন। তাঁর বংশধরদের কেউ কেউ দাওরাই অঞ্চলে বসবাস করছে।[৭৫]

---

৭৩. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৩৩

৭৪. সিলেটে ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ- ৬৮।

৭৫. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.), পৃ- ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫০. শায়খ কালু ওরফে পীর শাহ্ কালুঃ

শায়খ কালু বিশ্বনাথ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর ছেলে শায়খ চান্দ এক মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে সে মৌজার নাম হয় চান্দ ভরাট। পরবর্তী কালে তা চান্দ ভরাঙ্গে পরিণত হয়। বর্তমানে আবার কোন কোন ইতিহাস তত্ত্ববিদ গবেষণা করে বলেছেন, শাহ্ কালুই প্রথমে এদেশে আগমন করেন। পরে তার পিতা শাহচান্দ তাঁর খোজে আরবদেশ থেকে এদেশে এসেছিলেন। চান্দ ভরাঙ্গের জমিদার বংশ এ শাহচান্দেরই বংশধর। এ বংশের খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন সুহেল উদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

জনশ্রুতি রয়েছে শাহকালু পীরের গাঁয়ে এসে সর্বপ্রথম আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরেরা চান্দ ভরাঙ্গে চলে গেলেও তিনি আজীবন পীরের গায়েই বাস করেছে। শেখ কালুর কন্যার বংশধরগন পীরের গায়ে বাস করেন। তাঁরা সৈয়দ আহমদ ওরফে দামতি পীরের বংশধর। তাঁর মাজার বিহার প্রদেশে আজিমাবাদ পাটনা শহরে অবস্থিত। সৈয়দ শাহ সোবহান উদ্দীন ও সৈয়দ শাহ বদর আলম দামড়ি পীরের ভ্রাতা ছিলেন। শাহ সোবহান উদ্দিন দুলালী পরগনার ইউসুফপুর (ইসবপুর) নামক স্থান চলে যান। সেখানে তাঁর বংশধরগণ বাস করছেন। বদর আলম পীরের গাঁওয়ে অবস্থান করেন। তথাকার পীর সাহেবগন তাঁর বংশধর।

৫১. সৈয়দ শামস উদ্দীনঃ

সৈয়দ শামস উদ্দীন তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) সঙ্গীয় দরবেশ সৈয়দ আলা উদ্দিনের (৬২ পুত্র। তিনি আওরঙ্গপুর থেকে আতুয়াজান পরগণার সৈয়দপুর গ্রামে চলে যান। ঐ গ্রামেই তাঁর দরগাহ আছে। তাঁর বংশধরেরা সৈয়দপুর বসবাস করছেন। এই বংশের সৈয়দ ওয়াসিল আলী কোম্পানীর আমলে আলা সদর আমিন ছিলেন এবং বিস্তার ভূ সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। এ বংশের সৈয়দ শাহ আলম (অবসরপ্রাপ্ত জেলা পরিদর্শক) ও তার ভাই ডা. সৈয়দ শাহ আনোয়ার জন সমাজে পরিচিত। এ বংশের মরমী কবি সৈয়দ আজহার আলী অত্যন্ত খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন।[৭৬]

৫২. শায়খ শামসুদ্দীন হাজী ওরফে শামসুদ্দীন বিহারীঃ

শায়খ শামসুদ্দীন হাজী ওরফে শামসুদ্দীন বিহারী এর মাজার সুনাইতা পরগনার আটঘর গ্রামে অবস্থিত। তথাকার কেউ কেউ তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন। কথিত আছে উক্ত গ্রামের রাজান বাহা, কুজন বাহা প্রমুখ প্রতাপশালী সাত ভাই নামাজ পড়ার সময় হাজী সাহেবকে বেঁধে ফেলে। তৎপর তাদের বংশের এক কন্যা হঠাৎ মারা যায়। শেখ সাহেবের দোয়ায় সেই কন্যা পুনজীবন লাভ করলে তারা শেখ সাহেবের সাথে উক্ত মেয়েকে বিবাহ দেন ও নিজেরা ইসলাম কবুল করেন। শাহ সাহেব তার পুত্র জিয়া উদ্দীনকে নির্দেশ দেন তার ওফাতের পর নয়কেদার পরিমিত ভূমিতে একটি দিঘী খনন করে তার পারে যেন তাঁকে কবর দেয়া হয়। জিয়া উদ্দিন পিতার আদেশমত যে দীঘি খনন করান তা জিয়া উদ্দীন দীঘি নামে পরিচিত। উক্ত দীঘির পারে শেখ শামসুদ্দীন ও তাঁর পুত্র জিয়া উদ্দীনের মাজার আছে।

---

৭৬. সিলেটের ইসলাম। পৃ-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

জিয়া উদ্দিন পুত্র শাহ কামালুদ্দিন আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি বাংলার সুলতানের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকে সততার জন্য পুরুস্কার স্বরূপ খান উপাধি লাভ করেন। সুলতান থেকে যে তরবারী পান তা অদ্য তার বংশধরগণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। কামালুদ্দীন তের কেদারের একটি দীঘি খনন করান।[৭৭]

৫৩. সাইয়্যিদ ইউসুফ ইরাকীঃ

হযরত শাহ জালাল (রহ.) এর সঙ্গে ইরাক থেকে এসে মিলিত হন। তিনি ছাতক থানার সংচাপইড় পরগণার লামা হাইল (প্রকাশিত ছোট সৈয়দের গাঁও) মৌজায় বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বংশে বহু ওলি আল্লাহর জন্ম হয়েছে। তন্মধ্যে সৈয়দ নাসির উদ্দীনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয়। তিনি আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত লোকজন থেকে দুরে সরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে লাউড়ের পাহাড়ে গমন করে দীর্ঘকাল ইবাদত করেছেন। তার সুযোগ্য পুত্র মোবারক আলী ও অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সিংচাপইড়ের আবাস পরিত্যাগ করে, দীর্ঘকাল দুহালিয়া পরগণার পাত্তারগাঁয়ে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সিংচাপইড় ফিরে যাওয়ার পরে তার ইন্তেকাল হয়। তাঁর সুযোগ্য মধ্যম পুত্র সৈয়দ রাশিদ আলী কিবলা খুব বড় আলিম ছিলেন এবং মারিফতিতে উচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত ছিলেন। তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র সৈয়দ রাগীব আলী অতি উচ্চপর্যায়ের কামিল ফকির ছিলেন। তিনি দুহালিয়ার জমিদার বাড়ীতে (পুরান বাড়িতে) বাস করে তাবলীগ করতেন। তার মারিফতি সাধানার ফল তিনি 'মারিফুল অহদত' ও 'ইসরারুল হাকিকত' নামক দুখানি পুস্তক রচনা করে গেছেন।[৭৮]

৫৪. গায়েবী পীরঃ

গায়েবী পীরে লাউড় পরগনায় ইসলাম প্রচার করেন। শাহ আরিফিনের সমাধির কাছে গায়েবী মোকাম নামক স্থানে তিনি সমাহিত আছেন। গায়েবী পীরের প্রকৃত নাম জানা যায় না।[৭৯]

করিমগঞ্জ

৫৫. সৈয়দ বদর উদ্দীন ওরফে শাহ বদরঃ

সৈয়দ বদর উদ্দীন ওরফে শাহ বদর বদরপুর রেল ষ্টেশনের নিকটে তার সমাধি অবস্থিত। ১৯৪৭ সালে করিমগঞ্জের পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি, বদরপুর ও করিমগঞ্জ থানার অর্ধেককে সিলেট থেকে বিচ্ছিন্ন করে কাছাড় জিলার সঙ্গে যুক্ত করলেও, সংস্কৃতির দিক দিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর আগমনের পর থেকে করিমগঞ্জ সিলেট জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.) তার সঙ্গীয় দরবেশদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে করিমগঞ্জেও ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যার নাম সর্ব প্রথম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন শায়খ সৈয়দ বদর উদ্দীন ওরফে শায়খ বদর।

---

৭৭. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ. ৩৪
৭৮. সিলেট ইতিহাস, পৃ- ৭১
৭৯. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.), পৃ- ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রথমে তরফবিজয়ী শাহ নাসির উদ্দিন লস্কর সিপাহসালারের সঙ্গী ছিলেন এবং তরফের সামন্তরাজ আচাক নারায়নের বিরুদ্ধে শাহ নাসির উদ্দীনের অভিযানের সময় তার সাথেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তরফ বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল (রহ.) আদেশে তিনি করিমগঞ্জ এলাকায় ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন।[৮০]

৫৬. শাহ জিয়া উদ্দিনঃ

শাহ জিয়া উদ্দিন এ দেশে এসে দেওরাইল পরগনায় বোন্দাশীল গ্রামে অবস্থান করেন। তাঁর কবর নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে। এ স্থানের কেহ কেহ তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন। তিনি বুন্দাশীল অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা তাঁকে বিব্রত করে তুলে। প্রবাদ আছে যে, সিকান্দর গাজীর বিরুদ্ধে যে সব দৈত্য যুদ্ধ করে, সেই গুলি তখন সেখানে অবস্থান করছিল এবং জনসাধারণকে নানা ধরণের উপদ্রব করছিল। জনগণ অতিষ্ট হয়ে বিষয়টি হযরত জিয়া উদ্দিনের গোচরীভূত করেন। তিনি তদীয় পীর ও মুর্শিদ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাহায্য কামনা করেন। শাহজালাল (রহ.) সেখানে গমণ করেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। বহুলোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং দৈত্য সর্দারসহ অনেক দৈত্যকে বন্ধী করা হয় এবং কতক গুলি পলায়ন করে। দৈত্যগুলিকে সমুচিত শাস্তি প্রদানকরা হয়। অতঃপর তথাকার অধিবাসীগণ সুখে-শান্তি তে জীবন যাপন করতে থাকে। তিনি শাহজালাল (রহঃ) এর খলিফাদের অন্যতম ছিলেন।[৮১]

৫৭. শায়খ সিকান্দরঃ বর্তমানে কাছাড় জেলার দেওরাইল পরগণায় বুন্দাশীল গ্রামে তাঁর সমাধি ছিল। নদীর ভাঙ্গনে তা বিলীন হয়ে গিয়েছে। এতদঞ্চলের কোন ও কোন খন্দকারগণ তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন তিনি অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন।[৮২]

৫৮. শায়খ আদমখাকী ঃ বর্তমান কাছাড় জেলায় অন্তর্গত বদরপুর রেলস্টেশনের নিকটে তাঁর মাজার অবস্থিত। তিনি অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

৫৯. দরিয়াপীরঃ ইনি কাছাড় জেলায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন। পাথারিয়া পরগণার চান্দপুর গ্রামে তাঁর মাজার অবস্থিত।

৬০. জাহান সৈয়দ ঃ প্রতাপগড় পরগণার অন্তর্গত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে তাঁর মাজার অবস্থিত বলে সর্ব সাধারণের পক্ষে তার মাজার জিয়ারত সম্ভবপর হয় না। তবে কাঠ সংগ্রহকারী কাঠুরেগণ অত্যাত শ্রদ্ধার সাথে তার নাম স্মরণ করে।[৮৩]

---

৮০. সিলেটে ইসলাম, পৃ- ৮৬

৮১. হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ- ৩০৯

৮২. সিলেটে ইসলাম পৃ- ৮৭

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

হবিগঞ্জ

সিলেট বিজয়ের পরে হযরত শাহজালাল (রহঃ) সৈয়দ নাসির উদ্দীন লসকর সিপাহসালারকে তরফ বিজয়ে প্রেরণ করেন। এ অভিযানে তার সঙ্গে আরো এগারো জন অলি আল্লাহ ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন।

(১) শায়খ বদর উদ্দীন ওরফে শাহ বদর (২) ফতেহ গাজী (৩) শাহ-ই আরেফীন

(৪) শাহ মজলিস আমীন (৫) শাহ গাজী (৬) শাহ শহীদ (৭) শাহ মাহমুদ

(৮) সৈয়দ আহমদ ওরফে গেছু দরাজ (৯) শাহ রুকনুদ্দীন (১০) শাহ সুলতান

(১১) শাহ তাজউদ্দীন কোরেশী।

এরা সকলেই সিলেটে তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করেছেন। এ সকল সুফী দরবেশের মধ্যে শায়খ বদরউদ্দীন বর্তমান কাছাড় জেলার অন্তর্গত বদর পুরে ইসলাম প্রচার করে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

শাহ আরিফীন সুনামগঞ্জের লাউড় পরগণায় ইসলাম প্রচার করে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। সৈয়দ আহমদ গেছু দরাজের কর্ম ক্ষেত্র ছিল কুমিল্লা। তাঁর মাজার কুমিল্লা জেলার খড়মপুরে অবিস্থত। তাঁর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। প্রবাদে রয়েছে তাঁকে কোন এক বিধর্মী শহীদ করলে ও তার মাথা আল্লাহর নাম জপ করতে করতে নদীতে ভেসে চলে। কুমিল্লাহর খড়ম পুরের জেলেদের জালে আটকা পড়লো, তিনি তাদের নিকট তাঁর, এ শাহাদতের আনুপাতিক বিবরণ প্রকাশ করলেন, তাঁর কাছে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাঁর মাথাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এনে খড়ম পুরে সমাধিস্ত করে। তদবধি খড়ম পুরের দরগাহ এতদঞ্চলে পবিত্র স্থান বলে পরিচিত।

সৈয়দ নাসির উদ্দিনের অপর অনুসঙ্গী রুকন উদ্দীন আনসারী কুমিল্লা জেলার সরাইল পরগণায় ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানেই তার মাজার বিদ্যমান। শাহ সুলতান ময়মন সিংহের মদনপুরে গিয়ে ইসলাম প্রচার করেন। সেখানে তাঁর মাযার বিদ্যমান।[৮৪]

৬১. ফতেহ গাজীঃ

ফতেহ গাজী (রহ.) এর মাজার শাহজীবাজার রেলস্টেশনের নিকট। মাজার একটি নূতনদালানের ভিতর সংরক্ষিত। এর পশ্চিমে একটি এক গম্বুজ ওয়ালা মসজিদ আছে। চারিপাশে উঁচুর বুরুজ ও সামনে টিনের বারান্দা। দরগার জন্য মোগল আমলে জায়গীর ছিল। সৈয়দ নাসির উদ্দিন যে বারজন আউলিয়ার সাহায্যে তরফ মিভগাঁওয়ের রাজা আচাক নারায়নকে পরাভূত করেন ইনি তাদের অন্যতম।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৩, ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

তরফ বিজেতা সৈয়দ নাসির উদ্দীন ও শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার বোধ হয় ভিন্ন ব্যক্তি। উভয় নাসির উদ্দীনের বংশধরদের কাছে তাঁদের যে বংশাবলী আছে তাতে দেখা যায় উভয় নাসির উদ্দিনের পূর্বপুরুষ ভিন্ন ব্যক্তি। রাজা আচাক নারায়নের সঙ্গে দরবেশের যুদ্ধ শ্রীহট্ট বিজয়ের পরবর্তী ঘটনা বলে মনে হয়। কারণ সোহেলী ইয়ামনে তরফ বিজয়ের ঘটনা নাই। শাহজালাল যখন সিলেট আসেন তখন তিনি সম্ভবতঃ তরফের উভয় দিক দিয়া চৌকি ও বাহাদুর পুরে আসেন। পরে আচাক নারায়নকে পরাভূত করার জন্য বারোজন আউলিয়া তরফ অভিযান করেন। বোধ হয় তরফ বিজয়ের পর শাহ্ বদর চট্টগ্রামে চলে যান। তরফ বিজয়ের জন্য জলপথে রওয়ানা হয়ে সৈয়দ নাসির উদ্দিন যে স্থানে প্রথম উচ্চ ভূমি দর্শন করেন তা উচাইল নামে পরিচিত হয়। আচাক নারায়ন নাসির উদ্দীন ও তার সঙ্গীদের আগমন সংবাদ শুনে পলায়ন করে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় ত্রিপুরা জেলার সরাইল ও জোয়ান মাহী পরগনা তরফের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাসির উদ্দিন যে স্থানে বাস ভূমি স্থির করেন তা লষ্করপুর নামে খ্যাত। সৈয়দ নাসির উদ্দীনের প্র-পৌত্র ইব্রাহিম খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যার্জন করে তিনি বাংলার সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩১ খ্রিঃ) থেকে মালিকুল উলামা উপাধি প্রাপ্ত হন ও তার কন্যাকে বিবাহ করেন। বার ভুইয়ার প্রধান ঈশা খাঁর পূর্ব পুরুষ কালিদাস গজদানী এর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

সৈয়দ নাসিরুদ্দীনের বংশে সৈয়দ মুসা জন্মগ্রহণ করেন। আরাকানের রাজার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয় ও রাজা তাঁকে একখানি তরবারী উপহার দেন। সৈয়দ মুসার অনুরোধে বিখ্যাত কবি আলাওল সয়ফুল মুলুক বদি উজ্জামান গ্রন্থ লেখেন।[৮৫]

কুতবুল আউলিয়াঃ

এই বংশে বিখ্যাত ওলী শাহ ইলিয়াছ কুদ্দুছ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরবেশগণের মুকুট মনি ছিলেন ও কুতবুল আউলিয়া নামে পরিচিত হন। সৈয়দ ইলিয়াছ কুদ্দুছ বাল্যবধি উদাসীন প্রকৃতির ছিলেন। কথিত আছে, একদা এক দাসীর মুখে 'দিনগেল' কথাটি শুনে' তিনি হঠাৎ সংসারে বীতরাগ হয়ে ফকিরী গ্রহণ করেন। 'দিন তো গেল, দুনিয়াতে এসে কি করলাম'? এইকথা স্মরণ করে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকের জঙ্গলে এক নির্জন স্থানে এবাদতে মশগুল হন। একদা অন্ধকার রাত্রিতে জ্যোৎস্না লোকের ন্যায় একটি স্নিগ্ধ রেখা আকাশ প্রাপ্ত উজ্জল করে হুজরায় প্রবেশ করে। তদবধি ঐ গ্রাম চন্দ্র চুড়ি নামে খ্যাত হয়। কামালিয়াত লাভের পর 'সৈয়দ ইলিয়াছ কুতবুল আউলিয়া' নামে পরিচিত হন। তিনি দরবেশদের মুকুট মণি। তাঁর খ্যাতি তরফের মুসলমান সমাজকে গৌরবান্বিত করেছে।

৮৫. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৩৭, ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

কুতবুল আউলিয়া খোয়াই নদীর তীরে এক নির্জন কুটিরে এবাদত করতেন। তার জন্মস্থান গড়গাঁও আজও পীরের বাড়ী নামে পরিচিত। এখানে তার ব্যবহৃত তিনটুকরা পাথর সংরক্ষিত আছে। এর এক টুকরাতে বসে তিনি ওজু করতেন; দ্বিতীয় খন্ডে বসে নামাজ পড়তেন; তৃতীয় প্রস্তরে তিনি আহার করতেন। তাঁর লেখা আরবী, ফারসী, বাংলা ও হিন্দি শব্দ মিশ্রিত একটি গান পাওয়া গিয়াছে। কুতবুল আউলিয়ার মাজার নরপতি নিকটবর্তী মুড়ারবন্দ দরগায়। এই দরগা খোয়াই নদীর বাম তীরে পূর্বপশ্চিমে প্রায় সোয়া মাইল লম্বা। এই দরগায় সৈয়দ নাসিরুদ্দীনের বংশের শতাধিক ব্যক্তির মাজার রয়েছে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা বহুদুর থেকে এই মাজার জিয়ারত করতে আসেন।[৮৬]

৬২. শায়খ গাজী (শাহ গাজী)

শাহগাজী হবিগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। বন জংগল কেটে যে অঞ্চল তিনি আবাদ করেন, তার নামহয় গাজীপুর। বিশ গাঁয়ে তার মাজার আছে।

৬৩. শায়খ মাহমুদ (শাহ মাহমুদ)ঃ

শাহ মাহমুদ হবিগঞ্জের দক্ষিণ দিকস্থ বিরাট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন। কোন নির্দিষ্ট স্থানে আস্তানা স্থাপন করেননি। খুব সম্ভব তিনিও চিরকুমার ছিলেন। লস্করপুরের নিকট উর্দু বাজার নামক স্থানে তাঁর মাজার অবস্থিত।

৬৪. শায়খ মজলিস আমীন (শাহ মজলিস আমীন)

তিনি উচাইল পরগণায় ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর নির্দেশে বহু মসজিদ তৈরী হয়েছে এবং বহু কুপ খনন করা হয়েছে। উচাইলে তাঁর মাজার আছে।[৮৭]

৬৫. শায়খ শহীদঃ

তিনি তরফ বিজয়ে সৈয়দ নাসির উদ্দীনের সংগে ছিলেন এবং তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। লস্করপুর এলাকায় তিনি ইসলাম প্রচার করেন। লস্করপুরে তাঁর মাজার অবস্থিত।[৮৮]

৬৬. শাহ সৈয়দ শায়খ মিন্নাত উদ্দীনঃ

শাহ সৈয়দ মিন্নত উদ্দিন তরফ বিজয়ে সেনাপতি নাসির উদ্দীনের সাথে গমন করেন। লস্করপুরে তাঁর মাজার আছে। তারই প্রপৌত্র দাউদ শাহের নামানুসারে দাউদনগর এবং দাউদ পরগনার নামকরণ হয়। শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশনের কাছে তাঁর মাজার আছে।[৮৯]

---

৮৬. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ-৩৮, ৩৯, ৪১।

৮৭. হযরত শাহজালাল কুনিয়াত্তি, পৃ- ১৯৭

৮৮. সিলেটে ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ- ৮৪

৮৯. হযরত শাহজালাল কুনিয়াতী (রহ.), পৃ- ১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী বাজার

৬৭. সৈয়দ শাহ মোস্তফা বাগদাদী ঃ

সৈয়দ শাহ মোস্তফা বাগদাদ থেকে হযরত শাহ জালাল (রহ.) এর সঙ্গী হন। তিনি পিতার দিক থেকে হযরত আলী (রা.) এর সঙ্গে বংশসূত্রে যুক্ত ছিলেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি মৌলভী বাজারের অন্তর্গত চুয়াল্লিশ পরগনায় আগমন করেন। সমকালীন বর্শী জুরা পাহাড়ের রাজার নিকট বসবাসের জন্য একখন্ড জমি প্রার্থনা করে তিনি বিফল হন। যে রাজার কাছে তিনি জমি প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর নাম চন্দ্রনারায়ন। ঐ সময় চন্দ্র সিংহ ত্রিপুরা নামে রাজ্যের একজন সামন্ত নৃপতি ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। চন্দ্র নারায়ন ও চন্দ্র সিংহ একই ব্যক্তি হতে পারেন। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, বর্শীজুরা রাজ চন্দ্রায়ন ইটা রাজবংশীয় একজন নৃপতি ছিলেন। কথিত আছে, সৈয়দ মোস্তফা চুয়াল্লিশ পরগনায় অবস্থানকালে একটি হিংস্র বাঘ ঐ অঞ্চলে আবির্ভূত হয়ে মানুষ এবং গো মহিষাদি নির্বিবাদে হত্যা করতে থাকে। তদুপরি একটি বৃহৎ সর্পরাজ সিংহাসন দখল করে বসে। জনগন এগুলোকে অশুভ লক্ষণ ভেবে রাজার ধ্বংস আসন্ন মনে করতে থাকে। ভীত সন্ত্রস্ত রাজা চন্দ্রনারায়ন নিরুপায় হয়ে অলৌকিক শক্তিধর ফকীর সৈয়দ শাহ মোস্তফার শরণাপন্ন হন। সৈয়দ শাহ মোস্তফা অনায়াসে সর্পটিকে সিংহাসন থেকে টেনে নিয়ে আসেন এবং হিংস্র বাঘটিও তার হাতে ধৃত হয়। তিনি বাঘে আরোহন করে সর্পটিকে চাবুক হিসেবে ব্যবহার করেন। তখন থেকে তিনি 'শেরসাওয়ার' এবং 'চাবুক মার' নামে অভিহিত হন।

রাজা চন্দ্র নারায়ন সৈয়দ মোস্তফার অলৌকিক শক্তি দর্শনে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর সুন্দরী কন্যাকে ফকীরের হস্তে অর্পন করেন। রাজ কন্যা ইসলাম গ্রহণ করে 'সালমা খাতুন' নামে অভিহিত হন এবং ফকীরকে স্বামীত্বে বরণ করেন।

রাজা চন্দ্র নারায়ন অতঃপর কুলক্ষণ যুক্ত রাজপুরী পরিত্যাগ করে রাজ্যের পূর্বাংশে রাজধানী স্থাপন করেন। বর্তমানে দুর্লভ ছড়া চা বাগানের পূর্ব দিকে এবং শমসের কোনাগ্রামের পশ্চিমে আজও রাজা চন্দ্র নারায়নের নতুন রাজপুরীর ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়।

চুয়াল্লিশ পরগনার অন্তর্গত মোস্তফাপুর, হিলালপুর, কাজীরগাঁও, খলাপাড়া, প্রভৃতি গ্রামের সৈয়দরা সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফার অধঃস্তন পুরুষ। খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ সি.আই.ই সাহেবের পরিবার ও সৈয়দ মোস্তফার বংশধর বলে খ্যাত।

হযরত শাহ মোস্তফা (রহ.) এর আহবানে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তিনি এসব ধর্মান্তরিত লোকদের মধ্যে কোন কোন লোকের কন্যারও পানি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন পক্ষের গর্ভজাত সন্তানের বংশধরদের মধ্যে মোস্তফাপুর, হিলালপুর, কাজীরগাঁও, কলাপাড়া প্রভৃতি স্থানের সৈয়দগণ এখনও বাস করছেন। তার বংশের সর্ব শ্রেষ্ঠ কৃতি সন্তান খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ (১৮৭২-১৯২২) সাধারণ্যে কাপ্তান মিয়া নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ১৯২১ সালে আসামের শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় সিলেট সরকারী আলিয়া

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। জন সেবার জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকে খান বাহাদুর ওসি.আই.ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এম.সি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন, তাঁর অবদান অন্যতম। এতদতিতে তিনি সিলেটের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর জীবন কালে আমাদের মুসলিমদের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন।[৯০]

তাঁর মাজার মৌলভী বাজার নদীতে তলিয়ে যাওয়ায় ঐ কবরের মাটি এনে বর্তমান মাজারের রূপ দেয়া হয়েছে।

৬৮. শাহ হেলিম উদ্দীনঃ

শাহ হেলিম উদ্দিন তিনি আরবের 'ইয়ামন' দেশের অধিবাসী ছিলেন, মতান্তরে তিনি মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নারনুলের বাসিন্দা। তিনি ধর্ম প্রচারার্থে স্বাধীন ত্রিপুরার কৈলা শহরের নিকটবর্তী আসলাম রায়ের বেরী নামক স্থানে উপস্থিত হন। আসলাম রায় ত্রিপুরা বংশীয় সামন্তনৃপতি ছিলেন ও কৈলা শহরে তাঁর রাজধানী ছিল। কথিত আছে যে, আসলাম রায় একদা এক বাঘকে বধ করবার জন্য জাল ফেলে ইতস্তত করেছিলেন। ইতিমধ্যে শাহ হেলিম উদ্দীন অলৌকিক শক্তি প্রভাবে রিক্ত হস্তে বাঘকে ধরে তাড়িয়ে দেন। রাজা এই অলৌকিক ব্যাপারে অভিভূত হয়ে ফকিরকে কতক ভূমি দান করতে ইচ্ছুক হন। দরবেশ এক তীর পরিমাণ ভূমি নিতে স্বীকৃত হলেন। তদনুসারে এক তীর নিক্ষেপ করা হলে তা তীরপাশা নামকস্থানের এক বৃক্ষে বিদ্ধ হয়। রাজা তখন আসলাম রায়ের বেরী থেকে তীর পাশা পর্যন্ত দরবেশকে ছেড়ে দেন। শাহ হেলিম উদ্দীন তার পুত্র দৌলত মালিককে সঙ্গে নিয়ে লাল বাগের দক্ষিণ পূর্ব কোণে মনু নদীর পশ্চিম পারে বাড়ী নির্মাণ করে ইবাদতে মশগুল হন। সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। উক্ত মাজার মনু নদীর গর্ভে বিলীন হয়েছে। কথিত আছে, একদা রাত্রে দরবেশ আল্লাহর উপাসনায় মগ্ন এমন সময় একটি প্রদীপ স্বতঃই তাঁর ঘরে এসে প্রবেশ করে। প্রদীপের পিছনে রাজা আসলাম রায় ও এসে উপস্থিত হন। রাজা তখন দরবেশকে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার ঘরের প্রদীপ বের হয়ে যাচ্ছে। আমি এর পশ্চাদ্দাবন করে এখানে এসে পৌছেছি। যখন আমার ঘরের প্রদীপ বের হয়ে এল, আমার বিশ্বাস এ জায়গায় আমার বংশের আর শ্রী বৃদ্ধি হবে না। এই বলে রাজা উত্তরে মনু নদী ও তীর পাশা, দক্ষিণে কৈলাশহর, পূর্বে মনু নদী, পশ্চিম লাঘাটা নদী সীমার মধ্যবর্তী ভূ- ভাগ ফকিরকে দান করে রাজ্য ছেড়ে চলে যান। রাজা চলে গেলেও তাঁর মহিষী কনক রাণী ঐ স্থানে থেকে যান। শাহ হেলিম উদ্দীন কনকরাণীর বসবাসের জন্য কতকভূমি নির্দেশ করে দেন। ঐ রানীর বাড়ী ও পুকুর অদ্যাপি কনকীর বাড়ী ও কনকীর পুকুর মতান্তরে (কানীর বাড়ী কানীর পুকুর) নামে পরিচিত। শাহ হেলিম উদ্দীন উক্ত জায়গার নাম কনকহাটি রাখেন। বর্তমানে ঐ স্থান কানিহাটি নামে পরিচিত।

শাহ হেলিমুদ্দীনের পুত্র দৌলত মালিক কনকরানীর কন্যাকে বিবাহ করেন। মুসলমান হওয়ার পর উক্ত কন্যার নাম হাজিরা বিবি রাখা হয়। দৌলত মালিক অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন।

৯০. সিলেটে ইসলাম, পৃ ৭২, ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

কনক হাটি ও লংলা পরগণার কৌলা গ্রামের চৌধুরী খান দৌলত মালিকের বংশধর। খান বাহাদুর তজমুল আলী চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার) মরহুম এই বংশের ছিলেন। আব্দুল মত্তাকিম চৌধুরী প্রাক্তন এম.এল.এ খান বাহাদুর সাহেবের পুত্র।

দৌলত মালিকের পুত্র সুলতানপুর গ্রাম পত্তন করেন। সুলতানের পুত্র দাউদের নামানুসারে দাউদপুর গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে। দাউদের পুত্র মিয়া খান ওরফে ভূঁই মিয়ার নামানুসারে ভূ গাওয়ের নাম হয়েছে।[৯১]

৬৯. শায়খ শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশীঃ

শায়খ শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী কুলাউড়া, লংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন। তিনি শাহ তাজ উদ্দীন কোরেশীর (৬২) ভ্রাতা। তাঁর মাজার কুলাউড়ার কয়েক মাইল দুরে কানাই নদীর তীরে অবস্থিত। লংলার অনেক সম্রান্ত পরিবার তার বংশধর বলে দাবী করেন। তন্মধ্যে মনুসর গ্রামের চৌধুরী পরিবার প্রসিদ্ধ। দেওয়ান মনসুর একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন।[৯২]

৭০. শায়খ হামিদ ফারুকীঃ

তিনি প্রথমে মউরাপুরে বসবাস করে ইসলাম প্রচার করেন। তৎপর তিনি কাউকাপন চলে যান। সেখানকার মাটি হযরত শাহজালাল (রহ.) প্রদত্ত মাটির মত হওয়ায় তিনি সেখানে বসবাস করেন। তাঁর পুত্র মাখদুম হোসেন ফকির হয়ে এক দরগা স্থাপন করেন। মাখদুম হোসেন মাখদুমের জাহানিয়া খলিফা শায়খ হোসেন ফারুকী নামেও পরিচিত ছিলেন। মাখদুম হোসেনের বংশধরগণ উক্ত গ্রামে বাস করেন।[৯৩]

৭১. শাহ কালা মুজাররদ ইয়ামনীঃ

শাহ কালা মুজাররদ অকৃতদার ছিলেন। আল্লাহর আরাধনা এবং ইসলাম প্রচারেই সারা জীবন অতিবাহিত করেন। শমসের নগর রেল ষ্টেশন থেকে অর্ধমাইল দূরে কানই হাটি ভানুগাছ পরগণার সীমান্তে ভাদর দিউল গ্রামে লাখতা নদীর তীরে তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন। শাহ কালা মুজাররদ ইয়ামনীর মাজারটি জংলাকীর্ণ স্থানে অবিস্থত। জনশ্রুতি আছে যে, একটি বাঘ ও একটি অজগর তাঁর মাজার পাহারা দিত। বাঘটি মাজারের উত্তরদিকে অবস্থিত বটগাছের শাখায় হেলান দিয়ে থাকত এবং সাপটি প্রতিদিন দুপুর বেলায় মাজার প্রদক্ষিণ করে নিকটবর্তী গর্তে অবস্থান করত। বরায়া পরগনার অন্তর্গত ফুলবাড়ী গ্রামের মাহতাব উদ্দিন আহমদ সাহেব ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জংগল পরিস্কার করে মাজারটির যত্ন নিতে থাকেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই মাজারে এসে তাঁদের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকেন।[৯৪]

৭২. সৈয়দ রোকনুদ্দীনঃ

সৈয়দ আলা উদ্দীন বাগদাদী তনয় সৈয়দ রোকনুদ্দীন ইটা পরগনায় ইসলাম প্রচার করেন। কথিত যে, ভ্রমন পথের একস্থানে হঠাৎ করে তার কদম (পা) আটকে যায়। উক্ত কারণে ঐ স্থানের নাম হয় কদম আটকা। তিনি সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। কুলাউড়া, মৌলভী বাজার রাস্তার অনতি দুরে কদম হাটা গ্রামে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মাজারের সাথেই একটা ঈদগাহ স্থাপিত হয়েছে।

---

৯১. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৪৫, ৪৬।
৯২. প্রাগুক্ত পৃ- ৪৭
৯৩. সিলেটে ইসলাম, পৃ, ৭৬, ৭৭।
৯৪. হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.), পৃ ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

কদম হাটা গ্রামের সৈয়দগণ এবং শামপালী, কামার চোখ, বিজলী প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত পরিবার গুলো সৈয়দ রুকনুদ্দীনের বংশধর।

অনেকের মতে উনবিংশ শতাব্দীর কবি সৈয়দ শাহনুর সৈয়দ রুকনুদ্দীনের বংশধর। তিনি লামুয়া, ভাইশর, বালীশাস্রা, দক্ষিণ বালিক প্রভৃতি স্থানের বহু সংখ্যক অমুসলিমকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি ময়মনসিংহ ও হবিগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। হবিগঞ্জের জালালশপ নামক স্থানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তার ভাব সংগীত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।[৯৫]

৭৩. শায়খ দারঙ্গঃ

তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে আগমন করে মনুমুখ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ও হযরত শাহজালাল (রহ.) মত আজীবন কুমার ছিলেন। তবে তারই আদেশে তার এক ভাই আরব দেশ থেকে আগমন করেন এবং উভয় বেকামুরা স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বেকামুরার সৈয়দ পরিবার সৈয়দ দারঙ্গের ভাইয়ের বংশধর। এবং শের সৈয়দ কদর আলী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে আলা সদর আমিন ছিলেন। বর্তমানে এই বংশের লোক নানা শাখায় রয়েছেন। তন্মধ্যে সৈয়দ নওশাদ হোসেন ব্যবসা-বাণিজ্যে খ্যাতনামা। এ সৈয়দ পরিবারের সাথে রক্ত সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর পিতা খান বাহাদুর সিকন্দর আলী।[৯৬]

৭৪. শাহ কামালুদ্দীনঃ

শাহ কামালুদ্দীন চুয়াল্লিশ পরগণায় ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর নামানুসারেই কামালপুরের নাম হয়। কামালপুর ও নিজ করনশীয় চৌধুরীর শাহ কামাল উদ্দীনের বংশধর। চোয়াল্লিশ পরগণার কামালপুরে তার মাজার আছে। [৯৭]

৭৫. সৈয়দ নসর উল্লাহ ঃ তিনি লংলা পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর ইন্তেকাল কোথায় হয়েছিল এবং তাঁর মাযার কোথায় বর্তমান, এ সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায় না।

৭৬. শায়খ গরীব খাকিঃ তাঁর মাজার জুরিবেল স্টেশনের নিকটবর্তী বকতুরা গ্রামে অবস্থিত। তাঁর কোন বংশধরের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে স্থানীয় লোকের ধারণা তিনি মুজররদ বা চির কুমার ছিলেন।

৭৭. শায়খ সৈয়দ আবু বকরঃ

পাথারিয়া পরগণা ছোট লেখা গ্রামে তাঁর মাজার বিদ্যমান রয়েছে। তার বংশধরদের সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না বলে স্থানীয় লোকের ধারণা, তিনি ও মজররদ ছিলেন।

৭৮. সৈয়দ ইয়াকুবঃ দক্ষিণ ভাগ রেলওয়ে স্টেশনের নিকট পাথারিয়া পরগণার কাউতরীতে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনিও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মত মজররদ ছিলেন।

---

৯৫. প্রাগুক্ত পৃ- ১৯৪
৯৬. সিলেটে ইসলাম, পৃ ৭৭
৯৭. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ওলী আল্লাহ্ ব্যতিত মৌলভীবাজার জেলায় পরবর্তী কালে আরও পীর দরবেশ ও আউলিয়াই কেরামের আবির্ভাব হয়েছে এবং তারা এ জেলারসর্বত্র ইসলামের বাণী ও রীতিনীতি প্রচার করেছেন। তাদের মধ্যে কোন কোন ওলী ছিলেন পূর্বোক্ত কোনও এক ওলীর বংশধর। আবার কেউ কেউ বা বিদেশ থেকে এসে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। তার মধ্যে নিম্নলিখিত ওলী গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত শাহ্ কুতুবঃ তিনি একজন বিখ্যাত ওলী আল্লাহ্ ছিলেন। তাঁর মাজার রাজনগরের সাগর দীঘির পাড়ে অবস্থিত। তাঁর কোন বংশধর ছিলেন কিনা এবং তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন এখনও নির্ণীত হয়নি।

হযরত সৈয়দ ইয়াসিনঃ তিনি হযরত সৈয়দ শাহ মোস্তফা (রহ.) এর ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। তিনি মৌলভী বাজারের ইন্দেশ্বর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন এবং সেখানে তাঁর মাজার বর্তমান। তাঁর বংশধরগণ মৌলভী বাজারে বাস করছেন। মৌলভী বাজারের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম সৈয়দ কুদরত উল্লাহ এ বংশেরই লোক ছিলেন।

হযরত সৈয়দ ইসমাঈলঃ তিনি সৈয়দ শাহ মোস্তফা (রহ.) এর পুত্র ছিলেন। কথিত আছে তিনিও সৈয়দ ইয়াসিন এক সঙ্গে বাগদাদ থেকে এদেশে এসেছিলেন।

হযরত সৈয়দ শেকাকত শাহঃ তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অন্যতম অনুসঙ্গী সৈয়দ আব্দুল জলিলের বংশধর। আসামের তেজপুরে সৈয়দ আব্দুল জলিলের মাজার বিদ্যমান। সৈয়দ শেকাকত শাহ ইটার কুইসারে এসে বসবাস করেন। তাঁর ছেলে বন্দে আলী শাহ ও একজন কামিল ফকির ছিলেন। তাঁর বশধরগণ এখনও তথায় বাস করছেন। সিংকাপনের সৈয়দ আব্দুল বারী ও সৈয়দ আব্দুল নকী এ বংশেরই সন্তান।

সৈয়দ নুর আলী শাহঃ তিনি সৈয়দ শাহ মোস্তফার সাথী ছিলেন। তাঁর বংশধরেরা ধরকাপন ফকির বাড়ীতে অবস্থান করছেন। তাঁর মাজার বেরীগাঙ্গের তীরে অবস্থিত।

হযরত শাহ হিলালঃ তিনি সৈয়দ শাহ মোস্তফার বংশধর ছিলেন। তাঁর বংশধরেরা তথায় বাস করছেন। তার মাজার ও তার নামীয় হিলালপুর মৌজায় অবস্থিত।

হযরত পীর শাহ ওয়ালী মোহাম্মদঃ ভারতের মধ্যপ্রদেশ থেকে ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করে ইটা পরগনার সিংকাপন মৌজায় আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁর বংশের মৌলানা আবদুর রহমান সিংকাপনী খিলাফত ও পাকিস্তান আন্দোলনে সিলেটে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

হযরত শেখ শিহাব উদ্দীনঃ মৌলভী বাজারের নিকটবর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন। মৌলভী বাজারের বারশ্রী গ্রামে তার মাযার বর্তমান। তিনি চিরকুমার ছিলেন।

শাহ মমরুজঃ তাঁর মাযার কুলাউড়ার নিকটবর্তী মমরুজ পুর মৌজায় অবস্থিত।

হযরত শাহনুর বিয়াবানীঃ তাঁর মাযার কুলাউড়া রেলওয়ে জংশনের নিকটবর্তী রাউত গাওয়ে। তাঁর বংশধরেরা ভানুগাছের রানুপুরে বাস করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সিলেট বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সিলেটে ইসলাম প্রচার আরম্ভ হয়ে তার সঙ্গের ওলী আল্লাহ ইন্তেকালের সঙ্গেই তা শেষ হয়নি।

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর পরের দু'শত বছরের ইতিহাস এখন ও উদ্ধার না হলেও এসব ওলী আল্লাহদের প্রচারের দ্বারা প্রমাণিত হয়, হযরত শাহজালাল (রহ.) যে ধারাটি সিলেটে প্রবর্তন করেছিলেন তা বহু দিন পর্যন্ত জ্বলন্ত ছিল ইংরেজ শাসনকালেও এ ধারাটি বিনষ্ট হয়নি। বরং তা ছিল চলমান দৃপ্ত প্রত্যয় একদল মর্দ্দে মুজাহিদ যুগে যুগে বৃহত্তর সিলেটে এসে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাদের কেউ কেউ ছিলেন হযরত শাহ জালাল (রহ.) এর সঙ্গে আগত ওলী আল্লাহগণের বংশধর। আবার কেউ কেউ বিদেশ থেকে আগমন করে এদেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন।[৯৮]

এক নজরে ৩৬০ আউলিয়া সিলেটের বাইরে

করিমগঞ্জ ঃ শাহ জিয়া উদ্দিনঃ বদরপুর থানার 'দেওরাইল' পরগনার বুন্দাশীল মৌজায়।

আদম খাকী শাহ সিকন্দরঃ বদরপুর রেলস্টেশনের নিকটে কথিত বুন্দাশীল মৌজায় ছিল, বরাক নদীর ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেছে।

জালাল উদ্দীন ঃ কাছাড় জেলার মন ভুবন নামক মৌজায়।

অন্যান্য স্থানে

সৈয়দ আহমদ ওরফে কল্লা শহীদঃ তাহার দেহ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজারের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে 'লুতের মাজার' নামক স্থানে এবং মস্তক সাবেক কুমিল্লা জিলায় আখাউড়া জংশনের পশ্চিমে 'খড়মপুর' মৌজায়।

শাহ রুকন উদ্দীন আনসারীঃ ব্রাহ্মন বাড়িয়া জেলার সরাইল পরগনায় শাহবাজপুর মৌজায়।

শায়খ জালালঃ কুমিল্লা জেলা সদর হতে ৮ মাইল দুরে 'উটখাড়া' গ্রামে।

সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোরচাঁদঃ পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার 'হাড়োয়া' মৌজায়।[৯৯]

সিলেটের বাইরে ইসলাম প্রচারকারী আউলিয়ায়ে কেরাম

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী আউলিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে নিম্নলিখিত ওলী আল্লাহগণ বৃহত্তর সিলেট বিভাগের বাইরেও ইসলাম প্রচার করেছেন।

সোনার গাঁও সহ ঢাকা জিলায় ইসলাম প্রচার করেন শাহ মালিক ইয়ামনী (রহ.), শাহ দিলওয়ার লতিফ, শাহ গিয়াস উদ্দীন, শাহ হাফিজ উল্লাহ, শাহ মোহাম্মদ সৈয়দ, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাহ রওশন আলী (রহ.) প্রমুখ দরবেশ। নোয়াখালী জিলায় ইসলাম প্রচার করেন শাহ জামাল উদ্দীন, শাহ হারু, শাহ এনায়েত করমবক্ত, মাহবুব শাহ, মিয়া সাহেব বাগদাদী (রহ.) প্রমুখ দরবেশ।

---

৯৮. সিলেট ইসলাম, পৃ- ৮০, ৮১, ৮২।

৯৯. হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ- ৪০৭, ৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা জিলায় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন সৈয়দ আহমদ গেছু দরাজ, সৈয়দ জাফর সৈয়দ আব্দুল গফুর, সৈয়দ ইব্রাহিম, হাজী পীর, সৈয়দ ইসমাইল, সৈয়দ ইসহাক, সৈয়দ রওশন আলী, সৈয়দ গোলাম মর্তুজা, সৈয়দ আকরম আলী ও সৈয়দ শাহ আম্বিয়া (রহ.) প্রমুখ আউলিয়া।[১০০]

চট্টগ্রাম জিলায় ইসলাম প্রচার করেন হাজী খলিল, বদরপুরী প্রমুখ দরবেশ। ময়মন সিংহে ইসলাম প্রচারকারী দরবেশ শাহ সুলতান। আসামের কাছাড় জিলায় ইসলাম প্রচার করেন শাহ জালাল উদ্দীন (মনতুবান) মীরার পীর (রহ.) প্রমুখ। সুন্দরবনে সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোর চাঁদ প্রমুখ ইসলাম প্রচার করেন।

সৈয়দ আহমদ গেছু দরাজ

তিনি তরফ নিজয়ী ১২ আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন। তিনি কুমিল্লা নোয়াখালীতে ইসলাম প্রচার করিতে আদিষ্ট হন এবং এই মহান দায়িত্ব পালন কালে শহীদ হন। জেলেরা মাছ ধরিবার সময় তাঁর শির মুবারক নদী হইতে উদ্ধার করে। সাবেক কুমিল্লা জেলার আখাউড়ার নিকটস্থ 'খড়ম পুরে' তাহার শির মুবারক সমাহিত করা হয়। এইজন্য ইহা কল্লা শহীদ নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ তখন ঐ অঞ্চল তরফ রাজ্য ভুক্ত সরাইলের অর্ন্তভূক্ত ছিল।

৭৯. শাহ রুকন উদ্দীন আনসারী (রহ.)

সাবেক কুমিল্লা জেলার (বর্তমান ব্রাহ্মন বাড়িয়া জিলা) সরাইলের শাহজাদপুরে তাহার মাজার অবস্থিত। সরাইল তখন সিলেটের তরফ পরগণার অন্তর্গত ছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.) আদেশে তিনি তথায় ইসলাম প্রচার করেন। ইহার পূর্বে তিনি তরফ বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।[১০১]

<u>নেত্রকোনা জেলাঃ</u>

৮০. হযরত শাহ সুলতানঃ

তিনি নেত্রকোনা জেলার মদনপুরে প্রেরিত হয়ে ইসলাম প্রচার করেছেন। তার মাজার মদনপুরে অবস্থিত। তা এখন এক বিশেষ জনপ্রিয় দরগায় পরিণত হয়েছে।

ব্রাহ্মন বাড়িয়া জেলা

৮১. হযরত শাহ সৈয়দ শরীফ বাগদাদীঃ

তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে দিল্লী থেকে সিলেট আসেন। পরে তাঁকে কুমিল্লায় চিতৌষি অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয়। সে অঞ্চলের জমিদার নাটেশ্বর রায়ের কোতোয়াল হায়াত আব্দুল করিম ছিলেন শরীফ বাগদাদী সাহেবের কাছে মুরীদ। তাঁর ইন্তে কালের পরে বাগদাদীসাহেব সে স্থানে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হলে প্রথম দিকে নাটেশ্বর রায় তাঁকে নানা ভাবে নির্যাতন করে। পরে তাঁর অনন্য সাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর মাযারও মসজিদের জন্য ভূ সম্পত্তি দান করেন। নাটেশ্বর দীঘির পারে তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর নামানুসারে এ স্থানের নাম হয় শরীফ পুর।

---

১০০. হযরত শাহজালাল (রহ.) পৃ- ১৯৫, ১৯৮।
১০১. হযরত শাহজালাল (র.) পৃ- ৪০৮, ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা জেলা

৮২. সৈয়দ জাফরঃ ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিনি কুমিল্লায় গমন করেন।

৮৩. সৈয়দ আব্দুল গফুরঃ তিনি কুমিল্লায় বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন।

৮৪. সৈয়দ ইব্রাহিম ঃ কুমিল্লায় ইসলাম প্রচার করেছেন।

৮৫. হাজী পীরঃ তার প্রকৃত নাম জানা যায়নি। তিনি ইসলাম প্রচারার্থে তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত কৈলাস শহরে গমন করেন। তথায় তার মাজার অবস্থিত।

৮৬. সৈয়দ ইসমাইলঃ তিনি কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচারার্থে গমন করেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচার করেন।

৮৭. সৈয়দ ইসহাকঃ তিনিও কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচার করেন।

৮৮. সৈয়দ রওশন আলীঃ তিনি কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচার করেন।

৮৯. সৈয়দ গোলাম মর্তুজাঃ ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিনি কুমিল্লায় আগমন করেন।

৯০. সৈয়দ আকরম আলী ও সৈয়দ শাহ আম্বিয়াঃ এরা উভয়েই কুমিল্লায় ইসলাম প্রচার করেন।

৯১. সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ ইসরাইল ও শাহ মুহাম্মদ নুরু উদ্দীনঃ এরা দুজনই শাহ কামাল ও শাহ জামালের সঙ্গী ছিলেন। তারা দুজনেই ময়নামতির উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত বাবেল্লায় একটা ছোট টিলার উপর আস্তানা স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের মাজার এক গম্বুজ বিশিষ্ট পাকা দালানের পাশাপাশি অবস্থিত।

লক্ষীপুর জেলা

বর্তমান নোয়াখালী জেলা থেকে পৃথক হয়ে লক্ষীপুর একটা স্বতন্ত্র জেলাতে পরিণত হয়েছে। নোয়াখালীতে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অনুসারীদের ইসলাম প্রচারের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায় সেখানেও কয়েকজন বিশিষ্ট ওলী আল্লাহ ইসলাম প্রচার করেছেন। লক্ষীপুর জেলায় হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অনুসঙ্গী হযরত বড়পীর দস্তগীর ও সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর বংশধর বলে পরিচিত।

৯২. শাহ মিরন (রহ.) ঃ এতদঞ্চলের সর্বত্র ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর মাজার লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জে অবস্থিত।

নারায়নগঞ্জ জেলা

বর্তমানে নারায়নগঞ্জ একটা পৃথক জেলায় পরিণত হয়েছে। এজন্য এ জেলায় যারা ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের বর্ণনা পৃথক ভাবে দেয়া হয়েছে। ঢাকা জেলায় হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অনুসঙ্গীদের ইসলাম ধর্ম প্রচার বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যাবে, ঢাকাতেও বেশ কয়েক দরবেশ ইসলাম প্রচার করেছেন। নারায়নগঞ্জে ইসলাম প্রচার করেছেন।

৯৩. হযরত দেলোয়ার লতিফ ও হযরত গিয়াস উদ্দীনঃ

সোনারগাঁয়ে তদের মাজার অবস্থিত। বহুদুর দুরান্ত থেকে বহু লোকতাঁদের মাযার জিয়ারত করতে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

নরসিংদি জেলা

৯৪. হযরত কাপুল শাহঃ নরসিংদি রেল ষ্টেশনের পশ্চিম দিকের দুরবর্তী সিগনালের নিকটবর্তী বাম পার্শ্বস্থ স্থানে তার মাজার অবস্থিত। এতদঞ্চলে জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্য প্রেরীত হয়েছিলেন এবং এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার কালে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁকে এখানেই দাফন করে। তাঁর মাজার সকল শ্রেণীর লোকের কাছে খুবই সম্মানিত।

৯৫. শাহ-ই-ইরানীঃ নরসিংদি জেলার অন্তর্গত মনোহরদী থানার শাহরানী গ্রামে তাঁর মাজার অবস্থিত। তিনি হযরত শাহজালাল (র.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলে তথাকার চন্ডিনামে অভিহিত এক রাজা তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তবে তাঁর স্বল্প কালীন অবস্থানের ফলেই স্থানীয় লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাঁর মাজার ও মসজিদ বহুদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিলীন হয়ে যায়। তবে বিগত শতাব্দীতে কোন এক কৃষকের লাঙ্গলে সে মসজিদের গম্বুজের কিছুটা ধরা পড়লে খননের ফলে তা আবিস্কৃত হয়েছে। প্রবাদ রয়েছে, তিনি নাকি ইরানের রাজপুত্র ছিলেন। পথিমধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অনুগামী হন।

ঢাকা জেলা

৯৬. হযরত মীর সৈয়দ তাবরিযী ও খাজা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহিদ (রহ.)ঃ
তাঁরা উভয়েই ঢাকা জেলার ধামরাই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাদের মাজার সে অঞ্চলে রয়েছে।

৯৭. শায়খ গিয়াস উদ্দিনঃ তিনিও শায়খ দেলোয়ার লতিফের মত সোনার গায়ে ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে গমণ করেন। সেখানে তার মাজার রয়েছে।

৯৮. শায়খ হাফিজ উল্লাহঃ ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় গমন করেন।

৯৯. শায়খ ওয়ালী উল্লাহঃ তিনি ঢাকা জেলায় ইসলাম প্রচার করেন।

১০০. শায়খ রওশন আলীঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনিও ঢাকায় আগমন করেন।

১০১. শায়খ মুহম্মিদ সাইফিঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ও ঢাকা জেলায় আগমন করেন।

১০২. শায়খ আহমদ উল্লাহঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দরবেশ ও ঢাকায় আগমন করেন।

নোয়াখালী জেলা

১০৩. শায়খ জালাল উদ্দিনঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নোয়াখালী জেলায় আগমন করেন। নন্দনপুরে তার মাযার অবস্থিত।

১০৪. শায়খ হারুনঃ ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিনি নোয়াখালীতে গমন করেন।

১০৫. শায়খ এনায়েত করম বখশঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নোয়াখালীতে গমন করেন এবং সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়।

১০৬. শায়খ মাহবুব শাহঃ নোয়াখালীর বহু লোককে তিনি ইসলাম ধর্মে বায়আত দান করেন।

১০৭. মিয়া সাহেব বাগদাদীঃ তিনি সিলেট থেকে নোয়াখালীতে আগমন করে ইলাম প্রচার করেন।[১০২]

---

১০২. সিলেটে ইসলাম, পৃ ১৮৩-১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ জালাল (রহ.) এর সঙ্গী আউলিয়াদের মধ্যে সুন্দরবন এলাকায় ২২ জন আউলিয়ার ইসলাম প্রচার করেন।

তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(১) সৈয়দ আব্বাস (২) মুহাম্মদ সুফী (৩) দায়াবখা (৪) হযরত আব্দুল্লাহ (৫) হযরত আহমদ উল্লাহ (৬) হযরত দাউদ আকবর (৭) হযরত শফিকুলালম (৮) হযরত সাউদ (৯) হযরত হেলিম উদ্দীন (১০) হযরত কুরবান আলী (১১) হযরত মোমেনুদ্দীন (১২) হযরত ইলিয়াছ (১৩) হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদির (১৪) হযরত আব্দুল নঈম (১৫) হযরত আব্দুল ওয়াহেদ (১৬ হযরত হোসাইন হায়দার (১৭) হযরত মুহাম্মদ ফাজিল (১৮) হযরত আবুল ফজল (১৯) হযরত আব্দুল্লাহ আউলিয়া (২০) হযরত মুহাম্মদ হাসান (২১) হযরত আব্দুল লতিফ (২২) হযরত মুহাম্মদ দাঈম (রহ.)।

বাইশ জন দরবেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(১) হযরত শাহ সৈয়দ আব্বাস আলী। তাঁর মুর্শিদ তাকে খেতাব দিয়েছিলেন শামসুল আরিফীন ও কুতবুল আরিফীন। দেওয়ান রাজা চন্দ্র কেতু তাহাকে পীর গোরাচাদ নামে অভিহিত করেছিলেন। সেই হতেই তিনি জন সমাজে 'পীর গোরচান্দ নামে অভিহিত হয়ে আসছেন। তাঁর পবিত্র মাজার চব্বিশ পরগনা জেলার বশির হাট মহকুমার এলাকায় হাড়োয়া গ্রামে। এই মাজার তাঁহার হাড়গাড়া (হাড়োয়া) মাযার। যখন ইনি এই স্থানে আগমন করেছিলেন তখন এইস্থানে যতটা পরিমাণ জায়গায় মানবের বসতি ছিল ততটা জায়গাকে বার গোপপুর নামে অভিহিত করা হত। অবশিষ্ট সমস্ত ভূভাগকে বার গোপপুর বনভূমি বলা হত। দ্বাদশ ঘর গোপ এবং কয়েক ঘর আদিম অধিবাসী বার গোপপুরে বাস করত। হযরত পীর সাহেব আরবী ভাষায় সুপরিচিত ছিলেন। হিন্দুস্তানে আগমনের পর ইনি ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। বাংলাদেশ পরিভ্রমনের ফলে ইনি বাংলা ভাষায় মনের ভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে অভ্যস্থ হয়েছিলেন।

(২) হযরত মুহাম্মদ সুফী (রহ.) তাঁর মুর্শিদ হযরত শাহ সৈয়দ জালাল (রহ.) ইহাকে খিতাব দিয়েছিলেন 'সুলতানুল আউলিয়া'। পরবর্তীকালে ইনি শাহ সুফী সুলতান বলে পরিচিত হয়ে ছিলেন এবং আজও এই 'শাহ সুফী সুলতান' নামে ইনি পরিচিত। তিনি দিল্লীর আলা উদ্দীন খিলযীর ভাগিনেয়। চিরকুমার হযরত শাহজালাল এর দিল্লীতে আগমন করার পুর্বে ইনি যার হতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ইহার সাধনা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি ওফাত করেছিলেন। সুতরাং ইনি পুনরায় হযরত শাহজালাল (রহ.)এর বাইয়াত স্বীকার করেছিলেন এবং সাধনা সমাপ্ত করো মুর্শিদের নিকট হতে 'সুলতানুল আউলিয়া' খেতাবের অধিকারী হয়েছিলেন। ইনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। বাংলাদেশ পরিভ্রমনের ফলে ইনি বাঙলা ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্থ হয়েছিলেন। তাঁর মাজার হাড়োয়া, হুগলী জেলার পান্ডুয়া গ্রামে। পান্ডুয়া ষ্টেশন হতে তার রওজার চুড়া দেখতে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) হযরত দাবার খা (রহ.)। কেহ কেহ তাঁকে দারাজ খাঁ বলেও উল্লেখ করেছেন। ইনিও দিল্লির পাঠান বংশের সন্তান। ইনি এবং হযরত মুহাম্মদ সুফী, প্রথমে একই মুর্শিদের নিকট বাইআত স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু মুর্শিদের ওফাতের পর তারা উভয় পুনরায় হযরত শাহজালাল (রহ.) নিকট মুরিদ হয়ে সাধনায় কামালিয়াত লাভ করেছিলেন। ইনি আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। বাংলাদেশ পরিভ্রমনের ফলে ইনি বাংলা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্থ হয়েছিলেন। ইনি ফার্সী ভাষায় তাসাউফ বিষয়ক কয়েকখানি কিতাব লিখেছেন। তার বিরচিত সংস্কৃত স্তোত্র হিন্দু জাতির বিশেষ আদরের বস্তু। ইনি চির কুমার। তার পবিত্র মাজার হুগলি জিলার ত্রিবেনী নামক স্থানে, তার রওজায় হাতার মধ্যে একখন্ড প্রস্ত রের উপর একখানি কুড়াল (কুঠার) বসান আছে। কিন্তু উহা বিচ্যুত হয় না। লোকেরা বলে দাবারী গাজীর কুড়াল, নড়ে চড়ে, খসেনা।

(৪) হযরত আহমুদল্লাহ (রহ.) তাহার পবিত্র রওযা শিবিনী নামক স্থানে।

(৫) হযরত আহমদুল্লাহ (রহ.) মুসলিম জন সাধারণ তাঁকে একদিল শাহ খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। তাহার পবিত্র রওজা বারাসাত মহকুমার মধ্যে আনওয়ার পুর গ্রামে।

(৬) হযরত দাউদ আককবর (রহ.) সোহাইগ্রামে তাঁহার পবিত্র আস্তানা।

(৭) হযরত শফিকুল আলম (রহ.), জনসাধারণ ইঁহাকে 'ছক্কু দেওয়ান' নামে অভিহিত করে থাকেন।

(৮) হযরদ দাউদ (র.) তার পূর্বনাম 'সৈয়দ মুহাম্মদ সাইদ' তাঁহার রওজা পাক শালাতিয়া গ্রামে তথায় ইনি সৈয়দ শাহ নামে পরিচিত। শালতিয়া গ্রামে নৈহাটি থানার অন্তর্গত। অধুনা শালতিয়া গ্রামকে শালিদহ নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আদিম নাম শালতিয়া।

(৯) হযরত হামিদুদ্দীন, তার পবিত্র আস্তানা আবেদন পুর গ্রামে। বর্তমান সময়ে এই গ্রামের নাম মোঘল কোর্ট। সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক আবেদনপুর মোঘল কোর্ট নামে পরিচিত হয়েছিল। বাদশাহ শাহজাহানের পীর ভাই, হযরত শাহ বাঙ্গালী এই স্থানে বসবাস করেছিলেন। সে উপলক্ষ্যে বাদশাহ শাহজাহান এই স্থানে আগমন করেছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের অনেক কীর্তির নিদর্শন আজও এখানে বিদ্যমান।

(১০) হযরত কুরবান আলী (রহ.) তার পবিত্র আস্তানা হুগলি জিলার 'আরাম বাগে'।

(১১) হযরত মোমিনুদ্দীন (রহ.) তার পবিত্র আস্তানা বর্ধমান জিলায় বনজলা গ্রামে।

(১২) হযরত ইলিয়াছ (রহ.) তার পবিত্র আস্তানা চব্বিশ পরগনা জিলার বাদুড়িয়া থানার অধীন আঁধার মানিক গ্রামে।

(১৩) হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদির (রহ.) তার পবিত্র আস্তানা বঙ্গোপসাগরের নিকট।

(১৪) হযরত আব্দুল নঈম (র.) তার পবিত্র আস্তানা কওম নগর কোন্নাগর।

(১৫) হযরত আব্দুল ওয়াহিদ। তার পূর্ণ নাম আল্লামা মোল্লা আব্দুল ওয়াহিদ। তার আস্তান বর্ধমান জেলার রায় গ্রামে। বিজ্ঞ জানের দিক হতে তাঁর খেতাব আল্লামা ও মোল্লা। অধুনা

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা খেতাব মর্যাদা পূর্ণ নয়। কিন্তু ইলমের দিক দিয়ে হতে পুরানোকালে 'মোল্লা' খেতাব অত্যন্ত উচ্চ স্তরের খেতাব ছিল।

(১৬) হযরত হোসাইন হায়দার (র.) তার পবিত্র আস্তানা পুর্ণিয়া জিলার পুর্ণিয় শহরে। তৎকালে পূর্ণিয়া পশ্চিম বঙ্গেরই শামিল।

(১৭) হযরত মুহাম্মদ ফাজিল (রহ.)। তাঁহার পবিত্র আস্তানা হিওলগঞ্জ নামক স্থানে। হিওল গঞ্জ নাম মোঘল আমলের। মীর্জা হিওলের নামে এই স্থানের নামকরণ হয়েছিল। তৎপূর্ব এই স্থানের নাম ছিল করিমগঞ্জ। হযরত ফাজিল (রহ.) যখন এখানে আগমন করেছিলেন, তখন এই স্থানের নাম ছিল ব্রহ্মপুর। যখন পীর সাহেব ওফাত করেছিলেন তখন হিগুলগঞ্জ বা করিমগঞ্জ ব্রহ্মপুর নামে পরিচিত ছিল।

(১৮) হযরত আবুল ফজল ঃ তার পবিত্র আস্তানা সরওয়ার নগরে। সরওয়ার নগর হিন্দু যুগে শ্যাম নগর নামে পরিচিত ছিল। কোন সময়ে শ্যামল নগর নামক গ্রাম সরওয়ার নগর নাম গ্রহণ করেছিল পুথির শায়ীর তার কোন উল্লেখ করেন নাই।

(১৯) হযরত আব্দুল্লাহ আউলিয়া (রহ.) তার পবিত্র আস্তানা বীর ভূম। তার মুর্শিদ হযরত আব্বাস আলী ওরফে গোরাঁচাদ (র.) তাকে শাহ সোন্দল খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। হযরত গোরাচাঁদ আকালন্দ ও বলনন্দ কর্তৃক আহত হওয়ার পর উক্ত খেতাব দিয়া শাহ সোন্দল রাজকে বীর ভূম যেতে উপদেশ দান করেছিলেন। হযরত আব্বাস আলী হযরত সোন্দলকে বলেছিলেন, তুমি বীরভূম যেয়ে হযরত শাহ জয়েন উদ্দীন (রহ.) এর দরবারে উপস্থিত হবে এবং তার আদেশ পালন করবে। স্বীয় পীরের এই আদেশ মত শাহ আব্দুল্লাহ বীরভুম গমন করে শাহ জয়েন উদ্দীনের দরবারে উপস্থিত হবার পর উক্ত শাহ সাহেবের অনুরোধক্রমে বৃদ্ধ বয়সে হযরত শাহ সোন্দল তার কুমারী কন্যা বিবি কলসুমাকে বিবাহ করেছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে আল্লাহর কুদরতে হযরত আব্দুল্লাহর ওরসে এবং বিবি কলসুমার গর্ভে পর পর দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। জৈষ্ঠ্য হযরত মুবারক গাজী। হযরত মুবারক গাজীর আস্তানা চব্বিশ পরগণা জিলার কুঠিয়ারী শরীফে কনিষ্ঠ হযরত মুকাররম গাজী। হযরত মুকাররম গাজীর আস্তানা বাগের হাটে। হযরত আব্দুল্লাহ ওরফে হযরত শাহ সোন্দলের আস্তানা বীর ভূম। হযরত শাহ জয়েন উদ্দীন তার জামাতা হযরত শাহ আব্দুল্লাহ ওরফে হযরত শাহ সোন্দলকে মাহতাবুল আরিফীন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। হযরত শাহ আব্দুল্লাহর দুইটি উপাধিই অর্থপূর্ণ। হযরত শাহ আব্বাস আলী তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন শাহ সোন্দল অর্থাৎ তোমার যশ গৌরব জগদ্বাসীর নিকট চন্দন কাঠের ন্যায় সুগন্ধ বিতরণ করতে থাকুক। হযরত শাহ জয়েন উদ্দীন (র.) এর প্রদত্ত উপাধি ইহাই প্রমাণ করতেছে যে, আব্দুল্লাহ সুফী দিগের মধ্যে চন্দন তুল্য ছিলেন।

(২০) হযরত মুহাম্মদ হাসান (রহ.)। তার পবিত্র আস্তানা চব্বিশ পরগনা জিলার হাসানাবাদ গ্রামে।

Dhaka University Institutional Repository

(২১) হযরত আব্দুল লতিফ (রহ.) তার পবিত্র আস্তানা চব্বিশ পরগনা জিলার বর্তমান সোনাপুর গ্রামে। যে সময় ইনি এখানে আগমন করেছিলেন তখন স্থানটির নাম ছিল হরিপুর। পরে মোঘল সম্রাট জালালুদ্দীনমুহাম্মদ আকবরের সময় হরিপুর সোনারপুর নাম গ্রহণ করেছে।

(২২) হযরত মুহাম্মদ দায়েমঃ তাঁর পবিত্র আস্তানা চব্বিশ পরগনা জিলার বর্তমান ডায়মন্ড হারবারে। যখন ইনি এখানে শুভাগমন করেছিলেন তখন ঐ স্থানের নাম ছিল শিবতলা। ইনি ওফাত করলে তাঁর লাশ কবরস্থ করা হয় এবং স্থানটির নাম দেয়া হয় দায়েম হাড়োয়া। এক্ষনে উক্ত দায়েম হাড়োয়া নাম অপভ্রংশ হয়ে জয়মন্ডু হারবার নাম গ্রহণ করেছে।

উল্লেখিত যে বাইশজন দরবেশের পরিচিতি লিপিবদ্ধ হল তাদের আরও দুটি খেতাব আছে। সে খেতাব দু'টির প্রথমটা হচ্ছে তাদের নামের প্রথমে 'শাহ' খেতাব এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'গাজী' খেতাব যারা অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে ইসলাম বিরোধী শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন তারা যেমন গাজী উপাধিতে ভূষিত হন, তেমনি যারা নফসে আম্মারাকে পরাস্ত করে আল্লাহর পথে জয়যুক্ত হন, তারাও তেমনি গাজী উপাধিতে গৌরবের যোগ্য হন। [১০৩]

পূর্ব বঙ্গে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সিলেটের হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর অনুসঙ্গী বিরাট দরবেশ বাহিনীর অবদানই যে সর্বাপেক্ষা তা অবশ্য স্বীকার্য। সিলেট বিজিত হওয়ার পর হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গী দরবেশদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলামের বাণী বহন করে বিভিন্ন স্থানে গমন করেন এবং নানা স্থানে তাদের মাজার মাকবেরা আজও বিদ্যমান আছে।

ইতিহাসবিদ সৈয়দ মুর্তাজা আলী বলেন গিয়াস উদ্দীন ও দেলওয়ার লতিফ ঢাকা জেলার সোনারগাঁয়ে সমাহিত আছেন। তাঁর মতে শাহ বদরের মাযার করিমগঞ্জের বদরপুরে অবস্থিত। তিনি আরও বলেন, সম্ভবতঃ এই শাহ বদরই চট্টগ্রামের বিখ্যাত বদরপীর। সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে যে বহুসংখ্যক ওলী দরবেশ দেশের এই অঞ্চলে আগমন করেন, শাহ মালেক (রহ.) তাহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকা অঞ্চলে ইনি বিশেষ ভাবে ইসলাম প্রচার করেছেন বলে জানা যায়। সরকারী দফতর খানা ইডেন বিল্ডিং এর দক্ষিণ পূর্ব কোণে রাস্তার অপর পার্শ্বে তার মাজার বিদ্যমান।

শাহ কামালঃ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর শাগরিদ দের মধ্যে একই নামের তিনজন সুফী দরবেশ ছিলেন এবং তারাই হয়তো গারো পাহাড় ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চল ও কুমিল্লা এলাকায় ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। তারা যে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সঙ্গে এই দেশে আসেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ভিন্নমতে শাহ কামাল সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

ইসলাম প্রসঙ্গ গ্রন্থে 'ইসলাম প্রচারে হযরত শাহজালাল মুজররদের ভূমিকা প্রবন্ধে সুফী পন্ডিত' ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, হযরত শাহজালাল তাঁর শিষ্যগণ সৈয়দ জাফর, সৈয়দ আব্দুল গফুর, সৈয়দ ইব্রাহিম, সৈয়দ ইসমাইল, সৈয়দ ইসহাক, সৈয়দ মৌলভী রওশন আলী, সৈয়দ গোলাম মর্তুজা, শাহ জালাল, শাহ কামাল, সৈয়দ শাহ আকরম আলী এবং শাহ আম্বিয়াকে

---

১০৩. হযরত শাহজালাল (রহ.), প্রাগুক্ত পৃ- ৪১০-৪১৪

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরা জেলায় ইসলাম প্রচারে পাঠান এবং মৌলানা হাফিজ আহমদ শাহ হাফীবুল্লাহ, শাহ মুহাম্মদ দাঈম, শাহ ওয়ালীয়ুল্লাহ, শাহ রওশন আলী, শাহ আহমদুল্লাহ, প্রমুখকে তাবলীগের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন। তিনি নানা শাহ, হারুন শাহ, ইনয়াত কমরবস্তা, মাহবুব শাহ, মিয়া সাহেব বোগদাদী, সৈয়দ আহমদ ওরফে কল্লাহ শহীদ প্রমুখকে নোয়াখালী জেলায় পাঠান। কাছাড় রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হযরত শাহজালালের খলিফাগণ ইসলাম প্রচার করেন। কথিত আছে যে, জেলা ২৪ পরগনার পীর সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোরাচাঁদ তাঁর খলিফা ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হন। তাঁর মাযার জেলা ২৪ পরগনার বসির হাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে আছে। সেখানে প্রতিবৎসর ১২ই ফালগুন তার উরস উপলক্ষ্যে মেলা হয়।[১০৪]

পন্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মরহুম পীর গোরাচাঁদের বংশানুক্রমিক লাখেরাজ ভোগী খাদেমানের একজন। হযরত সৈয়দ আব্বাসের নাম হযরত শাহজালালের খলিফাগণের তালিকায় পাওয়া যায়।

সিলেট জেলার সর্বত্র হযরত শাহজালার (রহ.) এর সঙ্গী বহু দরবেশ ইসলাম প্রচার করেন। তাদের মাজার মাকাবেরা গনমানসে আজও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। তাদের মধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর ভাগিনা অন্যতম সঙ্গী ওলীয়ে কামিল হযরত শাহ পরান (রহ.) এর মাজার সিলেটে খুবই জনপ্রিয় ও সম্মানিত। খাজা আদিনার নামানুসারে সিলেটের বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়। একই নামের আরেকটি মসজিদ পান্ডুয়ায়ও নির্মিত আছে। হাজী সৈয়দ ইউসুফ, বুরহান উদ্দীন কাত্তাল, আহমদ নিশান বরদার আরিফ সুলতানী, শায়খ আব্দুল্লাহ, সৈয়দ উমর সমরকান্দী, হাজী খলিল, হাজী দরিয়া, হাজীগাজী, যাকারিয়া আরবী, রওশন চেরাগ, মানিক পীর, শাহ তাজ উদ্দীন কুরাইশী, শাহ হেলিম উদ্দিন কুরাইশী।

সুলেমান করনী কুরাইশী, শাহ সুলতান, শাহ সিকান্দর, জাফর গজনভী, শাহ দাউদ, জুনাইদ গোজরাটি, সৈয়দ হামজা, কাজী ইলিয়াছ, শায়খ খিজির, সৈয়দ আহমদ কবির, পাঁচপীর, সৈয়দ তাজ উদ্দীন, শাহ আলাউদ্দীন হাফিজ আতাউল্লাহ, শাহ কালা, শাহ কামাল ইয়ামনী, শাহ গায়রু, শাহ মোস্তফা, আদম খাকী, দাওরনাম খতিব, শায়খ কালু, শামসুদ্দীন বিহারী, শাহ পাতা, শাহ সুন্দর, গরম দেওয়ান, জিন্দাপীর ও নিজাম ওসমানী প্রমুখ দরবেশ সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। সিলেটের বিভিন্ন স্থানে তাদের মাজার মাকবারা অবস্থিত। ৩৬০ আউলিয়ার বিবরণ সিলেটের সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তাঁদের সকলের বিস্তৃত কাহিনী তাদের ত্যাগ ও তিতীক্ষার ইতিহাস আজ হয়তো আর আমাদের জানা নাই। কালের অতল তলে সবই বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইসব ওলী-দরবেশের সাধনার দানেই যে এই এলাকা আজ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই কথা জাতি কোন দিনই ভুলতে পারবেনা।[১০৫] কেবল তাহাই নহে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে তাদের অবদান চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

---

১০৪. ইসলাম প্রসঙ্গ, পৃ- ৯৯।

১০৫. চৌধুরী শামসুর রহমানঃ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো, (ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স), পৃ- ৮২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে কোনো বিশেষ কালের ইতিহাস চর্চায় মুদ্রার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কোনো বিশেষ সময়ে প্রচলিত মুদ্রা শুধুমাত্র শাসকের কাল নির্দেশক নয়। সে সময়ের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিচয়বাহী।

কয়েকবছর পূর্বে (ভারতের) করিমগঞ্জ শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আয়লা বাড়ী চা বাগানে বিভিন্ন মুল্য মানের ১৭৭টি মুদ্রা পাওয়া গেছে। বর্তমানে মুদ্রাগুলি গুয়াটিস্থিত আসাম রাজ্য সংগ্রহশালায় রয়েছে। এখানে একটি সংগ্রহে জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১ ঈ.) নাসির উদ্দীন মহাম্মদ শাহ (১৪২২-৫৯ ঈ.) এবং রুকনুদ্দীন বরবক শাহের (১৪৫৯-৭৪ঈ.) আমলের মুদ্রা পাওয়া গেছে।

সুলতানী আমলে মুসলিম মুদ্রা ব্যাপক ভাবে সিলেটে ও প্রচলিত ছিল। সিলেটের বিভিন্ন সময়ের শাসনকর্তাদের সময়ে সিলেট যে তাদের শাসনাধীন ছিল তা মুদ্রায় সাক্ষেও জানা যায়। ডক্টর আব্দুল করিমের পরীক্ষিত শামসুদ্দীনফিরুজ শাহের (১৩০১-১৩২২ঈ.) সকল মুদ্রা সিলেটে পাওয়া গেছে। এসব মুদ্রা হযরত জালাল লখনৌতি ও হযরত জালাল সোনারগাঁও টাকশালে উৎকীর্ণ ৭০৪হি. (১৩০৪ ঈ.) এর মুদ্রা সিলেট শহরের খাসদবীর ও কালীঘাট মহল্লায় পাওয়া গেছে। ফখর উদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৮-৪৯) মুদ্রা হযরত জালাল সোনারগাঁ টাকশালে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

মুদ্রা শিলালিপি সনদ সমকালীন ইতিহাস ও দলিল পত্র ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য উপাদান্ মুদ্রার সাক্ষে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম বাংলার অন্যান্য জেলার মত সিলেট ও বাংলার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল। সিলেটের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এক সময় সিলেট পুর্ববঙ্গের চন্দ্র বংশীয় রাজাদের অধিকারে ছিল। কয়েক বৎসর আগে সিলেট জেলার চন্দ্র বংশীয় রাজাদের আটটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।

জগন্নাথপুরে একটি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায় যাতে বাংলা লিপিতে রাজা বিজয় মানিক্য শ্রী শ্রী দেব্যাশকে ১১১৩' মুদ্রিত ছিল। গ্রন্থকার অনুমান করেন দ্বাদশ শতাব্দীতে লাউড়ে বিজয় মানিক্য নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন ও এই মুদ্রা তার আমলের। প্রকৃত পক্ষে এই মুদ্রা ত্রিপুরার মহারাজা বিজয় মানিক্যের যিনি ১৪৫১ থেকে ১৪৮২ শতাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। তাঁর রাণী লক্ষীর নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে।[১০৬] বিজয় মানিক্য জৈন্তা জয় করেছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। সম্ভবত জগন্নাথপুরে প্রাপ্ত উক্ত মুদ্রা ১৪৫৩ সনের ছিল।

সিলেট ৭০৩ হিজরী (১৩০৩ সাল) মুসলমানদের শাসনে আসে। ঐ সময়ে সামসউদ্দীন ফিরোজ শাহ -

---

১০৬. বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) পৃ- ৪৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৩০১ থেকে ১৩২২ ঈসায়ী। তাঁর আমলের ৭০৪ হিজরী (১৩০৪ঈ.) একটি মুদ্রা সিলেট শহরের কালীঘাট মহল্লায় পাওয়া গেছে। সামস উদ্দীন ফিরোজের অব্যবহতি পূর্ববর্তী বাংলার সুলতান রুকন উদ্দীন কায়কৌস (১২৯১-১৩০১ঈ.) এর একটি মুদ্রাও কালিঘাটে পাওয়া গেছে। মনে হয় সিলেট বিজয়ের সময় এই মুদ্রা এসে থাকবে। ফিরোজ শাহের পরবর্তী শিহাব উদ্দীন বোগদাশাহ (১৩১৭-১৮) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুরশাহ (১৩২২-২৮) ফখর উদ্দীন মোবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯) ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ (১৩৪৯-৫২) শামছ উদ্দিন ইলিয়াছ শাহ (১৩৪২-৫৮) ও সিকন্দর শাহের (১৩৫৮-৯০) মুদ্রা ও সিলেট জেলায় পাওয়া গেছে।

সিলেট জেলার চুড়খাইতে জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ (১৪১৮-৩৩) ও শাসম উদ্দীন আহমদ শাহের (১৪৩৩-৩৬) মুদ্রা পাওয়া গেছে। সিলেটের প্রাচীনতম শিলালিপি রুকনুদ্দীন বরকত শাহের (১৪৫৫-৭৬) আমলের। তাঁর সময়ের একটি মুদ্রা সিলেট জেলার বাশাইল স্থানে পাওয়া গেছে। তার পুত্র শামস উদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮০) এর সময়ের মুদ্রা সিলেটের কাকরীবাগ ও বাশাইলে পাওয়া গেছে। আলা উদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এর অনেক গুলি মুদ্রা সিলেটের কাকারীবাগ ও রাউতখাইতে পাওয়া গেছে। এর পরের সুলতান নসরৎ শাহ (১৫৩৩-৩২) গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮) ও বরক শাহের মুদ্রা ও সিলেট জেলায় পাওয়া গেছে।[১০৭]

আরবী ফার্সী শিলালিপি

রুকনুদ্দীন বরবক শাহঃ সিলেট জেলায় মুসলমান আমলের যে সকল শিলালিপি পাওয়া গেছে তন্মধ্যে হাটখোলায় (বর্তমান ভারতের কাছাড় জেলায়) প্রাপ্ত শিলালিপিই সর্ব প্রাচীন। শিলালিপির বঙ্গানুবাদ এই 'রাসুল বলেছেন' যে দুনিয়াতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তালা তার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ নির্মান করেন। সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র ন্যায় পরায়ন বরবক শাহ সুলতানের আমলে বাদশাহের প্রাসাদ রক্ষক খোরশেদ খান কর্তৃক ৮৬৮ হিজরী ৫ই সফর তারিখ (১৪৬৩ সালের ১৯ অক্টোবর) নির্মিত।[১০৮]

রুকন উদ্দীন বরবক শাহ ১৪৫৯ সাল হতে ১৪৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীন বাদশাহ ছিলেন। ইদানিং এই বাদশাহের আমলের আর একটি শিলালিপি সিলেটের গায়ীদিঘীতে পাওয়া গেছে। ঐ শিলালিপির যতটুকু পড়া গেছে তা এই।

নবী বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে তার জন্য সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মাহমুদ শাহ সুলতানের পুত্র রুকুনুদ্দীন আবুল মুযাফফর বরবাক শাহ সুলতান। উলূয খান খানে খাজান। অনুমান হল এই শিলালিপি ১৪৬৪ - ৬৫ সালের।

---

১০৭. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ২৭২-২৭৩।

১০৮. Inscription of Bengal Vol IV, P-7

Dhaka University Institutional Repository

শামস উদ্দীনে ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১)

রুকুনদ্দীন বরবক শাহরে পুত্র শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলের তিন খানা শিলালিপি সিলেট ইউসুফ শাহের আমলের প্রাচীনতন শিলালিপি শাহজালাল (রহ.) দরগায় আছে এর বঙ্গানুবাদ এই আল্লাহ বলেছেন 'মসজিদ আল্লাহর জন্য' নবী বলেছেন যে দুনিয়াতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তালা বেহেশতে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই সময় বরবক শাহের পুত্র ন্যায়পরায়ন ইউসুফ শাহের সময়ে নির্মিত। বিখ্যাত দস্তর মজলিস এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। খোদা তালা তাঁকে দু'জাহানের মসিবত থেকে রক্ষা করুন।

৮৮৭ হিজরী রবিউল আখের চান্দে সমাপ্ত হন। ১৪১৭ ঈসায়ী।

ইউসুফ শাহ ১৪৭৪ ঈসায়ী সিংহাসনে বসেন। বোধ হয় এই মসজিদ নির্মাণের সময় তিনি পিতার অধীনে পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। এই মসজিদ গৌড়ের বিখ্যাত আদিনা মসজিদের অনুকরণে সিলেট শহরের চৌকিদীঘি মহল্লায় নির্মিত হয়েছিল। সিলেটের ফৌজদার ইসফিন দিয়ার খার হুকুমে এই মসজিদ নষ্ট করা হলে প্রস্তর লিপি শাহজালাল (রহ.) দরগায় স্থানান্তরিত করা হয়।

মৌলভী বাজার শহরের তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিম গয়ঘড় মৌজায় খোজার মসজিদ নামে একটি মসজিদ আছে। উক্ত মসজিদের শিলালিপির অনুবাদ এই। "আল্লাহ তালা ও রসুল বলেছেন- যে দুনিয়াতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তালা বেহেশতে তার জন্য সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সুলতান মাহমুদ শাহের পৌত্র সুলতান বরবক শাহের পুত্র সুলতান শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলে এই মসজিদ নির্মিত হয়। হাজী আমীরের পৌত্র ও মুসার পুত্র বিখ্যাত মন্ত্রী মজলিসে আলম ৮৮১ হিজরীতে (১৪৭৬ ঈ.) এই মসজিদ নির্মাণ করান।

শাহজালাল (রহ.) দরগায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে উল্লেখিত মজলিস ও খোজার মসজিদের মজলিস আলম বোধ হয় একই ব্যক্তি। উভয় নির্মাতা মন্ত্রী ছিলেন ও দুইটি মসজিদ চারি বৎসর ব্যবধানে নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদটি বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় আছে। মুন্সী আশরফ হোসেনের মতে এই মসজিদটি একটি হিন্দু মন্দির ছিল দেয়ালে আঁকা ত্রিশুল, মঙ্গল কলস, দেবমুর্তি দক্ষিণ দিকে দরজা ও দক্ষিণের পুকুরের অবস্থান থেকে এ কথা বুঝা যায়। মনে হয় মন্দিরটিকে সংস্কার করে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে। [১০৯]

মেখেতারপুর পরগনার তিলাপাড়া গ্রামে ইউসুফ শাহের আমলের আর একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এর বঙ্গানুবাদ আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে বলেছেন "মসজিদ একমাত্র আল্লাহর জন্য।" রাসুল বলেছেন- "যে দুনিয়াতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তালা বেহেশতে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।" ৮৮৪ হিজরী (১৪৭৯ ঈ.) রবিউল আউয়াল চাদের দশ তারিখে মাহমুদ শাহের পুত্র সুবিচারক ইউসুফ শাহের আমলে তার মন্ত্রী মালিক সিকান্দর এই মসজিদ নির্মাণ করেন। যে ব্যক্তি এই মসজিদের অকফ নষ্ট বা হস্তান্তর করবে আল্লাহর দরগায় সে মরদুদ ও গাধার বত্তা হবে। হুগলী জেলার পান্ডুয়াতে ৮৮২ হিজরীতে আর একটি মসজিদ তৈরী হয়। উক্ত মসজিদের শিলালিপি তিলাপাড়া মসজিদের অনুরুপ ।

---

১০৯. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ- ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

আলা উদ্দিন হোসেন শাহঃ

ইউসুফ শাহের পরবর্তী কয়েকজন সুলতানের আমলের কোন শিলালিপি সিলেট জেলায় পাওয়া যায় নি। আলা উদ্দিন হোসেনশাহের আমলের ছয়খানি শিলালিপি সিলেট জেলায় পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রাচীনতম হযরত শাহজালাল (রহ.) দরগাহ শরীফে দ্বারদেশে। এর অনুবাদঃ পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামে কলিয়ার অধিবাসী চির কুমার জালাল এই মসজিদ নির্মাণের হুকুম দেন। আল্লাহ তায়ালা এই মসজিদকে সময়ের অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। এই মসজিদ সুলতান আলা উদ্দীন হোসেন শাহের আমলে ৯১১ হিজরী (১৫০৫ঈ.) মোয়াজ্জামাবাদের সেনাপতি ও মন্ত্রী খাওয়াস খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

শিলালিপিতে উল্লেখিত হযরত শাহজালাল (রহ.) আদেশ বোধ হয় স্বপ্নে প্রত্যাদেশ রূপে আসে। আলা উদ্দীন হোসেন শাহের আমলের সিলেট প্রাপ্ত ৯১৮ হিজরীর শিলালিপী ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত।

এর অনুবাদঃ মোহাম্মদের পুত্র চির কুমার জালালের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে সুলতান ফিরুজ শাহ দেহলভীর সময় ৭০৩ হিজরীতে (১৩০৩ ঈ.) সিকন্দর খান গাজী সর্ব প্রথম সিলেটে মুসলমানদের অধিকার স্থাপন করেন। হযরত গামহারিয়ান (?) বিজয়ী রুকন খান এই অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তিনি বাংলার সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন ও কামরু (কামরূপ) কামতা (রংপুর জেলার কামতাপুর) জাজিনগর (উড়িষ্যায় জাজপুর) ও উড়িষ্যা বিজয়ের সময় সুলতানের বাহিনীতে সেনাপতি ছিলেন। ৯১৮ হিজরী (১৫১১ ঈ.) নির্মিত।

তরফ পরগনার দাউদ নগরের শাহ আহমদ উম্মার বাড়ীর সংলগ্ন মসজিদ গোত্রে আর একটি শিলালিপি আছে। ঐ শিলালিপি পাঠে জানা যায় ত্রিপুরার সেনাপতি ও মোয়াজ মাবাদের মন্ত্রী খোয়াস খান ৯১৯ হিজরীতে (১৫১৩ ঈ.) ঐ মসজিদ নির্মাণকরান। খোয়াস খান ঐ সালে ময়মনসিংহে আরও একটি মসজিদ তৈরী করান।

দাউদ নগরের শিলালিপি থেকে জানা যায় খোয়াস খাঁর অধিকার তরফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিলেট শহরের চৌকিদেখী মহল্লায় শাহনুরের দরগায় আলা উদ্দীন হোসেন শাহের সময়ের অপর একখানা শিলালিপি আছে।[১১০]

হযরত শাহজালাল (রহ.) দরগার অন্যান্য শিলালিপি

১। একটি শিলালিপি এই, সখত সৈয়দ জালাল বাহারে সওয়াব মসজিদে কে আনদরু নাসত'। সালে তারেখাস আজ কালাক গুযাত বিন গারতুদার। অর্থাৎ সৈয়দ জালাল সাওয়াব হাসিলের জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করলেন। এর ভিতরে তৈরী করার তারিখ ১০৭৪ হিজরী (১৬৬৪ ঈ.)

---

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

২। হযরত শাহজালাল (রহ.) দরগাহ শরীফের মসজিদের বারান্দা আর একটি শিলা লিপি এই, শুকুর উল্লা মসজিদে আলী বলাবস বসকা কান্দারাউ বাসদ ইজাবত্রা সবকত বরদুয়া দার আহদে শাহ আন শাহে শাহজাহান আওরঙ্গজেব আকে আজা দলাস বনাজাদ আরজ হরদম বের সামা আখতরী বুরজে সিখন্দা ও সাহবো সায়েফা ও কালাম মারি আব্দুল্লা শিবজী জে সেদক দিলবানা মুমীনায়া সুদ নিদা সালতামীল ইউন চুনীন কাবায়েছানী বনাসুদ সজদা হয়ে বয়াদ বাজে।

অর্থাৎ- আল্লাহকে ধন্যবাদ। এর ভিতরে প্রার্থনা অন্যান্যের উপর। অনেক কৌশলের সহিত এই মসজিদ শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেবের (যার ন্যায় বিচারের জন্য দুনিয়া আকাশের চেয়ে গৌরবান্বিত সময়ে সৈয়দ বংশীয় মীর আব্দুল্লাহ সিরাজীর পবিত্র মনে তৈরী করান। এটি তৈরী করার তারিখ সম্পর্কে দৈববানী হল দ্বিতীয় কাবা তৈরী করা হল। উপযুক্ত প্রার্থনা করা দরকার।'

এই শিলালিপি দরগার পুকুরে পূর্বদক্ষিনস্থ মসজিদে ছিল। আবজাদ হিসাব অনুযায়ী এই মসজিদ নির্মানের তারিখ ১১১০ হিজরী (১৬৯৯ ঈ.) পাওয়া যায়। আব্দুল্লা সিরাজী ঐ সময়ে সিলেটের ফৌজদার ছিলেন।

(৩) অন্য একটি শিলালিপি এই- বা হামদুল্লাহবানায়া গম্বুজ খাস কে বা আকলক দর দহম ওয়াসাকেবাহদে শাহে আওরঙ্গজেব আদিল বা তাওফিকে এলাহী হায়ে বাকে জেসিদকে নিয়তে ফরহাদ খানী মরওব গসত দর আলী রওয়াকে পাখী তারিখ হাতিফ ই দুয়া গোযাত বুয়দে চুন গম্বুদে আপলক বাকী।

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা। এই বিশেষ গম্বুজ যা আকাশের মত শক্তিশালী বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার সাহায্যে ফরহাদ খান অকপট চিত্তে তৈরী করান। এর তারিখ সম্বন্ধে ফেরেশতা বললেন 'এটি যেন আকাশের মত স্থায়ী হয়।

এটি শাহজালালের দরগার সবচেয়ে বড় মসজিদের গাত্র সংলগ্ন। এর নির্মাণের তারিখ ১৯৮৮ হিজরী (১৬৭৮ ঈ.) ঐ সময় ফরহাদ খান সিলেটের ফৌজদার ছিলেন।

(৪) আর একটি শিলালিপি এই-

বা ফৌজদারিয়া বাহরাম খান ওয়ালা কদর রশিদ জুদ বয়েতমান ইয়ে বানায় আজিম সবুলে গায়েব বামান গোফত সালে তারেখাম কেবেগু গসস সালে তারেখাম কেবেগু গসত বেনায়ে মসজিদ আজ ইব্রাহীম।

অর্থাৎ- মহামান্য ফৌজদার বাহরাম খানের আমলে এই মহৎ দালান শীঘ্র তৈরী হল। অজানিত রাজ্যের ফিরিশতা এটি তৈরীর তারিখ বললেন- বল মসজিদটি ইব্রাহিম তৈরী করেছে। এই মসজিদ ১১৫৭ হিজরী (১৭৪৪ ঈ.) তৈরী হয়েছে। [১১১]

---

১১১. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, প্রাগুক্ত পৃ- ২৬৪, ২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈসালে সওয়াব ও উরস-ই-শাহ্জালাল (রহ.)

ঈসাল বাবে ইফয়াল এর মাছদার রূপ অর্থ পৌছানো এবং সওয়াব অর্থ পুণ্য বা নেক কাজ। তাই ঈসালে সওয়াব অর্থ সওয়াব পৌছানো। নিজে নেক কাজ করে তার সওয়াব অন্যজনকে বখশিয়ে দেয়া। শরীয়তের পরিভাষায় আর্থিক ইবাদত যেমন সাদকাহ, খয়রাত ইত্যাদি। দৈহিক ইবাদত যেমন নামাজ রোজা তেলাওয়াতে কুরআন মজিদ ইত্যাদির সওয়াব অন্যকে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু তার মেহের বানীগুণে পৌছে দেন।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের এ বিষয়ে ইজমা বা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে।

হযরত ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে দৈহিক ইবাদতের সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে না। হযরত ইমাম শাফী (রহ.) মতেও শুধুমাত্র আর্থিক ইবাদতেরই সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে। কিন্তু পরবর্তী শাফী উলামায়ে কেরামের মতে দৈহিক ইবাদতের সওয়াবও মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে। কাজেই সুন্নী হানাফী মতের সিদ্ধান্তই সর্বজন মান্য হয়েছে।[১১২]

শরহে আকাইদ আন নছফী নামক নির্ভরযোগ্য আকাইদ বিষয়ক কিতাবের ভাষ্য হচ্ছে -

وفي دعاء الاحياء للاموات وصدقتهم اي صدقة الاحياء عنهم اي عن الاموات نفع

لهم– اي للاموات– ১১৩

অর্থাৎ- জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য দোয়া এবং ছদকা খয়রাত করা তাদের উপকার সাধিত হয়। অর্থাৎ এর ছওয়াব তাদের নিকট পৌছানো হয়। মুল কিতাব ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন হাদীসের আলোকে কতিপয় প্রমাণ পেশ করেছেন

(১) মৃত মুমিনদের জন্য দোয়া করতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان–

(২) মাতা পিতার জন্য দোয়া করার জন্য আল্লাহতায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন-

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

(৩) ফেরেশতাগন জগৎ বাসীর জন্য ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেন-

ويستغفرون لمن في الارض–

(৪) হামালাতুল আরশ তথা আল্লাহ্র আরশ বহনকারী ফেরেশতাগন বিশেষতঃ মুমিনদের জন্য ইস্তেগফার করে থাকেন- يؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا

---

১১২. মাসিক পরওয়ানা, জানুয়ারী ১৯৯৩, (ঢাকা, ফকিরেরপুল) পৃ. ৯

১১৩. আকাইদ আন নসাফী উর্দু শরাহ আকদুল ফরাইদ আলা শারহিল আকাইদ, পৃ. ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

(৫) নবী করিম (সা.) নিজ হাত মুবারক দ্বারা দু'টো দুম্বা কুরবানী করলেন একটি উম্মতের জন্য অপরটি নিজের জন্য।

শরহে আকাইদের নছফীতে তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

(১) ছহীহ হাদীস শরীফে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া বড় উল্লেখ রয়েছে। বিশেষত জানাযার নামাজ ছালফে ছালিহিনদের থেকে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যদি উহা দ্বারা মৃতদের উপকার না হয় তবে তা নিরর্থক হতো।

(২) নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন-

ما من ميت تصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون الاشفعوا فيه

কোন মৃত ব্যক্তি যার জন্য শতজন মুসলমান নামাজ (জানাযা) পড়ে ওরা সকল তার জন্য সুপারিশ কারী হবেন এবং তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।

(৩) সাদ বিন উবাদাহ হতে বর্ণিত তিনি বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার মাতার ইন্তেকাল হয়ে গেছে এখন কোন প্রকার ছাদকাহ তার জন্য উত্তম। তখন নবী করিম (স.) উত্তরে বললেন পানি। তখন সাদ ইবনে উবাদ একটি কুপ খনন করলেন এবং বললেন এটা উম্মে সাদের কুপ।

وعن سعد بن عباده انه قال يا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ام سعد ما تت فاي

الصدقة افضل قال الماء فحفربئرا وقال هذا لام سعد– [১১৪]

এছাড়া ঈসালে সওয়াবের প্রমাণ অনেক হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلثة الا من

صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله– (رواه مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত মানুষ মারা যাওয়ার পরে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবল তিনটি বাকী থাকে, সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম ও নেক সন্তান যারা তাঁর জন্য দোয়া করে। (মুসলিম) এখানে যে তিনটি আমলের কথা বলা হয়েছে তা মূলতঃ মৃত ব্যক্তিরই আমল। আর এগুলোরকারণেই সে মৃত্যুর পর সওয়াবের ভাগী হয়।

(২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত -

ما الميت في قبره الا شبه الغريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب وام اواولد

اوصديق ثقة فاذا لحقته كان احب اليه من الدنيا–

অর্থাৎ- কবরে মৃতদের অবস্থা, আর্তনাদকারী ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। সে অপেক্ষা করতে থাকে দোয়ার তার মা, বাবা, সন্তান, নির্ভর যোগ্য বন্ধুর যখন তাদের পক্ষ থেকে এ দোয়া তার আমল নামায় মিলিত হয় তখন উহা হয়ে থাকে দুনিয়ার সমস্থ বস্তু থেকে তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।[১১৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ঈসালে সওয়াব কোরআন ও হাদিস দ্বারা অতীব উত্তম কাজ হিসেবে প্রমাণিত হল। ওলী আউলিয়াগণ আল্লাহর মাকবুল ও মাহবুব বান্দাহ। ইন্তেকালের মাধ্যমে তাঁরা মাওলায়ে হাকিকির সান্নিধ্য অর্জন করে থাকেন।

---

১১৪. আকদুল ফরাইদ আলা শারহিস আকাইদ, পৃ- ২৯৭, ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

কবর জিয়ারতের মাধ্যমে ও ঈসালে সওয়াব করা হয়ে থাকে। কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। সপ্তাহে অন্তত একদিন কবর জিয়ারতে যাওয়া উত্তম। জুমআর দিন হলে আরও ভালো। ছহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন- "আমি কবর জিয়ারত করতে মানা করছিলাম, এখন আবার অনুমতি দিলাম তোমরা জিয়ারত কর।"

কবর জিয়ারতের মাধ্যমে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি জন্মায় এবং মওতের কথা মনে পড়ে। এ মর্মে হাদীসের উল্লেখ রয়েছে।

আউলিয়ায়ে কেরাম বুযুর্গানে দ্বীনের কবর জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা জায়িজ। আল্লামা শামী 'রাদ্দুল মুখতার' কিতাবে লিখেন জুমআর দিন অথবা জুমার আগের দিন অথবা জুমার পরদিন কবর জিয়ারত করলে কবরবাসী জিয়ারত কারীকে চিনতে পারে।

আওলিয়ারে কিরামের রওজা ও মাজার শরীফ থেকে বহুবিধ ফয়েজ জারী থাকে, সেহেতু জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর নিরর্থক নয়।

কবর জিয়ারত ইসলামে কোন নূতন সংযোজন নয় স্বরং হুজুর পাক (সা.) জান্নাতুল বাকীতে জিয়ারত করেছেন। জিয়ারতের পদ্ধতি ও মাসনুন দোয়াও শিক্ষা দিয়েছেন। পূর্বকাল থেকে এর শরয়ী প্রচলন এসেছে- হযরত ইমাম শাফী (রহ.) বলেছেন, "হযরত ইমাম মুসা কাযিম (রহ.) মাজার মুবারকে বিদ্যুৎ বেগে দু'আ কুবুল হয়। ইয়াহিয়া উলুমুদ্দীন কিতাবে হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এর কবর জিয়ারতের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আলী বিন সায়মুন বলেন- ইমাম শাফী বলেছেন, "আমি প্রত্যেক দিন ইমাম আবু হানিফার কবর (বাগদাদ অবস্থান কালে) জিয়ারত করতাম। আমার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে দু রাকাত নামাজ আদায় করে ইমাম আবু হানিফার কবর জিয়ারত করে আমার প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তালার কাছে মোনাজাত করতাম। অল্প দিনের মধ্যে আমার উদ্দেশ্য সাধন হত। (আল্লাহ তালা সকল ইমামগণের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন)।

খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) বলেন- একবার হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)'র মাজার জিয়ারত করার সময় আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগল- আমরা যে জিয়ারতে আসি এ বিষয়ে কবর বাসী ওলীগণ অবগত হন কিনা? অতঃপর আমি মাযারের পাশে মুরাকাবা অবস্থায় বসলাম এবং বখতিয়ার কাকীর (রহ.) কবর থেকে একটি কবিতা শুনলাম-

মরা জিন্দা পন্দার চু খেশতন
মন আয়ম বজান গরতু আয়দ বতন।[১১৫]

অর্থাৎ আমাকে জীবিত বলে মনে কর। তুমি যদি শরীর নিয়ে আস তবে আমি রুহসহ উপস্থিত আছি।

মৃত ব্যক্তির শোকে কাপড়ছেড়া, গাল মুখে কপালে থাপপর মারা, বুক থাপড়ানো এ ধরণের নানা ভাবে হা হু তাশ করা নাজায়েজ। হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) রনাঙ্গনে কারবালার প্রান্তরে আহলে বাইতের উদ্দেশ্যে নছিহত করতে গিয়ে নিজেই নিষেধ করেছেন। অজ্ঞতা বশতঃ এ ধরণের কাজকে কেউ কেউ সওয়াবের কাজ মনে করে অথচ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে হযরত নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন- "যারা মুখে থাপপর মারে অথবা কাপড় ছিড়ে তারা আমার দলভুক্ত নয়।"

---

১১৫. ইমাদ উদ্দীন মাওলানা চৌধুরী, আদর্শ গল্প সংকলন (ইমাম ছিনওয়ী রচিত আখবারু আবু হানিফা ও আসহাবিহি ও ছিয়রে নিজামীর অনুদিত সংশ্লিষ্ট অংশে) (সিলেট, ফুলতলী ছাহেব বাড়ী, ২০০৪ঈ, সং৪) পৃ- ১৭ ও ২৪, ২৫

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ্য যে, নীরবে অশ্রুপাত করায় দোষ নেই বরং সাওয়াবের কাজ। ঐ নিয়মে তেলাওয়াতে কুরআনে পাক, ইস্তিগফার তাসবিহ তাহলিল ইত্যাদির মাধ্যমে ইছালে ছওয়াব হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, কোরআন মাজিদ তিলাওয়াত করে তার সওয়াব অন্যদের জন্য বখশিয়ে দেয়াকে ফাতিহা বলে। সম্ভবত সুরা ফাতিহা দ্বারা তিলাওয়াত শুরু করা হয়, বিধায় তাকে 'ফাতিহা' বলা হয়।

প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাব 'বাহরুর রায়িকের' বর্ণনামতে ইবাদত করার সময় যদি অন্যকে সওয়াব দানের নিয়ত না করা হয়ে থাকে তথাপিও সে ছওয়াব পরবর্তীতে অন্যকে দানের নিয়ত করা সহীহ এবং যথারীতি ছওয়াব পৌছবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ অনুগ্রহ যে, যে ব্যক্তি নিজের আমলের ছওয়াব অন্যকে বখশিশ করে দিবে সে নিজে মাহরুম হবে না বরং নিজেও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। উলামায়ে কিরাম বুযুর্গানে দ্বীন তাদের কিতাব সমূহে উল্লেখ করেছেন যে, যখনি কোন মুসলমান কোন নফল ইবাদত করে তার উচিত সে যেন তা সকল মুমিন মুসলমানদের রূহে পৌছবার নিয়ত করে তাতে সে নিজে যেমন সওয়াবের হকদার হয় ঠিক তেমনি ভাবে তামাম মু'মিন মুসলমানের পবিত্র আত্মা সমূহের কাছে সওয়াব পৌছে। উল্লেখ্য যে, সকল মুমিন মুসলমানদের রুহে সওয়াব পৌছাবার নিয়ত করায় নিজের ভাগে ডবল সওয়াব পাওয়ার জোর সম্ভাবনা থাকে। কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ইবাদতের সওয়াব অন্য কয়েক জনের রুহ মোবারকে পৌছবার নিয়ত করে তবে সবার মধ্যে তা বন্টন করে দেয়া হয়না বরং প্রত্যেককে পুরাপুরি সওয়াবই দেয়া হয় যা সেই ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়।

শায়খুল মাশায়েখ হযরত শাহ জালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও আসামের মুসলমান ইসলামের আবে হায়াত লাভ করেছেন, বিধায় ছহীহ হাদীস অনুসারে কিয়ামত পর্যন্ত ছদকায়ে জারিয়া হিসেবে ওরা সবাই তাদের আত্মার আত্মীয় ও একান্ত আপনজনের মত ডবল সওয়াব পাবেন। যেহেতু তাদের দ্বারা সর্ব প্রথম এসব অঞ্চলে ইসলামের আলো পৌছেছে। তাই এই সুন্নতে হাসানার প্রবর্তক হলেন এসব আউলিয়ায়ে কেরাম। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও মহান ত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন স্মৃতির মনিকোঠায় লিপিবদ্ধ থাকবে। অতএব, তাদের আনীত এ দ্বীন ইসলামের পথে যারা চলবে অনুসরণ করবে তাদের নেক আমলের ছওয়াবের আরেক গুণ ছওয়াব তারা লাভ করবেন।

এ মর্মে হাদিছ শরীফের অনুবাদ নিম্নরূপঃ "যারা কোন নেক কাজের প্রচলন জারী করবে তাদের জন্য রয়েছে সে কাজের প্রতিদান। পাশাপাশি যারা এ আমল (কাজ) করবে তা থেকে রয়েছে আরেক প্রতিদান। কারও পুণ্যের অংশ হ্রাস করা হবে না। এমনিভাবে যারা কোন পাপকাজের প্রচলন জারী করবে সে ঐ পাপ কাজের অংশ পাবে, প্রতিদান হিসেবে। এর পাশাপাশি যারা এ আমল করবে তাদের পাপের অংশ থেকে আরেক অংশ পাবে। কারও অংশ থেকে হ্রাস করা হবে না।

বিশেষত হযরত শাহজালাল (রহ.)এর রূহানী আওলাদ এতদঞ্চলের মুমিন মুসলমান। তাই নিজ পিতা মাতা রেখে যাওয়া আওলাদে ছালেহ বা নেক সন্তান দ্বারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

যেভাবে সওয়াব পেয়ে থাকবেন ঠিক তেমনি ভাবে হযরত শাহজালাল (রহ.) কোন অংশে এদের নেক আমলের অংশ থেকে সওয়াব কম পাবেন না। তাছাড়া বোনাস হিসাবে তাদের যাবতীয় দোয়া ও নেক আমলের সওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তাঁর ও সঙ্গী সাথী আউলিয়ায়ে কেরামদের আমলনামায় যোগ হতে থাকবে যতদিন এসব জনপদ ও মুমিন মুসলমান বেঁচে থাকবেন।

উরস-ই-শাহজালাল (রহ.)

'উরস' বিশেষ্য ও একবচন। 'উরস' এবং 'উরুস' অর্থ কনেকে স্বামীর নিকট পৌঁছানো ওলীমার খাবার। বহুবচনে আয়রাস ওয়া উরুসাত উরস উরসান বাব নাছারা হতে অর্থ খুশির মধ্যে থাকা।[১১৬]

আরীসা আরসান বাব সামি'য়া হতে অর্থ- ঘিরে রাখা, মহব্বত করা ইত্যাদি।

'উরস' মানে ফকীর দরবেশের জন্য উপহার।

পীর বুজুর্গদের ওফাত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বার্ষিক ফাতেহা শরীফের নামই হচ্ছে উরুস মোবারক। উরুস হচ্ছে ওলী দরবেশের মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁদের সমাধিস্থলে পবিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ। আউলিয়ায়ে কেরামের ওফাত দিবসকে 'উরস' নামে অভিহিত করার হেকমত এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর প্রেমিক আউলিয়াগণ ওফাতের মাধ্যমে ঐ দিন তাদের চির আকাঙ্খিত আল্লাহর দীদার ও রাসুল (সা.) এর জিয়ারত লাভ করেন। ঐ দিন আউলিয়াদের জন্য পরম আনন্দের দিন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ যখন কবরে মুনকির ও নাকির দুই ফেরেশতার সওয়ালের জবাব দিয়ে কামিয়াব হয়ে যান তখনই বেহেশতী ফেরেশতাগণ বেহেশতের দিকে দরজা খোলে ঐ বান্দাগনকে বেহেশতী জামা কাপড় পরিয়ে বেহেশতী বিছানায় শুয়ে দিয়ে বলেন, হাদীসের ভাষায় "নাম কানাউমাতিল আরুস লা ইউক্বায়ু ঈল্লা আহবাবু আলাইহি ইলাইহি।" অর্থাৎ- তুমি ঐ নূতন বরের ন্যায় ঘুমিয়ে পড় যাকে তাঁর বন্ধু ব্যতিত অন্য কেউ জাগ্রত করবে না।

ওফাতের মাধ্যমে আউলিয়ায়ে কেরামগন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিদার লাভ করেন আর এ দিদার বা সান্নিধ্য লাভ করাকেই হাদীস শরীফে উরসের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ওফাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালার সাথে আউলিয়ায়ে কেরামের সাক্ষাত নূতন দুলহার মতই আনন্দের। কারণ মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভই হচ্ছে মুমিন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।

ইসলামে উরস-ই-আউলিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। পীর ফকিরদের মৃত্যুদিবস কে স্মরণীয় বরণীয় করে রাখার জন্য উহা একটি যোগসূত্র।

প্রতি বছর ২০শে জিলক্বদ হযরত শাহজালাল (রহ.) উরস মোবারক প্রতিপালিত হয়। ১৯ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। উরস পালনের উদ্দেশ্যে এসে জমায়েত হয়ে মাজার জিয়ারত, কোরআন তিলাওয়াত, মিলাদ শরীফ, দুরুদ ও ইস্তেগফার পাঠ জিকির

---

১১৬. আল মুনজিদ, আরবী-উর্দু লুগাত, দারুল এশায়াত করাচি-১, জুলাই-১৯৭৫, পৃ- ৬৪১, ৬৪২ ও আল মায়জামুল ওয়াসিত (আরবী) পৃ- ৫৯২

Dhaka University Institutional Repository

আজকার গরীব-দুঃখীদের সাহায্য সহযোগিতা ও বিশেষ খাবার প্রদান করা হয়। ঐ দিন শাহজালাল (রহ.) এর ঐতিহাসিক ডেগ চুলায় বসানো হয়, শিরনী পাকানো হয়। আখেরী মোনাজাতের মাধ্যমে সওয়াব রেছানী করে শিরণী বিতরণ করা হয়। প্রতি বছর এভাবে কর্মসূচীর সমাপ্তি হয়। এ সমস্ত কর্মসূচী নিঃসন্দেহে সাদকায়ে জারিয়া মুলক নেক কাজ। ইছালে ছওয়াব হিসেবে উহা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম সকল মুমিন নর-নারীর রুহে বখশিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়।

উরস উপলক্ষে এসব ভালো কর্মসূচির পাশাপাশি পরিবশে দুষণীয় তথা কুরআন, সুন্নাহ পরিপন্থি বিদআত ও জগণ্য অপরাধমুলক কার্যকলাপ চলতে থাকে। এ সময় রাজ্যের লাউয়াশাহ, গদাশাহ, গাঞ্জাশাহ এমনকি ভন্ড পীর এবং পীরানিরা এক সঙ্গে মেলা দেন। গাঞ্জার দুর্গন্ধ এ পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত করে। দুর দুরান্ত থেকে বক্তরা এসে জমায়েত হয় পূণ্য লাভের আশায়। পীর-পীরানীর অবাধ চলাফেরা ও গান-বাজনা মেলার রূপ ধারন করে। কেউ কেউ বলে কারো মনে নাকি কোন কুমতলব উদয় হয়না। অবশ্যই মাজার শরীফে এলে সবার মন পবিত্র হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যে আউলিয়া বিবাহ করেন নি, যিনি কোন দিন নারীমুখ দেখেননি যার নজরে পড়ে গায়েব হয়ে গেলে বিবির মোকামের বিবি। শরীয়ত ও মা'রিফতের সম্রাট, জগত বিখ্যাত অন্যতম ওলী শাহজালাল (রহ.) এর মাজারে বিবিদের লীলাখেলা করতে দেয়া দরগাহ কর্তৃপক্ষের কতটুকু সুবিবেচনার কাজ হচ্ছে তা অবশ্যই বিচার্য। একদিন সবাই মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে নিজ কর্মের জন্য। আগুনের সংস্পর্শে ঘি গলে একথা যারা অস্বীকার করেন তারা হয় মিথ্যাবাদী, না হয় তাপের শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। [১১৭]

সহীহ হাদিছে উল্লেখ রয়েছে 'কুল্লুকুম রায়ীন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রায়িয়্যাতিহি"। অর্থাৎ- তোমরা সবাই এক একজন তত্ত্বাবধায়ক। তোমাদের যথার্থ তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব দলমত নির্বিশেষে আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে এ মহান ওলীর জীবন ও মিশনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে তা বাস্তবায়ন করা। সর্বোপরি যাবতীয় বিদআত, শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ চিহ্নিত করে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে দরগাহ কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করা। যাতে করে শাহজালাল (রহ.) এর প্রকৃত শিক্ষা ও দীক্ষার আলো থেকে দেশ ও জাতি সঠিক নির্দেশনা পেতে পারে।

---

১১৭. শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, পৃ- ১২৮, ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

০১. আল-কুরআনুল করিমঃ মুজমা'য় আল মালিক ফাহাদ, আল মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ, সাউদিআরব।

০২. আস-সুয়ুতি, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান, শায়খুল ইসলাম, তাফসীর জালালাইন, মুখতার এন্ড কোং, দেওবন্দ ইউ.পি ১৩৭৬হি.

০৩. আস-সুয়ুতি, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান, শায়খুল ইসলাম, আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, দিল্লী, কুতুবখানা ইশায়াতুল ইসলাম, তা.বি।

০৪. মুস্তাফিজুর রহমান ড. কুরআন পরিচিতি, ঢাকা, নুবালা পাবলিকেশন্স, ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

০৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামে, আস-সহীহ, দিল্লী কুতুবখানা রশিদিয়া ১৩০৫ হি. ১খ।

০৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামে, আস-সহীহ, করাচি, ক্বাদিমী কুতুবখানা, মুকাবিল আরামবাগ ১৩৮১হি, ২ খ.

০৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইবনে সাওরাতা, আত-তিরমিযি, ইমামুল আল্লামা, আল-জামে' আস-সহীহ, লিত-তিরিমিযি, মুখতার এন্ড কোম্পানী নাহিয়াল ইসলামী কুতুবখানা, দেওবন্দ, ১৯৮৫ঈ.

০৮. নূর মোহাম্মদ আজমী, মাওলানা, হাদিসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৬৬ঈ.।

০৯. সম্পাদনা পরিষদ, বিবাহ ও পারিবারীক জীবন সংক্রেন্ত মাসয়ালা ও মাসায়েল, ঢাকা, ইফাবা, জুন- ২০০৫ঈ.।

১০. আহমদ শায়খ মুল্লাজীরন (রহ.) ইবন আবি সাঈদ ইবনে উবায়দুল্লাহ, আল মানার, নুরুল আনোয়ার, মা'য়া কামরিল আকমার, দিল্লী আল মুজতবা মাতবা'য় ১৩৫৯ হি.

১১. আন নাসাফী আমার ইব্‌ন আহমদ, ইবনে ইসমাইল ইব্‌ন মোহাম্মদ (জ. ৪১৬ হি. মৃ. ৫৩৭হি.) উর্দু আকদুল ফারাইদ আলা শারহিল আকাইদ, অনুদিত মাওলানা মোহাম্মদ আলী চট্টগ্রাম, হাটহাজারী, জামিরিয়া লাইব্রেরী ১৩৯৭ হি.।

১২. ওয়ালী উল্লাহ হযরত মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.), আল কাউলুল জামিল, অনু. হাফিজ মাও. আব্দুল জলিল, ঢাকা হক লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম ২০০০ঈ.

১৩. আলী হাজবিরি, পীর কামিল মাখদুম সৈয়দ, (হযরত দাতাগঞ্জ বখশ নামে পরিচিত), কাশফুল মাহযুব, মুফতি গোলাম উদ্দীন কর্তৃক অনুদিত, রেব্বতী কিতাব ঘর, ইন্ডিয়া, ১৯৮৮।

১৪. শামছুল হক ফরিদপুরী মাওলানা, তাছাওওফ তত্ত্ব, ঢাকা, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স১৯৯৮ঈ.

১৫. মমতাজ উদ্দিন মাওলানা, ফাজেলে দেওবন্দ, আইনুল ইলিম, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.।

১৬. আব্দুর রশীদ ফকীর, সুফি দর্শন, ঢাকা, ইফাবা ১৯৮০ ইংরেজী।

১৭. মুশাহিদ আলী মাওলনা বায়মপুরী, আল ফুরকান বাইনাল হক্বে ওয়াল বাতীল, সিলেট, আহমদীয়া লাইব্রেরী, কানাইঘাট বাজার, ১৩৭৬ হি.।

১৮. আব্দুল লতিফ মাওলানা, ক্বারী, ছাহেব কিবলা ফুলতলী সিলেটী, আনোয়ারুস সালিকিন, মাওলানা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী, ফুলতলী ছাহেব বাড়ী ১৯৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. নাসির উদ্দিন হায়দার মুন্সেক, সুহেল-ই-ইয়ামন, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ ১৮৬০, এলাহি বক্স অনুদিত ১২৭৮ বা.

২০. মুর্তাজা আলী সৈয়দ, হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৬৫ঈ.।

২১. মুর্তাজা আলী সৈয়দ, হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, ঢাকা, এ.বি. বুক স্টোর্স, আজিমপুর, জানুয়ারী ১৯৭০ঈ.।

২২. শামসুল আলম এ.জেড. এম. হযরত শাহজালাল কুনয়াভী (রহ.), ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল লিঃ আগষ্ট ১৯৯৬ঈ.।

২৩. রহিম এম.এ.ড. (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনু.) বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৮ঈ. ১খ (১২০৩-১৫৭৬)।

২৪. আহমেদ শরীফ উদ্দিন, প্রফেসর, সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, জুলাই- ১৯৯৯ ঈ.।

২৫. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, হযরত শাহজালাল (র) ঢাকা, ইফাবা, জুন- ১৯৯৫।

২৬. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন, দেওয়ান, আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম, ঢাকা ইফাবা, জুন ১৯৯৫ঈ.।

২৭. চৌধুরী আবদুল মালিক, হযরত শাহজালাল, কলকাতা, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৩১ বা.।

২৮. আজহার উদ্দিন আহমদ মুফতি, সিদ্দিকী, শ্রীহট্ট ইসলাম জ্যোতি, সিলেট নভেম্বর ১৯৩৮ঈ.।

২৯. ফজলুর রহমান, সিলেটের একশত এক জন, সিলেট, ফখরুল কবির খাঁ, এপ্রিল ১৯৯৪ঈ.

৩০. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, সিলেট বিভাগের ইতিহাস, ঢাকা, সৈয়দা তাহেরা বেগম, লক্ষী বাজার, ২০০৬ঈ.।

৩১. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, হযরত শাহ জালাল দলিল ও ভাষ্য, ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৯৯ঈ.

৩২. শামসুল আলম, এ.জেড.এম. হযরত শায়খ জালাল (রহ.), ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৩ ঈ.।

৩৩. বজলুর রশীদ আ.ন.ম, আমাদের সুফী সাধক, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৭৭ ঈ.।

৩৪. চৌধুরী মোহাম্মদ মুসলিম, উজ্জ্বল এক পায়রা, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮০ঈ.।

৩৫. চৌধুরী গোলাম আকবর, সাহিত্য ভুষণ, ইসলাম জ্যোতি হযরত শাহজালাল (রহ.), সিলেট ১৯৭০।

৩৬. মুখোপাধ্যায় সুখময়, অধ্যাপক বিশ্ব ভারতী, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮), ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, প্যারিদাস রোড, এপ্রিল- ২০০০ঈ.।

৩৭. শহীদুল্লাহ মুহাম্মদ ড. ইসলাম প্রসঙ্গ, ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স লিমিটেড ১৯৬৩ঈ.।

৩৮. ফজলুর রহমান, সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, সিলেট, লে. কর্ণেল (অব.) আব্দুল মান্নান, এপ্রিল- ১৯৯১ঈ.

৩৯. গোলাম সাকলায়েন ড. পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৩৮৭বা.।

৪০. এলিফিনষ্টোন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, উদ্ধৃত বাংলা ও বাংগালী, মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, আব্দুল মান্নান মোহাম্মদ, ঢাকা, সৃজন প্রকাশনী ১৩৯৭।

৪১. এনামুল হক ড. মোহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮ঈ.।

৪২. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৯ঈ.

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. আব্দুল করিম ড. চট্টগ্রামে ইসলাম, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ঈ.।

৪৪. আমিরুল ইসলাম সৈয়দ, বাংলাদেশ ও ইসলাম, ১খ, ঢাকা ১৩৯৪ বা.।

৪৫. ইবনে খুরদাদ বিহ, কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক, হি. ৩৫০।

৪৬. মাসউদী, মারুজুয্‌ যহব, হি. ৩৪৬, উদ্ধৃত ড. এম. এ. রহিম।

৪৭. কৃত্তিবাস, রামায়ন ভূমিকা, আত্মকথা, কলকাতা ১৯২৬ ঈ.।

৪৮. নুরুল করিম অধ্যক্ষ ও আবুল কালাম আজাদ মোহাম্মদ, দাখিল ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, জানুয়ারী ২০০৪ঈ.

৪৯. মাহমুদুল হাসান সৈয়দ ড. বাংলার ইতিহাস প্রাচীন কাল হতে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত, ঢাকা, অধুনা প্রকাশন; আগষ্ট ২০০৩ঈ.।

৫০. আব্দুর রহিম মোহাম্মদ ড. প্রমুখ, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্থান, মার্চ ২০০৩ ঈ.।

৫১. মোস্তফা কামাল সৈয়দ, সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, সিলেট, রেনেসা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০০০ঈ.

৫২. আজরফ দেওয়ান মোহাম্মদ, সিলেটে ইসলাম, ঢাকা, ইফাবা, মে ১৯৯৫ঈ.।

৫৩. আবদুল করিম, বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, অনু. মোকাদ্দেসুর রহমান, ঢাকা ১৯৯৩।

৫৪. আহমদ হাসান দানী, শ্রীহট্ট নগরী লিপির উৎকর্ষ ও বিকাশ, বাংলা ভাষা ২ খন্ড হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৮০ঈ.।

৫৫. আব্দুল করিম, পাক ভারত মুসলিম শাসন, ঢাকা, ১৯৬৯ ঈ.।

৫৬. চৌধুরী কমলকান্ত গুপ্ত, শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস, সিলেট, সারদা প্রেস ১৩৪৭ বা.।

৫৭. চৌধুরী অচ্যুত চরণ, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২ খ. কলকাতা, বিজয় প্রেস ১৩১৭ বাংলা

৫৮. আব্দুর রহিম শ্রী মোহাম্মদ, শ্রীহট্ট নুর বা শাহজালাল মজররদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, কলকাতা, ক্রনিক্যাল প্রেস, শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দাস প্রিন্টার্স ১৯০৫ঈ.

৫৯. ওবায়দুল হক মাওলানা, তাযকিরাত-ই আউলিয়া, বাংলা, ফেনী হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৯ঈ.।

৬০. ইকরাম এস.এম. আবে কাওছার, লাহোর ফিরোজ সন্স, ১৯৫৯ ঈ.।

৬১. বারানী জিয়া উদ্দিন, তারিখে ফিরোজ শাহী, ভারত, বিবলিথিকা ১৮৯২ঈ.।

৬২. আব্দুল আজিজ মাষ্টার মোহাম্মদ, জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস, সিলেট লিপিকা প্রিন্টার্স, ১৯৬৫ ঈ.

৬৩. নিজামী মালিক আহমদ, দি লাইফ এন্ড টাইম অব ফরিদুদ্দীন গাঞ্জে শাকর, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫ঈ.।

৬৪. সুরেন্দ্র কুমার দাস শ্রী চৌধুরী, শাহজালালের মাটি, শ্রী ফনীন্দ্র চন্দ্র সাহা, কুন্টি চাঁদ প্রিন্টার্স, ওয়ার্ক শ্রীহট্ট, ১৩৪৪ বা.।

৬৫. ওয়াকিল আহমদ ড. মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, ঢাকা, ১৯৬৮ঈ.।

৬৬. সুহেল-ই ইয়ামন বা ইয়ামেনের নক্ষত্র (জালালী ইতিহাস) মুল নাসির উদ্দিন হায়দার মৌলভী সৈয়দ, অনু. মাও. মো. আব্দুল হাকিম, সিলেট, মোবাইল পাঠাগার, দরগাহ মহল্লাহ, ২০০১ঈ.।

৬৭. চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো, ঢাকা পাকিস্তান পাবলিকেশন্স ১৯৬৫ঈ.।

৬৮. গোলাম সারওয়ার, খাজিনাতুল আসফিয়া, নেওয়াল কিশোর লখনৌ ১৩২৫হি.।

৬৯. আব্দুল হক দেহলভী শায়খ, আখবারুল আখিয়ার, ফার্সি মাতবা মোহাম্মদী ১২৮৩ হি. উর্দু অনুবাদ করাচি ১৯৬৩ঈ.।

৭০. আবুল ফজল, আইন-ই আকবরী, ২য় খন্ড, কলকাতা ১৮০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৭১. জামালী মাওলানা, সিয়ারুল আরিফিন, দিল্লী ১৩১১ হি.।

৭২. খান রইছ উদ্দিন কে.এম. বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং ১৯৯৬।

৭৩. তালিব আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮০ ঈ.।

৭৪. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, ঢাকা, বাংলা একাডেমী জানুয়ারী ১৯৮৭ঈ.।

৭৫. মোস্তফা কামাল সৈয়দ, সিলেট বিভাগের পরিচিতি, সিলেট রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স, সেপ্টেম্বর ২০০৪ঈ.

৭৬. নাজির আহমদ এ.কে.এম. বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার জানুয়ারী ১৯৯৯ঈ.।

৭৭. এম.এ. রহিম ড. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনু মো. আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, মার্চ ১৯৮২, ১ম খন্ড।

৭৮. ফজলুল হাসান ইউসুফ ড. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৬ ঈ.

৭৯. আইনে আকবরী জ্যারেট কর্তৃক অনুদিত, ৩য় খন্ড, উদ্ধৃত গোলাম হোসেন সলিম, রিয়াজুল সালাতিনের বঙ্গানুবাদ, আকবর উদ্দিন অনুদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৪ঈ.

৮০. আইনে আকবরী, জ্যারেট কর্তৃক অনুদিত, ২য় খন্ড তাবকাতে নাসিরী, উদ্ধৃত বাংলার ইতিহাস।

৮১. আইনে আকবরী, জ্যারেট (১ম খন্ড)

৮২. খান আহমদ সৈয়দ, সম্পাদিত তুযুকই জাহাঙ্গীর, বোজায়ের উর্দু অনুবাদ।

৮৩. খন্দকার ফযলে রাব্বী, বাংলার মুসলমান মো. আব্দুর রাজ্জাক অনুদিত, বাংলা একাডেমী ১৯৬৮।

৮৪. আইনে আকবরী, ২য় খন্ড।

৮৫. আব্দুর রউফ সাহেব কাদিরী, দানাপুরী হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত, আসাহহুস সিয়ার ফি হুদান খাইরিল বাশার, ঢাকা, তা.বি।

৮৬. পানিপথি, ইসমাঈল শায়খ, মোহাম্মদ, মহি উদ্দিন অনুদিত, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, ঢাকা, ইফাবা, নভেম্বর ২০০৪ ঈ.

৮৭. খান বাহাদুর মো. হুসায়ন, আযাযিবুল আসফার, ২য় খন্ড, দিল্লী ১৯১৩ ঈ.।

৮৮. মজুমদার রমেশ চন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, কলকাতা।

৮৯. ইমাদ উদ্দিন মাওলানা চৌধুরী, আদর্শ গল্প সংকলন, সিলেট, ফুলতলী ছাহেব বাড়ী ২০০৪ ঈ.।

৯০. হিমাদ্রী শিখর রায়, সিলেট বিডি ইনফো ডট কম, ঢাকা ফকিরেরপুর, ২০০২ঈ.

৯১. আফজল মোহাম্মদ ডা. ও মোস্তফা কামাল সৈয়দ, হবিগঞ্জ পরিক্রমা, সিলেট ১৯৯৪ঈ.

৯২. এনামুল হক ড. মনীষা মঞ্জুষা, ঢাকা, মুক্তধরা, ১৯৮৪ঈ.।

৯৩. আল কাসিফী আলী ইবন আল ওয়াইজ, রাসাহাত নেওয়াল কিশোর প্রেস, কানপুর ১৯১১ঈ.।

৯৪. তালিব আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা, ইফাবা, ডিসেম্বর ২০০২ঈ.।

৯৫. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, জালালাবাদের কথা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ঈ.।

৯৬. সম্পাদনা পরিষদ, রাগীব আলী, সিলেট ২০০১।

৯৭. বাদায়ুনী, নিজাম উদ্দিন আহমদ, রাহাতুল কুলুব, মালফুযাতে শায়খ ফরিদুদ্দীন গাঞ্জে শাকর রচনাবলী. ৬৫৫/ ১২৪৫ লাখনৌ, তাবি।

৯৮. মোঃ বরকত উল্লাহ, মৌলভী, আনওয়ারুল আতকিয়া উর্দু অনুবাদ তাযকিরাতুল আউলিয়া, মুল কিতাব গ্রন্থকার হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার, ১৩৮০ হি. কলকাতা, মাতবায় কায়ুম খাঁন।

Dhaka University Institutional Repository

৯৯. আজহার উদ্দিন আহমদ, মুকতি সিদ্দিকী, শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, ঢাকা উৎস প্রকাশন ২০০২ঈ.

১০০. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ঈ.

১০১. শিবলী নোমানী ও সুলায়মান নদভী, আল্লামা, সিরাতুন্নবী অনুদিত মহি উদ্দিন খাঁন, ঢাকা প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১৯৭৪/১৯৯৭ ১ম ও ২য় খন্ড।

১০২. Enamul Hoque Dr. A. History of Sufism in Bengal, Dhaka 1975.

১০৩. Mohammad Gaushi, Maunduvi (1612-13) Gulzar-E-abrar, A.S.B Fiolio 41 Calcutta 1913.

১০৪. Abdur Rahim Muhammad, Social and Cultural History of Bangal Vol. 01 (1201-1576). Pakistan historical society. Karachi 1963.

১০৫. Azhar Uddin Ahmed, Shahjalal and his Khadims. Sylhet, Welsah Mission press 1914.

১০৬. Shams Uddin Ahmed, Inscription of Bengal, Rajshahi, 1960 Vol. IV.

১০৭. H.A.R Gibb, Ibn- batuta travels in Asia and Africa, London 1926.

১০৮. Khan Abid Ali, Memories of Goure and pandua. Stapleton Calcutta 1931.

১০৯. Khan M. H. Dr. An Early History of Technical paper manufacture in Bangla, Vol. XII the eastern library Dhaka 1968.

১১০. Jadunath sarkar (ed) History of Bangal Vo. 2 Muslim period (1200-1757), Published by the University of Dhaka 1948.

১১১. Hassan Askir, Bangal Past and Present, Vol. LXVII calcutta.

১১২. Chatargy S.K. The Origin and Development of the Bangali Language, London 1970.

১১৩. Nurul Haque Md. Arab Relationship with Bangladesh. M Phil Dissertation D.U. 1980.

১১৪. Nizami K.A. (Dr Md. Zakied) Arab Account of India during the fourteenth century. Idarah- 1, Adabiyat - 1, Aligarh Delhi 1981

১১৫. Dikshit K.N. Memoirs of the archaeological survey of India, No. 56 Delhi 1938

১১৬. A. Karim Social History of the Muslim in Bengla. Chitagong 1985.

১১৭. E. Hoque and A. Karim Arakan Rajsh bhaya Bangla Shailya. (Bengali litarachar in the arakan)

১১৮. Bernville suggests that name chittagong originated from the Arabs. S.N.H Rezi (ed).

১১৯. Richard symonds. The making of Pakistan Allies Book corporation Karachi 1966.

১২০. H.M. Sir, Ellial and John dowson professor. The History of India as toldby its own historians.

Dhaka University Institutional Repository

১২১. S. Muhmmad Hossyn nainar Arab, Giographers Knowledge of Soutthern India, University of Madras 1942.

১২২. Majumdar R.C. (ed),the history of Bengal Vol. 1 the University of Dhaka 1963.

১২৩. Hadivala S. Studied in indo Muslim history Bombay 1939.

১২৪. Taifoor S.M. Gilmses of old Dhaka. Dhaka 1956, Introductions.

১২৫. N.K. Bhuttasali, coins and chronology of the early Independent sultan of Bangal (ed).

১২৬. Historical Atlas of South Asia (ed). E. Joseph scholarly ileers. Chicago University press 1978.

১২৭. Diya al-din barani, Tarik E. Firuz Shahi Bibliotheca India 1892.

১২৮. A.H. Dhani Bibliography of The Muslim inscriptions of Bengal, Dkaha 1957.

১২৯. Bangladesh District Gazetteer, Sylhet, Dhaka 1974.

১৩০. Bangladesh District Gazetteer, Sylhet, 1974.

১৩১. Sylhet District Gazetteer, 1975.

১৩২. Hassan Mahdi Dr. The Rihla of Ibn Batuta, Baroda 1953.

১৩৩. হাসান দানী আহমদ, বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইন্সক্রিপশন অব বেঙ্গল, (জে.এ.এস.পি ঢাকা, ১৯৫৭) এপেনডিক্স- ২।

১৩৪. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি, জে.এ.এস.বি. কলিকাতা ১৯২২ ই.।

১৩৫. ব্রকম্যান ড. হায়মিট অব কুনিয়া, জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৩ খ্রী.।

১৩৬. ঢাকা রিভিউ, আগষ্ট ১৯১৩ ঈ.।

১৩৭. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা, ২ খ, ১৯৫৬।

১৩৮. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম- ১০, ডিসেম্বর ১৯৬৫।

১৩৯. জে.এ.এস.পি ভল্যুম- ২ ডিসেম্বর ১৯৫৫।

১৪০. ওয়াইজ ড. কলকাতা, জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৭৩ঈ.।

১৪১. মূল ভাষ্য আল সাকাফাত আল ইসলামিয়্যাহ ফি বিলাদ আল বাংগাল, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলসিলাতুল বহুছ কিসমুল উলুম আত তাওহীদ ওয়া আদদাওয়াত আল ইসলামিয়া, ১৯৯২ঈ. ২ খ।

১৪২. জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৪৪ ঈ.।

১৪৩. Journal of Asiatic society of Pakistan Vol. 2 Dacca 1957.

১৪৪. B.C Allen I.C.S. Assam District Gazzetteers. Sylhet, Vol. II, Sylhet 1905.

১৪৫. E.A Gait I.C.S History of Assam. Sylhet 1905.

১৪৬. Provincial Gazetteers of India. Eastern Bengal and Assam.

১৪৭. J. Wise Dr. Notes of Shahjalal, the Patron saint of Sylhet. Cited by H. Blochmann contribution to the Geography and History of Bengal. Muhammadan Period Calcutta 1873.

Dhaka University Institutional Repository

১৪৮. Journal of Asiatic Society of Bangal, Calcutta, May 1913.

১৪৯. J.A.S.B Calcutta 1844.

১৫০. Journal of the Asiatic Society of Bangal Calcutta (J.A.S.B) New series XVIII, 1922.

১৫১. বাংলা পিডিয়া, ঢাকা,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ- ২০০৩, খ- ১।

১৫২. বাংলা পিডিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি মার্চ ২০০৩, ৪ খ।

১৫৩. বাংলা পিডিয়া, ঢাকা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, খ-৫।

১৫৪. বাংলা পিডিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, খ-৬।

১৫৫. বাংলা পিডিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, খ-৭।

১৫৬. বাংলা পিডিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট, মার্চ ২০০৩, ৯খ।

১৫৭. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা, মার্চ ২০০৩, খ-১০।

১৫৮. উর্দু মাআরিফে ইসলামিয়া, দানিশগা পাঞ্জাব, লাহোর, ১৩৯১ হি/ ১৯৭১ ঈ. ৭ খ.।

১৫৯. মাহদী আল্লামা ড. দায়িরাতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়্যা (আরবী) দামেস্ক, সিরিয়া দারুল ফিকর, ২০ জুলাই, ১৯৩৩ ঈ. পৃ- ১৩।

১৬০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা, ইফাবা, নভেম্বর ১৯৮৭, ২খ.।

১৬১. ইসলামী বিশ্ব কোষ, ঢাকা ইফাবা, জুন ১৯৯৭, ২৩ খ।

১৬২. ইসলামী বিশ্ব কোষ, ঢাকা, ইফাবা, জুন ১৯৯৭, ১খ. ।

১৬৩. The world Book encyclopedia Vol. 2, U.S.A. 1988.

১৬৪. মাসউদ জুব'রান আর রায়িদ, আধুনিক আরবী অভিধান, বাইরুত লেবানন, জানুয়ারী ১৯৮৬ ই. ২ খ.।

১৬৫. বাংলা একাডেমী চরিতাবিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৫ঈ.।

১৬৬. আল মা'জামুল ওয়াসিত, দেওবন্দ, কুতুবখানা, ইউ.পি দারুল উলুম দিল্লী, মার্চ ১৯৭২।

১৬৭. ফিরুজুল লুগাত, উর্দু, করাচি, ফিরোজ সন্স লিমিটেড জানুয়ারী ১৯৬৭ঈ.।

১৬৮. আল মুনজিদ, আরবী উর্দু লুগাত, দারুল এশায়াত, করাচি-১, জুলাই- ১৯৭৫ঈ.

১৬৯. চিশতী আব্দুর রহমান প্রণীত, মিরআতুল আসরার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পান্ডুলিপি নং- ১৬ এ আর।

১৭০. চিশতী আব্দুর রহমান প্রণীত, মিরআতুল আসরার, মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, পান্ডুলিপি নং এম.এ ১২। ১৯-২০।

১৭১. মেহরাব আলী, একশত তেইশ হিজরীর শিলালিপি দিনাজপুর যাদুঘর, সিরিজ নং- ৪

১৭২. ৯১৮ হি./ ১৫১২ ঈ. উৎকীর্ণ হোসেন শাহী শিলালিপি, ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত।

১৭৩. ঢাকা ডায়রি ১৯৯৯ঈ.।

১৭৪. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফিদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭) পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬ঈ.

১৭৫. আব্দুল লতিফ মুহাম্মদ, শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মুনিরী ও নুর কুতুবুল আলম (রহ.) সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপরে তুলনামূলক সমীক্ষা, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৬. মোঃ শহীদুল ইসলাম নিজামী, মাওলানা মুহাম্মদ মুশাহিদঃ জীবন কর্ম ও চিন্তা, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, (অপ্রকাশিত) ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।

১৭৭. মাসিক শ্রীভূমি করিমগঞ্জ, শ্রীভূমি কার্যালয়, ভাদ্র ১৩২২ বাং।

১৭৮. অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ঢাকা, ইফাবা ১৯৮৮ঈ.।

১৭৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৭ শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৯৮৭ ঈ.।

১৮০. মাসিক ভারতবর্ষ, ২৯বর্ষ, ২খ, পৌষ ১৩৪৮ বাংলা।

১৮১. আল ইসলাহ, শাহজালাল সংখ্যা, ২৬শ বর্ষ, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৫৪ঈ.।

১৮২. আল ইসলাহ, শাহজালাল সংখ্যা, সিলেট কেমুসাস, ১৩৬৪ বাংলা।

১৮৩. আল ইসলাহ, সিলেট, কেমুসাস, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৬৪ বাংলা।

১৮৪. আল ইসলাহ হযরত শাহজালাল সংখ্যা জানু- মে ২০০৪ঈ.।

১৮৫. মাসিক পরওয়ানা জানুয়ারী ১৯৯৩ঈ. ঢাকা ফকিরেরপুল।

১৮৬. ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ইফাবা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫ঈ.।

১৮৭. ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ইফাবা, ৩৯বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন- ২০০০ঈ.

১৮৮. ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ইফাবা, ৩৯বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন- ২০০৩ঈ.

১৮৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮১, ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

১৯০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮৯, অক্টোবর-২০০৭।

১৯১. অগ্রপথিক ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ইফাবা ১৯৮৯ঈ.

১৯২. বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবন ১৩২৯ বা. ৫ম বর্ষ।

১৯৩. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবন-আশ্বিন ১৩৭২ বাংলা।

১৯৪. ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ ১৯৮৪ঈ.।

১৯৫. সাপ্তাহিক যুগভেরী, সিলেট। ৩১/১২/৮৪ঈ.।

১৯৬. দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পাদকীয় ১০/১২/২০০৩ঈ.

১৯৭. বাংলাদেশ অবজারভার ২৭/১২/৮৪ঈ.

১৯৮. আবদুল করিম, অধ্যাপক ড. সাক্ষাতকার দৈনিক ইনকিলাব ২১/০২/২০০৩ঈ.

১৯৯. দৈনিক ইত্তেফাক ২৯ জুলাই ১৯৯৩ঈ.

২০০. দৈনিক বাংলা ২০ এপ্রিল ১৯৮৬ঈ.।

২০১. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ১৬ জানুয়ারী ২০০০ঈ.

২০২. The Citizen, Publish by the District Council Sylhet, Sep- 1963 Vol. No. 2

২০৩. The Daily Star January 14, 2004.

২০৪. দৈনিক সিলেটের ডাক, ২৫/১১/২০০৮ঈ.

২০৫. দৈনিক মানব জমিন ১৪ জানুয়ারী ২০০৪ঈ.

২০৬. দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারী ২০০৪ঈ.

২০৭. The Bangladesh observer 14, January 2004

২০৮. দৈনিক সিলেটের ডাক, ২৪ জানুয়ারী ২০০৪।